মেয়েরা যেমন হয়

মেয়েরা যেমন হয়

সমরেশ মজুমদার

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

মেয়েরা যেমন হয়

॥ ১ ॥

প্রথমে একটা কথা স্বীকার করে নেওয়া ভাল যাতে কেউ ভুল না বোঝেন। আমার জ্ঞানগম্যি খুবই কম, যা দেখি তাই সত্যি বলে মনে করি। আর সেটা প্রায়ই ঠিক হয় না। বন্ধুরা এসে যখন টাকা ধার চায় তখন তাদের করুণ মুখের প্রতিশ্রুতি শুনে বিশ্বাস করি ঠিক সময়ে ফেরৎ পাবো। দশ জনের ন'জন কথা রাখেনি। এই লেখার শিরোনাম দেখে অনেকেই আমার বোকামি ধরতে পারবেন। স্বয়ং ঈশ্বর যা বুঝতে পারেননি বলে চাউর আছে তা আমার মতো মূর্খ কি করে বুঝবে। কিন্তু মুশকিল হলো অন্ধ মানুষ তাঁর নিজের মতন করে হাতির আকৃতি নির্ধারণ করেন। এই নির্ধারণ হয়তো সেইরকমই কিন্তু যেভাবে আমি তাঁদের দেখেছি তাতে নিজের বিশ্বাস থেকে সরে যাওয়ার কোনো কারণ এখন পর্যন্ত ঘটেনি। মেয়েরা কেমন হয়—এর একমাত্র উত্তর তাই, মেয়েরা যেমন হয়।

আমার জীবনের প্রথম নারী, বেশিরভাগ মানুষের যেমন হয়ে থাকে তেমন ঘটেনি। যিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন তাঁকে আমি চিনেছি অনেক পরে। পৃথিবীর যেকোনো মানুষীর শরীরে যখন সন্তানের সাড়া প্রথমবার জাগে তখন তাঁর কাছে বিপুল বিস্ময় এবং ভীতির ব্যাপার হয়। স্বামী এবং স্ত্রীর যৌথজীবনে সেই প্রাণ আগন্তুকমাত্র, মাতৃস্নেহ তখনও অজাত। পুরুষ এবং নারীর নিবিড় সম্পর্কের পাথরে একটু একটু করে ফাটল ধরিয়ে ভূমিষ্ঠ হবার সময় শিশু মাতৃমনে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে স্নেহভালবাসা আদায় করে নেয়। আমিও হয়তো সেইভাবেই ভদ্রমহিলার মনে জায়গা নিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে সেই ভদ্রমহিলার পরিচয় আমার বাবার স্ত্রী হিসেবে ছিল না, বাড়ির বউ অথবা বউমা হিসেবে স্বীকৃত ছিল। আমাকে জন্ম দেওয়ামাত্র তাঁর বালবিধবা ননদ এগিয়ে এলো। এসবের পর গর্ভধারিণী অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমার বেঁচে থাকার রসদ সদ্যসন্তানবতী আর এক মহিলার কাছ থেকে আহরণের ব্যবস্থা করলেন সেই সন্তানহীনা বিধবা মহিলা যিনি আমার পিসিমা না মা তা বুঝতে অনেক বছর লেগে গিয়েছিল।

জীবনের প্রথম চার বছর আমরা একত্রে বাস করেছি। সেই বাসের সময় যেমন পিতার কোনো ভূমিকা ছিল না তেমনি আমার গর্ভধারিণীও পর্দার আড়ালে ছিলেন। পনের ষোল বছরের একটি শ্যামলা কিশোরী যার বাবা স্টেশনমাস্টারের চাকরির সুবাদে বিভিন্ন অজ স্টেশনে বাস করতে বাধ্য হয়েছেন তার পড়াশুনা বেশিদূর এগোতে পারেনি। দাদামশাই ছিলেন অত্যন্ত

নরম স্বভাবের মানুষ। বড় হয়ে, যখন আমার বারো বছর বয়স তখন তাঁর সঙ্গে একটা গোট
রাত আমি বারসই স্টেশনে কাটিয়েছিলাম পরের সকালে বাস ধরে বালুরঘাট যাব বলে
ভদ্রলোক তখন চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। একেবারে একা তাঁর সঙ্গে আগে কখনও
থাকিনি। সেই বৃদ্ধকে প্রচণ্ড অসহায় লাগছিল সেই রাত্রে। আমার কষ্টের কথা তো ভাবছিলেনই
কিন্তু কথাটা তাঁর মেয়ের শ্বশুরমশাই শুনলে যে প্রতিক্রিয়া হবে তা ভেবে কূল পাচ্ছিলেন না
অথচ স্ট্যাটাসের দিক দিয়ে দুজনেই তো সমান ছিলেন। কিন্তু পৃথিবীতে কোনো কোনো মানুষ
নিজের স্বভাব অনুযায়ী অন্যের ওপর তীব্র প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। আশেপাশের মানুষকে
তটস্থ করে রাখার ক্ষমতা তাঁরা কিভাবে আয়ত্ত করেন তা জানি না কিন্তু আমার পিতামহ সেই
জাতের মানুষ ছিলেন। ত্রুটি পেলে নিজের বেহাইকে শাসন করতে তিনি ছাড়তেন না।

এইরকম এক রাশভারী জাঁদরেল ভদ্রলোক পুত্রের জন্যে যখন পাত্রী সন্ধান করবেন তখন
তাঁর কথাই যে শেষ কথা তা বলা বাহুল্য। কিন্তু তিনি কেন এক অজ স্টেশনমাস্টারের শ্যামল
মোটাসোটা কিশোরীকে পুত্রবধূ হিসেবে নির্বাচন করলেন তা বোঝা মুশকিল। আমার জীবনের
প্রথম নারী, যাঁকে পিসিমা বলে ডেকে এসেছি, তিনি অবশ্য প্রচণ্ড প্রশংসা করতেন, 'কি চুল
ছিল ওর, একেবারে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকত, কি তার গোছ। আমি তো চুল বেঁধে
দিতে হিমশিম খেতাম। ইচ্ছে হতো কেটে দিই মাঝখান থেকে। কিন্তু বাবার হুকুম ছিল, চুল
ছোট করা চলবে না। আর মুখখানা? ঢলঢলে, মা লক্ষ্মী।'

আমার যখন চৈতন্য ফুটেছে তখন সেই চুল প্রাকৃতিক নিয়মে পিঠের মাঝখানে উঠে
এসেছে। সেসময় তাঁকে মা না ভেবে দিদি ভাবতে ইচ্ছে করত। বিয়ের পর এ বাড়িতে ঢুকে
নানা রকমের শেকল তাঁকে পরে ফেলতে হলো। তবে তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন ওরকম এক
ননদকে পেয়ে। পিসিমা মাকে আগলে রাখতেন। পিতৃদেবের সঙ্গে একা কোথাও যাওয়ার প্রশ্ন
উঠত না। ইচ্ছে হলেও একা বাড়ির সামনের বিশাল মাঠে হাঁটাহাঁটি করার কথা ভাবতে পারে
না। ভোর ভোর ঘুম থেকে উঠে বেশ পরিবর্তন করে কাঠের উনুন ধরানো তাঁর প্রথম কাজ
সেই যে তিনি রান্নাঘরে ঢুকলেন অমনি সেটাই তাঁর পৃথিবী হয়ে গেল। একটু বেলা বাড়লে
পুজোআর্চার পাট চুকিয়ে তাঁর ননদ অবশ্যই সেখানে যোগ দেন কিন্তু একটি বৃদ্ধ চাকরের
সাহায্যে তাঁকে রেঁধে যেতে হবে একটার পর একটা পদ। তাঁর শ্বশুরের রুচি এবং স্বাদ অনুযায়ী
সেসব রান্না অতি সতর্কভাবে রাঁধতে হয় কারণ একটু ব্যতিক্রম ঘটলে ভদ্রলোক আহার ত্যাগ
করে উঠে যেতে পারেন। সবার খাওয়া চুকলে তবে স্নান এবং খাওয়া। ননদ এবং ভাজ দূরে
রেখে খেতে বসেন। একজন আমিষ অন্যজন নিজের হাতে নিরামিষ রেঁধে নিয়েছেন। সেসময়
গল্প হয়। এগার বছরে বিয়ে এবং বারো বছরে বিধবা মহিলা তাঁর পিতৃদেবের মেজাজের বিভিন্ন
গল্প শোনান। এই করতে করতে প্রায়-বিকেল। সেসময় পুরুষেরা বাড়িতে থাকে না। বিছানায়
আধঘণ্টা গা এলানো যায়, সঙ্গে মাসিক প্রবাসী অথবা বসুমতী অথবা সচিত্র ভারত। এই একটি
পথ পৃথিবীর খবর পাওয়ার। সন্ধ্যে নামার আগেই হ্যারিকেন জ্বেলে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে
তারপর চায়ের ব্যবস্থা করতে সেই যে রান্নাঘরে ঢোকা একেবারে রাতের খাবার শেষ না হলে
আর বেরুনোর উপায় নেই। একমাত্র শুক্রবারের সন্ধ্যের খবরের পর ভেতর বারান্দায় গি

মোড়া টেনে বসার সুযোগ হয়। তখন রেডিওতে নাটক হয়। বাড়িসুদ্ধ লোক নরেশ মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরীদের গলা শোনে, তাঁরাও। আর এই করতে করতে ষোল বছরে এ সংসারে আসা কিশোরী কখন মধ্যবয়সিনী হয়ে যান তা নিজেও জানতে পারলেন না। তখন তাঁর চারপাশে অনেকগুলো সন্তান। শ্বশুরমশাই অবসর নিয়ে বিধবা কন্যা এবং বড় নাতিকে নিয়ে চলে গিয়েছেন শহরে। তখন একমাত্র চিন্তা ছেলেমেয়েগুলোকে ভালভাবে বড় করে তোলা। পা-ছোঁয়া চুলের ঢাল তখন ইতিহাস।

ওই ভদ্রমহিলা, যিনি আমার গর্ভধারিণী, তাঁকে আমার মা হিসেবে ভাবতে পারিনি অনেক কাল। মা শব্দটির বিরাটত্ব এবং তার আর্কষণ অনুভব করিনি কারণ আমি মানুষ হয়েছি পিসিমার কাছে। সেই বালবিধবা তথাকথিত অশিক্ষিতা মহিলাই আমার হাতেখড়ি দিয়েছেন, আমাকে আগলেছেন এবং চার বছর বয়স থেকে তো তাঁর সঙ্গেই আলাদা ছিলাম। পাঁচ-ছয় বছর বয়সে অসুখ-বিসুখ হলে পিসিমার একটা কথা শুনতে আমার খুব খারাপ লাগত। অদ্ভুত গলায় তিনি বলতেন, 'কি করে অসুখ বাধালি তুই, পরের ছেলে এনে রেখেছি যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে কি জবাব দেব!' যিনি আমায় বুকে আগলে রেখেছিলেন তিনি কেন পরের ছেলে বলবেন? একদিন প্রশ্নটা করেছিলাম, তিনি তখন বলেছিলেন, 'তুই তো আমার পেটে হোসনি যে নিজের ছেলে বলব?'

সেই সন্তানহীনা মহিলার গর্ভে আমি জন্মাইনি এই যদি আমার অপরাধ হয় তবে তার জন্যে আমার কি দায়িত্ব ছিল তা ওঁকে বলতে পারিনি। কিন্তু আমার সঙ্গে ওঁর আচরণ যা ছিল তা মা-সন্তানের নয় একথা আমি কখনই বুঝতাম না, যদি তিনি নিজে প্রায়ই সেকথা বলতেন।

কেন বলতেন? সন্তান না হওয়ার আক্ষেপ থেকে? নাকি সেই গ্রাম্য মানসিকতা? এককালে পরপর কয়েকটি সন্তান মারা যাওয়ার পর মা নবজাতক সন্তানকে দেবতার উদ্দেশে দান করে দিয়ে কেয়ারটেকার হিসেবে মানুষ করতেন। ভাবখানা এমন এবার দেবতার সন্তান হয়ে গেল যে তাকে আর দেবতা কেড়ে নেবেন না। বালক বয়সেও নিজের সন্তান বলে মা দাবী করতেন না এই ভয়ে যে করলেই সন্তানের যদি বিপদ হয়? এই যে অভিনয় তা করার মতো ক্ষমতা ওঁদের ছিল। বারংবার মনে হতো পিসিমাও একই শক্তির অধিকারিণী।

গর্ভধারিণী যখন তাঁর শ্বশুরকে দেখতে আসতেন (ভুলেও ছেলেকে দেখতে আসছি বলতেন না, তাতে স্বার্থের গন্ধ পাওয়া যেত বলে) তখন পিসিমা তোর ছেলে এই করেছে, ওই করেছে বলে আমার সম্পর্কে যাবতীয় অভিযোগের ডালি তাঁর সামনে সাজিয়ে দিতেন। গর্ভধারিণী চুপচাপ শুনতেন। তাঁর মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা যেত না। শেষ পর্যন্ত হয়তো বলতেন, 'ওকে মারেন না কেন? দুষ্টুমি করলেই মারবেন।'

পিসিমার মুখ ভার হয়ে যেত পরামর্শ শুনে, 'তুই কি রে! মা ছাড়া ছেলেটা এখানে রয়েছে আর তাকে আমি মারব।' কথাটা শোনামাত্র মা প্রসঙ্গান্তরে চলে যেতেন। পিসিমাও তাতে খুশি হতেন। আমার খুব রাগ হতো গর্ভধারিণীর ওপর। ক্রমশ ভাবতে ভাল লাগত তিনি আমার ভাইবোনেদের মা আমার নন।

শ্বশুরমশাই এবং বিধবা ননদ শহরে চলে যাওয়ার পর গর্ভধারিণী নিশ্চয়ই কিছুটা স্বাধীনতা

পেয়েছিলেন। তখন স্বামী এবং সন্তানেরা চারপাশে। সেইসময় প্রথম পুত্রের অভাব তিনি কতটা অনুভব করতেন আমি জানি না। মানুষীর একাধিক সন্তান থাকলে একজনের অভাব কি আর একজনকে দিয়ে পূর্ণ করা সম্ভব? হয়তো! হয়তো নয়! তবে এর দীর্ঘ সময় বাদে, যখন পিতামহ অথবা পিসিমা পৃথিবীতে নেই, পিতার শেষ কাজ করতে আমি ছুটে গিয়েছি কলকাতা থেকে। গিয়েছে আমার মতো সব ভাইবোনেরাও। দেখলাম তিনি শক্ত আছেন। সব যখন শেষ হয়ে গেল তখন ভিড় কমতে লাগল। ভাইবোনেরা ফিরে গেল যে যার নিজের জায়গায়। প্রত্যেকেই এখন সংসারী হয়েছে, নিজের জগৎ তৈরি করেছে। পিতামহের তৈরি বাড়িতে গর্ভধারিণী ছিলেন এবং থাকবেন আমাদের কনিষ্ঠ জনের সঙ্গে। যেদিন আমি চলে আসছি, সেই বিদায় মুহূর্তে তিনি হঠাৎ সশব্দে কেঁদে উঠলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এখন থেকে আমি কার কাছে থাকব?'

আমি কেঁদে উঠলাম। আমার সমস্ত জীবন পেরিয়ে জীবনের শুরুর সময় ওঁর সঙ্গে যে গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছিল মুহূর্তেই সেটাকে খুঁজে পেলাম।

যেসব সন্তানের সঙ্গে তিনি অনেককাল কাটিয়েছেন তাদের বিদায়মুহূর্তে তো এভাবে ভেঙে পড়েননি। যাকে তিনি ভূমিষ্ঠ হবার পর স্তন্যদান করতে পারেননি অসুস্থতার জন্যে, চার বছর বয়সে যার দখল নিয়ে চলে গেছে ননদিনী, তার কাছেই এই প্রশ্ন এতগুলো বছর পরে কেন করলেন? প্রথম সন্তান বলে? নাকি প্রথম ভালবাসা!

আমি বিশ্বাস করি না অপরিচিত কোনো পুরুষকে মেয়েরা বিয়ের দিন থেকে ভালবাসতে পারে। যেহেতু স্বামী তাই ভালবাসতেই হবে এমন বোধ বাঙালি মেয়েদের মধ্যে ঢোকানো হয়ে থাকে কিন্তু সেটা স্বাভাবিক নয়। হয়তো একসঙ্গে থাকতে থাকতে একসময় ভালবাসা তৈরি হয় কারো কারো ক্ষেত্রে কিন্তু বেশিরভাগই পরস্পরকে মেনে নিয়ে দীর্ঘকাল যাপন করেন। মেনে নিয়ে না বলে মানিয়ে নিয়ে বলাটাই সঠিক। সেক্ষেত্রে নারীর প্রথম ভালবাসা অবশ্যই তার সন্তান। অনেক সুখ অনেক উদ্বেগ এবং প্রচণ্ড যন্ত্রণা দিয়ে নিজস্ব যে মানুষটিকে নারী পৃথিবীতে নিয়ে এল তার বদলে সে পেল ভালবাসার স্বাদ। আবার স্বামীর যৌন আচরণ বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়েছে যে নারীকে সে কিছুতেই সন্তানকে নিজের বলে ভাবতে পারে না। ভালবাসার জন্মের পেছনে সুস্থতা দরকার।

এই যে জন্মমাত্র আমি গর্ভধারিণীর সঙ্গ ছাড়া এতে ওঁর কোনো ভূমিকা ছিল না। তিনি নির্লিপ্ত থাকতেন কারণ বিধবা ননদকে দুঃখ দিতে চাইতেন না, আমাকে তিনি কখনই জড়িয়ে ধরেননি, চুমু খাননি। কারণ বাঙালি মেয়েরা অন্যের সামনে তো বটেই একান্তে হলেও নিজের সন্তানকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে এই সেদিনও সক্ষম ছিলেন না। কোথায় যেন তাঁদের আটকাতো। পঞ্চাশ বছর আগে তো ব্যাপারটা ভাবতেই পারতেন না তাঁরা। বিশেষত সন্তানের বয়স যদি দশ পেরিয়ে যায় তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু কোনো এক বিশেষ সময় এবং পরিস্থিতি এলে সেই ভালবাসা আর পাথরচাপা থাকে না, থাকতে পারে না। তার প্রকাশ অনিবার্য।

এখনও তাঁর সঙ্গে আমার বছরে কয়েকদিনের জন্যে দেখা হয়। দেখা হলে পাশাপাশি বসে

আমরা কথা বলি। যেসব পরিচিত মানুষ চলে গিয়েছেন তাঁদের কথা, যারা আছে তাদেরও। স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে কোনো ভুল হলে তিনি সেটা ধরিয়ে দেন। যেসব কাহিনী এখন কেউ জানে না আমার মুখে সেসব শুনে তিনি বিস্মিত হন। আমি টের পাই তিনি বন্ধু হয়ে উঠছেন। এবং তখন আমি আবিষ্কার করি আমার গর্ভধারিণীর কোনো বন্ধু ছিল না। না, আমার বাবাও সেই জায়গা নেবার কথা কখনও ভাবেননি। পিসিমা হয়তো হতে পারতেন কিন্তু আমার প্রতি অত্যধিক স্নেহ সেই ভদ্রমহিলাকে অন্ধ করে রেখেছিল।

এবং পিসিমা! আমার জীবনের প্রথম নারী। যিনি কথা বলতে ভালবাসতেন। শহরের বিরাট বাড়িতে আমরা তিনজন থাকতাম। পিতামহ তাঁর নিজস্ব জগতে বাস করতেন। আমি আর পিসিমা তাই ঘনিষ্ঠ। তাঁর কথা বলার মানুষ নেই আমি ছাড়া। শ্রোতা হিসেবে আমি খুবই ভাল ছিলাম। নিজের অজান্তেই তিনি তাঁর কথা কখনও সখনও বলে যেতেন আমাকে।

এগার বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল নদীয়ার এক যুবকের সঙ্গে। যুবকের বয়স কুড়ি। তিনি ছিলেন সুদর্শন এবং সেকালের এনট্র্যান্স পাশ। পিতামহ তাঁকে চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বিয়ের পর এগার বছরের মেয়েটি যে আটবছরেই মাতৃহারা রওনা হয়েছিল শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে। অনেক নদী মাঠ পেরিয়ে নদীয়ার গ্রামে পৌঁছেছিল সে। আট দিন বাদে দ্বিরাগমনে ফিরে আসা। পৌঁছে দিয়ে স্বামী গিয়েছিল আসামে, এক আত্মীয়ার বাড়িতে। সেখানে কিছুদিন থাকার পর তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেন। সেই অসুখ সারল না। বিধবা হবার পর শ্বশুরবাড়ির মানুষ তাঁকে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু পিতামহ রাজী হননি। তখন সেই বালিকার হৃদয় জুড়ে এক কুড়ি বছরের সুদর্শন যুবকের ছবি, যার নাম দেবেশ। ক্রমশ ছবিটা বিবর্ণ হয়ে গেল, শেষ পর্যন্ত মুছেও গিয়েছিল কিন্তু নামটি উজ্জ্বল হয়েছিল আমৃত্যু। পিসেমশাই কি খেতে ভালবাসতেন তাও তাঁর স্মরণে সঠিক ছিল। কখনও স্কুলের বন্ধুদের বাড়িতে এনে কাউকে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় দেবেশ নামটি উচ্চারণ করেছি আর দেখেছি পিসিমা কিছুতেই সেই বন্ধুর প্রণাম নেননি। অন্যদের যে খাবার দিয়েছেন দেবেশকে তার থেকে আলাদা এবং যত্নের। এটা লক্ষ্য করে মাঝেমাঝেই এক একজনকে দেবেশ সাজিয়ে আনতাম। এখন এসব ভাবলে খুব খারাপ লাগে।

পিতামহ তাঁর কন্যার পুনর্বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মশাই তখনও শ্রদ্ধেয়। কিন্তু পিসিমা রাজী হননি। কেন হননি ? আমি চলে গেলে তোর দাদুকে কে দেখবে ? কেন ? একবার তো গিয়েছিলে তখন কে দেখত ? আহা, তখন তো আমার বয়স কম ছিল, কেউ পাত্তা দিত না, আঠারো বছরে তো সেটা সম্ভব নয়। তাহলে দাদুর জন্যে তুমি বিয়ে করলে না ? তিনি মাথা নাড়তেন।

অথচ পিতামহের সঙ্গে তাঁর খুব ঝগড়া হতো। দুজনে দুই মেরুর ছিলেন। কথায় খোঁটার গন্ধ পেলে কেঁদে ভাসাতেন। আবার অশক্ত পিতামহের মলমূত্র নিজের হাতে পরিষ্কার করতে দ্বিধা করতেন না। একসময় আমার চোখে একজন বৃদ্ধ অন্যজন মধ্যবয়সিনী ছিলেন। তারপর একজন বৃদ্ধই অন্যজন প্রৌঢ়া হলেন। শেষতক দুজনেই বৃদ্ধবৃদ্ধায় রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। বাবা-মেয়ের এমন সম্পর্ক আমি আর কখনও দেখিনি।

তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে আমি ছুটে গেলাম কলকাতা থেকে। অসুস্থ তো বটেই, জ্ঞান ছিল না তাঁর। চুপচাপ শুয়ে আছেন আমার পিসিমা। মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ছে। আমি অনেকবার নিচু গলায় কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে তাঁকে ডাকলাম। একটুও প্রতিক্রিয়া হয়নি। নার্স বললেন উনি এখন আর শুনতে পাবেন না, ডেকে লাভ নেই। শরীরে প্রাণ আছে অথচ এ কিরকম প্রাণ ?

তিনি আমার গর্ভধারিণী নন অথচ আমার জননী। তাঁর অনড় শরীরের পাশে বসে মনে হয়েছিল কোনোকালেই আমার ভালবাসা শ্রদ্ধা ভক্তি তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে পারিনি। আমি সারা জীবন ধরে দুহাত ভরে নিয়েই গিয়েছি। পৃথিবীর মায়েরা তাঁদের সন্তানদের ভালবাসেন— এই ভালবাসার প্রকাশ কত সহজে বোঝা যায়। কিন্তু একমাত্র যত্ন করা অথবা কথা শোনা ছাড়া সন্তানরা তাদের মাকে ভালবাসছে বোঝাবার উপায় নেই।

এ জীবন শুরু হয়েছিল ওই দুই মহিলাকে নিয়ে। একজন ছিলেন আমাকে আড়াল করে, অন্যজন আড়ালে আড়ালে। তারপর কত মুখ কত জীবনের সংস্পর্শে এলাম, নদীর মতো এক এক ঘাট ছুঁয়ে এগিয়ে চলা, চোখ বন্ধ করলে তাদের ছবি অন্ধকারে ভেসে বেড়ায়। আমার এই লেখা সেইসব মানুষীকে নিয়ে যাঁদের ঈশ্বর বোঝেননি, আমি আমার মতো বুঝে নিয়েছি। ঈশ্বর আছেন কিনা জানি না কিন্তু সেইসব ঈশ্বরীরা ছিলেন এবং আছেন।

তখন আমি সতের বছরের তরুণ। মুখে হালকা গোঁফ দাড়ি, কামাবো কি কামাবো না ঠিক করতে পারছি না, স্কুলের শেষ পরীক্ষার ফল বের হলো। যেন মুক্তির স্বাদ পেলাম। সেই সকালে ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে সাইকেল নিয়ে আমরা চার বন্ধু জলপাইগুড়ি শহর চষে বেরিয়েছিলাম। কলকাতায় পড়তে যাব, স্বাধীনতা তুমি এসে গেছ এমন ভাব আর কি ! ইচ্ছে করে মেয়েদের স্কুলের সামনে টহল মেরেছি। দেখেছি কেউ কেউ কান্নায় ভেঙে পড়েছে। ছেলেরা স্কুলের শেষ পরীক্ষায় ফেল করলে কাঁদে না, মেয়েরা, অন্তত তখন, কাঁদত। এখন স্বীকার করছি, মেয়েদের কাঁদতে দেখলে একটুও ভাল লাগত না। না, দুঃখে নয়, কাঁদলে মেয়েদের মুখ কি বিশ্রী হয়ে যায় এটা জানা থাকলে মনে হয় অধিকাংশ মেয়ে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে কাঁদত। অবশ্য আমি সশব্দে কান্নার কথা বলছি। নিঃশব্দে কান্না অবশ্য এক শিল্প।

যেদিন জলপাইগুড়ি থেকে ট্রেনে উঠব সেদিন পিসিমার যেন নিশ্বাস ফেলার সময় ছিল না। বারংবার ছুটে আসছেন আমার কাছে, কি নিয়ে যেতে হবে মনে করিয়ে দিয়ে আবার চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছেন। মেয়েরা বিয়ের পর দিন শ্বশুরবাড়িতে চলে যাওয়ার সময় বাবার যে অবস্থা হয় ঠিক তেমনি পিসিমার অবস্থা। দাদু গম্ভীর। পাঁচটায় ট্রেন, বাড়ি থেকে দশ মিনিট দূরে স্টেশন অথচ দুটো থেকে তাগাদা দিচ্ছেন তৈরি হবার জন্যে। চারটের সময় যখন টিনের স্যুটকেস আর সতরঞ্চির বেডিং নিয়ে রিকশায় উঠব তখন পিসিমা মুখে আঁচল ঢেকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। প্রণাম করতেই বললেন, 'সাবধানে থেকো বাবা। কলকাতা খুব খারাপ শহর। শুনেছি ডাইনিরা ঘুরে বেড়ায় সেখানে। কখনও কোনো মেয়ের সঙ্গে মিশবে না। মেয়েদের ছায়া মাড়াবে না। মনে থাকবে ?'

সরল গলায় প্রশ্ন করেছিলাম, 'কেন ?'

'যা বলছি তাই শোন। তোমার ছেলেবেলায় এক তান্ত্রিক এসে বলে গিয়েছিল অনেক মেয়ে আসবে জীবনে। সেই থেকে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি।' পিসিমার মুখে শঙ্কা ছিল।

আমার এই লেখা সেই ভদ্রমহিলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত যিনি মহিলা হয়েও মহিলাদের ভয়ে কাঁটা হয়েছিলেন আমার জন্যে। হয়তো কথার কথা কিন্তু আমার মনে কৌতূহলের জন্ম দিয়েছিলেন তিনি, এটাই সত্যি।

লিখতে গিয়েই তার মুখ মনে এল।

আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আমি কখনও গোছানো নই। বালক দত্ত লেনে যখন থাকতাম তখন সেই ছোট্ট ঘরে কোনো খাট ছিল না, বালিশের পাশেই জুতো চলে আসত অনেক সময়। ছেলেবেলায় বকুনি শুনতাম, কোনো ভাল জিনিস আর কিনে দেওয়া হবে না বলে, কারণ আমি যত্ন করে রাখতে জানতাম না। যার আটে হয় না তার কি আশীতেও হয় ?

যদি গোছানো হতাম তাহলে আমার একটা খাতা থাকত যাতে জীবনে যাদের দেখেছি তাদের নাম পর পর লিখে রাখতাম এবং আজ গল্প বলার সময় তালিকা অনুযায়ী আসত, আগে পরে নয়। স্বভাবে নেই যখন তখন মনে যে আসছে তাকে নিয়েই শুরু করা যাক।

কোপেনহেগেন শহরের মাঝখানে বাস থেকে নেমে স্যুটকেস ফেরৎ নিতে গিয়ে আমার চক্ষু চড়কগাছ। তিনি হাঁ হয়ে আছেন। সদ্য দেশ থেকে কেনা নতুন স্যাটকেসে আমি একটু বেশি জিনিস না হয় ভরেছিলাম তাই বলে এমন হাল হবে ? গায়ের জোরে তার মুখ বন্ধ করতে চেষ্টা করছি। বাসস্ট্যাণ্ড তখন প্রায় ফাঁকা। এইসময় রোগা মতন এক প্রৌঢ় ডেনিস ভাষায় আমাকে যে প্রশ্ন করলেন তার বিন্দুবিসর্গ বুঝলাম না। কথা বলে টের পেলাম তিনি ইংরেজি জানেন না। তাই বাংলায় বললাম, 'স্যাটকেসের পেট ফুলে গেছে। বন্ধ করতে পারছি না।'

তিনি মাথা নাড়লেন। তারপর কোমর থেকে একটা লম্বা ফিতে খুলে আমাকে দিলেন। আমি অবাক। ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনের এক ডেনিস সাহেব দড়ি দিয়ে প্যান্ট বেঁধেছেন ? ওঁকে খুব আপন মনে হলো। বাল্যকালে জলপাইগুড়িতে এমন কাণ্ড খুব স্বাভাবিক ছিল। হাতলের ভেতর ফিতে ঢুকিয়ে স্যাটকেসটাকে ভদ্রস্থ করলাম। বিদ্যাসাগর হবার জন্যে এইরকম দড়ি বাঁধা স্যুটকেস নিয়ে একসময় মফস্বলের ছেলেরা কলকাতায় আসত।

ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। এবার হাসলেন। বাংলায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'সস্তার হোটেল

কোথায় পাব ?'

'হোটেল ?' ওঁকে চিন্তিত দেখাল। তারপর হাত তুলে একটা রাস্তা দেখিয়ে দিলেন।

আকাশে চমৎকার হালকা রোদ। এখন বিকেল। এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি এখানে এসেছি। ভাষা না জানলে দেখছি বাংলা চমৎকার কাজ দেয়। রাস্তাটার নাম ভেস্টারব্রোগেড। একটু এগোতেই হোটেলটা পেয়ে গেলাম, 'অ্যাবস্যালন'। বাইশ ডলার দিয়ে ঘর পাওয়া গেল, চমৎকার সাজানো হোটেল। রিসেপশনিস্ট ছেলেটি জানালো স্নানের জন্যে গরম জল পাওয়া যাবে।

ঘরে ঢুকে মন ভাল হলো। ছিমছাম ঘর। একটা টিভিও রয়েছে। এখন তো সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু বাইরে কড়া রোদ। বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কোথায় জলপাইগুড়ি অথবা কোলকাতা আর কোথায় আমি ? স্নান সেরে চুল আঁচড়াতেই খিদে পেল। ঠিক করলাম হোটেলের ভেতর যে রেস্তোরাঁ সেখানে ঢুকব না। নিশ্চয়ই গলা কাটবে। বাইরে বেরিয়ে কোনো ফাস্ট ফুড-এর দোকান খুঁজব। বিদেশে কয়েকবার গিয়ে বুঝেছি নিজের পয়সায় দামী রেস্তোরাঁতে যায় নির্বোধরা। আমার মতো মানুষের জন্যে চমৎকার দাঁড়িয়ে খাবার জায়গা ইউরোপ আমেরিকায় সর্বত্র ছড়ানো। এগুলো খুঁজে বের করতে গেলে একটা লাভ হয়। জায়গাটা ভাল করে দেখা যায়। আলাপ জমাতে পারলে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

একটু সেজেগুজেই বের হলাম। বিদেশে বেশিদিন ঘুরলে জামাপ্যান্টের হাল করুণ হয়ে ওঠে। এই যাত্রায় কোনো বঙ্গসন্তানের কাছে উঠিনি বলে বিনি পয়সায় সেগুলো ধোয়ানোর উপায় ছিল না। তবু বাঁচিয়ে রাখা পোশাকটাই অঙ্গে চড়ালাম। আমার স্যুটকেস ফুলে ওঠার কারণও সেটাই।

রিসেপশনে চাবি দিতে ছেলেটা সুন্দর হাসল। বললাম, 'নতুন এসেছি, আপনার কোনো উপদেশ আছে ?' ছেলেটা একটা কার্ড বের করে ইংরেজিতে বলল, 'পাসপোর্ট আর টাকাপয়সা সাবধানে রাখবেন। পকেটে খুচরো রাখবেন সবসময় যাতে অসুবিধে হলে টেলিফোন করতে পারেন।'

ডলার ভাঙিয়ে ক্রোনার নিলাম বেশ কিছু। তারপর হোটেলের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাস্তায় মানুষজন তেমন নেই। কেমন ঘুম ঘুম ভাব চারপাশে। এখানে রাত নামে কখন ? খাবারের কথা রিসেপশনিস্টকে বলার পাত্র আমি নই। একটা ফাস্ট ফুডের দোকান নিজেই বের করে নিতে পারব। উল্টোদিকের একটা দোকানের সাইনবোর্ড চোখে পড়ল, 'টপলেস গার্ল অ্যাণ্ড বিয়ার'। ব্যাপারটা কি ? বিজ্ঞাপনের চমক ?

ডানদিকের রাস্তা ধরে হাঁটছি। আমার নজর খাবারের দোকানের দিকে। একটা ব্লক পেরিয়ে দ্বিতীয়টার ফুটপাতে উঠে অস্বস্তি হলো। ফুটপাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে কিছু ছেলে মেয়ে। বেশিরভাগের পরনে শর্টস আর গেঞ্জি। ছেলেগুলোর মুখে বিশ্রী দাড়ি। প্রায় প্রত্যেকের শরীরে ময়লা জমে জমে বিচিত্র চেহারা নিয়েছে। কেউ মাউথ অর্গান বাজাচ্ছে, কেউ বা টিনের কৌটো বাজিয়ে শব্দ করছে। শক্তসমর্থ চেহারার মানুষগুলো ভিখিরী নয় আবার হিপি

বলে ভাবতেও পারছি না। একটি মেয়েকে তো সোফিয়া লোরেনের মতো মনে হলো। এত ভাল ফিগার পশ্চিমবাংলার কোনো মেয়ের নেই। কিন্তু হাঁটুর ওপর ময়লা জমে যে চেহারা নিয়েছে তাতে জন্মসূত্রে পাওয়া গোলাপী রঙটি যেন লজ্জায় মর মর। আমি যে ফুটপাত ধরে যাচ্ছি তা ওরা ধর্তব্যের মধ্যে নিচ্ছে না। পা সরিয়ে জায়গা করে দেবার বিন্দুমাত্র বাসনা নেই। অতএব আমাকেই রাস্তায় নেমে এগোতে হলো। সানফ্রানসিসকোয় দেখেছি হিপিরা রাস্তায় জড়ো হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের সাজগোজে বেশ ঘটা আছে। আর পাঙ্কদের তো স্টাইলই শেষ কথা। এরা কারা ?

আর একটু এগোতেই একটা ফাস্ট ফুডের দোকান দেখতে পেলাম। দোকানদার ছাড়া কাউন্টারের এপার ওপারে কোনো মানুষ নেই। ভেতরে ঢুকলাম। কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ। মেনু টাঙানো রয়েছে দেওয়ালে। একটা হটডগ আর মিল্কশেক নিলে দু-ডলারের বেশি দিতে হবে না। তারই অর্ডার দিলাম। লোকটা মাথা নেড়ে ভেতরে চলে গেলে সিগারেট ধরালাম। কাউন্টারে প্লেট রেখে দাঁড়িয়ে খেতে হবে, মন্দ কি !

'হাই !' খসখসে গলা পাশ থেকে ভেসে এল।

মুখ ফেরাতেই মেয়েটাকে দেখতে পেলাম। সেই সোফিয়া লোরেন। তখন বসেছিল বলে বুঝতে পারিনি, এ যে দেখছি লম্বায় প্রায় আমার চোখের সমান।

'একটা সিগারেট নিতে পারি ?' এরকম খসখসে গলা একমাত্র সোফিয়াদেরই মানায়।

প্যাকেটটা দিতে গিয়ে সামলে নিলাম, একটা বের করে এগিয়ে ধরতে সে দুই আঙুলে তুলে নিয়ে ঠোঁটে লাগাল। ইশারায় জানাল আগুন দরকার। ধরিয়ে দিতে ইচ্ছে হলো না। বাধ্য হয়ে দেশলাইটা দিলাম। বিদেশে আমাদের মতো দেশলাই দেখা যায় না। মেয়েটি সেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে চোখ তুলল, 'বোম্বে ?'

আমি মাথা নাড়লাম। এ বোধহয় একটু আধটু ইংরেজি বলতে পারে। সিগারেট ধরিয়ে সে যেভাবে টান দিল তাতে বুঝলাম নির্ঘাৎ গাঁজা খাওয়ার অভ্যেস আছে। চোখ বন্ধ. মুখ লাল। মেয়েটির পরনে একটা তেল-চিটচিটে গেঞ্জি। ওর মূল রঙ কি ছিল তা বোধহয় কোনোদিন জানা যাবে না। গেঞ্জির নিচে প্যান্টটারও সেই অবস্থা। বোধহয় ফুলপ্যান্ট ছেঁটে ফেলা হয়েছে। চুলগুলো একেবারে ছেলেদের মতো ছাঁটা বলে তাতে জট পাকায়নি। সারা শরীরে ময়লা দাগ, কতদিন স্নান না করলে এরকমটা হয় ঈশ্বর জানেন।

অথচ মেয়েটির দিকে তাকালে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। এমন বাড়াবাড়ি রকমের যৌবন নিখুঁতভাবে কোনও মানুষীর শরীরে ঈশ্বর দিতে পারেন তা একে না দেখলে জানতাম না। মেয়েটি যে অন্তর্বাস পরেনি তা অন্ধও বলে দিতে পারে।

আড়চোখে দেখলাম মেয়েটির হাতে আমার দেশলাই তখনও রয়েছে। সেই হাত কাউন্টারের ওপর নাচছে। আমি সতর্ক হলাম। বিদেশে এমন উদ্ভট মেয়ের অনেক কাহিনী শোনা যায়। এরা পকেটমার অথবা কোনো অপরাধী চক্রের একজন হতে পারে। তাছাড়া, এত কাছাকাছি দাঁড়ানো মহিলাটির শরীরে কোনও অসুখ আছে কিনা তাও তো জানা নেই। ইউরোপ আমেরিকায় এইড্স তো মুড়িমুড়কির মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে। এর শরীরের বাইরে যত নোংরা তার

একাংশ যদি ভেতরে থাকে তাহলে আর দেখতে হবে না।

দেশলাইয়ের মায়া ত্যাগ করে দেখলাম সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। মেয়েটি উদাস গলায় বলল, 'মা-ই-গু!' যেন সিগারেটের মতন আমিও তেমন কিছু জোরালো নই।

এইসময় সেলসম্যান খাবার নিয়ে এসে আমার সামনে রাখল। হটডগ দেখতে তেমন ভাল নয়। আমি অনেক রকম দোকানের হটডগ খেয়েছি। এক মধ্যরাতে শিকাগো শহরের স্কচি ম্যাকডোনাল্ডে যেরকমটি খেয়েছিলাম তা কোনোদিন ভুলব না। সবে ছুরি বসিয়েছি এমন সময় মেয়েটি ফিসফিস করে বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে। অর্ডার দাও, প্লিজ।'

বলে কি মেয়েটা। আমি না শোনার ভান করলাম। কিন্তু ঠিক খাবার পাশে একটি অভুক্ত নারী দাঁড়িয়ে থাকলে খাবারের স্বাদ কতখানি ভাল লাগে?

কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়ানো লোকটি ইশারায় জিজ্ঞাসা করল মেয়েটিকে খাবার দেবে কিনা? সন্দেহ হলো এদের মধ্যে একটা সমঝোতা আছে।

'তোমাকে দেখে একটুও শক্ত লোক বলে মনে হয় না। প্লিজ, বলো।'

অগত্যা বললাম। নারীর অনুরোধ স্বয়ং ঈশ্বর উপেক্ষা করতে পারেন না, আমি তো কোন ছার। বললাম, 'একটা হটডগ।'

লোকটি মাথা নেড়ে চলে গেল। আমি চুপচাপ খেতে লাগলাম।

'আপনি কি একাই এসেছেন?'

মাথা নাড়লাম। ঠিক করলাম খাওয়া শেষ করে দুজনের দাম মিটিয়ে চলে যাব। হঠাৎ একটি ছেলে ঢুকল। ফুটপাতের ওই নোংরাগুলোর একটা। ছেলেটি চিৎকার করে কিছু বলতেই মেয়েটা তার চেয়ে উঁচু গলায় ধমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি, বছর পঁচিশের একটি যুবক, হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। ওর দাড়িগোঁফভর্তি মুখ বেঁকেচুরে একাকার। কান্নার শব্দে আমি হতভম্ব, খেতে ভুলে গেলাম। মেয়েটি এগিয়ে গেল ছেলেটির সামনে। বুকে হাত দিয়ে নিচু গলায় কিছু বলল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি জড়িয়ে ধরল মেয়েটিকে। অনর্গল কথা বলে যেতে লাগল কান্নাজড়ানো গলায় যার বিন্দুবিসর্গ আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। মেয়েটা জননীর মতো ছেলেটির মাথায় গায়ে হাত বোলাতে লাগল। অনুমান করলাম, অভিমানজনিত অভিযোগের জবাবে মেয়েটি নরম হাতে সান্ত্বনা দিতে চাইছে।

এইসময় সেলসম্যান মেয়েটির হটডগ নিয়ে এল। দেখামাত্র মেয়েটি ছুটে গেল খাবারটা নিতে। লম্বা খাবারের একটা দিক দাঁতে কেটে বাকিটা নিয়ে তখনও ফোঁপানো ছেলেটার সামনে এসে আহা তুতু জাতীয় আওয়াজে কাঁদে না কাঁদে না বলে খানিকটা মুখে ঢুকিয়ে দিল। ছেলেটি খাবারের স্বাদ পাওয়ামাত্র সেটা কামড়াতে লাগল। মেয়েটা তখন তাকে ঠেলে একটু একটু করে রেস্টুরেন্টের বাইরে বের করে দিল।

প্রায় রাজেন্দ্রাণীর মতো একগাল হাসি নিয়ে ফিরে এল মেয়েটি। তখনও হটডগের শেষ প্রান্ত তার হাতে। এসে বলল, 'আমার স্বামী।'

আমি এতটা আন্দাজ করিনি, মাথা নাড়লাম। প্রেমিক গোছের কাউকে ভেবেছিলাম

'খুব নরম মন। অল্পেই কেঁদে ফেলে। বন্ধুদের কেউ বুঝিয়েছে তোমার সঙ্গে আমার কিছু

চ্ছে, ব্যস, হাঁউমাউ করে চলে এসেছে। যা কিছু করার তা ওর সামনে করতে হবে।' মেয়েটিকে যন স্বামীগর্বে গরবিনী বলে মনে হলো।

'ওর সামনে ?'

'আর বলো না। সেটা সবাই রাজী হবে কেন ? যাক, এখন অন্তত ঘণ্টা দুয়েক কোনো চিন্তা নেই। আমার হটডগটা ও খেয়ে নিল, আরও কিছু বল।'

'অসম্ভব।'

'কেন ? সকালে একটা বানরুটি খেয়েছিলাম। তারপর সলিড খাওয়া কিছু হয়নি।'

'তাতে আমার কি করার আছে ?'

'বাঃ, ধরো আমি যদি এখন তোমার সঙ্গে ঘণ্টা দুয়েক থাকি তাহলে আমি সুস্থ ভাবে থাকি তাই তো তুমি চাইবে, চাইবে না ?'

'তোমাকে আমার সঙ্গে থাকতে হবে না।'

'তাকি হয় ? আমি কি ভিখিরী ?'

'আমি তো সেকথা বলিনি।'

'নিশ্চয়ই বলেছ। তোমার কি মনে হয় আমি যার তার কাছে খাবার চেয়ে খাই ?'

'তা নয়। আমি বলেছি তোমাকে এর জন্যে আমার সঙ্গে কাটাতে হবে না।'

'কেন ? কি রাজকার্য করবে তুমি এখন ?'

আচ্ছা ঝামেলায় পড়েছি। কোনো জবাব না দিয়ে খাবারের দাম মিটিয়ে দিয়ে বাইরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই মেয়েটা আমার পাশে চলে এল, 'আমার স্বামীকে আমি বলেছি তুমি বিদেশি। এই কোপেনহেগেন ঘুরিয়ে দেখানোর জন্যে তুমি আমাকে অ্যাপয়েন্ট করেছ। এখন এভাবে চলে গেলে ওর কাছে আমার মুখ থাকবে না।'

দাঁড়ালাম, 'কিন্তু আমি কি করতে পারি ?'

'আমি পেট ভরে খাওয়ার পর আমরা ওসব নিয়ে না হয় আলোচনা করব।'

'দ্যাখো, আমার কোনো গাইডের দরকার নেই। তুমি এখন কাটো।'

'কেন ? আমার অপরাধটা কি ?' সে ফুটপাতে নেমে এল।

'জানি না।' আমি হাঁটা শুরু করলাম।

সে ছুটে এল পাশে, 'কেন ? আমার শরীর কি সুন্দর নয় ?'

'অত ময়লা জড়ানো থাকায় সেটা কেউ বুঝবে না।'

বলামাত্র সে থেমে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে হেসে উঠল। প্রথমে কোমরে পরে মুখে হাত দিয়ে হাসিতে এমন ভাবে ভেঙে পড়ল, আমার পক্ষে চলে যাওয়া সম্ভব ছিল না। অথচ দাঁড়িয়ে থাকারও কোনো মানে হয় না। দেখলাম, মেয়েটির সঙ্গীরা ফুটপাতে শুয়ে বসে আমাদের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে।

কোনোমতে হাসি বন্ধ করে মেয়েটি বলল, 'আমাকে একটা সাবান আর গরম জল দাও, গুলো দুই পা বেয়ে নেমে যাবে।'

'সেটা তোমার সমস্যা। বাই।' আমি জোরে জোরে হাঁটতে লাগলাম। মেয়েটা উত্তেজিত

হয়ে কিছু বলতে বলতে আসছিল। আর তখনই ওর সঙ্গীরা ঠ্যা ঠ্যা করে হাসতে লাগল। হাসির সঙ্গে অদ্ভুত গলায় মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছিল তারা। হঠাৎ মেয়েটি গলা পাল্টালো। এবার ইংরেজি নয়, ডেনিস ভাষাতেই সম্ভবত চিৎকার করতে লাগল সে। আর একমাত্র গালাগাল না দিলে ওইভাবে চিৎকার করা যায় না এটা আমি যৌবনের শুরু থেকে দেখে এসেছি।

ওর সঙ্গীদের এড়াতে ফুটপাত থেকে নেমে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। এবার মেয়েটির সঙ্গে আর একটি পুরুষকণ্ঠ মিশেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম ওর স্বামীটিও জুটেছে। দুজনে ছুটে আসছে আমার পেছনে। যে শব্দগুলো ওরা ব্যবহার করছে তা ওরাই জানে কিন্তু অভিব্যক্তি দুজনের একধরনের।

হোটেলের দরজায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। ভয় হলো, ওরা আমার ঘর পর্যন্ত ধাওয়া করবে কিনা। তাহলে রক্ষে নেই। চটপট ভেতরে ঢুকে রিসেপশনিস্টকে বললাম ব্যাপারটা। ছেলেটা হাসল, 'না, না। অ্যাবস্যালন হোটেলে ঢোকার সাহস ওদের কখনও হবে না। কোন মেয়েটা বল তো ? লম্বা, ভাল ফিগার ?'

'হ্যাঁ।'

'বুঝেছি। ওর নাম সোফিয়া।'

'কি ? সোফিয়া ? নিশ্চয়ই বলবে না ও সোফিয়া লোরেন ?'

'টাইটেল তো জানি না। সোফিয়া লোরেন আবার কে ?'

আগে অবাক হতাম এখন হই না। খোদ আমেরিকার মানুষই যখন তাদের প্রেসিডেন্টের নাম জানে না, রাজধানী কোথায় বলতে পারে না তখন এই ডেনিস যুবক তার জন্মের আগে বিখ্যাত ইতালিয়ান অভিনেত্রীর নাম নাও শুনতে পারে।

'তিনি একজন অভিনেত্রী ছিলেন।'

'ওহো, নো ! ও অভিনয়-টভিনয় করে না।' ছেলেটা হাত নাড়ল। তারপর গলার স্বর বদলে গেল ওর, 'এসব মেয়ের সঙ্গে একদম কথা বলবেন না। আপনাকে দুটো নাইট ক্লাবের ঠিকানা দিচ্ছি। একটা ওয়াটারলু নাইট ক্লাব, আর একটার নাম ফেলিনি। খুব ভাল। চমৎকার বান্ধবী পেয়ে যাবেন। একটু বেশি খরচ হবে। তা খরচ করে নিরাপত্তা কেনা নিশ্চয়ই যায়।'

নাইট ক্লাবে গিয়ে ডলার ওড়াবার সাধ্য আমার নেই। তবু কার্ড দুটো নিলাম। বললাম 'তোমাদের হোটেলের পাশেই ওদের দল রয়েছে। যেতে আসতে কোনো অসুবিধে হবে না তো ?'

'না না। এরা যদি কোনো টুরিস্টকে বিপদে ফেলে তাহলে এদের বারোটা বেজে যাবে।'

ঘরে ফিরে এলাম। মেয়েটিকে কি বলা যায় ? আমাদের দেশে যারা রাস্তায় শুয়ে থাকে তাদের সঙ্গে এর তফাৎ আছে। আবার হিপি বা পাঙ্কও নয়। দিনের পর দিন না খেয়ে আছে একথা স্বাস্থ্য দেখলে মনে হয় না। তাহলে ?

রাত আটটা নাগাদ ঘুম ভাঙল। কিন্তু আকাশে তো এখনও বেশ রোদ। উঠে পড়লাম। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে বছরের একসময় রাত গুটিয়ে যায়। এখন বোধহয় সেই অবস্থা। জানলার পর্দা টেনে ঘুমাবার চেষ্টা করেন বিদেশিরা। এরা অভ্যেস করে ফেলেছে।

বাইরে বের হলাম। দেখলাম ফুটপাত ফাঁকা। একটু ঠাণ্ডা বেড়েছে। হলুদ রোদ নেতিয়ে আছে বাড়িগুলোর ওপরে। রাস্তায় চমৎকার ছায়া। আর সেই ছায়ায় দুপাশের দোকানগুলোর নিওন জ্বলে ওঠার চেষ্টা করছে। ওরা কোথায় গেল কে জানে!

হাঁটতে গিয়ে রেস্টুরেন্টগুলোর বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল। আসল আমেরিকান পিজ্জা। বারোশো মোমবাতির আলোয় ডিনার। শেলফিস স্যান্ডউইচ। এখনই ডিনার খাওয়ার বাসনা আমার নেই। টিভোলিতে চলে এলাম। রাত বারোটায় বাগান বন্ধ হয়। শুনেছি পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর এই টিভোলি পার্ক, কিন্তু আজ আমি ওখানে ঢুকব না। একটা শহরকে প্রথমে পায়ে হেঁটে দেখে নেওয়া উচিত। কাল সকালে এসে আঠাশি ক্রোনার দিয়ে একটা ট্যুর পাশ কিনে নেব যাতে পার্কের ভেতর পঁচিশ রকমের মজার কাণ্ড দেখতে অসুবিধে না হয়।

হঠাৎ চোখে পড়ল, নিওন আলোয় জ্বলছে, 'টপলেশ মহিলা আপনাকে খাবার দেবেন।'

একটি না, পাশাপাশি অনেকগুলোতে টপলেশ শব্দটা বিভিন্নভাবে সাজানো।

পিগ্যাল, সোহো, ম্যানহাটন অথবা সোনাগাছি, চরিত্র প্রায় প্রত্যেকের আলাদা। শুনেছি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান শহরগুলোতে যৌনতা নিয়ে তেমন গোঁড়ামি নেই। এই পাড়াটিকে কিন্তু মোটেই রেডলাইট এরিয়া বলে মনে হচ্ছে না। সোহো বা পিগ্যাল নিজস্ব এলাকা তৈরি করে আছে সোনাগাছির মতো। এখানে সামনেই বাচ্চাদের স্কুল দেখছি। চার্চের ঘণ্টাও কানে আসছে। তাহলে?

সামনে যে দোকানটি তার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে একটা সরু প্যাসেজ দেখতে পেলাম। প্যাসেজের গায়ে ডিনার শব্দটিতে তীর এঁকে ওপরে উঠে যেতে বলা হয়েছে। ডানদিকের দরজায় লেখা রয়েছে ওল। ওল মানে যে বিয়ার সেটা ভিতরে ঢুকে বুঝলাম। একটা ছোট ঘর। কাউন্টারের এপাশে জনা দশেক লোক দাঁড়িয়ে বিয়ার খাচ্ছে। পেছনের শো-কেসে হরেক রকমের বিয়ারের ক্যান আর বোতল। বিয়ার পাব বলা যেতে পারে এটাকে। বিয়ার খেতে আমার খারাপ লাগে না কিন্তু মোটা হবার ভয়ে সেটা থেকে দূরে থাকি। এখানে এসেছি যখন এক পাত্র খাওয়া যাক এইরকম ভেবে এক কোণায় দাঁড়ালাম। আমার বাঁ দিকে একজন মধ্যবয়স্ক ডেনিস চোখ বন্ধ করে গ্লাস শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রলোক আউট নাকি? এইসময় পাশের দরজা দিয়ে কাউন্টারের ওপাশে প্রচণ্ড ব্যস্ততা নিয়ে যিনি উদয় হলেন তাঁকে দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ। প্রত্যেকের গ্লাস আড়চোখে দেখতে দেখতে আমার কাছে পৌঁছে তিনি থামলেন: সঙ্গে সঙ্গে হাসি ফুটে উঠল রঙ করা ঠোঁটে, 'কি দেব?'

কি দেবেন ইনি? আমার গলা ততক্ষণে শুকিয়ে কাঠ। শৈশবে চা বাগানে থাকতাম। সেখানে ঝরনার জলে মদেশিয়া মেয়েদের স্নান করতে দেখেছি। বয়স অল্প বলে আমাকে উপেক্ষা করে তারা পরিষ্কার হতো। সেই বয়সে দৃশ্যগুলো আমার কাছে মোটেই অস্বাভাবিক বলে মনে হতো না। বছর দশেক আগে এক আদিবাসীদের গ্রামে গিয়েছিলাম। মায়েরা স্বচ্ছন্দে শিশুদের স্তনাপান করাচ্ছিল প্রকাশ্যে। বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হতে দেখিনি তাদের। বরং আমাদের তাকাতে অস্বস্তি হয়েছিল। তাকানোটাই যেন অপরাধ বলে মনে হয়েছিল।

আজ এখানে মাত্র আড়াই ফুট কাউন্টারের ওপাশে যে দীর্ঘাঙ্গিনী সুন্দরী দাঁড়িয়ে প্রশ্ন

করছেন তাঁর নিম্নাঙ্গে একটি লাল স্কার্ট যা হাঁটুর জোড়ায় আটকে গেছে। ঊর্ধ্বাঙ্গে আকাশের মুক্ততা। তিনি যে মুক্তবক্ষ এটা তাঁরই যেন জানা নেই।

'ইয়েস। নো ড্যানিস ?' ওঁর চোখ ঘুরল। গলা খসখসে।

'নো।'

'ইংলিশ ? ওয়ান্ট বিয়ার ? ক্যান বিয়ার। মেড ইন জার্মানি !'

মাথা নাড়তেই তিনি পেছন ফিরে একটা হ্যানিকেন তুলে নিয়ে গ্লাসে ঢেলে ফেললেন। ওঁর পিঠে ছিটে ছিটে দাগ। মেয়েদের পিঠ বড় পবিত্র হয়। মহিলা বিয়ারের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে হাসতেই আমার মনে হলো একে আমি চিনি। কারও সঙ্গে যেন খুব মিল। মনে তার মুখ আসামাত্র আমি অবাক হয়ে আবার তাকালাম।

আজ বিকেলে যাকে ফাস্ট ফুডের দোকানে নাটক করতে দেখলাম তার সঙ্গে এর এত মিল হয় কি করে ? এরা কি দুই বোন ? অথবা নিকট আত্মীয়। একজন ওই ভবঘুরে জীবনের যন্ত্রণাবিলাসে মজে আছে আর একজন অর্ধ-উন্মুক্ত হয়ে পাঁচজনের মাথা ঘোরাচ্ছেন।

এই বিয়ার বারে কেউ ওই মহিলাকে দেখে তেমন বিচলিত হয়েছেন বলে মনে হলো না কয়েক চুমুক বিয়ার পেটে চালান করে আমি টয়লেটের দিকে পা বাড়ালাম। পৃথিবীর সমস্ত সস্তার বার রেস্তোরাঁর টয়লেট যে বিদিকিচ্ছিরি গন্ধ লালন করে এটিও তার ব্যতিক্রম নয়। খারাপ স্বভাবের ক্ষেত্রে মানুষের কিরকম মিল !

ফিরে এসে আমি অবাক। আমার গ্লাস প্রায় শেষ, তলানিটা পড়ে থাকার জন্যেই যেন রয়েছে। অথচ আমি অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ ভরাট রেখে টয়লেটে গিয়েছিলাম। হয় তো আমার মুখ দেখে মায়া হয়েছিল তাই পাশে দাঁড়ানো প্রৌঢ় ভাঙা ইংরেজিতে কথা বললেন। শুনে আমার মুখ হাঁ। টপলেশ সুন্দরী আমার বিয়ার সাবাড় করেছেন।

মহিলার দিকে তাকালাম। খুব স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে তিনি অন্যদিকে খদ্দের সামলে চলেছেন যার যা দরকার যোগান দিচ্ছেন। হঠাৎ এগিয়ে এলেন আমার উল্টোদিকে। একগাল হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গ্লাস খালি,আর একটা বিয়ার ?'

মাথা নাড়লাম, 'আমাকে নয়। এবার আপনি নিন। দাম আমি দেব।'

চোখ কপালে তুললেন, 'ওঃ, নো ! আমি কাউন্টারের এপাশে দাঁড়িয়ে পুরো গ্লাস খেতে পারি না। চাকরি চলে যাবে।' মহিলা আবার ছুটে গেলেন ওপাশে খদ্দের সামলাতে।

প্রৌঢ় এবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'কি বুঝলে খোকা ? এদের সামনে খাবার ধরে দিলে খাবে না, কিন্তু অন্যের খাবার চুরি করে খেতে ভালবাসে। সেই পাখিটার মতো, কি যেন নাম ?'

আমি ভাবতে চেষ্টা করলাম। এরকম কোনো পাখি আছে নাকি ? পিসিমা একটা কাককে চোর বলে গালাগাল দিতেন। দূর ! মেয়েদের সঙ্গে কাকের কোনো মিল থাকতেই পারে না

॥ ৩ ॥

কোপেনহেগেন শহরটিকে আমার ভাল লেগেছিল। ভিজে ভিজে মেঘের দুপুর যেন চব্বিশ ঘন্টা টাঙানো থাকে মাথার ওপর। রাত বারোটাতেও সন্ধ্যে নামে না, আবার সকাল হয়ে যায় সকাল হবার আগেই। নিদ্রাদেবীর সঙ্গে আমার প্রেম এত গভীর যে কখনই ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। ইচ্ছে করলেই ঘুমিয়ে পড়তে পারি আমি। কোপেনহেগেনে গিয়ে রাত দুপুরে রোদ দেখে শুনেছি অনেকেই অনিদ্রায় ভোগেন, জানলার পর্দা টেনেও নাকি তাঁদের অস্বস্তি।

হোটেল ভাড়ার মধ্যেই বিনি পয়সার ব্রেকফাস্ট এবং সেটা যতটা সম্ভব বেশি পেটে পুরে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। বাইরে বেরিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢোকার সাহস আমি মাত্র বার চারেক দেখিয়েছি। ভারত সরকার যে ডলার দিতেন তাতে ফাস্টফুড শপের কাউন্টারই নিরাপদ বলে মনে হতো। অতএব বিনি পয়সার ব্রেকফাস্ট খাওয়ার ধরন দেখে কোনো বিদেশীর চোখ বড় হলেও আমার কিছু করার ছিল না।

সকাল দশটায় যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম তখন আমি তরতাজা। ঠাণ্ডা আছে তবে জলপাইগুড়ির ছেলের কাছে কিছু নয়। আড়চোখে দেখে নিলাম সেই ফুটপাথ দখল করা দলটা এখন নেই। মুক্তবক্ষ পাবগুলোও কেমন স্যাঁতসেঁতে। নিওন জ্বলছে না, মানুষজন আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। এই সাতসকালে কে ওখানে যাবে?

রাস্তাটার নাম হেলগোলানগেড।। ঠিকঠাক লিখলাম কিনা জানি না। ডেনিস নাম, অন্যরকম হতেও পারে। ছিমছাম সুন্দর রাস্তাটায় মানুষজন তেমন নেই। তবে এখানে ফুটপাতে দেখতে পাওয়া যায়, এই যা। ভেস্টারব্রোগেডের মোড়ে পৌঁছে আমাদের চৌরঙ্গী রোডের মতো চওড়া রাজপথ দেখতে পেলাম। হোটেল থেকে পাওয়া 'কোপেনহেগেন দিস উইক' নামক অনুযায়ী এটি শহরের সবচেয়ে ব্যস্ত রাজপথ, কিন্তু সকাল সওয়া দশটাতেও গাড়ির ড় দেখতে পাচ্ছি না। শনিবারে বোধহয় এরা বাড়ির বাইরে যেতে চায় না। হঠাৎ নজরে পড়ল চওড়া ফুটপাতের একদিক জুড়ে স্ট্যান্ডের ওপর শোকেস রাখা। কাছে গিয়ে দেখলাম নানান নামের প্রচুর ঘড়ি তাতে সাজানো। পেছনেই ঘড়ির দোকান। দোকানটি বন্ধ। ব্যবস্থাটা অদ্ভুত। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে শোকেস থেকে ঘড়ি পছন্দ করে ভেতরে গিয়ে যাতে খদ্দের কিনতে পারে তাই এই ব্যবস্থা। দোকানের ভেতর কি দাঁড়াবার বেশি জায়গা নেই? শাটারের আয়তন দেখে অবশ্য তা মনে হচ্ছে না। ঘড়িগুলো ঝুঁকে দেখতে লাগলাম। দারুণ দারুণ ঘড়ি এর কগুলোর নাম আমি আগে শুনেছি। সবগুলোই সুইজারল্যান্ডে তৈরি। কলকাতায় আমার

কিছু বন্ধু আছেন যাঁরা ঘড়ির জগতের খোঁজ খবর রাখেন। তাঁরা এখানে এলে খুবই পুলকিত হতেন।

কিন্তু কোনো পাহারাদার নেই। কাঁচ ভেঙে মুঠোয় তুলে নিলে কয়েক হাজার ডলার রোজগার। ইউরোপে এখন ব্যাগ ঝুলিয়ে হাঁটলে ছিনতাই-এর সম্ভাবনা, সেখানে এগুলোর দিকে কেউ নজর দিচ্ছে না কেন ? ডামি বলে মনে হচ্ছে না, কারণ কাঁটাগুলো চালু আছে। সবচেয়ে কম দামের ঘড়িটির মূল্য দুশো বারো ডলার। আমি একমনে ঘড়ি দেখছিলাম। সময় জানতে পারলেই মানুষ খুশি নয়, শখ মেটাতে তার দামী, আরও দামী ঘড়ি দরকার। হঠাৎ কানে এল, 'ইউ ওয়ান্ট গুড ওয়াচ ?'

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম একটা কালো ছেলে আমার পেছনে কখন এসে দাঁড়িয়েছে। ছেলেটার জ্যাকেট এবং প্যান্ট বলে দিচ্ছে অবস্থা খুবই খারাপ। মুখে খোঁচা দাড়ি, হাসিটি ভাল। এখন ইউরোপের অনেক শহরে আমেরিকা এবং আফ্রিকার কালো ছেলেরা ছড়িয়ে পড়েছে। এদের বেশিরভাগই আর্থিক দুর্দশায় কাটায় বলে অপরাধমূলক ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে। এখন ইংলন্ডের নির্জন গ্রামেও এদের দেখেছি অসভ্যতা করতে। কোপেনহেগেন শহরেও যে ওরা থাকবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। বললাম, 'নো থ্যাঙ্কস।'

আমি জানি এবার ও আমার কাছে সিগারেট চাইবে এবং না দিলে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করবে। নিউ ইয়র্কের পোর্ট অথরিটি বাস টার্মিনাসে একটা কালো ছেলে সিগারেট চেয়ে না পেয়ে আচমকা আমার হাতে এমন আঘাত করেছিল যে আধখাওয়া সিগারেট আঙুল থেকে খসে পড়েছিল নিচে। স্বচ্ছন্দে সেটা কুড়িয়ে টানতে টানতে চলে গিয়েছিল ছেলেটা। কিন্তু একে দেখলাম অন্য কথা বলতে, 'এগুলোর দাম খুব বেশি। বড় রাস্তার বড় দোকান বলেই দাম এমন। তার ওপর ওই শোকেসটা এখানে রাখায় বেশ খরচ পড়ে ওদের। তুমি ওই কাচটা ভাঙতে চাইলেই অ্যালার্ম বেজে উঠবে, পালাবার পথ পাবে না।'

বোঝা গেল। কাচটার দিকে তাকালাম : এখন আর নিরীহ অসহায় বলে মনে হচ্ছে না। বললাম, 'বুঝতেই পারছ ইচ্ছে থাকলেও কেনার উপায় নেই।'

'ঠিক। কিন্তু ওই একই জিনিস তুমি অনেক কমে পেতে পার।'

'কত কমে ?'

'ধরো প্রায় অর্ধেক।'

'না ভাই, ঘড়ি কেনার কোনো দরকার নেই আমার।'

'তাহলে দেখছিলে কেন ?'

'দেখতে ভাল লাগছিল তাই দেখছিলাম, টিভোলি কোনদিকে ?'

ছেলেটা হাসল। বছর পঁচিশের মধ্যে বয়স। বলল, 'তুমি টিভোলিতে যাবে ? গুড। চল আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

আমি মাথা নাড়লাম, 'নো। দ্যাখো, তোমার যদি মতলব থাকে এইসব করে আমার কাছ থেকে কিছু ক্রোনার রোজগার করবে তাহলে ভুল জায়গায় এসেছ।'

ছেলেটা হঠাৎ খুব উদাসীন হয়ে গেল। মানুষ খুব হতাশ হয়ে গেলে এইরকম মুখ করতে

পারে। হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোত্থেকে এসেছ?'

'ইন্ডিয়া।'

'ইন্ডিয়ার মানুষরা কি তোমার মতো নিষ্ঠুর হয়?'

এবার হেসে ফেললাম, 'আমার সঙ্গতি কম, আর থাকলেও তোমাকে দিতে যাব কেন? আচ্ছা, চলি।'

'আমি যদি তোমার সঙ্গে যাই তাহলেও কি আপত্তি আছে? না, এর জন্যে আমাকে কিছু দিতে হবে না। আসলে আজ সকাল থেকে আমি খুব ডিপ্রেশনে ভুগছি। একা থাকলে মনে হচ্ছে আত্মহত্যা করে ফেলব।'

ছেলেটার দিকে তাকালাম। আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলছে না। ওর তো খুব রাগী হওয়া উচিত। শরীরের শক্তি আর বেয়াড়া মেজাজ এক করে যা ইচ্ছে তাই করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কেউ আত্মহত্যা করতে পারে শুনলে মন খারাপ হয়ে যায়। বললাম, 'ঠিক আছে। তুমি আমার সঙ্গে হাঁটতে পার। কি নাম তোমার?'

'রিচার্ড গোল্ড।'

'তুমি আমেরিকান?'

'হ্যাঁ! আমি একটা সিগারেট পেতে পারি?'

কথা বলতে বলতে প্যাকেটটা বের করেছিলাম, একটা দিলাম ওকে।

'এখানে তুমি খুব ভাল অবস্থায় নেই, তাই না?'

'ইয়েস। নেই। আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে এদেশে এসেছিলাম। কয়েক মাসের মধ্যেই ও একজন ডেনিসের সঙ্গে চলে গেল। তারপর থেকে আমি একা।'

'কাজকর্ম কিছু কর?'

'করতাম। এখন কাজ নেই।'

ছেলেটা কথা বলছিল খুবই অনিচ্ছা নিয়ে। ও নিশ্চয়ই ডেনমার্কে অনেকদিন আছে। এখানে থাকার অনুমতি কি করে পেল জানি না। প্যারিসে দেখেছি ভিসা ফুরিয়ে থেকে যাওয়া কালোদের ধরার জন্যে প্রায়ই পুলিশ ফাঁদ পাতে, এখানে কি সেই চেষ্টা হয় না? ছেলেটার জন্যে আমার খারাপ লাগছিল কিন্তু ওকে সমর্থন করতে পারছিলাম না।

সেন্ট্রাল স্টেশন এবং টাউন হল স্কোয়ারের ঠিক মাঝখানে ডেনমার্কের গর্ব—টিভোলি পার্ক। পৃথিবীর কোনো দেশে শহরের ঠিক মাঝখানে হোটেল থেকে কয়েক মিনিটের পথ পেরিয়ে এমন একটা পার্কের দর্শন পাওয়া যায় না বলে ডেনিসরা গর্বিত হন। ইউরোপের পর্যটকদের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ টিভোলি, কারণ এখানে একই সঙ্গে মজা এবং সংস্কৃতির চমৎকার বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে। ঢোকার সময় আমাকে কুড়ি ক্রোনারের টিকিট কাটতে হয়েছে। দুজনের জন্য। ছেলেটাকে উপেক্ষা করতে পারিনি।

ভেতরে ঢোকা মাত্র রিচার্ডের চেহারা পাল্টে গেল। বেশ খুশি খুশি ভাব এখন। বলল, 'আমার এই জায়গাটা খুব ভাল লাগে। মনে হয় হ্যানস ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসনের লেখা পড়ছি। তুমি লোকটার নাম শুনেছ?'

ও এমন প্রশ্ন করতেই পারে। বরং ওর মুখে নামটা শুনে আমি বিস্মিত। যেখানে শতকরা কুড়িজন স্কুলের ওপর ক্লাসের ছাত্র দেশের প্রেসিডেন্টের নাম, রাজধানীর নাম জানে না, সেখানে—। হেসে বললাম, 'ওঁর লেখা ফেয়ারি টেলস বাল্যকালে পড়েছি।'

চোখ জুড়িয়ে গেল। বিশাল এলাকা জুড়ে রূপকথার বাগান তৈরি করা হয়েছে। মাঝে মাঝে ফোয়ারা থেকে জলের ধারা আকাশ ভিজিয়ে দিচ্ছে। একপাশে রেভ্যু থিয়েটার, কনসার্ট হল, ওপেন এয়ার স্টেজে এই সকালেই ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। আমাদের সামনে দিয়ে একশ নয়টি কিশোর রানীর নিজস্ব বাহিনীর পোশাক পরে মিছিল করে গেল। রিচার্ড বলল, 'রাত্রে এলে এক লক্ষ দশ হাজার বাতির আলোর কারসাজি দেখতে পেতে।' সকাল দশটায় খুলে রাত বারোটায় টিভোলি বন্ধ হয়।

আমার মনে হলো এরকম একটা জায়গায় একা ঘুরতে পারলে ভাল লাগবে। রিচার্ড ছেলেটা মন্দ নয়, কিন্তু ওকে ট্যাকে নিয়ে ঘোরার কোনো দরকার নেই। হ্যাঁ, আমার একটা ব্যাপার জানার লোভ হচ্ছে, সেটা হলো, ও যেখানে থাকে সেই ডেরাটা দেখে আসা। বেকার ভবঘুরেদের আড্ডা নিশ্চয়ই এবং সেটার চেহারা কিরকম ?

বললাম, 'তুমি এক কাজ কর। ঘণ্টা ছয়েক পরে এখানে ফিরে এসো। আমি এবার একাই ঘুরতে চাই।' সে সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সায় দিল। ছেলেটা দেখছি ভাল।

'কার্নিভাল' শব্দটার মানে ঠিক মেলা নয়। শব্দটা উচ্চারণ করলে ঠিক যেরকম অনুভূতি হতো এখানে এসে তার বাস্তব চেহারা দেখলাম। এই সাতসকালেই প্রচুর দর্শক ঢুকে পড়েছে তবে বেশিরভাগ উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান দেখছি সন্ধ্যের পর হবে। যেমন, দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটা, শিক্ষিত শীল মাছের কাণ্ডকারখানা। বাগানের ঠিক মাঝখানে মুক্তমঞ্চে সেসবের আয়োজন এখন টিভোলি সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা বাজাচ্ছে. ভিড় সেখানেও।

একটা বিজ্ঞাপনে দেখেছিলাম, 'ইউরোপের সবচেয়ে সুখী মানুষেরা ডেনমার্কে থাকেন সেখানে পা দিলেই প্রথমে চোখে পড়বে তাদের মুখজোড়া হাসি।' বিজ্ঞাপনে এমন অনেক কথাই লেখা থাকে। কোপেনহেগেনে এসে অবধি আমার তেমন অভিজ্ঞতা হয়নি। কিন্তু এখানে পৌঁছে বুঝলাম বিজ্ঞাপন সত্যি। এত হাসিখুশি সুন্দর স্বাস্থ্যের নারী-পুরুষের ভিড় সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। বাঙালি মেয়েদের লাবণ্য নিয়ে আমরা গর্ব করি। যে কোনো পশ্চিমের সুন্দরীকে আমরা লাবণ্যের অভাব দেখিয়ে নস্যাৎ করে দিতে দেরি করি না। কিন্তু কলকাতার মেলায় অথবা পার্বণে যেসব বঙ্গনারীদের দেখা যায়, তাদের অধিকাংশের স্বাস্থ্য এত অযত্নে লালিত যে সেই লাবণ্য ধুয়ে বেশিদিন জল খাওয়া যায় না, সেটাই আমরা বুঝতে পারি না। এখন সত্যিকারের স্বাস্থ্যবতী বঙ্গনারীর দর্শন পাওয়া কপালের ব্যাপার। বেশির ভাগই রোগগ্রস্ত চিমসে। তাই এখানে চোখজুড়ানো সুন্দরীদের দেখে আমার কষ্ট হচ্ছিল। হাল এমন হয়েছে, টালিগঞ্জের সিনেমায় এঁদের যে কেউ গেলে প্রযোজকরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচতেন।

সামনে মূকাভিনয় চলছিল। তিনজনের দল। শরীর, বিশেষ করে চোখ এবং আঙুলের ভাষা পৃথিবীর ভাষা। বেশ মজা লাগছিল। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, মঞ্চটা তার কিছুটা দূরে। দর্শকদের মাথা ডিঙিয়ে কিছুক্ষণ অভিনয় দেখে কয়েক পা হেঁটে একটা বেঞ্চিতে বসলাম।

টার হেনজ নামের একজন শিল্পী এই স্বপ্নরাজ্যের একটি পোস্টার এঁকেছেন। হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান ্যান্ডারসন ক্যাসেল থেকে সেটা বিক্রি হচ্ছে। পোস্টারে রয়েছে এক ফালি চাঁদের ওপর এক জাদার মানুষ ব্যালেন্স রেখে দাঁড়িয়ে আর তার নিচে চাঁদে ওঠার জন্য একটা সিঁড়ি ঠেকানো। ্যান্ডারসন সাহেবকে সেলাম জানানোর জন্যে অদ্ভুত সুন্দর কল্পনা এটি। ওপাশে আকাশরেল টছে হৈ হৈ করে। বাচ্চাদের গলায় এখন শুধুই আনন্দ। চুপচাপ দেখে যাচ্ছিলাম।

'কটা বাজে ?'

তাকিয়ে দেখলাম একটি কিশোরী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। এখানে বারো বছরে পড়ার াগেই বাচ্চাদের মাথা পাঁচ ফুট ছুঁয়ে ফেলে। সময়টা বললাম।

সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, 'ধন্যবাদ।' বলে বেঁকেচুরে দাঁড়িয়ে রইল।

আমার খেয়াল হলো ও ডেনিস কথা বলেনি। তার মানে বিদেশিনী। যেভাবে দাঁড়িয়ে াছে তাতে মনে হচ্ছে হয় দলছুট, নয় কারো জন্যে অপেক্ষা করছে।

বললাম, 'তুমি ইচ্ছে করলে এখানে বসতে পার।'

সে আমার দিকে তাকাল, 'ধন্যবাদ।' বলে হাত দেড়েক দূরে বসে পড়ল।

ওর পরনে নীল স্কার্ট, নীল জামা। অনেকটা ইউনিফর্মের মতো। স্কুল ড্রেস ? মুখ বলছে য়স বেশি নয়, কিন্তু শরীর মানতে চাইছে না। লক্ষ্য করলাম মেয়েটি কেবলি মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে, সম্ভবত কাউকে খুঁজছে।

বললাম, 'আমি কি তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারি ?'

আড়চোখে দেখে নিয়ে মেয়েটি আবার মেইন গেটের দিকে তাকাল, 'বেশিক্ষণ সময় দিতে ারব না। আমার বয়ফ্রেন্ড আসবে।'

কলকাতা হলে হোঁচট খেতাম, স্থানগুণে হাসলাম। এইটুকুনি মেয়েরও বয়ফ্রেন্ড ?

হঠাৎ মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'পুরুষরা সময় রাখতে শেখে না কেন বল তো ?'

'তোমার বয়ফ্রেন্ড কি পুরুষ ?'

'আশ্চর্য ! আমি বয়ফ্রেন্ড বলছি না ?'

ধাতস্থ হলাম। এখন একটি তেরো বছরের কিশোর এলেও তাকে পুরুষ ভাবতে হবে।

'ওর বয়স কত ?'

'আমি জানি না। আমার সঙ্গে তিন দিন আগে আলাপ হয়েছে। তা ছাড়া আমি আমার ানো বয়ফ্রেন্ডেরই বয়স জিজ্ঞাসা করি না। কেন জানো ?' চোখে হাসি মেয়েটার।

মাথা নেড়ে না বললাম।

'বয়স জিজ্ঞাসা করলে যদি জন্মদিন বলে দেয় তাহলে ওকে গিফট দিতে হবে। এমন াকামি করার কোনো মানে হয় ?'

'তা ঠিক। তোমার বয়ফ্রেন্ড এখন কত ?'

কর গুনতে লাগল কিশোরী। এই সময় ওকে সত্যি কিশোরী মনে হচ্ছিল। শুনে বলল, ঠিক আটজন। তবে তিনজনের সঙ্গে আর দেখা করব না।'

'কেন ? তারা কি দোষ করল ?'

'তারা কথা রাখেনি।'

'কি রকম ?'

'একজন বলেছিল আমাকে ব্যাকেনে নিয়ে যাবে। তুমি গিয়েছ ?'

'না।'

'উঃ, কি মিস করেছ। বাকেন হলো এই শহরের উত্তর দিকে, সিটি সেন্টার থেকে বা কিলোমিটার দূরে ডিয়ার পার্কের ভেতরে। ওখানে গেলে দেখবে লাল হরিণেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে এই টিভোলির মতো নানান মজার ব্যবস্থা আছে ওখানে। ফ্যান্টাস্টিক রোলার কোস্টার, ভাবে পারবে না। ডিস্কোস, মিউজিক, ওপেন এয়ার স্টেজ। চারশো বছরের পুরনো।'

'কি ভাবে যেতে হবে ?'

'ক্ল্যাম্পেনবর্গ যেতে হবে। একশো ছিয়াত্তর বাস ধরে চলে যাও। এস-ট্রেনেও যে পার। ঢুকতে টিকিট লাগে না। কিন্তু গেলে খাওয়াতে হবে বলে ও গেল না। চিকেন।'

'খুব অন্যায় করেছে। আর বাকি দুজন ?'

'ওরা বলেছিল আমাকে লেগোল্যান্ডে নিয়ে যাবে। নাম শুনেছ ? শোননি ! তুমি কি ওয়ার্ল্ড ফেমাস চিলড্রেন্স অ্যামুজমেন্ট পার্ক ! অ্যান্টিক ডলস, টয়স আর ফেয়ারি টেলসে ছড়াছড়ি সেখানে। আর জানো, ওসবই লেগো-ইঁট থেকে তৈরি। ওরা নিয়ে গেল না।'

'তুমি দেখছি খুব বেড়াতে ভালবাস।'

'খুব। কিন্তু পয়সা নেই বলে মনে মনে বেড়াই।' মেয়েটির খেয়াল হলো, 'কটা বাজে

আমি আবার তাকে সময় জানালাম। সঙ্গে সঙ্গে মুখ গম্ভীর হয়ে গেল ওর। এবারে বয়ফ্রেন্ড কথা রাখছে না। ওকে খুশি করতে বললাম, 'তুমি কিন্তু চমৎকার ইংরেজি জানো

'বাঃ, আমার মা তো আমেরিকান।'

'তাই বলো।'

'মা অবশ্য ছ বছর হলো আমেরিকায় চলে গিয়েছে। বাবার সঙ্গে ডিভোর্স হওয়ার প একজন বন্ধুর সঙ্গে স্টেডি ছিল। সেই লোকটা এত মদ খেতে আরম্ভ করল যে মা চলে গেল

'তুমি তোমার বাবার সঙ্গে থাক ?'

'নাহ। বাবা আবার বিয়ে করেছে। আমি থাকি দিদিমার সঙ্গে।'

মেয়েটা উঠে দাঁড়াল। ও যে খুব চিন্তিত তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। ঠিক এই স রিচার্ড আমাদের দিকে এগিয়ে এল। আমি মেয়েটিকে বললাম, 'তুমি আর একটু অপেক্ষা কর পারতে।'

'যে আসবে না তার জন্যে অপেক্ষা করে কি লাভ ?'

'আসতেও তো পারে।'

'নাঃ। ও বলেছিল আমার শরীরটা নাকি বেশ বড়। তাই হয়তো আসছে না। আচ্ছ তোমারও কি তাই মনে হয় ?'

'মোটেই না। তোমার মতো স্বাস্থ্য আমাদের দেশের খুব কম মেয়ের আছে।'

প্রশংসা শুনে হাসি ফুটল ওর, 'সত্যি ?'

'একশো ভাগ সত্যি। বসে পড়। ও যদি না আসে তাহলে আমরা কফি খেতে পারি।'

'কফি না, আইসক্রিম।'

'বেশ, তাই হবে।'

এবার রিচার্ডের দিকে তাকালাম,'কি হলো ?'

'আমার ভাল লাগছে না। এখানে একা একা ঘুরতে কি ভাল লাগে ?'

'তাহলে তুমি কি ফিরে যাবে ?'

রিচার্ড মাথা নাড়ল। এবং তারপরেই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে 'হাই' বলল। মেয়েটি খুব গম্ভীর হয়ে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমরা দুজনেই আফ্রিকা থেকে এসেছ ?'

হেসে ফেললাম। আমার গায়ের রঙ ফর্সা নয় কিন্তু কেউ আফ্রিকান বলে ভাববে তা কখনও চিন্তা করিনি। বললাম, 'আমার দেশ ইন্ডিয়া আর ওর আমেরিকা।'

ইন্ডিয়া শুনে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। কিন্তু মেয়েটি অবাক হয়ে রিচার্ডের দিকে তাকাল, 'তুমি আমেরিকান ? যাঃ ! সত্যি ? আমেরিকানরা এত গরিব হয় ?'

রিচার্ড বিন্দুমাত্র লজ্জিত হলো না। বলল, 'এই দেশে আসার পর আমি গরিব হয়ে গেছি।'

'তাই ? তাহলে এখানে আছ কেন ?'

'এবার ফিরে যাব।'

'কবে যাবে ?'

'দেখি !'

'আমেরিকায় কোথায় থাকো তুমি ?'

'বস্টন।'

'বাফেলো সেখান থেকে কত দূরে ?'

'এক ঘণ্টাও লাগে না প্লেনে।'

'আমার নাম জুলি। তোমার ফোন নম্বর কত ?'

'সরি। আমার কোনো ফোন নেই। আমি রিচার্ড গোল্ড।'

'ওহো। তাহলে তোমার সঙ্গে আমি কিভাবে যোগাযোগ করব ? আমার যদি ইচ্ছে করে তাহলে তোমার সঙ্গে আমেরিকায় যেতে পারি। আমাকে বাফেলো যেতে হবে।'

রিচার্ড আমার দিকে তাকাল। আমি উদাসীন।

'আমরা কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় দেখা করতে পারি।'

'তা পারি। কিন্তু তোমার কাছে ক্রোনার নেই। কোথাও বসলে বিল দেবে কে ? নাঃ, তোমার সঙ্গে দেখা করে কোনো লাভ নেই। আচ্ছা এলাম।' শেষ শব্দ দুটো আমাকে বলে চলে গেল মেয়েটা। ওর যাওয়ার ভঙ্গিতেও ছেলেমানুষী রয়েছে।

রিচার্ডের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। ছেলেটা ফিরে এসেছিল বলে একটু আগে বিরক্ত হয়েছিলাম কিন্তু এখন মায়া লাগল। ওকে বসতে বললাম। চুপচাপ বসে পড়ল সে।

বললাম, 'মেয়েটা সরল। বাচ্চা বলেই ওইভাবে কথা বলল।'

'বাচ্চা ? এখানে বাচ্চা থেকে বুড়ি সবাই ওভাবেই কথা বলে। তোমার কাছে ক্রোনার

থাকলে তুমি একরকম, না থাকলে আর একরকম।' রিচার্ড ফুঁসে উঠল।

'এটা পৃথিবীর সব দেশের মানুষই ভাবে। তবে এমন স্পষ্ট মুখের ওপর বলে না। এ মেয়েটার বয়স বারোর বেশি হবে না অথচ ও এখনই ইমোশনকে বাদ দিয়ে ফেলেছে।' কথা বলার সময় খেয়াল হয়েছিল, তাই প্রশ্ন করলাম, 'তোমার কি এখানে কাজ করার পারমিট নেই?'

'না। তবে অল্প মাইনেতে কাজ করলে তার দরকার পড়ে না।'

'দেশে ফেরার টিকিট নেই?'

'আছে। কিন্তু সেটা আমার বান্ধবী নিয়ে গেছে।'

'ওর কাছে গিয়ে চেয়ে নাও না কেন?'

'ওটার সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে ফেরৎ দেবে বলেছে।'

'ওটা রেখে ওর লাভ কি?'

'ও যদি মন পাল্টায় তাহলে আমার সঙ্গে ফিরে যাবে। দেখি!'

এতক্ষণে ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো। শ্রীমান রিচার্ড কোপেনহেগেনে এই ভাবে পড়ে আছে শুধু এই আশা নিয়ে যে বান্ধবীটি ফিরে যাবে তার সঙ্গে। পৃথিবীর যে কোনো প্রেমিক অথব প্রেমিকা চিরকাল এক ভুল করে থাকে। ভাবামাত্র মনে হলো ভুল ভাবলাম। জুলিদের প্রজন্ম এমন ভুল কখনই করবে না। ওরা অনেক বাস্তববাদী। একটু অপেক্ষা করে হাল বুঝে নিয়ে মন থেকে ঝেড়ে ফেলবে প্রেমফ্রেম নামক বায়বীয় ব্যাপার-স্যাপার।

রিচার্ডকে ওইখানে বসিয়ে রেখে টিভোলি ঘুরে দেখলাম। প্রতিটি শো দেখার জন্যে আলাদা করে টিকিট কাটতে হয়। তার সবগুলোই যে চমকপ্রদ তা বলতে পারছি না। আমাদের গ্রাম্য মেলায় দড়ির ওপর হাঁটে যে কৃশকায় মেয়েটি সে এখানে এলে ভাল রোজগার করতে পারত। তবে চারধারে যে হৈহুল্লোড় ব্যাপার তার মেজাজ আলাদা।

এই যে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, দেখছি, মজা পাচ্ছি, কিন্তু ওই কিশোরীকে ভুলতে পারছি না। আইনের চোখে ও এখনও অপ্রাপ্তবয়স্কা। কিন্তু আইন তো সবসময় লাঠি হাতে পাহারা দিতে পারে না। এই বয়সেই ও জীবনের অনেকগুলো দিক দেখে নিয়েছে। বড় হতে হতে ওর কাছে বিস্ময়কর কিছু থাকবে না। তখন ও বাঁচবে কি নিয়ে? ওর মা বিয়ে ভাঙার পরেও এদেশে কারও সঙ্গে বাস করতেন। আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার সময় তিনি মেয়েকে নিয়ে যাননি কেন? ওর বাবা কি খোঁজ-খবর নেন? দিদিমা নিশ্চয়ই বৃদ্ধা। তবু তিনি আছেন বলেই ও বেঁচে গেছে। কিন্তু ও নিজে মায়ের কাছে চলে যাচ্ছে না কেন? টিকিটের দামটা কি চেষ্টা করেও যোগাড় করতে পারছে না মেয়েটা? এইসব ভাবনা মারপিট করছিল মাথায়।

ফিরে এসে দেখলাম বেঞ্চির ওপর লম্বা হয়ে রিচার্ড ঘুমোচ্ছে। স্বচ্ছন্দে ওকে না জাগিয়ে হোটেলে ফিরে যেতে পারতাম আমি। কিন্তু কোথায় যেন আটকালো। ঘুম ভাঙাতেই রিচার্ড ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। এখন প্রায় বিকেল। জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কি এখন বেরুবো?'

মাথা নাড়লাম। টিভোলি থেকে বেরিয়ে ভেস্টারব্রোগেডে দাঁড়ালাম। এখন বেশ ভিড় ফুটপাতে। মানুষজন বেরিয়ে পড়েছে। রিচার্ড বলল, 'আমাকে দশ মিনিট সময় দেবে?'

'কেন?'

'আমি একটু পাশেই অ্যান্ডারসন বুলেভার্ডে যাব।'

'তোমার যদি কাজ থাকে চলে যেতে পার।'

'না, না। দশ মিনিট। আসলে ওখানে আমার বান্ধবী চাকরি করে। ওর ছুটির সময় হয়ে গেছে। জাস্ট দশ মিনিট।' ওর মুখভঙ্গি দেখে মায়া লাগল।

আমরা টিভোলির পাশের রাস্তায় ঢুকলাম। এটাই অ্যান্ডারসন বুলেভার্ড। একটা বিশাল বাড়ির উল্টোদিকে দাঁড়ালাম আমরা। দুই ফুটপাতেই মানুষ হাঁটছে। রিচার্ড বলল, 'আসলে জানো, মেয়েটা খুব ভাল। মনটা খুব নরম। আমি রোজ ওকে এখান থেকে দেখি, কথা বলি না। ও বলেছে কথা বলার সময় হলে ও নিজে রাস্তা পেরিয়ে এসে কথা বলবে। আমি সেই দিনটার জন্যে অপেক্ষা করছি।' হঠাৎ ও সোজা হলো, 'ওই যে।'

আমি দেখলাম উল্টোদিকের একটা বাড়ি থেকে একটি সাদা মেয়ে বের হলো। হাতে ব্যাগ। দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে বাসস্ট্যান্ডের দিকে। এদিকে তাকাল না।

রবীন্দ্রনাথ একে অনেককাল আগে কল্পনা করেছিলেন, এদের নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। হয়তো সে ছিল রেলগাড়ির কামরায়, এই যা

॥ ৪ ॥

বাঙালির কোনো ইতিহাস নেই, বর্তমান কতটা আছে বুঝতে পারি না। সম্বল বলতে গোটা উনিশশো সাল আর বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছর। এর আগে একজনকে আমরা চেষ্টাচরিত্র করে বাঙালি বানিয়ে দিয়েছি, তিনি চৈতন্যদেব আর এরপর সম্বল বলতে দুজন, সত্যজিৎ রায় আর রবিশংকর। মোদ্দা কথা হলো গোটা বাঙালি জাতটা বেঁচে আছে ওই উনবিংশ শতাব্দীকে সম্বল করে যার শেষ প্রান্ত বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। তবু কোনো বয়স্ক বাঙালির সঙ্গে কথা বলে দেখুন, শুনবেন, আমাদের এই ছিল, সেই ছিল। বাঙালির ট্র্যাডিশন নষ্ট হচ্ছে। এই 'নবদিনমণি উদিবে আবার পুরাতন হে পূরবে?' লাইনটা উচ্চারণ করার সময় কেউ জিজ্ঞাসা করে না 'আবার' শব্দটি কেন লেখা হলো? এর আগে কবে কখন সূর্য ঝলমল করেছে? খনা, মৈত্রেয়ী গার্গী ইত্যাদি কখনই বাঙালি ছিলেন না। আমরা মেয়েদের বিধবা হলে পুড়িয়েছি, ঘরে বন্দী করে রেখেছি যে অভ্যেসে সেই অভ্যেসে এখনও তাদের মেয়েছেলে বলে সম্বোধন করি। একটা ছেলে বড় হলে তার হাজারটা পুরুষ বন্ধু থাকতে পারে, কিন্তু মেয়ে বন্ধু থাকলেই চরিত্র গেল। এ সবই তথাকথিত ঐতিহ্যের ফসল। সূর্যগ্রহণের সময় কুলের ডাল ভাতের হাঁড়িতে দেওয়ার মতো দিয়েই চলেছি, কেন দিচ্ছি না বুঝে।

অনেকেই আমাকে চরিত্রহীন বলে থাকেন। মেয়েদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব সহ
তৈরি হয়ে যায়, বন্ধুত্ব ভাল জমে, তাই হয়তো। কুষ্টিতে লেখা ছিল জাতকের জীবনে বহু ন
আসবে, তারা তাকে দুঃখ দেবে, ক্ষতি করবে, আবার ভাল যদি কিছু হয় তো তাদের দ্বা
হবে। যিনি গণনা করেছিলেন তিনি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন, মানতেই হবে। তবে এ নিয়ে কম
বোঝাবুঝি হলো না। জলপাইগুড়ি শহরে যৌবনের শুরুতে দেখেছি কোনো ছেলে এ
মেয়েকে চিঠি লিখলে অন্য ছেলেরা ঈর্ষায় জ্বলত। মেয়েরা আমার সঙ্গে প্রেম করে না বলে
হুতাশ করতে অনেক বন্ধুকে দেখেছি। যেসব মেয়ে তখন প্রেম করত তাদের কি রকম বে
বোকা মনে হতো। আমার সেইসব প্রেমিক বন্ধুদের ধারণা ছিল যে আমি খুব ভাল প্রেম
লিখতে পারি। তারা আমাকে দিয়ে পাওয়া চিঠির উত্তর লেখাত। সেই সব চিঠি পড়তে গি
মেয়েগুলোকে জেনে ফেলেছিলাম। বেশিরভাগ মেয়ে লিখত, আমার বাবা-মা গোঁড়া বাঙা
এসব একদম পছন্দ করেন না। তুমি গোপনে গোপনে চিঠি পাঠাবে। এই গোঁড়ামি বাঙালি ক
কোত্থেকে অর্জন করল তাই বুঝতে পারিনি এখনও। হাজার বছর আগেও তো তাদের অ
স্থির হয়নি।

ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে গেল হয়তো কিন্তু সুহাসিনীর কথা মনে এলেই নি
বাঙালিত্ব নিয়ে জ্বলেপুড়ে মরি।

সুহাসিনীর বাবা আমার বাবার সহকর্মী, একই চা-বাগানে চাকরি করতেন। তি
গানবাজনার ভক্ত ছিলেন। সেসময় চা-বাগানে এটা বিলাসিতার পর্যায়ে ছিল। দু'-একজ
বাড়িতে রেডিও ছিল, বাকিরা কলের গান কেনার কথা ভাবতে পারতেন না। তা সুহাসি
বাবা যতীন কাকা সায়গল কানাকেষ্ট কাননদেবী বাজাতেন সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে। সেসব
আমাকে আকর্ষণ করত না শুধু আব্বাসউদ্দিনের 'আল্লা মেঘ দে পানি দে' ছাড়া।

সুহাসিনী সুন্দরী ছিল। তার বেণীর স্মৃতি আজও ভুলিনি। খোলা থাকলে মাটিতে লু
পড়ত সাপের মতো। একবার বেণী খুলে দাঁড়িয়েছিল মাঠের মাঝখানে, মা কালীর চেয়ে সু
মনে হয়েছিল ওকে। যতীনকাকা ফরসা ছিলেন না, কাকীমাও শ্যামলা, অথচ আলতাগ
রঙ ছিল সুহাসিনীর। মাত্র তের বছরে সে চোখ টানতে লাগল সবার। সুহাসিনী খুবই লাজ
অস্বস্তিতে পড়লেই তার নাকের ডগায় ঘাম জমে। চা-বাগানের অনেক ছেলের মধ্যে এক
আমার সঙ্গেই তার যা কিছু কথাবার্তা। এর একটা কারণ সেই আট বছর বয়স থেকে আমি শ
থেকে স্কুলে পড়ছি। ছুটি হলে চা-বাগানে যাই। ওর মা আমাকে খুব ভালবাসতো। দেখা হ
বলতাম, 'দেখি তোর গাল লাল হয় কিনা?'

এটা আমাদের বাল্যকাল থেকে ম্যাজিক ম্যাজিক খেলা ছিল। সুহাসিনীর গালে টো
দিলেই রক্ত জমত। সেই জায়গাটা জবাফুল হয়ে যেত চট করে। ছুটিতে এলে আমি ও
বাড়িতে গিয়ে আগে টোকা দিতাম। সেই কৃষ্ণচূড়ার লাল। তের বছর যখন বয়স তখন টো
দিতে হলো না। একটু বেশি ব্যবধানে সেবার গিয়েছিলাম। ওদের বাড়িতে যেতেই
করেছিলাম, 'দেখি তোর গাল লাল হয় কিনা?'

টোকা দিতে হলো না। সে দাঁড়িয়েছিল বেশ তফাৎ-এ। কিন্তু দেখলাম মুহূর্তেই তার

পলাশ হয়ে গেল। আমি বললাম, 'সেকি রে, এখন দেখছি আপনা আপনি হচ্ছে!'

ও দৌড়ে পালাল। কাকিমা হেসে বললেন, 'বাবলু, সুনির সম্বন্ধ এসেছে।'

'সেকি ?' আমি চমকে উঠলাম। তখন শরৎচন্দ্র পড়া হয়ে গিয়েছে আমার।

'কি করব বল। বয়সের তুলনায় মেয়ে বেশি ডাগর হয়েছে। বাঙালির ঘরে একসময় তো এই বয়সে মা হয়ে যেত। আমার মায়ের বিয়ে হয়েছিল এগারতে, আমি হয়েছি তের বছরে। আমার বিয়ে হয়েছিল তের বছরে। সুন্দরী মেয়ে ঘরে রাখতে ভয় লাগে রে। তোর মা শুনে খুব রেগে গেছে আমার ওপর। ওর বাবার ইচ্ছে নেই এতটুকুও। আমার ভাই বর্ধমান থেকে এই সম্বন্ধটা এনেছে। সামনের সোমবার দেখতে আসবে।'

কাকিমার কাছ থেকে উঠে যতীনকাকার কাছে গেলাম। কলের গান বন্ধ। গালে হাত দিয়ে বসে আছেন চেয়ারে। আমায় দেখে বললেন, 'আচ্ছা বাবলু, বিদ্যেসাগর মশাই এত করলেন তবু বাঙালির চৈতন্য হলো না কেন বলতে পার ?'

'আপনি রাজী না হলে তো সুহাসিনীর বিয়ে হবে না।'

'আমি কে ? এ সংসারে আমি শুধু অর্থ আনার মেশিন। এই যে শনি-মঙ্গলবার বাড়িতে নিমপাতা খাওয়া হয় না, কেন হয় না কেউ উত্তর দিতে পারবে ? আমি খেতে চাইলে কেউ রান্না করবে ? ঈশ্বর যদি আগামী পঁচিশ বছর ধরে বাঙালির সংসারে কোনো মেয়ে জন্মাতে না দিত তাহলে উচিত শিক্ষা হতো। মর শালা, মর। বেজাতকে বিয়ে না করলে বংশবৃদ্ধি হবে না, বাঙালি ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি মেনে না নিলে অনর্থ বেধে যাবে সংসারে।' ক্ষিপ্ত গলায় বলে গেলেন যতীনকাকা। তখন মনে হয়েছিল ভদ্রলোক নপুংসক। মনে আক্ষেপ বা কষ্ট পুষে রেখে যারা সব কিছু মেনে নেয় তাদের ওই আখ্যা দেওয়া উচিত। একথাও ঠিক, জীবনে আমিও অনেকবার নপুংসক হয়েছি। কিন্তু এও লক্ষ্য করছি, পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে এইরকম হওয়ার প্রবণতা অনেক কমে যাচ্ছে। আজকের তরুণ প্রজন্ম মুখের ওপর যা সত্যি তা বলে দিতে দ্বিধাবোধ করে না।

সেই বিকেলে মাঠের মাঝখানে সুহাসিনী আর আমি দাঁড়িয়ে। মাঠের একপাশে কোয়ার্টার্সগুলোর বারান্দায় আমাদের চেনাজানা মানুষেরা গল্প করছেন। মাঠের আর একপাশে আসাম রোড চুপচাপ পড়ে আছে। এই দৃশ্যটি এখন কল্পনা করতে পারি না। হয়তো সেই তের বছর বয়স পর্যন্ত আমরা শৈশবে বাস করছি বলে অভিভাবকদের ধারণা ছিল, তাই মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা দেখতে কারও কোনো অসুবিধে হয়নি।

সুহাসিনীর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তোর বিয়ে হয়ে যাবে ?'

সে খুব তেজী গলায় বলেছিল, 'হ্যাঁ।'

'তোর বিয়ে করতে ইচ্ছে করছে ?'

'বাঃ, কেন করবে না ?'

'তোর পড়াশুনা করতে ইচ্ছে করে না ?'

'পড়াশুনা করেও তো বিয়ে করতে হবে, রান্না করতে হবে, হবে না ? সেই যখন করতে হবে তখন কষ্ট করে পড়াশুনা করার দরকার কি ? বিয়ে হয়ে যাওয়াই ভাল।'

আমার খুব রাগ হয়েছিল জবাব শুনে। মনে হয়েছিল ওর সঙ্গে আর কথা না বলাই উচিত। তবু জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আমাদের আর দেখতে পাবি না, তোর ভাল লাগবে ?'

সে সামান্য ভেবে বলেছিল, 'তা একটু খারাপ লাগবে। তুই তো মাসের পর মাস শহরে থাকিস, খারাপ লাগা অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।'

ফিরে এসেছিলাম শহরে। খবর পেয়েছিলাম সুহাসিনীর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। ওর বড় অন্তত বারো বছরের বড়। সেটা আমাদের সেই বয়স যখন চল্লিশের লোককে বৃদ্ধ বলে মনে হতো, তিরিশকে প্রৌঢ়। অতএব একজন প্রায় প্রৌঢ়ের সঙ্গে সুহাসিনীর প্রেম হতে পারে না। আর বিয়ের পর প্রেম হয় কিনা সে সম্পর্কে বাংলা উপন্যাস তেমন ধারণা দেয়নি। 'বিষবৃক্ষ' পড়িনি তখনও।

সুহাসিনী কোলকাতায় থাকে। ওর বর রেলে কাজ করে। বেলগাছিয়ায় তাদের কোয়ার্টার্স। কলকাতায় পড়তে এসেও ওর সঙ্গে দেখা করতে যাইনি। আমার সঙ্গে ওর প্রেম ছিল না কিন্তু এক ধরনের তীব্র অভিমানে আমি কেন আক্রান্ত ছিলাম তা জানি না। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন এক বিকেলে বাগবাজারে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। সারদা মায়ের বাড়ির কাছে সুহাসিনীকে দেখলাম। দেখে চমকে উঠলাম। ও যে বিধবা তা বুঝতে অসুবিধে হলো না। উত্তর কোলকাতায় তখনও মেয়েদের বৈধব্য নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি চলত। সুহাসিনীর পায়ে চটি নেই। পরনে সাদা কাপড়, মাথায় আধো ঘোমটা। গায়ের রঙ একটু চাপা। শরীর বড় হয়ে গেছে বেশ। একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি রে ?'

চমকে সে মুখ তুলল। চিনতে অসুবিধে হবার কথা নয় আট বছর পরেও। মুখে কোনো প্রসাধন নেই, রুক্ষতা দখল করেছে মুখ।

সে কথা বলল না, দাঁড়িয়ে রইল।

বললাম, 'এসব কবে হলো ?'

'কি দরকার তোমার ?'

'বাঃ, আমি তো কিছুই জানি না।'

'জানার ইচ্ছে যখন ছিল না তখন আফশোস করা কি মানায় ?'

'এভাবে কথা বলছিস কেন ?'

'কি ভাবে বলব বল ? শুনেছি কোলকাতায় আছ পাঁচ বছর, খবর নিয়েছ কখনও ?'

'সাহস পাইনি।'

'বাজে কথা। বল ইচ্ছে হয়নি।'

'যতীনকাকা মারা যাওয়ার পর কাকিমার ঠিকানা আর জানি না। ওঁরা তো চা-বাগানে নেই।'

'পুরুষ মানুষ অজুহাত সবসময় খুঁজে পায়।'

'তুই আছিস কোথায় ?'

'ভাসুরের বাড়িতে।'

'কোথায় যাচ্ছিস ?'

'গঙ্গার ঘাটে।'

'এই অবেলায় স্নান করবি নাকি?'

'হ্যাঁ। চুল কেটে স্নান করব।'

'চুল কাটবি?'

'শত্তুর দূর করব।'

'সে কি। কেন?'

'এসব কথা শুনে তোমার কোনো উপকার হবে?'

সেদিন অনেক চেষ্টার পর সুহাসিনীর মন কিছুটা নরম হয়েছিল। শোনা গেল সে আছে য ভাসুরের বাসায় সেই ভদ্রলোকের সন্তান নেই। স্ত্রী বেশ অসুস্থ। বিধবা হবার পর বাপের াড়িতে চলে যেতে চেয়েছিল সুহাসিনী কিন্তু যতীনকাকার মৃত্যুর পর কাকিমারই থাকার জায়গার সমস্যা ছিল, সে থাকবে কোথায়? শ্বশুর-শাশুড়ী তাকে অলক্ষুণে বলে ডাকতেন, খারাপ ব্যবহার করতেন। শেষ পর্যন্ত এই ভাসুর তাকে আশ্রয় দিয়েছেন কিন্তু তার বিনিময়ে যা চান তা দেওয়া সুহাসিনীর পক্ষে সম্ভব নয়। ভদ্রলোক তার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছেন। তাকে রঙিন শাড়ি পরাতে চান। আর সুহাসিনী চাইছে কি করে নিজেকে কুৎসিত করে তোলা যায় তার রাস্তা খুঁজতে। চুল কেটে ফেলা তারই এক ধাপ।

'তুই এভাবে থাকলে মারা যাবি সুহাসিনী।'

'কিভাবে থাকলে বেঁচে যাব?'

'আমি হস্টেলে থাকি। নইলে—।'

'নইলের গল্প আর আমাকে শুনিও না বাবলুদা।'

আমি অসহায় হয়ে ওকে দেখেছিলাম। তখন আমার কোনো রোজগার নেই। বাবার পাঠানো টাকায় কোনোমতে হস্টেল আর কলেজের খরচ চলে। ওই অবস্থায় যতই ইচ্ছে থাক সুহাসিনীর কোনো উপকার আমি করতে পারব না। হঠাৎ সুভাষের কথা মনে এল। সুভাষ আমার সহপাঠী। উত্তর কোলকাতায় বনেদী বাড়ির ছেলে। বিশাল বাড়ি। ওর মা ঠিক দুর্গাঠাকুরের মতো। বাবা নেই কিন্তু অবস্থা ভাল। সুভাষের মায়ের কাছে যদি সুহাসিনীকে নিয়ে যাই তাহলে উনি নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করতে পারেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুই আমার সঙ্গে যাবি?'

'কোথায়?'

'আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। ওরা খুব ভাল মানুষ। তোর অসুবিধে হবে না।'

সুহাসিনী হাসল, 'আমার পেটে বিদ্যে নেই। ঘরের কাজ আর রান্না ছাড়া কিছুই পারি না। ভাসুরের বাড়িতে বিনি পয়সার ঝিগিরি করছি কিন্তু অন্যের বাড়িতে সেটা করতে সম্মানে বাধবে। আমাকে সেটা করতে বলো না।'

সেদিন অনেক বুঝিয়ে সুহাসিনীকে শুধু চুল কাটা থেকে বিরত করতে পেরেছিলাম। সে তার ভাসুরের ঠিকানা দিয়েছিল আমাকে। তাকে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দিতে সে আমায় বলেছিল, 'এবার তুমি যাও। বাড়ির বিধবার সঙ্গে পরপুরুষকে দেখলে পাড়ায় থাকতে পারব না।'

'আমি পরপুরুষ ?'

'নয় তো কি ? হেসেছিল সে, 'ছেলেবেলা যৌবনে মরে যায় বাবলুদা।'

তখন হস্টেলে বসে ছটফট করতাম। একই কোলকাতায় থাকি অথচ আমি সুহাসিনী পাশে দাঁড়াতে পারছি না, এই যন্ত্রণায় জ্বলতাম তখন। সেটা এমন বয়স যে আবেগ পৃথিবী শেষ কথা বলে মনে হতো। এক একবার ইচ্ছে হতো ওর ভাসুরের বাড়িতে গিয়ে কথা বলতে কিন্তু কি কথা বলব ? সুভাষকে বলেছিলাম সুহাসিনীর কথা। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল 'তুই কি ওকে ভালবাসিস ?'

কথাটা কখনও ভাবিনি। মনে হলো ভাল তো বাসিই। তাই বললাম।

সুভাষ জিজ্ঞাসা করল, 'ওকে বিয়ে করতে পারবি ? বিধবাবিবাহ ?'

কবে বিদ্যাসাগর যা করতে চেয়েছিলেন তা না পারার বয়স তখন আমার নয়। এক কথা রাজী হয়েছিলাম। সুভাষ বলেছিল, 'পাশ করে চাকরি জোটা, তারপর না হয় ব্যাপারটা ক যাবে। যা বললি তাতে সুহাসিনীর কাছে কথার ফুলঝুরির কোনো দাম নেই, তোকে কাজে সো দেখাতে হবে।'

পাশ করলাম। চাকরিও পেলাম। তারপর সুভাষকে নিয়ে ওর ভাসুরের বাড়িতে হাজি হলাম। ইতিমধ্যে দুটো বছর কেটে গেছে। সুহাসিনীর ভাসুর অত্যন্ত সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় আমাদের আসার কারণ জানতে পেরে হাসলেন, 'তোমরা একটু দেরিতে এসেছ ভাই। (এখানে নেই। কোথায় আছে জানি না, জানতেও চাই না।'

'কেন ? কোথায় গিয়েছে সে ?' সুভাষ জিজ্ঞাসা করেছিল।

'সে সংসার তো বটেই, কুলও ত্যাগ করেছে। কুলটার খবর রাখা ঠিক নয়।' নির্লিপ্ত মু বললেন সুহাসিনীর ভাসুর।

খুব বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আপনি স্পষ্ট করে বলুন কোথায় গিয়েছে সে।'

'জানলে তো বলব। আমাদের আপিসে একটা মুসলমান ছেলে জিনিসপত্র সাপ্লাই দে মনে হচ্ছে তার সঙ্গেই ভেগেছে। ছেলেটা কাজেকর্মে এ বাড়িতে আমার কাছে আসত। ক যে ভাবসাব হলো তা ওরাই জানে। ভাই-এর বিধবা বউ বলে দয়া দেখিয়ে ঠাঁই দিয়েছিলা যোগ্য ব্যবহার করে গেল হে। তা, তোমরা এত খবর নিচ্ছ কেন ?'

মিথ্যে বলেছিলাম, 'ওর মা আমাদের পাঠিয়েছেন খবর নেবার জন্যে। সেই মুসলম ছেলেটির ঠিকানা জানেন নিশ্চয়ই ! কোথায় থাকে সে ?'

'মারকুইস স্ট্রিট না কোথায় যেন। অতশত মনে নেই। আচ্ছা।'

আমরা বুঝলাম লোকটার পেট থেকে কথা বের করা যাবে না। বাইরে বেরিয়ে এসে ম খারাপ হয়ে গেল। সুহাসিনী একটা অজানা ছেলের সঙ্গে কোথায় চলে গেল ! ও কি অ কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারত না ?

সুভাষ হয়তো আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল। সান্ত্বনার সুরে বলল, 'তুই তো প্রমি করে যাসনি ওর কাছে ফিরে আসবি ! এরকম ভাসুর যার সে কি করে অনিশ্চয়তা'র মধ্যে সা জীবন অপেক্ষা করে থাকবে ! আর হিন্দু বাঙালি বিয়ে করার সময় আইবুড়ো মেয়ে খোঁ

ধবাকে বিয়ে করার কথা ভাবে না। তোর সুহাসিনীকে যদি মুসলমান ছেলেটি সুখে রাখে াহলে তোর খুশি হওয়া উচিত।'

কিন্তু খুশি হতে পারিনি। সুহাসিনীর বিয়ের আগে আমার সঙ্গে কি প্রেম ছিল ? এতদিনে ঝে গিয়েছি, ছিল না। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে প্রেম হলে কিছু বলার নেই। সেটা মেনে নিতে য়। আমার সঙ্গে ছিল না যেমন, তেমন হতেও তো পারত। আর আমার সঙ্গে যখন আবার দখা হলো তখন সে যে গলায় কথা বলেছিল তা হৃদয় শুষ্ক থাকলে কি বলা যায় ? সেদিন আমার দলে অন্য কেউ অনুরোধ করলে সে চুল কাটা থেকে বিরত হতো ? বরং আমার সেদিন মনে যেছিল যে প্রেম আমাদের মধ্যে অনুচ্চারিত অবস্থায় ছিল, সেদিন সেটা দুজনে স্পষ্ট করে য়েছিলাম। তারপর মাত্র দু' বছর সে অপেক্ষা করতে পারল না ? অদ্ভুত কষ্ট হয়েছিল।

সুভাষকে বলেছিলাম মারকুইস স্ট্রিটে গিয়ে খোঁজ নিলে কেমন হয়। সুভাষ বলেছিল, পাগলামি করিস না। অত বড় রাস্তার ফুটপাতে দাঁড়িয়ে তোকে শুধু সুহাসিনীর নাম ধরে চিৎকার রে যেতে হবে, ছেলেটার নামটাও তো আমরা জানি না।'

একজন বাঙালি বন্ধু মুসলমান না হিন্দু তা জানার আগ্রহ আমার কখনই হয় না। ংলাদেশে বারংবার গিয়ে দেখেছি আমার মুসলমান বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে আমি কোনো ফারাক খুঁজে পাইনি। তাঁরাও তাঁদের ব্যবহারে সেটা পেয়েছেন এমনটা মনে হয়নি। আমার শ্বাস যত দিন যাবে তত আমরা পূর্বপুরুষের পাপ থেকে মুক্ত হব।

মনে হচ্ছে একটা সত্যি কথা বলা দরকার। আমি জানি না কেন আমার পরিচিত থাকথিত হিন্দু, যাঁরা হিন্দু হিসেবে কোনো রকম ধর্মাচরণ করেন না শুধু মূর্তি অথবা ফটো জো করা ছাড়া, মুসলমানদের বাঙালি হিসেবে ভাবতেই পারেন না। এত মূর্খামি সহ্য করা শকিল। আমার চারপাশে হাজার হাজার মূর্খ বাস করছেন যাঁরা নিজেকে বাঙালি এবং শেখ জিবর রহমানকে মুসলমান বলে ভাবেন। এপার বাংলার হিন্দু বাঙালি যখন নিজের ঐতিহ্যের থা ভাবেন তখন মুসলমান বাঙালির কথা চিন্তাও করেন না। ভাগ্যের এমন পরিহাস আজ দেশে তাঁদের পরিচয় ভারতীয় বলে, বাঙালি হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ দের গরিষ্ঠ অংশ মুসলমান। আমি আজ পর্যন্ত কোনো সুস্থ মুসলমানকে হিন্দু বাঙালি সম্পর্কে যোদগার করতে শুনিনি কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি হিন্দুরা সেটা প্রায়শই করে থাকেন। যাঁরা ককালে দেশবিভাগের কারণে পূর্ব বাংলা ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের রাগের রণ বোঝা যায়। কিন্তু তাঁরা রাজনীতিকে ধর্মের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে চেয়েছেন। পাকিস্তান ষণা হওয়া মাত্র যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পূর্ব বাংলা থেকে পালিয়ে পশ্চিম বাংলায় চলে এসেছেন, দের বেশির ভাগই হীনম্মন্যতায় ভুগছেন। যাঁরা ভোলেননি তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম মহাদেব হা অথবা নির্মলেন্দু গুণের মতো শ্রদ্ধেয় কবিকে ঢাকায় আবিষ্কার করেছেন।

তাহলে ? একথা প্রমাণিত একজন হিন্দু একজন মুসলমানের চেয়ে অনেক বেশি সংকীর্ণ য়ে আছেন। অবশ্যই এই মুসলমান মৌলবাদী নন। বাংলাদেশের নাগরিকদের মাত্র পাঁচ তাংশ মৌলবাদী, যাঁরা ধর্মের দোহাই দিয়ে মানবতাকে শূলে চড়ান আর পশ্চিম বাংলার ন্দুদের পঁচানব্বই ভাগ মানুষ মৌলবাদী না হওয়া সত্ত্বেও একজন খ্রীস্টানকে মুসলমানের চেয়ে

কাছের মানুষ বলে মনে করেন। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হিন্দু বাঙালি পাঠক গল্প উপন্যা
মুসলমান চরিত্র থাকলে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। মুজতবা আলি সাহেবকে হিন্দু বাঙালি গ্রহ
করেছিল, কারণ তিনি আন্তর্জাতিক ছিলেন। গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রেম নেই' দেশ পত্রিকা
পড়েছেন সবাই, বই কিনেছেন ক'জন ? আজ বাংলাদেশের জনপ্রিয় লেখকদের বই কলকাতা
পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু বিক্রি হচ্ছে না তেমন। কারণ তাঁদের চরিত্র মুসলমান, সামাজিক পরিমণ্ড
সেই কারণেই অন্যরকম। অথচ আমাদের উপন্যাসে তুলসীতলা অথবা লক্ষ্মীঠাকুরের বর্ণ
থাকলেও চট্টগ্রামের মুসলমান পরিবার সাগ্রহে পড়ছেন। কই, তাঁদের তো কোনো অসুবিধে হ
না। আমার ঠাকুমা বাড়িতে মুসলমান এলে চৌকাঠ ডিঙোতে দিতেন না স্বাধীনতা-দা
ইত্যাদির অনেক আগে। কেন দিতেন না এই প্রশ্ন তাঁকে কেউ করেনি। বাঙালির ঐতিহ্য ব
ধরে নিয়েছিল। যা কিছু বাঙালিয়ানা তা যেন হিন্দুদের সম্পত্তি ছিল।

তাই, সুহাসিনী একজন মুসলমানের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে জেনে আমার যে প্রতিক্রি
হয়েছিল তা হিন্দুর সঙ্গে করলেও হতো। কিন্তু ক্রমশ যখন খবরটা প্রচারিত হয়ে চা-বাগা
পৌঁছাল তখন চারদিকে সুহাসিনীর নিন্দা। নিন্দার কারণ গৃহত্যাগ নয়, মুসলমানের সঙ্গী হওয়া
আমি এইটে মেনে নিতে পারিনি। তারপর সেই ক্ষতের ওপর একটু একটু করে ধুলো পড়
লাগল।

কোলকাতা খুব ছোট্ট শহর। আমি না চাইলেও সুহাসিনীর সঙ্গে আমার দেখা হলো। এক
নামকরা স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হতে হয়েছিল। প্রায় আধঘণ্টা ধরে পুরস্কা
তুলে দিতে দিতে যখন বিরক্ত তখন একটি বালকের নাম ঘোষণা করা হলো। সে ক্লাসে প্রথ
হয়েছে। সাদা শার্ট কালো প্যান্ট পরা আট বছরের ছেলেটি খুব সপ্রতিভ ভঙ্গীতে আমার সাম
এগিয়ে এল। দারুণ ফর্সা আর মুখের আদল বড্ড চেনা চেনা। জিজ্ঞাসা করার দরকার ছি
না, ঘোষক ওর নাম বলেছেন সম্রাট হক্।

পুরস্কার দেওয়া শেষ হলে উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি
এই সময় ছেলেটি এল সামনে, 'শুনুন। আপনি একটু দাঁড়ান।'

'কেন ?' হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলাম।

এবং তখনই সুহাসিনীকে দেখতে পেলাম। না, বোরখা নেই, স্বাভাবিক শাড়ি পরনে
সামনে এসে বলল, 'আমার ছেলে।'

'বাঃ, খুব ভাল।'

'আমার একটা অনুরোধ রাখবে ?'

'নিশ্চয়ই।'

'এক কাপ চা খাওয়াতে চাই। কাছেই বাড়ি।'

এতদিন তো কোনো আগ্রহ ছিল না, ওকে দেখে সেগুলো বুকের মধ্যে হুড়মুড়িয়ে জে
উঠল। আমার গাড়িতে সবাই বসলাম। ক্রিক রো-তে একটি প্রাচীন বাড়ির সামনে পৌঁছালাম
সরু প্যাসেজ, অনেক ভাড়াটের বাস। আমাকে ওরা ছাদের ঘরে নিয়ে এল। দুটো ঘর কি
খুবই পরিচ্ছন্ন।

চেয়ারে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার কর্তা কোথায় ?'

'রাত এগারটার আগে ফিরবেন না।'

লক্ষ্য করলাম ছেলেটি তার এমন আনন্দের দিনেও বাড়ি ফিরে বই নিয়ে বসে গেল পাশের ঘরে। দৃশ্যটা ভাল লাগল।

চা নিয়ে এল সুহাসিনী, সঙ্গে বিস্কুট। বলল, 'আমার বিরুদ্ধে তোমার কোনো অভিযোগ নেই ? আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে চিনতেই চাইবে না।'

'অভিযোগ থাকবে কেন ?'

'আমি মুসলমান বিয়ে করেছি বলে।'

'তুমি হিন্দু বিয়ে করলে আমার ক্ষেত্রে কি তফাৎটা হতো ?'

সে বড় চোখে তাকাল। তারপর হাসল, 'আমি সুখী কিনা জিজ্ঞাসা করবে না ?'

'অত ভাল ছেলে যার সে কেন অসুখী হবে ?'

'ছেলেই সব ? আমি আমার স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী। কাজকর্ম শেষ করে তিনি বিকেলবেলায় প্রথম জনের কাছে যান। সেখান থেকে খেয়েদেয়ে রাত এগারটা নাগাদ আসেন। আবার সকালের ভাত এখান থেকে খেয়ে কাজে বেরিয়ে যান। কেমন লাগছে শুনতে ?'

আমি কথা বললাম না। সুহাসিনী দেখতে কি আরও সুন্দরী হয়েছে ? অল্প বয়সের ছেলেমানুষী শরীরে নেই, এখন সবই ভরাট। ওর কথার ধরন কিন্তু পাল্টায়নি।

'আমি মুসলমান বিয়ে করেছি বলে তুমি নাক কুঁচকেছো ?'

'তুমি বিয়ে করেছ আবার, এ খবরে খারাপ লেগেছিল। মুসলমান না হিন্দু তা ভাবিনি।'

'আমার সমস্ত আত্মীয়স্বজন আমাকে বর্জন করেছে।'

'আফশোস হচ্ছে ?'

'বিন্দুমাত্র নয়। বরং আমি ভাল আছি। খাওয়া-পরা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। চব্বিশ ঘণ্টা স্বামী পাশে থাকলে ঝগড়াঝাঁটি হতোই, দুঃখ পেতাম। তার চেয়ে এ ঢের ভাল।'

'কাকিমা—।'

'মা এক মাসির বাড়িতে আছেন। আমি মুসলমান বলে এখানে আসেন না কিন্তু আমার পাঠানো টাকা প্রত্যেক মাসে নেন।' হাসল সুহাসিনী, 'আমাকে আমার স্বামী ধর্মান্তরিত করেছেন বটে কিন্তু কোনো রকম ধর্মাচরণ করতে বাধ্য করেননি।'

'তাহলে ভাল আছ ?'

'হ্যাঁ, আছি। তবে মাঝে মাঝে মনে হয় তেরো বছর বয়সে বিয়ে না হলে ভাল হতো। মেয়েদের পড়াশুনা শেষ করে নিজের পায়ের নিচে মাটি আগে যোগাড় করা দরকার। আমি সেই ভুল করেছিলাম মায়ের চাপে।'

'উনি তো তোমাকে টাকাপয়সা থেকে বঞ্চিত করেন না!'

'হ্যাঁ। করেন না। প্রত্যেক দিন সকালে একশ টাকা দিয়ে যান। তা থেকে বাজার, ইলেকট্রিক, ছেলের পড়াশুনা চালিয়ে মাকে টাকা পাঠাই। এইভাবে টাকা নিতে খুব খারাপ লাগে। উনি কিন্তু কখনই মাসের প্রথমে একসঙ্গে টাকা দেবেন না। যদি কোনো রাত্রে বাড়িতে

ফিরতে না পারেন তাহলে পরের দিন রোজগার বন্ধ।'

'রোজগার বলছ কেন ?'

'তা নয়তো কি ! স্ত্রী হিসেবে রাত্রে ওর সঙ্গে শুই বলেই তো সকালে টাকা পাই।' সুহাসিনীর মুখের চেহারা বদলে গেল, 'আশি ভাগ বাঙালি বউ-এর মনের কথা জিজ্ঞাসা করলে এই সত্যিটা তারা বলবে।'

'তুমি শুরুতে স্বামী সম্পর্কে যে সুখ্যাতি করছিলে তার সঙ্গে এ কথার কোনো মিল নেই।'

'কি আশ্চর্য ? মিল থাকবে না কেন ? ওর বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। ধরো, তোমার সঙ্গে আমার যদি অল্প বয়সে বিয়ে হতো তাহলে কি এখন আমরা ভাল সম্পর্ক নিয়ে থাকতাম ? তোমার চরিত্রের সব খারাপ দিক যেমন আমি জেনে যেতাম তুমিও আমারটা জানতে। তখন থাকতে হয় বলে থাকতাম। অবশ্য তার মধ্যেই ভাল থাকার চেষ্টা করতাম, যেমন এখন আছি।'

'আমাকে হঠাৎ এখানে আনলে কেন ?'

'জানি না। হঠাৎ কি রকম ভাবপ্রবণ হয়ে গেলাম। শোন, তুমি আমার একটা উপকার করবে ? আমি অভিনয় করতে চাই, একটা সুযোগ পাইয়ে দেবে ?'

'অভিনয় ?' অবাক হলাম।

'হ্যাঁ। থিয়েটার, সিনেমা, সিরিয়ালে, যেখানে হোক। তোমার তো ওই মহলে ভাল হোল্ড আছে। দেবে আমাকে সুযোগ ?'

'হঠাৎ এরকম ইচ্ছে কেন ?'

'আমার টাকার দরকার। স্বাবলম্বী হতে চাই। এই বয়সে আর কোনো কিছু শিখে উপার্জন করতে পারব না। কিন্তু অভিনয় করতে পারি।'

'তোমার স্বামী ?'

'ও রাজী হবে না। বউকে ঘরের বাইরে পা বাড়াতে দেবে না।'

'তাহলে ?'

'তবু আমাকে পা বাড়াতে হবে।'

'এসব না ভেবে ছেলেকে মানুষ করার চেষ্টা করছ না কেন ?'

'আর একবার দুঃখ পেতে ! ও তো হাজার হোক ছেলে। পাখা গজালে নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু দেখবে না। তুমি আমাকে বল, কোথায় যেতে হবে ?'

'ভেবে দেখি।'

'না। তোমাকে কথা দিতে হবে।'

ওইরকম জেদের সামনে বেশিক্ষণ প্রতিরোধ করা যায় না। মোটামুটি সম্মতি আদায় করে নিয়েছিল সুহাসিনী। আমাকে আবার তার কাছে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল।

আমি প্রতিশ্রুতি রাখিনি। আমি বিশ্বাস করি অভিনয়ের জীবন থেকে মেয়েরা কখনই সুখ অথবা শান্তি পায় না। সাফল্য এলেও নয়। সাধ করে আমি কাউকে সেই পথে যেতে উদ্বুদ্ধ করতে পারি না।

প্রকাশকের ঠিকানায় চিঠি পেয়েছিলাম সুহাসিনীর। অনেক অভিযোগ করেছে সে। যেতে বলেছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। বাড়ি বদল করে চলে গিয়েছে গার্ডেনরিচে।

তার কিছুদিন পরে বাবরি মসজিদ নিয়ে দেশে আগুন জ্বলল। পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে দর শোওয়ার ঘর পুড়িয়ে দিলে মুখ বুঁজে সহ্য করবে অথচ মন্দির বা মসজিদে আঁচড় পড়লেই াদ হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষ যেমন মসজিদ ভাঙা পছন্দ করে না তেমনি তার জন্যে দাঙ্গাও র্থন করে না। কিন্তু তাদেরই ফলভোগ করতে হয় খুব বেশি। কলকাতার কয়েকটা পকেটে র আঁচ এসে লাগল। খবরের কাগজে দেখলাম গার্ডেনরিচ জ্বলছে।

আমি জানি না সুহাসিনী এখন কেমন আছে। আছে কিনা তাও জানি না। শুধু জানি ওর ল আর রঙ জমে না। ওর সর্বাঙ্গ লাল আগুনে ঝলসাচ্ছে। সে আগুন চোখে না দেখা গেলেও নি একান্ত তারই।

॥ ৫ ॥

যে মেয়ে রান্না করতে ভালবাসে না সে কিছুতেই ভাল প্রেমিকা হতে পারে না।

এই লাইনটি পড়ে অনেকেই হয়তো ঠোঁট মোচড়াবেন। এখন যা অবস্থা, মেয়েরা বিয়ের আগে রান্নাঘরে ঢোকার সুযোগ এবং সময় পায় না। আপনাদের চেনা একটি মেয়ের কথা বলা যাক। তিন বছর বয়সে সে প্রথম স্কুলে গিয়েছিল। ন'টায় তার স্কুল, বারোটায় ছুটি। বারবার বলে দেওয়া হয়েছিল টিফিন খেয়ো। বাক্স খুলে দেখেছিল কোনোদিন ডিমসেদ্ধ পাউরুটি, কোনোদিন চিকেন স্যান্ডউইচ। বাড়িতে মা আর রান্নার লোক।

একটু একটু করে বড় হতে লাগল। তার পড়ার খুব চাপ। সকালে উঠে তৈরি হতে না স্কুলের বাস এসে হর্ন দেয়। স্কুল থেকে ফেরে আড়াইটেয়। এসে অল্পসল্প খেয়ে টিভির মনে বসে। পাঁচটা থেকে পড়া শুরু। রাত ন'টায় টিভির সামনে বসে ডিনার এবং দশটায় । এই মেয়েটি ওইভাবে স্কুল ফাইন্যাল, হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে যখন কলেজে গেল ন দুটো জিনিস শিখেছে। কি করে স্যান্ডউইচ অথবা চাউমেন চটজলদি তৈরি করা যায়। জোর কোনো আধুনিক রেসিপিতে মুরগির মাংস। এই মেয়েটি বিয়ের সময় প্রথমেই জেনে য় রান্নার লোক আছে কিনা। যেহেতু তার স্মৃতিতে গোকুল পিঠে নেই, ইলিশের কাঁটা দিয়ে র শাক নেই এবং সেই স্মৃতির সঙ্গে তার স্বামীরও মিল রয়েছে তাই রান্নার লোক দেশে গেলে একদিন এক একটা হোটেল চেখে বেড়ানো ছাড়া কোনো উপায় নেই। প্রশ্ন হলো, এই মেয়েটি ভাল প্রেমিকা হতে পারে কিনা!

একটু দুঃসাহসী হয়ে বলছি প্রেমিকা কনসেপ্টের সঙ্গে আমাদের মা-মাসি-দিদিমার কো
মিল নেই। তাঁরা চমৎকার রাঁধতে জানতেন। আমার বিধবা পিসিমার রান্না ফুলকপির তরক
জীবনে ভুলতে পারব না। বারো বছরে বিধবা হওয়ায় তিনি কখনও প্রেম করার সুযোগ পানন
বিয়ের আগে তো নয়ই, বিয়ের পর তাঁরা স্বামীর সঙ্গে আদৌ প্রেম করেছেন কিনা সন্দেহ আছে
আমার বাবার ঠাকুমার মুখ তাঁর স্বামী কখনও দিনের আলোয় দ্যাখেননি। রাত গভীর হলে সব
খাওয়া-দাওয়া চুকলে তিনি অন্ধকারে মশারির মধ্যে ঢুকতেন, ভোরের আলো ফোটার আ
রান্নাঘরে ফিরে যেতেন। এবং ওইভাবেই তাঁর সন্তানাদি হয়েছিল। তা সেই ভদ্রমহিলা ত
স্বামীর সঙ্গে প্রেম করতেন, করলে কি ধরনের প্রেম তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। যেসব নিরুচ্চা
মুখবোঁজা, বুককাঁপা প্রেমের গপ্পো শোনা যায় তার সঙ্গে জীবনের কতটা মিল ছিল জানি ন
তবে জানি, শ্রীযুক্তা রাধা তাঁর প্রেম নিয়ে সবিস্তারে প্রচারিতা। অতদূরের গল্প বলে কি লা
বঙ্কিম তাঁর কিশোরী নায়িকার প্রেমের বর্ণনা দেওয়া সত্ত্বেও আঠারোশো আশি সালে কো
বঙ্গকিশোরী প্রেমের ব্যাপারে সাহস দেখাতে পারেনি। আমরা জ্ঞান হবার পরই মাকে মা
চেহারায় দেখেছি, সেই বঙ্গজননীদের প্রেমিকারূপ ঈশ্বরও দ্যাখেননি। কিন্তু তাঁরা চমৎক
রাঁধতেন। গ্যাস, আধুনিক মশলা, নানান বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ছাড়াই নেহাৎই দিশী যেসব র
যখন স্মৃতিতে তখন বলতেই হবে প্রেম করতে চাইলে অথবা পারলে তাঁদের প্রেমিকরা কয়ে
জন্ম ধরে ভুলতে পারতেন না, পুনর্জন্ম তত্ত্বের দোহাই দিয়ে বলছি।

বাঙালি মেয়ে বিছানায় পাপবোধে আক্রান্ত হয় বলে একটা কথা চালু আছে। এর ব্যাখ্য
আছে। আট-দশ বছর বয়স থেকে নানান অশিক্ষায় ডুবে থাকা মা-মাসিরা তাদের যেভা
দীক্ষিত করত তা তাদের মনে গেঁথে যেত। স্বামীর সঙ্গে সহবাসও একটি অপবিত্র কর্ম বলে ম
করতেন অনেকেই। চোরের মতো কাজ শেষ হলেই যেন বেঁচে যেতেন। ব্যতিক্রম নিশ্চ
ছিল। কিরণময়ীর সঙ্গে দিবাকরের বিয়ে হলে বা হীরার সঙ্গে নগেন্দ্র বাস করলে যে ওই ক
কখনই ঘটত না তা জোর গলায় বলা যায়। এই কিরণময়ী অথবা হীরা নিশ্চয়ই সমাজবহি
চরিত্র নয়, তবে তারা সংখ্যায় অল্প। এখনও স্বামীর সঙ্গে বাসমুক্ত হয়ে শুতে বাঙালি মে
অনেক কুণ্ঠা। কিন্তু ক্রমশ সময় পাল্টাচ্ছে। আমার এক মনস্তাত্ত্বিক বন্ধু বলছিলেন সেকথ
তাঁর কাছে বেশ কিছু কেস এসেছে যেখানে স্ত্রীর দ্বারা স্বামী প্রায়শই রেপ্‌ড্ হচ্ছেন। এই মেয়ে
কতখানি ভাল প্রেমিকা? যেখানে প্রেমের সংজ্ঞা আই নিড ইউ, ইউ নিড মি পর্যায়ে চ
গেছে? জীবনের সবকিছুর যখন নতুন করে মূল্যায়ন হচ্ছে তখন প্রেম তার আদিকালের ধা
নিয়ে থাকতে পারে না।

এসব কথা শোনার পর প্রশ্ন উঠবেই, ভাল রান্না করার সঙ্গে প্রেমের কি সম্পর্ক আছে
আছে। আপনি একটি সুন্দরী নারীকে বিয়ে করলেন। সকালে উঠে চা, টোস্ট এবং অ
যাওয়ার সময় কোনোমতে ঝোলভাত খেয়ে গেলেন। বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখলেন ভদ্রমহি
অনুজ্জ্বল শাড়ি পরে আছেন। ভাল করে চুলও আঁচড়াননি। আসামাত্র নানান সমস্যার ক
শুনিয়ে সিঙাড়া আর চা দিলেন। রাত্রে রুটি আর সবজি, সঙ্গে ডিম থাকল তো তার এব
ঝোল। এই দিনের পর দিন চলছে। আপনি লক্ষ্য করবেন আপনার প্রেম কমে যাচ্ছে। অ

আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে শোনা যাবে, 'এ আবার কি কথা ! স্বামীকে স্ত্রী ভালবাসবে না কি অন্য কেউ ভালবাসবে।' ভদ্রমহিলার প্রেমের কোনো ধারণা নেই।

সেই যে কথায় বলে, অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর, অর্থহীন নয়। এই ঘরণী যিনি অতি বড় তিনি ঘর সুন্দর করতে জানেন। আপনি সুন্দরী, শুধু চেহারাটুকুই আছে, পেটে কিছু বিদ্যে, মাপ করবেন, আপনার প্রেমিককে অল্পদিনের মধ্যেই হারাবেন। প্রেম ধরে রাখতে কিছু দিতে হয়। এই দেওয়াটা ঠিক হলে দেখবেন দু'হাত ভরে পাচ্ছেন। আপনি কিছুই দেবেন না আর আশা করবেন আপনার স্বামী পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করছে, এ কি হয় ? আগে একান্নবর্তী সংসার থাকায় চক্ষুলজ্জা, গুরুজনদের ভয়ে এসব চাপা পড়ে যেত, কিন্তু এখন সংসার তো দুজনের, প্রকাশ পেতে বাধ্য। সকালে চায়ের সঙ্গে পাঁউরুটির স্লাইসটি আড়াআড়ি কেটে একটায় মাখন, অন্যটায় জেলি মাখিয়ে দিলে যিনি খাচ্ছেন তাঁর সকালের মেজাজটা ভাল হয়ে যাবে। রোজ একঘেয়ে ভাত ঝোল না করে একদিন শুধু পাঁচ রকমের সেদ্ধ অথবা চার রকমের ভাজা আর মুসুরি ডাল করুন। খেতে খেতে লোকটা বলবে, বেশ স্বাদ পাল্টালো। বিকেলে দোকান থেকে সিঙাড়া না এনে বাড়িতে নিমকি করতে পারেন অথবা নিদেনপক্ষে ভেজিটেবল স্যান্ডউইচ। রাত্রে ডিম-তরকা করা কি খুব কষ্টকর ! একজন ঘরণী এরকম হরেক পদ ভাবতে পারেন। একটু ভাবুন, রান্নার বই পড়ুন, এক্সপেরিমেন্ট প্রথমে ভাল নাও হতে পারে, কিন্তু দেখবেন বাড়ির আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে। এর জন্যে আপনাকে খুব বেশি সময় দিতে হবে না, টিভির সিরিয়ালও মিস করবেন না।

আসলে কি জানেন, ছেলেদের মনে ছেলেবেলার স্মৃতি বড্ড বেশি দাগ কেটে থাকে। আপনি যত ভাল পারেন রাঁধুন না কেন, আমি বলব আমার পিসিমার মতো হয়নি। কিন্তু আপনি যদি চিকেন সেদ্ধ করে তার মাংস ছাড়িয়ে কর্নফ্লাওয়ারের আস্তরণে ঢেকে ভেজে দেন, এবং সেই পুরের মধ্যে এক চিলতে মাখন যদি থাকে তাহলে খেতে গিয়ে মনে হবে এমন জিনিস এর আগে কেউ আমাকে করে দেয়নি।

সন্ধ্যাদির কথা মনে পড়ছে : জলপাইগুড়িতে কিশোরবেলায় আমরা কয়েকটা নর্ম মান্য করতাম। তখন আমার উঠতি বয়স। উত্তমকুমার-সুচিত্রা সেনের ছবি দেখে দেখে মন দারুণ রোমান্টিক হয়ে উঠেছে। বয়স মাত্র পনের বলে মন খারাপ হয়ে যেত। দেখতাম পৃথিবীর যাবতীয় সুন্দরীদের বয়স আমার চেয়ে বেশি। তেরো-চোদ্দর মেয়েদের নেহাৎই বালিকা বলে মনে হয়। কেউ সুচিত্রা সেনের আদল পায়নি, না চেহারায়, না অভিব্যক্তিতে। কিন্তু বয়সে বড় মেয়েদের দিদি বলার রেওয়াজ ছিল। একবার যাকে দিদি বলে ডেকেছি তাকে অন্য চোখে দেখার বদলে চোখ বন্ধ করে ফেলতাম সেসময়। সন্ধ্যাদি আমার চেয়ে মাত্র এক বছরের বড়। আমি টেনে, সে কলেজে। অনেকটা কাবেরী বোসের মতো দেখতে ছিল সন্ধ্যাদি। সেসময় খুব অল্প ছবি করে কাবেরী বোস সুচিত্রা সেনের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হয়ে উঠেছিলেন। হঠাৎ কি কারণে জানি না, চলচ্চিত্র জগৎ থেকে সরে গেলেন তিনি। ফিরে এসেছিলেন অনেক পরে সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে। পরে দুর্ঘটনায় মারা যান।

তা কাবেরী বোসের আদলে সন্ধ্যাদি আমার দিদি। জলপাইগুড়ির বিভিন্ন পাড়ার ছেলেরা,

যারা আমার চেয়ে বয়সে বড়, তারা সাইকেল নিয়ে সন্ধ্যাদির বাড়ির সামনে পাক খেত, কেউ কেউ কলেজে যাওয়া-আসার পথে সাইকেলে সঙ্গী হতো। এই সন্ধ্যাদির রূপের খ্যাতি তে ছিলই, রান্নার সুখ্যাতিও কম ছিল না। তখন জলপাইগুড়ি শহরের মানুষ চিরাচরিত রান্না খেতে অভ্যস্ত ছিল। সন্ধ্যাদি দিশী পত্রিকা আর বিদেশী রান্নার বই যোগাড় করে দারুণ দারুণ ডিশ তৈরি করত। ওই ষোল বছর বয়সে একাই পঞ্চাশ জন লোকের রান্না চমৎকার রেঁধে দিতে পারত। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তুমি এত ভাল রাঁধো কি করে ?'

সন্ধ্যাদি উদাসীন গলায় বলেছিল, 'ধ্যেৎ ! কি আর ভাল !'

'তোমার মতো রান্না মা-ও রাঁধতে পারে না।'

'বাজে বকিস না। সেদিন মাসিমার কাছে আমি সরুচাকলি শিখে এসেছি।'

'তোমার মা বুঝি খুব ভাল রাঁধে ?'

'নারে ! মায়ের তো অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল। বাবারও মা ছিল না তখন। রান্না শেখার সুযোগই পায়নি। কোনোমতে চালিয়ে এসেছে।'

'তুমি এত ভাল রান্না কোত্থেকে শিখলে ?'

'তেমন কি আর ভাল ! তুই তো মাত্র একদিন খেয়েছিস !'

'একদিনেই তো বোঝা যায়।'

'আসলে কি জানিস, আমার রান্না করতে খুব ভাল লাগে. নতুন নতুন রান্না করার মধ্যে অদ্ভুত একটা চার্ম আছে। ধর মোচা। মোচার তরকারি তো খেয়েছিস। কিন্তু ওইভাবে তৈরি না করে পুরো মোচা ছাড়িয়ে একেবারে শেষটুকু রেখে পুরোটা সেদ্ধ করে নিলাম, তারপর মোচার মতো সাজিয়ে নিয়ে বেসনে ঢেকে ফেললাম। এমনি বেসন নয়, ডিমের কুসুমগোলা বেসন কি রকম লাগবে বল তো খেতে ?'

'দারুণ !'

'আসলে নতুন ভাল রান্না করলে মনে হয় একটা কিছু সৃষ্টি করলাম।'

'তোমার ওইরকম সৃষ্টি করতে খুব ভাল লাগে ?'

'খুব।' সন্ধ্যাদি বলেছিল, 'কেউ কেউ দেখেছি রান্নাঘরে যাওয়ার কথা উঠলেই কিরকম করে। আমার খুব অবাক লাগে। এই সে শুনিস না, মেয়েরা বলে, খুন্তি হাতা নাড়তে নাড়তেই জীবনটা শেষ হয়ে গেল, তারা কিন্তু জানেই না পৃথিবীর নামকরা রাঁধুনিরা সব পুরুষ। বড় বড় হোটেলে গিয়ে দ্যাখ পুরুষরাই রান্না করছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র চার ঘণ্টা রান্নাঘরে থাকলে তো বাকি কুড়ি ঘণ্টায় অন্য কাজ করা যায়।'

আমি বলেছিলাম, 'ঠিক বলেছ। আমাদের সর্দারজীর হোটেলে যে রাঁধে সে-ও ছেলে।'

সন্ধ্যাদি পড়াশুনায় খারাপ ছিল না। ইংরেজিটা ভাল বুঝত। জিজ্ঞাসা করলে বলত, 'ইচ্ছে আছে ইংরেজিতে অনার্স নেব। দেখি কি হয় !'

একদিন সাহস করে বলে ফেলেছিলাম, 'তুমি কি জানো অনেক ছেলে তোমার সঙ্গে ভাব করার জন্যে সাইকেলে চক্কর দেয় !'

'তুই কি করে জানলি ?'

'বাঃ, আমরা তো দেখতে পাই।'

'কেন চক্কর দেয় কে জানে।' উদাসীন হয়ে গেল সন্ধ্যাদি।

'বাঃ, তুমি কত সুন্দর দেখতে !'

'তাতে কি ? সবাই আমাকে দেখবে কিন্তু আমি যদি কাউকে দেখতে না পাই তাতে ওদের লাভ হবে ! এই ব্যাপারটাই উজবুকগুলো বোঝে না।'

কথাটার মানে তখন বুঝতে পারিনি। পরে যখন বুঝেছিলাম তখন নিজে ভাল শিক্ষা পেয়েছিলাম। একটি মেয়েকে দেখে আমার ভাল লাগতেই পারে কিন্তু আমাকে তার ভাল লাগছে কিনা একথা কজন জানতে চাই ?

সেসময় জলপাইগুড়িতে রান্নার প্রতিযোগিতা হয়েছিল। সন্ধ্যাদি প্রথমে রাজী হননি, আমি জোর করে ওর নাম ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। বিশাল ভিড়। বিচারকদের মধ্যে বেড়াতে আসা এক চিত্র-পরিচালকও ছিলেন। যথারীতি সন্ধ্যাদি ফার্স্ট হয়েছিল। পুরস্কার তুলে দেবার সময় সেই চিত্র-পরিচালক বলেছিলেন, 'বাঃ, তুমি তো সুন্দর দেখতে। রেঁধে সময় নষ্ট না করে ফিল্মে অভিনয় করলে অনেক নাম করবে। রাজী থাকলে বল !'

সন্ধ্যাদি বলেছিল, 'রাঁধলে সময় নষ্ট হয় তা আপনাকে কে বলল ?'

ভদ্রলোক জবাব দিতে পারেননি।

সন্ধ্যাদি যখন ইংরেজি অনার্স নিয়ে কলেজে পড়ছে তখন আমি কলকাতায় চলে আসি। ছুটিতে গেলে দেখা হয়। মনে হলো সন্ধ্যাদি অনেক সুন্দরী হয়েছে। সন্ধ্যাদির বাবা সরকারী অফিসে চাকরি করতেন। অবস্থা সাধারণ। কিন্তু ওঁকে দেখে সেকথা বোঝা যেত না। আলুর খোসা দিয়ে এমন একটা পদ করতেন যা চমৎকার মনে হতো। সে-বাবদ খরচও হতো না খুব। সেই সময় আমি যখন কলকাতায় তখন সন্ধ্যাদির চিঠি পেলাম। স্নেহের বাবলু, আশা করি ভাল আছিস। আমার পরীক্ষা এগিয়ে আসছে, কি হবে কে জানে। পিসিমার কাছে শুনলাম তোর হস্টেলে খুব খারাপ খাওয়াচ্ছে। কেন যে কলকাতায় পড়তে গেলি, এখানে তো কলেজ ছিল। তুই আপেল বা পেয়ারা সেদ্ধ করে একটু চিনি মাখিয়ে পেস্ট করে নিয়ে রুটির সঙ্গে খাবি বিকেল-বেলায়। দেখবি ভাল লাগবে। যাকগে, লজ্জার মাথা খেয়ে তোকে একটা জিনিস আনতে লিখছি। তোর তো আসার সময় হলো। আমি জলপাইগুড়ির কোনো দোকানে খুঁজে না পেয়ে তোকে লিখছি। ফ্রি সাইজের কয়েকটা লেডিস প্যান্টি দরকার। এলেই দাম দিয়ে দেব। তোর ওপর আস্থা আছে, এটা গল্প হিসেবে প্রচারিত হবে না। ভাল থাকিস। তোর সন্ধ্যাদি। পুনশ্চ : তোর কাছে টাকা না থাকলে আনতে হবে না।

চিঠি পেয়ে আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। মেয়েরা তাঁদের অন্তর্বাস নিজেরাই কিনে থাকেন। আমার স্কুলের এক বন্ধু বলেছিল, 'তুই লক্ষ্য করে দেখিস, কাপড় শুকাবার তারে সবকিছু মেলে দেওয়া হয়েছে কিন্তু ওদের অন্তর্বাস দেখতে পাবি না। সেটা শুকাতে দিলে তার ওপর আর একটা জামা চাপা দেওয়া হয় যাতে কেউ ওটাকে দেখতে না পায়।' এখনকার মতো তখন দোকানে দোকানে অথবা বিজ্ঞাপনে অন্তর্বাস দেখা যেত না। ওসব গোপন জগতের ব্যাপার বলে চিহ্নিত ছিল। জলপাইগুড়ির মেয়েরা তখন প্যান্টি ব্যবহার করত না। ফ্রক ছাড়ার

সময় ইজেরমুক্ত হয়ে যেত চিরকালের জন্যে। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। এখনকার অল্পবয়সী মেয়েরা ব্যাপারটা ভাবতেই পারবে না। আগের অভ্যেস নিয়ে যাঁরা বড় হয়েছেন তাঁরা যত শিক্ষিতাই হোন না কেন, প্যান্টি পরতে অস্বস্তি বোধ করেন। একই কারণে শালোয়ার কামিজও তাঁদের পরতে দেখিনি। চল ছিল না বলেই কোনো দোকানে প্যান্টি রাখা হতো না। কেউ প্যান্টির খোঁজ করছে দোকানদার ভাবতেও পারত না। এরকম অবস্থায় সন্ধ্যাদি আমাকে যে হুকুমটি করল তা অবশ্যই বিস্ময়কর।

কলেজের এক সহপাঠিনীর শরণাপন্ন হলাম ছুটিতে যাওয়ার আগে।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'কার জন্যে?'

'আমার এক দিদি নিয়ে যেতে বলেছে।'

'বাব্বা! খুব আধুনিকা দিদি তো!'

সে-ই কিনে দিয়েছিল। আমার সন্দেহ হয়েছিল সে নিজে ওসব ব্যবহার করে না। কলকাতার মেয়ে হয়েও যা পারেনি তা সন্ধ্যাদি পারতে চাইছে কি করে?

জলপাইগুড়িতে গিয়ে প্যাকেট পৌঁছে দিলাম। নিতে না চাইলেও জোর করে দাম গছিয়ে দিল সন্ধ্যাদি। এবং সেবারই জানতে পারলাম সন্ধ্যাদি নাকি প্রেমে পড়েছে। আনন্দচন্দ্র কলেজে এক তরুণ অধ্যাপক এসেছেন, তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে সন্ধ্যাদি। বন্ধুরা সাতকাহন করে গল্পগুলো শোনাচ্ছিল। ইংরেজি পড়ান শুভংকরবাবু। সন্ধ্যাদি ইতিমধ্যেই তাঁর প্রিয় ছাত্রী হয়ে গিয়েছে। ভদ্রলোক রেসকোর্স পাড়ায় দু' কামরার ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আছেন। সেখানে কলেজফেরৎ সন্ধ্যাদি যায় কোচিং নিতে। সেই কোচিং যে কি ধরনের তা নিয়ে রসালো গল্প ছড়িয়ে পড়ছে। বাইরের দরজা বন্ধ করে ছ-সাত বছরের ব্যবধানের ছাত্রী-অধ্যাপক কি কি পড়াশুনা করতে পারে তাই নিয়ে উপবাসীদের নানান কল্পনা।

শুনে আমার প্রথমে খারাপ লাগল, পরে খুব রাগ হলো। কেন যে রেগে গেলাম তা তখন বুঝিনি কিন্তু সন্ধ্যাদির সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করলাম, ওদের বাড়ির সামনে দিয়েও যেতাম না। ছুটি ফুরিয়ে আসছিল। এর মধ্যে পিসিমার কাছে শুনেছি সন্ধ্যাদি আমার খোঁজে এসেছিল। একদিন বিকেলে ওদের কলেজের সামনে গেলাম। দেখলাম সন্ধ্যাদি একাই বেরিয়ে আসছে। যারা সাইকেলে চক্কর দিত তাদের কেউ নেই। সামনাসামনি পড়ে গেলাম। সন্ধ্যাদি একগাদা অভিযোগ আর অভিমান নিয়ে আমাকে আক্রমণ করতে লাগল। যতই রাগ হোক, আমি চুপ করে থাকলাম।

সন্ধ্যাদি বলল, 'চল, আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'এক জায়গায় যাব, আধঘন্টার জন্যে, তারপর একসঙ্গে বাড়ি ফিরব।'

এই এক জায়গাটা অনুমান করতে পারছিলাম। যেতে ইচ্ছে করছিল না একটুও, কিন্তু না গিয়েও পারলাম না।

বাড়িটা একতলা। দরজা খুললেন যিনি তিনি সুদর্শন। বললেন, 'এসো।'

ঘরে ঢোকামাত্র শুভংকর বললেন, 'শেক্সপীয়ারের লাইন ভুল কোট করা একজন

রজির ছাত্রীর পক্ষে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।'

'কি ভুল হয়েছে?' সন্ধ্যাদি খুব ভয় পেয়ে গেল।

'দ্যাখো।' একটা খাতা সামনের টেবিলে খুলে দিলেন শুভংকর।

সন্ধ্যাদি এগিয়ে গিয়ে দেখল, লাল দাগ দেওয়া লাইনটা। তারপর একটা কলম নিয়ে শর মার্জিনে কিছু লিখল। শুভংকর সেটা দেখে মাথা নাড়লেন।

সন্ধ্যাদি বলল, 'তাড়াহুড়োতে ভুলটা হয়ে গিয়েছিল।'

'কেউ তোমার পেছনে ধাওয়া করেনি যে তাড়াহুড়ো করতে হবে।'

'লেখার সময় মনে হয় ওরকম—! সরি! এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আমার ভাই-মতো, কলকাতায় পড়ে।' আমার ভাল নামটাই বলল সন্ধ্যাদি।

দেখা গেল আমি যে কলেজে পড়ছি শুভংকর সেই কলেজেই পড়তেন। পুরনো ্যাপকদের কথা উঠতে গল্প জমে গেল। সুশীলবাবু কেমন আছেন, ঘোষাল স্যারের খবর কি, কবাবু রিটায়ার করেছেন কিনা? সন্ধ্যাদি ভেতরে চলে গিয়েছিল। বুঝতেই পারলাম এ ড়িতে ওর অবাধ যাতায়াত।

শুভংকর চমৎকার কথা বলেন। ডুয়ার্সের রূপে মুগ্ধ। মনে মনে বললাম, তা তো বলবেই। ্যাদিকে পেলে আর কি চাই। সন্ধ্যাদি ফিরে এল ট্রে হাতে, তাতে দু'রকমের ডিশ। বলল, পট খেয়ে নে। চায়ের জল গরম হচ্ছে। আপনার ময়দা ফুরিয়ে গেছে। আনিয়ে রাখবেন।'

'ঠিক আছে।'

'আর রাত্রের জন্যে ডিমের রসা করে যাচ্ছি।' সন্ধ্যাদি ফিরে গেল।

খেতে খেতে শুভংকর বললেন, 'দারুণ। চমৎকার রাঁধে।'

আমি বললাম, 'হুঁ।'

চল্লিশ মিনিটে সব শেষ করে বাইরে বেরিয়ে যখন আমরা বাড়ির পথে হাঁটছি তখন জিজ্ঞাসা লাম, 'আজ পড়লে না?'

'নাঃ।'

'তুমি ভদ্রলোককে খুব ভালবাস, না?'

'তার মানে?'

'এই যে কলেজ থেকে এসে রান্নাটান্না করে দাও।'

'কি করব বল। একটা বুড়িকে রেখেছে, কিস্যু রাঁধতে পারে না। আমি করে দিলে ভাল র তবু খেতে পারে। আর আমি রেঁধে দিই বলে টিউশন-ফি নেয় না। সেটা কম?'

'কিন্তু লোকে অন্য কথা বলে।'

'কি বলে? আমি শুভংকরবাবুর সঙ্গে প্রেম করছি?'

'হ্যাঁ।'

'তুই আজ কি দেখলি?'

'বাঃ, আমার সামনে তোমরা প্রেম করবে নাকি?'

'হুম্। প্রেম করছি কিনা জানি না, তবে ওকে আমার পছন্দ হয়েছে।'

'কিন্তু এইভাবে বন্ধ বাড়িতে একজন পুরুষের সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকছ, তোমার তো ক্ষ হয়ে যেতে পারে।'

'দূর। মেয়েরা যদি না চায় তাহলে কোনো পুরুষ তাদের ক্ষতি করতে পারে ?) তাছা বাড়তি প্রতিরোধ রাখতে তো তোকে দিয়ে পোশাকটা আনিয়ে নিলাম।'

আমি কথা খুঁজে পাইনি। সন্ধ্যাদি যে এমন স্পষ্ট গলায় ওই ব্যাখ্যা দেবে সে বয়সে কল্পন করিনি, হজম করতে খুব অসুবিধে হয়েছিল।

বিয়ের চিঠি পেয়েছিলাম, সেই সঙ্গে সন্ধ্যাদির নিজের হাতে লেখা চিঠি। বিয়েতে যে আমি অবশ্যই যাই। আমি না গেলে ওর মন খুব খারাপ হয়ে যাবে। যেতে পারিনি। তখন আ পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। মনে মনে হেসেছিলাম। শুভংকরকে সন্ধ্যাদি বিয়ে করবে এটাই ে স্বাভাবিক ছিল, মিছিমিছি আমার কাছে ভণিতা করার কি দরকার ছিল।

সরকারি কলেজে চাকরি পেয়ে শুভংকর সস্ত্রীক জলপাইগুড়ি ছেড়ে গিয়েছিলেন। আমা সঙ্গেও যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

এর মধ্যে অনেক জল গড়িয়েছে। লেখা থেকে অর্থ পাচ্ছি, চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। সিরিয় তৈরির ব্যবসায় নেমেছি অনেক দিন। আমি ভেতরের কাজগুলো দেখি, পার্টি স্পনসরারদে সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার পার্টনার। সেবার কিছুদিনের জন্যে সে বিদেশে গিয়েছিল। অ্যাড এজেন্সি স্পনসরারের হয়ে কাজ করছিল তাদের সঙ্গে পেমেন্ট নিয়ে ঝামেলা হচ্ছি তাই আলোচনার জন্যে আমি ওদের অফিসে গেলাম।

প্রীতিশ শাহ্ খুব কড়া মানুষ কিন্তু তাঁর যুক্তি যখন ধোপে টিকছিল না তখন তি ইন্টারকমে একজনকে বললেন, 'মিস দত্ত, আপনি বলেছিলেন ক্যাসেট ঠিক সময়ে জমা পড়ে বলে দূরদর্শন কমপ্লেন করেছে। ক্যাসেট জমা দেবার দায়িত্ব আমাদের না প্রোডিউসারে আচ্ছা, কন্ট্রাক্ট ফাইলটা নিয়ে এখানে আসুন।'

ভদ্রমহিলা এলেন। প্রায় বাইশ বছরের ব্যবধান তবু চিনতে অসুবিধে হলো না। মিস দ ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে কপালে ভাঁজ ফেললেন। প্রীতিশ ফাইল দেখে বললেন, 'একি, এখা তো লেখা আছে আমরাই ওসব ব্যাপারে দূরদর্শনের সঙ্গে ডিল করব।'

মিস দত্ত বলল, 'হ্যাঁ, লেখা আছে। কিন্তু রেওয়াজ হচ্ছে প্রোডিউসাররাই এটা করে। এ আগে চারটে সিরিয়ালের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে।'

বললাম, 'আমরা আপনাদের কাজটা করে দিই। আপনারা কোনো কাজ না করে কমিশ নেন। এবার ক্যাসেট জমা দিতে মাত্র একটা দিন দেরি হয়েছে। তাও তিনটে ক্যাসেট ও হাতে ছিল। সেই কারণে পেমেন্ট আটকে দেবার কি যুক্তি থাকতে পারে ?'

'সরি স্যার। আপনি একটু মিস দত্তের সঙ্গে বসে সব ঠিক করে নিন।'

মিস দত্ত বললেন, 'আসুন।'

ছোট একটা খোপে মিস দত্ত বসেন। তাঁর সামনের চেয়ারে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তু নিশ্চযই আমাকে চিনতে ভুল করোনি ?'

'কেমন আছ ?' খট্ করে কানে লাগল প্রশ্নটা। সন্ধ্যাদি আমাকে তুই বলত।

'চলছে. তুমি ?'

'এই আর কি !'

'শুভংকরবাবু ?'

'ও দার্জিলিং-এ আছে। ভালই আছে। তুমি খুব মোটা হয়ে গিয়েছ। ছেলেমেয়ে ?'

'দুটো মেয়ে। সাবালিকা হয়ে গিয়েছে তারা। তোমার ?'

'নেই। হয়নি। একদম ঝাড়া হাত-পা। এসো না একদিন।' ড্রয়ার খুলে কার্ড এগিয়ে দিল ন্ধ্যাদি, 'সামনের শনিবার সন্ধ্যেবেলায় এসো। পারবে ?'

'ঠিক আছে।'

কাজ শেষ করে ফিরে আসার সময় মনে হচ্ছিল এই সন্ধ্যাদিকে আমি চিনি না। তারপরেই খেয়াল হলো প্রীতিশ ওকে মিস দত্ত বলে ডাকছিলেন কেন ? শুভংকর ?

কৌতূহল বড় মারাত্মক জিনিস। শনিবার বিকেল ফুরাবার আগে ঠিকানা মিলিয়ে হাজির লাম। সরকারি আবাসন। তিনতলায় ফ্ল্যাটের দরজার ওপর লেখা এস. দত্ত।

দরজা খুলে সন্ধ্যাদি হাসল। 'এসো. এসো। নামী মানুষের পদধন্য হোক ফ্ল্যাট।'

'কি হচ্ছে কি ! বাঃ, চমৎকার সাজিয়েছ তো ! সুন্দর।'

'বসো।'

সোফায় আমাকে বসিয়ে ভেতরে চলে গেল সন্ধ্যাদি। ফিরে এল একটা ছোট ট্রে-তে জলের গ্লাস আর তার পাশে ভেজা তোয়ালে নিয়ে। বলল, 'আগে তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছে ফেল, আরাম পাবে। তারপর জল খাও।'

একটু ঘেমেছিলাম ঠিকই কিন্তু এমন আপ্যায়ন কোথাও পাইনি। তোয়ালে গরম জলে ভেজানোই শুধু নয়, তাতে সুগন্ধি মেশানো রয়েছে। বড় আরাম হলো। জল খেলাম। সেগুলো ফিরে নিয়ে সন্ধ্যাদি বলল, 'বউকে আনতে পারতে।'

'আনতে বলোনি।'

'হ্যাঁ, ভাবলাম আগে নিজেরা গল্প করব।'

'তোমার বাড়ির খবর কি ?'

'বাবা নেই। মা ভাই-এর কাছে আছে, শিলিগুড়িতে।'

'তুমি এখানে কতদিন ?'

'কুড়ি বছর।' সন্ধ্যাদি হাসল. 'অ্যাডে চাকরি করছি একুশ। তোমার পার্টনারের সঙ্গে ভাল আলাপ আছে। তোমার সব খবর রাখি।'

'তাহলে যোগাযোগ করোনি কেন ?'

'ইচ্ছে হয়নি।'

যত খারাপ লাগুক স্বীকার করলাম এই উত্তর সহজ।

'শুভংকরের সঙ্গে কিছু হয়েছে নাকি ?'

'হ্যাঁ। আমরা আলাদা হয়ে গেছি। তাও কুড়ি বছর হয়ে গেল।'

'সেকি ? কেন ? তোমরা তো ভালবেসে বিয়ে করেছিলে ?'

'আমি এই কথাটা বুঝতে পারি না। একবার কাউকে ভালবাসলে আজীবন তাকে ভালবাসতেই হবে ? মনে ভালবাসা আর না এলেও ! ধরো, গোলাপ যখন ফুটেছে তখন তোমার খুব ভাল লাগল। সেই গোলাপের সব পাপড়ি যখন একে একে খসে পড়ছে তখনও কি সেই ভাললাগাটা আঁকড়ে রাখতে পারবে ? যেদিন দেখলাম আমরা দুজনেই পরস্পর সম্পর্কে কোনো টান অনুভব করছি না, সেদিন আলাদা হয়ে গেলাম।'

'কেন এমন হলো ?'

'সত্যি কোনো কারণ নেই। অনেকেই জানতে চেয়েছে, কিন্তু কারণ না থাকলে কি বানিয়ে বানিয়ে বলব। ও ওর পড়াশুনা নিয়ে থাকত। আমি বেকার বসে না থেকে কাজ খুঁজতে লাগলাম। প্রথমে একটা ছোট অ্যাড এজেন্সিতে কাজ জুটল। পরে আরও একটু বড়তে।'

'কি করে বুঝলে আর টান নেই ?'

'যেদিন দেখলাম আর আমার রান্না করতে ভাল লাগছে না।'

'সেকি ?'

'হ্যাঁ, যখন রাঁধি তখন ভাবি আমার প্রিয়জন ওটা খাবে। তাকে তৃপ্তি দেবার জন্যে আমার সব মনোযোগ ঢেলে দিই।'

'তোমার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল ?'

'কখনই নয়। রাত্রে আমি শুয়ে পড়ার পরও ও পড়ত। সকালে উঠে দেখতাম প্রায়ই খায় না। আমার রান্না ফেলে দিতে হয়। না খেলে আগে কেন বলে না জিজ্ঞাসা করলে বলত, আমার খাওয়া আর ফেলে দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য কি তোমার কাছে ? পার্থক্য কি বোঝাতে চাইলে বলত ওটা নিছকই ইমোশন। একটু একটু করে ও বোঝাতে চাইল একা থাকতেই ওর ভাল লাগে আমার কোনো গুণ, আমার শরীর যেন ওকে আর টানে না। না, অন্য নারীও ওর জীবনে আসেনি। সব পাওয়া হয়ে গেলে যে নিস্পৃহভাব আসে তাই ওর মধ্যে দেখতে পেলাম। শেষ পর্যন্ত ও ট্র্যান্সফার নিল।'

'তোমাদের ডিভোর্স হয়নি ?'

'নাঃ, প্রয়োজন হয়নি। হলে নিতাম। কলকাতায় এলে এখানে ওঠে। ক'দিন থাকে যেমন অতিথিরা থাকেন।'

এত চমৎকার ডিনার আমি কখনও খাইনি। সাধারণ সব জিনিস নিয়ে অসাধারণ রান্না শুনলাম, সকালে আয়োজন করে গিয়েছিল, দুপুরে অফিস থেকে ফিরে শেষ করেছে। একসঙ্গে খেলাম। বলল, 'অনেকদিন পরে রাঁধতে ভাল লাগল। নিজের জন্যে যা হোক কিছু করি, করতে হয় বলে।'

'তাহলে বলছ আমি তোমার প্রিয়জন ?'

'নিশ্চয়ই।'

'তুমি এত ভাল ভাল রান্না কর, তবু শুভংকর—'

'দোষ আছে নিশ্চয়ই আমার।'

'কি দোষ ?'

'আমি খুব বেশি ভালবাসতে চাই। পুরুষমানুষ ভালবাসার বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না। সব মেয়ে পজেসিভ তাদের কাছে পুরুষরা বোধহয় হাঁপিয়ে পড়ে। ভালবাসার একটা মারেখা রাখলে তারা খুশি হয়।'

'তুমি আর কাউকে পাওনি ?'

'প্রস্তাব তো পেয়েছি প্রচুর। কিন্তু এই একা থাকতে থাকতে অভ্যেস হয়ে গেছে। তাছাড়া কর এলে হেলাফেলা করে যখন রাঁধতে চাই, পারি না। একটু খারাপ হলে জিজ্ঞাসা করে তোমার কি শরীর খারাপ ? বুঝতে পারি। ও কিন্তু কখনও আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি তোমার মন খারাপ ? দাঁড়াও, মশলা দিচ্ছি।' সন্ধ্যাদি মশলা আনতে গেল।

শুরু করেছিলাম, যে রান্না করতে ভালবাসে না সে কিছুতেই ভাল প্রেমিকা হতে পারে পৃথিবীর নামী প্রেমিকারা কি তাদের প্রেমিকের সঙ্গে চিরকাল থাকতে পেরেছে ?

॥ ৬ ॥

জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতায় পড়তে এসেছিলাম টিনের বাক্স সঙ্গে নিয়ে, পরনে ছিল ধুতি আর নীল হাফশার্ট। পরে জেনেছি ওটাকে বাংলা শার্ট বলে। তখন ওই পোশাকটাকে খুব আধুনিক মনে করতাম। উত্তমকুমার 'তাসের ঘর' ছবিতে ওই পোশাক পরেছিলেন। সঙ্গে কোনো অভিভাবক ছিল না, নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে চেপে আমি আর দীপু শিয়ালদায় নেমে বাবার বন্ধুর মেসে গিয়ে উঠেছিলাম। মেসটার নাম রেইনবো ক্লাব, বউবাজার স্ট্রিটে। দীপু ড়নায় ভাল ছিল। আমরা পায়ে হেঁটে কলকাতার কয়েকটা কলেজে ঘুরে ফর্ম জমা য়েছিলাম। দেখা গেল দীপু আর আমার নাম উঠেছে সেন্ট পলস কলেজে। ও বিজ্ঞান নিয়ে ড়তে পারে, আমি ইকনমিক্স অনার্সে। পাশাপাশি স্কটিশেও আমার নাম দেখা গেল বাংলা নার্সে। সেন্ট পলস কলেজে তখন মেয়েরা পড়ত না। বড় রসহীন মনে হয়েছিল গিয়ে। নায় স্কটিশে তখন প্রজাপতির মেলা। মফস্বল থেকে আসা ছেলের চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো ন্দরীদের দেখে অন্য কলেজে ভর্তির কথা আর ভাবিনি। পিতৃদেব মন্তব্য করেছিলেন, বাংলা য়ে পড়া মানে ভবিষ্যৎ ঝরঝরে হয়ে গেল।

থাকতাম কলেজ হস্টেলে। সে-সময় আমার কলকাতার সঙ্গে মানিয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা চ্ছে। ধুতি ছেড়ে প্যান্ট পরেছি। কলকাতায় কোথায় কি আছে দেখে না বেরিয়ে কলেজ স্ট্রিট বসুশ্রী কফিহাউসে ঢুঁ মারছি। মনে মনে বাসনা, ওই করতে গিয়ে সত্যজিৎ বায় অথবা তপন

সিংহর চোখে পড়ে যাব, ব্যস, আর কি চাই ! কলেজে অভিনয় করছি। সেটা যে খুব কাঁচা ব্যাপ
তা বুঝলাম নাট্যকারের সন্ধানে ছটা চরিত্র দেখার পর।

এইরকম সময়ে যা হবার তাই হলো। হস্টেলে আমার জানলার উল্টোদিকের বাড়িটির সা
কৈশোর পার হওয়া মেয়েটি এক ছুটির দুপুরে গান গাইছিল, 'ওগো আর কিছু তো নাই, বিদ
নেবার আগে তাই...।' বুকের ভেতর জলতরঙ্গ বেজে গেল। মনে হলো ওই গান আম
উদ্দেশ্যেই। সলিল চৌধুরী বা লতা মঙ্গেশকারের কথা মনেও এল না।

পরদিনই তাকে সামনাসামনি দেখার জন্যে স্কটিশের উল্টোদিকে বেথুন স্কুলের সাম
গিয়ে দাঁড়ালাম। ছুটি হলেই সে বেরিয়ে এল। একবার তাকে মনে হলো সাবিত্রী চ্যাটার্জ
পরক্ষণেই মনে হলো কাবেরী বসু। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার ঠোঁটের কোণে হা
ফুটল। কোনো কথা না বলে সে তার বান্ধবীদের নিয়ে চলে গেল। এরপর আমাদের দেখা হ
লাগল ঘনঘন। সে হাসে, তার নাকের ডগায় ঘাম। কিন্তু কোনো কথা হয় না। আগ বাড়ি
কথা বলার সাহস তখন আমার ছিল না। সেটা এমন একটা সময়, ওই চিলতে হাসিটুকুতে
প্রচুর রোমাঞ্চ হতো।

এল সরস্বতী পুজো। ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছি। তখন বিকেল। একটা পুজোমণ্ডপে
সামনে তাকে দেখলাম। হলুদ শাড়িতে দারুণ দেখাচ্ছে। বেশ বড় বড়। হঠাৎ সে আমার সাম
এগিয়ে এল, 'কবে সাহস হবে?'

'সাহস ?'

'নয়তো কি ! এতদিনেও কথা বলা গেল না ?'

'বিপাশা' ছবিতে সুচিত্রা সেন ঠিক ওই ভঙ্গিতে কথা বলেছিলেন। ব্যস, আমার মনে হল
আজ বসন্ত। সে হাঁটতে লাগল আমার পাশে, 'বাড়িতে বলে এসেছি বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছি। আ
এভাবে বেশিক্ষণ হাঁটতে পারব না কিন্তু।'

'কেন ?' আমি তখন আত্মহারা।

'বারে ! আমাদের আত্মীয়স্বজন কত জানা আছে ? মায়ের দিক দিয়ে পঞ্চাশ তো বা
দিক দিয়ে একশ। কেউ না কেউ দেখে ফেলবে। নিজে হস্টেলে আছো তো, কোনো চি
নেই !'

চিন্তা করতে হলো। কেউ দেখবে না, আড়ালে গিয়ে কথা বলা যায় এমন জায়গা কোথায়
সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'কী ? খুব সমস্যায় ফেলে দিলাম, না ? ঠিক আছে, আ
ওই রাস্তা দিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছি, নিজে যেন অন্য রাস্তা ধরা হয়।'

'এত তাড়াতাড়ি ?' মন খারাপ হয়ে গেল।

'কি করব ? রাস্তায় রাস্তায় ট্যাঙোস ট্যাঙোস করে কতক্ষণ হাঁটব ?' সে চারপাশে তাক
'অবশ্য ওই রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসা যায়।'

তখন পিতৃদেব যে টাকা পাঠাতেন তাতে আমার কোনোমতে চলে যেত। সব খরচ ব
দিয়ে গোটা কুড়ি টাকা থাকে সারা মাসের হাতখরচের জন্যে। তার অর্ধেক পকেটে ছিল। কি
হিসেব না করে ঢুকে গেলাম রেস্টুরেন্টে। তখন উত্তর কলকাতার অনেক রেস্টুরেন্টেই পর্দাফে

কবিনের ব্যবস্থা থাকত রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েদের জন্যে। তার একটায় বসে ফিশ ফ্রাই-র অর্ডার দিলাম। মেনু থেকে দাম দেখে বুঝলাম তিনটে টাকা পকেটে থাকবে। আমরা বসেছিলাম মুখোমুখি।

'আমার নাম জানা আছে ?'

ঘাড় নাড়লাম। হস্টেলের একটি ছেলে পাড়ার সব মেয়ের নাম জানত। তার কাছেই জেনে নিয়েছিলাম।

সে হাসল, 'বাব্বা, পেটে পেটে এত! বাড়ি কোথায় ?'

'জলপাইগুড়ি।'

'কে কে আছে ?'

'সবাই।'

'নামটা কি ?'

বললাম। বলেই মনে হলো আমার নামটা একটু আধুনিক হলে ভাল হতো।

'কলকাতায় এসে কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়নি ? কোনো মেয়ের সঙ্গে ?'

'না।'

'আমাকে কি ভাল লাগে ?'

নীরবে মাথা নাড়তেই সে প্রশ্ন করেছিল, 'কেন ভাল লাগে ?'

আমি দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। কেন ভাল লাগে তা এককথায় বোঝাই কি করে ? বলতে গিয়ে দেখলাম নিজেই ঠিক বুঝতে পারছি না। শেষতক উত্তর দিলাম, 'মন ভাল হয়ে যায় তাই। বারংবার দেখতে ইচ্ছে করে, তাই।'

'কথাগুলো যে সত্যি তা বিশ্বাস করব কি করে ?'

আমার কাছে বিশ্বাস করানোর মতো কোনো উপায় ছিল না। জবাব না পেয়ে সে মিটিমিটি হাসতে লাগল। তারপরই প্রসঙ্গ পাল্টালো। সে কখনও জলপাইগুড়ির চা বাগান দ্যাখেনি। দার্জিলিং-এ যায়নি। আমি সেসব গল্প শোনালাম। খাওয়া শেষ হলে সে চলে গেল।

সেই শুরু। কিন্তু মাসে একবারের বেশি তার সঙ্গে দেখা করতে পারতাম না। কারণ দেখা হলেই কথা বলতে হবে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলা যাবে না। রেস্টুরেন্টে ঢুকলে সাত টাকা খরচ হবে। তাতে মাসের বেশ কিছুদিন আমার খুব অসুবিধে হয়। কিন্তু একবারের বেশি রেস্টুরেন্টে গেলে আমি চোখে সরষে ফুল দেখব। এসব সত্ত্বেও আমি আনন্দে ছিলাম। তার সঙ্গে উত্তম-সুচিত্রা নিয়ে কথা হয়, সন্ধ্যা-লতার গানের ভক্ত আমরা দুজনেই। অথচ আমরা কেউ কাউকে স্পর্শ করিনি। আমি তাকে তুমি বলতাম আর সে সবসময় ভাববাচ্যে আমার সঙ্গে কথা বলত। মনে হয়েছিল ওটা ওর স্টাইল।

ওর বাড়ির লোকদের আমি এড়িয়ে চলতাম। তখন ছেলেমেয়ের প্রকাশ্যে মেলামেশা করার রেওয়াজ হয়নি। ধারণা করে নেওয়া স্বাভাবিক ছিল ওর বাবা-মা আমাকে পছন্দ করবেন না। হঠাৎ একদিন বজ্রপাত হলো। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে খুব ভালবাসা হয় ? ভাল করে ভেবে উত্তরটা দিলে খুশি হব।'

'নিশ্চয়ই !'

'তাহলে আমাকে বিয়ে করতে হবে।'

'কবে ?'

'এখনই।'

'এখনই কি করে সম্ভব ! আমি কলেজে পড়ছি। পড়াশুনা শেষ করে চাকরি পেলেই আমি বিয়ে করব। এখন আমার টাকা কোথায় ?'

'আমি কিছু জানি না। ভালবাসা যাচ্ছে যখন তখন বিয়ে করার ব্যবস্থা করতে হবে। আমার পক্ষে আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।' সে খুব সিরিয়াস।

'তুমি বুঝতে পারছ না কেন ? আমি এখনও নিজের পায়ে দাঁড়াইনি। বাবার টাকায় পড়াশুনা করছি। এখন বিয়ে করতে চাইলে লোকে আমাকে পাগল বলবে।'

'কে কি বলছে তাতে আমার কিছুই এসে যায় না।'

'তুমি অনর্থক পাগলামি করছ।'

'একদম না। বেশ, আমার সঙ্গে যাওয়া হোক।'

ও রকম সংলাপ শুনতে খুব খারাপ লাগে কিন্তু তখন অন্য কিছু ভাবার অবকাশ ছিল না। সে চলল আগে আগে, আমি খানিকটা পেছনে। এ গলি সে গলি দিয়ে একটা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কোথায় আমায় নিয়ে চলেছে জানি না। বাড়িতে ঢোকার সময় ইশারায় আমাকে ডাকল।

ঘরে ঢুকে দেখলাম এক ভদ্রলোক বসে বই পড়ছেন। পরনে শার্ট এবং ধুতি। বয়স তিরিশের মতো। ওই বয়সের লোকদের আমরা তখন রীতিমতো বয়স্ক ভাবতাম।

সে জিজ্ঞেস করল, 'কি বড়ই পড়া হচ্ছে ?'

ভদ্রলোক বইটা দেখালেন, 'অফিসের বই। কি খবর ?'

'ঠিক আছে। এর সঙ্গে আলাপ করা হোক, আমাদের বাড়ির উল্টোদিকের হস্টেলে থাকে। অনেক দূরে, জলপাইগুড়িতে বাড়ি।' সে কেমন ছটফটিয়ে কথা বলছিল।

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'চা-বাগানের দেশের লোক ?'

'হ্যাঁ।' আমি কোনো তল পাচ্ছিলাম না।

যতদূর মনে আছে খুব তাড়াতাড়ি আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম। ভদ্রলোক বেশি কথা বলেননি। বললেও তার কোনো গুরুত্ব ছিল না বলে আজ মনে নেই। বাইরে বেরিয়ে সে তার পথ ধরে চলে গিয়েছিল। আমাদের একসঙ্গে পথহাঁটা সে পছন্দ করত না।

পরের মাসে তার দেখা পাইনি। এই দীর্ঘ সময় যে কি যন্ত্রণায় কাটিয়েছি, এখন ভাবলে নিজের জন্যে মায়া হয়। প্রেম নিয়ে যেসব স্বর্গীয় অনুভূতির গল্প এখন অবাস্তব মনে হয় তখন সেগুলো বিপুলভাবে সত্যি ছিল। দেবদাসকে খুব কাছের মানুষ বলে মনে হতো। মাঝে মাঝে জানলা থেকে একপলকের জন্যে তাকে দেখতে পাই। মুখ গম্ভীর। ইশারা করার আগেই সে চোখের আড়ালে চলে যায়। বন্ধুরা বলেছে আমার চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় মাসে ঠিক সময়ে সে এল। মাসের ওই নির্দিষ্ট দিনে আমাদের দেখা করার কথা। এসেই বলল, 'ট্যাক্সি কর

তখন চার টাকায় ট্যাক্সি চেপে ধর্মতলা যাওয়া যেত। আমরা গেলাম। সমস্ত পথ সে আমার আঙুল ধরে বসে রইল। একটাও কথা বলল না। আমার ভেতরে রাজ্যের অভিমান, রাগ পাক খাচ্ছিল, কিন্তু স্পর্শ পাওয়া মাত্র সেসব কোথায় তলিয়ে গেল। মনুমেন্টের সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে আমরা হাঁটতে লাগলাম দুপুর রোদে। যেহেতু ওটা তার পাড়া নয় তাই চট করে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। সে সময় কলকাতায় মানুষ কম ছিল, গাড়ির সংখ্যাও বেশি নয়। আমরা দিব্যি হেঁটে গেলাম। ময়দানে অনেক স্মৃতিসৌধ ছিল। তার একটার ছায়ায় বসলাম দুজনে।

কিছুক্ষণ পরে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ভাবা হলো ?'

'কি ব্যাপারে ?'

'আমাকে বিয়ে করার কথা মনে নেই ?'

'আশ্চর্য ! এখনই কি করে সম্ভব ? অন্তত তিনটে বছর— ।'

'তাহলে আমাকে যেন দোষ দেওয়া না হয়।'

'তার মানে ?'

'ওই সেদিন যাকে দেখা হলো, আমার চেয়ে বয়সে বড় কিন্তু পাগলের মতো ভালবাসে। বিয়ে করতে চাইছে এখনই। ভাল মাইনে পায়।'

'ওই লোকটাকে তুমি বিয়ে করবে ?' আমি হতভম্ব।

'সেইজন্যেই তো বললাম বিয়ে করতে। তাহলে ওকে বলে দিতাম সম্ভব নয়। মুশকিল হলো বাড়ির লোকজনের তেমন আপত্তি নেই। শুধু বয়সটা নিয়ে। মা অবশ্য বলল ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব আর মা সারদাময়ীর নাকি আমাদের চেয়ে বেশি পার্থক্য ছিল।'

'কিন্তু, তুমি, তুমি আমাকে ভালবাস না ?'

'বাসি। তাই তো কি করব ভেবে পাচ্ছি না। মাকে বলে ফেলেছি এই ভালবাসার কথা। শুনে আমার জানলায়, ছাদে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বলেছে যে নিজে বাপের অন্ন ধ্বংস করছে সে তোকে খাওয়াবে কি করে ? তোর দিকে নজর দিলে হস্টেলের সুপারকে বলব বের করে দিতে। আমি কোনো ক্ষতি করতে চাইনি বলে এতদিন দেখা করিনি।'

'কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না।'

'আমিও।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম আমরা। একটা গভীর দুঃখের সঙ্গে সুখের মিশেল ঘন মেঘের মতো আমাদের ওপর নেমে এল। হঠাৎ সে বলল, 'আচ্ছা, এমন হতে পারে না ?'

'কি রকম ?' রাস্তা পেতে আমি তখন উদ্‌গ্রীব।

'ওকে বিয়ে করলাম কিন্তু আমাদের এই ভালবাসাটা মরল না। এটা থেকে গেল। আমরা প্রতি মাসে এমনি দেখা করতে লাগলাম। আমাদের সম্পর্ক যেমন আছে তেমন থাকল।'

'সেটা কি করে সম্ভব' ?

'কেন সম্ভব নয় ?'

'উনি মেনে নেবেন কেন ?'

'আমার মা-বাবা কি মেনে নিয়েছে ? তবু তো আমি দেখা করতে এসেছি।'

'কিন্তু—।' আমি তল পাচ্ছিলাম না, 'কিন্তু তুমি আমার হবে না ?'

'কেন হব না ? ধরা যাক, চাকরি পেতে পেতে আরও পাঁচ বছর কাটল। তারপর মাইনে বাড়তে আরও দু'বছর। তদ্দিনে আমার বয়স পঁচিশ হবে। সুচিত্রা সেনের বয়স এখন তার থেকে বেশি, তবু নায়িকা হচ্ছে, হচ্ছে না ?'

'বাঃ, তখন তো তুমি বিবাহিতা মহিলা।'

'হোক গে। ডিভোর্স করতে কতক্ষণ ? এখন অসুবিধে আছে বলে বিয়ে করা যাচ্ছে না, যখন অসুবিধে থাকবে না তখন আমি ডিভোর্স করে নেব। কিন্তু একটা কথা দিতে হবে। আমাকে ছুঁয়ে বলা হোক।'

'কি কথা ?'

'অন্য কোনো মেয়েকে ভালবাসি বলা চলবে না।'

'বাঃ, খামোকা বলতে যাব কেন ?'

'ছেলেদের একটুও বিশ্বাস নেই। চোখের সামনে একরকম, চোখের আড়ালে গেলেই অন্য চেহারা। কি, বলা হবে ?'

তার হাত ছুঁয়ে শপথ নিয়েছিলাম। সে হেসে বলেছিল, 'মনে থাকে যেন।'

সে ফিরে এসেছিল দু'নম্বর বাস ধরে, আমি টু-বিতে। হস্টেলে ফিরে নিজের বিছানায় শুয়ে কিরকম অসাড় লাগছিল নিজেকে। তারপরই খেয়াল হলো সেই বয়স্ক লোকটি যাকে সে বিয়ে করতে যাচ্ছে, তার সঙ্গেও তো ভাববাচ্যে কথা বলেছিল ও। তুমি বা আপনি বলতে শুনিনি। অ্যাদ্দিন ভাবতাম আমাকে খুব ভালবাসে বলেই ভাববাচ্যে কথা বলে। তাহলে ওই ভদ্রলোকের সঙ্গেও ওইভাবে কথা বলবে কেন ? বন্ধুদের তুই-তোকারি নিশ্চয়ই করে, মা-বাবা-ভাইবোনকে কি তুমি বলে না ? খটকাটা খারাপ লাগল। তারপরই মনে হলো এ মাসে আমার মাত্র চার টাকা বারো পয়সা খরচ হয়েছে। বাকি দুটো টাকা অষ্টাশি পয়সায় দুটো সিনেমা হয়ে যায়। কয়েক মাস সিনেমা দেখা হয়নি।

ছুটি পড়ে গেল দেড় মাসের মতো। হস্টেল ফাঁকা করে আমরা যে যার বাড়িতে ফিরে গেলাম। কলেজ খুললে ফিরে এসে তার সঙ্গে দেখা হলো। শ্বশুরবাড়ি যখন কাছেই তখন তার আসতে অসুবিধে নেই। আমরা রেস্টুরেন্টে বসে ফিশ ফ্রাই খেলাম, আগের মতো কথা বললাম। তার সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে নোয়া এবং শাঁখা। কিন্তু সেগুলো তার কাছে যেন কোনো প্রতিবন্ধকই নয়। কিন্তু আমার অস্বস্তি শুরু হলো। একজন কুমারী মেয়েকে যত সহজে ভালবাসার কথা বলা যায় বিবাহিতাকে বলতে গেলে কোথায় আটকে যায়। যত উদারই হই না কেন, একা হলেই মনে হয় ও প্রতি রাত্রে স্বামীর সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত জ্বলুনি শুরু হয়, ভালবাসা উধাও হয়ে যায়। বন্ধুরা অবশ্য বলত, 'তোর কোনো রিস্ক নেই। চালিয়ে যা।' আর এটাও আমার কাছে রীতিমতো অপমান বলে মনে হতো। কিন্তু প্রতি মাসে দেখা হবার আকর্ষণ আমার কাছে এত তীব্র ছিল যে আমি তাকে এড়াতে পারতাম না।

হঠাৎ একদিন সে বলল, 'এখন কয়েক মাস আমার পক্ষে দেখা করা বেশ মুশকিল হবে। আমি ভাবছি ওকে বলব যাতে বাড়িতেই দেখা হয়।'

'কেন ?' আমি একটু অস্বস্তিতে পড়লাম।

'আর মাস পাঁচেকের মধ্যেই, কিছু বোঝা যাচ্ছে না ?' তার মুখ লাল।

'না।'

'ধ্যেৎ। আমি ভেবেছিলাম নিজেই বুঝতে পেরে যাবে। আমাকে এখন রেগুলার ডাক্তার দেখাতে হয়। পাঁচ মাস বাদে ডেট।'

'তুমি, তুমি এত তাড়াতাড়ি মা হবে ?'

'কি করব ? হয়ে গেল। অ্যাই, রাগ হচ্ছে ?'

'আশ্চর্য ! আমি ভেবেছি তুমি ওকে ডিভোর্স করবে চাকরি পেলেই—।'

'তাতে কোথায় অসুবিধে হবে ?'

'আরে, বাচ্চা হয়ে গেলে কি ডিভোর্স করা যাবে ?'

'কেন যাবে না ? কোথাও কোনো আইনে আছে সেকথা ?'

বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত আইন আমার জানা ছিল না, দরকারও পড়েনি। ফিরে এসে খোঁজ-খবর নিয়ে জানলাম সন্তান ডিভোর্স পাওয়ার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক নয়। কিন্তু সেটা পেতে হলে জোরালো কারণ থাকা দরকার। সেইসব কারণ দেখাবার কোনো সুযোগ তার নেই। অতএব ভদ্রলোক আপত্তি করলে সে ডিভোর্স পেতে পারে না।

সন্তানের জন্ম এবং তার আগে পরের সময়ের মধ্যে পৃথিবীর সব নদী অজস্র জল সমুদ্রে বয়ে নিয়ে গেল। তার সঙ্গে আমার দেখা হলো না অনেককাল। ততদিনে বুঝে গিয়েছি, যে ছেলেমানুষী স্রোত বর্ষায় তীব্র হয়, তা চৈত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার জীবনের সরল অবুঝ সময়টাকে কিরকম বোকা বোকা বলে মনে হতে লাগল একসময়। সব আবেগ উধাও হয়ে গেল একসময়।

কিন্তু সত্যি কি উধাও হয়ে গিয়েছিল ? কলেজ ছেড়েছি, চাকরি করছি তখন। ক্রিসমাসের সন্ধ্যাবেলায় পার্ক স্ট্রিটে হাঁটছি। আলোয় ঝলমল চারদিক। হঠাৎ একটা গাড়ি থেকে সে নামল। সঙ্গে ভারি চেহারার বয়স্ক মানুষ। তার পোশাক এবং ভঙ্গি বলে দেয় ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স প্রচুর। ভদ্রলোক ওর হাত ধরে একটা বড় বার-কাম-রেস্টুরেন্টে ঢুকে গেলেন। আমাকে সে দ্যাখেনি। সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে সেই পুরনো হাওয়ার স্পর্শ পেলাম। তখন সামর্থ্য এসেছে, আমিও দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেলাম। ওরা যে টেবিলে বসেছিল তার কাছাকাছি বসলাম। বসামাত্র তার চোখে পড়লাম আমি। প্রথমে সে যেন নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিল। আমি তখনও মদ খাইনি কোনোদিন। তাই বিয়ার নিলাম। পরিমাণে বেশি, অনেক সময় ধরে খাওয়া যায়। বিদেশে ওরা যদি জলের বদলে খেতে পারে তাহলে আমিও হজম করতে পারব।

ঘন্টাখানেক বাদে ভদ্রলোক উঠে টয়লেটে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে একটা পেপার ন্যাপকিনে দ্রুত কিছু লিখে বেয়ারাকে ডেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিল। দেখলাম, 'কাল দুপুর দুটোয়, ফ্লুরিজ। প্লিজ।'

বেরিয়ে এলাম আগেই। আমি নিঃসন্দেহ এই ভদ্রলোক সেই লোক নয় যার কাছে সে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। তাহলে এ কে ? সেই লোক হলে আমাকে ওদের টেবিলে ডেকে নিয়ে

যাওয়ার সাহস তার হতো। একে কি তাহলে ভয় পায় ? যাব কি যাব না ভেবে কূল পাচ্ছিলাম না। আগের থেকে সে এখন অনেক বেশি সুন্দরী হয়েছে। আগে যদি ঝরনা তবে এখন ভরা নদী। সেই পুরনো হাওয়াটা যেন আমাকে দোলাতে লাগল। কখন যে মন তৈরি হয়ে গেল আর আমি ঠিক দুটোর সময় ফ্লুরিজ রেস্টুরেন্টে হাজির হয়েছি তার কোনো ব্যাখ্যা নেই ; শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত রেস্টুরেন্টে ডিসেম্বরের কলকাতার চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা। সে এল প্রায় একই সময়ে

সামনে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'খবর কি ?'

'ঠিক আছি।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। বারে ঢুকে মদ খাওয়া হয়। বিয়ে হয়নি ?'

'এখনও সুযোগ পাইনি !'

দেখলাম কথা আটকে যাচ্ছে। দুজনে চুপচাপ চায়ের কাপ নিয়ে বসে আছি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাচ্চা কি পড়ছে ?'

'ক্লাশ থ্রি। আর একজনের এখনও স্কুল যাওয়ার সময় হয়নি।'

'কোথায় আছ ?'

'বাগবাজারে। তবে সামনের মাসে পার্ক সার্কাসে উঠে যাব। ফ্ল্যাট পেয়েছি।'

'কিনেছ ?'

'নাঃ ; ভাড়া। এক লাখ টাকা সেলামি দিতে হলো !'

'বাপস ! তোমার স্বামী কি ব্যবসা শুরু করেছেন ?'

'না। ও চাকরিই করে। মিস্টার রায় ব্যবস্থা করেছেন !'

'মিস্টার রায় ?'

'কাল যাঁকে দেখা হলো। ওঁর প্রচুর ব্যবসা।'

'উনি কে হন ?'

'আমাদের পারিবারিক বন্ধু।' হঠাৎ সে মুখ তুলল, 'আর কিছু জানার আছে ?'

'মনে হচ্ছে তুমি বিরক্ত হয়েছ ?'

'হ্যাঁ। ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে চাই না।'

'আশ্চর্য ! তুমি কিন্তু নিজেই ধরা দিচ্ছ !'

'তার মানে ?'

'তুমি যে সমস্যায় আছ তা বুঝিয়ে দিচ্ছ।'

'মোটেই নয়। আমি কোনো সমস্যায় নেই। মিস্টার রায় আমার বন্ধু, আমার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ভাল। বাঙালির স্বভাব হলো অন্যকে সমস্যাগ্রস্ত দেখে খুশি হওয়া।'

'তুমি খুব বদলে গেছ।'

'তাই নাকি ?'

'এতদিন পরে দেখা হলো আর ঝগড়া করছ।'

'আমি মোটেই ঝগড়া করিনি।'

'তুমি বলেছিলে আমি চাকরি পেলে ভদ্রলোককে ডিভোর্স করবে !'

সে হঠাৎ মুখ নামাল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'এতদিন যোগাযোগ রাখা হয়নি কেন ? আমি কি করে বুঝব আমার কথা ভাবা হয় ?'

'তাহলে কথাটা কথার কথা ছিল ?'

'আমি জানি না। কিন্তু দেখামাত্র তো সাড়া দিয়েছি।'

সে চা খেয়ে উঠে গেল। তার শরীর থেকে বিদেশি গন্ধ বের হচ্ছিল। তার সাজগোজে আধুনিকতার স্পর্শ প্রকট। যাওয়ার আগে সে আমার অফিসের টেলিফোন নম্বর নিয়ে গেল। অথচ আমি একটুও ঈর্ষান্বিত হলাম না। ওকে পাওয়ার জন্যে যে টান একদা বোধ করতাম তা আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু ওকে দেখলে যে ভাল লাগে তাও ঠিক।

মাস কয়েক বাদে ময়দানের মেলায় আবার তার সঙ্গে দেখা। সেদিন এক বান্ধবী সঙ্গে ছিল তার। উচ্ছ্বসিত হয়ে আলাপ করিয়ে দিল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেমন আছ ?'

'বাঃ, খারাপ থাকব কেন ?' সে ভ্রূ তুলল।

'আমি তো বলিনি খারাপ আছ !'

'বাঙালিরা ওই প্রশ্ন করে খারাপ আছে কিনা জানতে।'

'তোমার দেখছি বাঙালির ওপর খুব রাগ। মিস্টার রায় অবাঙালি নাকি ?'

'চমৎকার।' সে অদ্ভুত গলায় শব্দটা বলে আমার দিকে তাকাল। তার মুখচোখ প্রচণ্ড অবাক হয়ে গেল। কিন্তু খুব দ্রুত সেটা সামলে নিয়ে সে বলল, 'একদিন আলাপ করিয়ে দেব।'

আমি পরিবেশ হালকা করার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মিস্টার কোথায় ?'

'তার অনেক কাজ। একদিন আমাদের নতুন ফ্ল্যাটে আসা হোক।'

'নতুন ফ্ল্যাট ?'

'পার্ক সার্কাসে। বাজারটার ঠিক পেছনে।' সে আমাকে ঠিকানা দিল। তারপর বান্ধবীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিরে, পছন্দ হয় ?'

'অন্যের জিনিস আমি পছন্দ করি না।' বান্ধবী জবাব দিয়েছিল।

'অন্যের জিনিস নাকি ? সেই অন্যটা কে তা তো আমি জানি না।' সে হেসে উঠল। এই সময় একটি বালিকা মা মা বলে ছুটে এল। সে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমার বড় মেয়ে।' দেখলাম দূরে সেই মিস্টার রায় দাঁড়িয়ে আছেন। বললাম, 'চলি।'

কয়েক মাস পরে টেলিফোন পেলাম। ওদের বাড়িতে যেতেই হবে, কোনো আপত্তি শুনতে চাই না। শেষতক গেলাম।

অভিজাত পাড়ায় সাহেব-সাহেব বাড়িতে ফ্ল্যাট। বোতাম টিপতে ভেতরে বাজনা বাজল। দরজা খুললেন ওর স্বামী। ভদ্রলোকের চেহারা একই রকম। তবে এখন প্যান্টশার্ট পরছেন। বললেন, 'কাকে চান ?' তারপরই যেন চিনতে পারলেন, 'আরে আপনি ? আসুন, আসুন।' এই দ্যাখো, কে এসেছে।'

সে এল, 'বাব্বা, শেষ পর্যন্ত সময় হলো। বসা হোক।'

আমি বললাম, 'এই ধরনের বাংলা শুনতে খুব ভাল লাগে না।'

'আমার মতো করে আমি বলি, কার কি লাগল তাতে কিছু যায় আসে না !'

বসলাম। দু'-চার মিনিট কথা বলে সে ভেতরে চলে গেল। ওর স্বামী কথা শুরু করলেন সবটাই চাকরি-বাকরি সংক্রান্ত। আমার সঙ্গে যে ওঁর স্ত্রীর একদা সম্পর্ক ছিল তা যেন উনি জানেনই না। সে চা-খাবার নিয়ে এল। এসে জিজ্ঞাসা করল, 'ছেলেমেয়ে হয়েছে? কত ব ওরা?'

'আমি বিয়ে করেছি এ খবর রাখো?'

'সব খবর পাওয়া যায় মশাই। বউ খুব ভাল হয়েছে?'

'লোকে তো তাই বলে।'

'যাক বাঁচা গেল।'

'কেন?'

'তাহলে আর বারমুখো হতে হবে না।'

'তাই বুঝি!'

'হুঁ। অবশ্য যে নিজে ঘরমুখো সে পছন্দ না হলেও স্বভাব পাল্টায় ন

ভদ্রলোক বললেন, 'ও আপনার কথা খুব বলে। আমিও বলেছি ওঁকে এখানে আসতে বল। আড্ডা মারা যাবে।'

সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। 'আমার ফ্ল্যাট দেখা হবে না?'

'বেশ সুন্দর।'

ঘরে ঢুকে লক্ষ্য করেছিলাম চারপাশ দামী দামী জিনিসে সাজানো। এদের মূল্য যে প্রচ তাতে সন্দেহ নেই। আর এই সাজানোর মধ্যে রুচির ছাপ রয়েছে। কিন্তু সে আমাকে সম ফ্ল্যাটটা ঘুরে দেখালো। বেশ বড় ফ্ল্যাট। প্রতিটি ঘরে বৈভবের চিহ্ন ছড়ানো। বললাম, 'কবে কি?'

'আমি খারাপভাবে থাকতে পারি না।'

বাচ্চা দুটো খুব সুন্দর। ভারি ভাল লাগল ওদের। হঠাৎ বেল বাজল। সঙ্গে সঙ্গে গম্ভী হয়ে গেল মুখ দুটো। পরিচিত মানুষ বেল টিপলে বাড়ির লোক বুঝতে পারে। এরাও পার ভদ্রলোক বললেন, 'আবার আসবেন

স্পষ্টতই এটা আমাকে চলে যেতে বলা। আমি উঠে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে দরজা পর্য পৌঁছে দিলেন। দরজা খুলতেই মিস্টার রায়কে দেখলাম। আমাকে দেখামাত্র তাঁর মুখ গম্ভী হয়ে গেল। আমি তাঁর পাশ দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

এসব ঘটনার পর অনেক বছর চলে গিয়েছে। সে আর আমাকে ফোন করেনি। আমি আর যাওয়ার আগ্রহ বোধ করিনি। মাঝে একবার এসপ্ল্যানেডে ওর স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়েছি ভদ্রলোক আমাকে কেন ডুব মেরেছি জানতে চেয়েছিলেন। আমি উত্তর দিইনি। এই সে ওই পাড়ায় গিয়েছিলাম একটা কাজে। মনে পড়ল। বয়স বাড়লে মানুষ অনেক নির্লিপ্ত হ যায় বলে শুনেছি কিন্তু আমার মনে কৌতূহল ছোবল মারতে শুরু করল। গেলাম।

সেই বেল টিপলাম। দরজা খুলল একটি কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়ে। সে ইংরেজি জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চাই?'

হেসে বললাম, 'তোমার মা-বাবা কোথায় ?'

'বাব্বা, অ্যাদ্দিনে মনে পড়ল !' গলাটা ভেসে আসতেই লক্ষ্য করলাম ঘরের এক প্রান্তে সোফায় সে বসে আছে। মেয়েটি সরে দাঁড়াল। সে হাত বাড়িয়ে পাশের জায়গাটা দেখাল, 'বসা হোক।'

'কি খবর সব ?' আমি হাসলাম, 'তোমার মেয়েকে তো চিনতেই পারিনি প্রথমে।'

'কত বছর বাদে আসা হলো খেয়াল আছে ?'

'তা ঠিক।'

'টিউ, যাও, বাবাকে ডেকে আনো।'

মেয়েটি চলে গেল। আমি তাকালাম। ফ্ল্যাটটি ঠিক আছে কিন্তু সেই আগের মতো চকচকে নেই। দামী জিনিসগুলোকেও আর দেখতে পাচ্ছি না।

হঠাৎ সে বলল, 'আমি ভাল নেই।'

তাকালাম। তার ওপরের শরীর বেশ ভারি, সিঁথির দু' পাশের চুলে পাক ধরেছে। গালে, চোখের নিচে হাঁসের পায়ের দাগ।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, 'মিস্টার রায় কেমন আছেন ?'

'ভোলা হয়নি দেখছি। ওই যে কবিতা আছে, সব পাখি ঘরে ফেরে, সব নদী। কেউ তো তার ব্যতিক্রম নয়। তাই না ?'

'কি জানি।'

স্বামী এলেন। বেশ ভেঙে পড়া শরীর। এসে বললেন, 'আরে আপনি ! কি আশ্চর্য ! অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলেন ? প্রায়ই আমরা আপনার কথা বলি।'

'তাই ?'

'হ্যাঁ। আপনি তো শুনেছেন ?'

'কি ?'

'ওর শরীরের ব্যাপার জানেন না ? সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে কোমরে এমন চোট পায় যে হাঁটতে পারে না একা ! আমিও রিটায়ার করার পর হাজারটা অসুখে ভুগছি। ওষুধের দাম তো জানেন। তারপর বাজারদর বাড়ছে হু-হু করে। সংসার চালানোই মুশকিল হয়ে পড়েছে।'

সে হাত তুলল, 'প্লিজ !'

স্বামী বললেন, 'উনি তো ঘরের লোক, তাই বলছি।'

'আমার শুনতে ভাল লাগছে না।'

'ও।'

হঠাৎ সে আমার দিকে তাকাল, 'এখন কেমন লাগছে ?'

'ভাল না।'

'একটুও খুশি হওয়া যাচ্ছে না ?'

'না।' আমি নিঃশ্বাস ফেললাম।

'ও ! মহৎ হবার সাধ হয়েছে। চলে যাওয়া হোক এখান থেকে।'

স্বামী আপত্তি করলেন। আমাকে বারংবার অনুরোধ করলেন যোগাযোগ রাখতে। যখন বেরিয়ে এলাম তিনি সঙ্গে এলেন কিছুটা। তারপর আমার হাত ধরে বললেন, 'আপনাকে কিন্তু ও খুব ভালবাসে। প্লিজ, ওকে ভুল বুঝবেন না।'

আমি অবাক হয়ে ওঁকে দেখলাম, কে কাকে ভালবাসে তা শুধু ঈশ্বরই জানেন।

॥ ৭

তখন দার্জিলিং মেল নামে কোনো ট্রেন ছিল না। গঙ্গা ওপর ব্রিজও তৈরি হয়নি। বিকেল বিকেল যে ট্রেনা শিলিগুড়ি ধরে চলে সেটা ভোরবেলায় গঙ্গার ধারে এ যেই থামত অমনি হাজার খানেক মানুষ পোঁটলাপুঁটি নিয়ে ছুট লাগাতো বালির চরে। গঙ্গায় তখন বড় বড় ল আর স্টিমার দাঁড়িয়ে হুইস্‌ল মারছে। যাত্রীরা তার একটা উঠে বসত। স্টিমারের মধ্যে চায়ের দোকান, খাবারে ব্যবস্থা। কেউ কেউ ওই ফাঁকে ডুব দিয়ে নিত গঙ্গায়, পু হবে বলে। একতলাটা যখন ভিড়ে ভিড়াক্কার ওপরতলাটা তখন বেশ সুনসান। সেখানে প্রথ শ্রেণীর যাত্রীদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। সেইসব বঙ্গ সন্তানেরা বেশিরভাগ বাক্য ইংরেজিতে বলতেন। একতলার দোকানে যেমন স্যান্ডউইচ পাওয়া যেত না দোতলায় বিক্রি হতো সিঙাড়া। যাত্রীবোঝাই স্টিমার এপারে এসে লাগতেই আবার দে দৌড়। কুলিদের হাঁকাহাঁকি আ মানুষের ব্যস্ততায় চর মুখর হয়ে উঠত। দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটার কামরা ভর্তি হয়ে গেলে হোগলা অস্থায়ী দোকান থেকে ডাক আসত, 'চলে আসুন, ইলিশের ঝাল আর ভাত, মাত্র আট আনা ভাত ডাল তরকারি নিরামিষ পবিত্র হিন্দু হোটেল,, সোওয়া পাঁচ আনা। বালির ওপর কাঠ পুঁ বেঞ্চি বানিয়ে যে গরম খাবার দিত ওরা তার স্বাদ অনেকদিন মনে লেগে থাকত। বয়স্ক বলতেন গোয়ালন্দের স্টিমার ঘাটায় নাকি ঠিক ওইরকম, অবশ্য ওইরকম আর কি করে হবে তার স্বাদই আলাদা, তবু কাছাকাছি খাবার পাওয়া যেত।

এগারোটা নাগাদ ট্রেন ছাড়তো নদীর সঙ্গ, পৌঁছাতো সন্ধ্যে নাগাদ শিয়ালদা স্টেশনে। সে এ স্বপ্নের যাত্রা ছিল।

পঁয়ত্রিশ বছর আগে যখন কলেজে আসার জন্যে জলপাইগুড়ি ছেড়েছিলাম তখন বছ অন্তত চারবার ওই পথে যাওয়া আসা করতাম। বিন্দুমাত্র কষ্ট হতো না। সেসময় প্রথম শ্রে ছাড়া ওই ট্রেনে রিজার্ভেশনের বালাই ছিল না। সেকেন্ড ক্লাশ এবং থার্ড ক্লাশ ছিল। শুনে তার আগে ইন্টার ক্লাশের চল ছিল। সেসময় এখনকার চেয়ে মানুষ অনেক কম থাকলেও ট্রে ওঠার সময় মনে হতো প্রচণ্ড ভিড়। অথচ ট্রেন ছাড়লেই বেশ ফাঁকা।

জলপাইগুড়ি স্টেশনটার নাকি একসময় রমরমে ব্যাপার ছিল। সেটা ব্রিটিশ আমলে। নেছি পাকিস্তান হবার পরও নাকি শিয়ালদা থেকে পাকিস্তান ঘুরে ট্রেন এসে পৌছাতো লপাইগুড়িতে। আমি সেটা দেখিনি। ষাট সালে জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি একটা ট্রেন ত্র চারবার যাওয়া আসা করত। এখনও করে। কোনো পরিবর্তন হয়নি। স্টেশনটা ছোট এবং র্ণতার ছাপ সারা শরীরে জড়ানো। বিকেলবেলায় হলদিবাড়ি থেকে যে ট্রেনটা শিলিগুড়ি ওয়ার জন্যে জলপাইগুড়ি স্টেশনে মিনিট পাঁচেকের জন্যে দাঁড়াত তাতে দুটো কামরা থাকত শিলিগুড়িতে যাওয়ার পর নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হতো। সেই দুটো মরায় ওঠার জন্যে ধস্তাধস্তি এমন কি মারপিটও হতো মাঝে মাঝে।

আমরা আসতাম দল বেঁধে। জলপাইগুড়ি থেকে পাশ করে কলকাতার বিভিন্ন কলেজে রা ভর্তি হয়েছিলাম তারা ছুটির সময় যাওয়া আসা করতাম একসঙ্গে। ফলে অন্যান্য যাত্রীদের থেকে আমাদের দাপট বোধহয় একটু বেশি ছিল। তার ওপর আমাদের কিছু বন্ধু যারা লপাইগুড়িতেই থাকত তারা দুপুরবেলায় হলদিবাড়িতে চলে যেত ট্রেনে জায়গা দখল করতে। টো বাঙ্ক, দুটো বেঞ্চির দখল নিয়ে জলপাইগুড়িতে ট্রেন ঢুকলে ওরা আমাদের আরামের ব্যবস্থা রে দিত। অন্যান্যরা যখন একটু বসার জায়গার জন্যে হা-পিত্যেশ করছে তখন আমরা রাজার তো পা ছড়িয়ে শুয়ে আছি। সেসব ভাল দিন ছিল।

সেবার পুজোর ছুটির পর আমরা চারজন কলকাতায় ফিরছি। সেবার একটু আগেই তাসে শীতশীত ভাব এসেছিল। দুটো বাঙ্ক আর বেঞ্চির দখল নিয়ে আমরা যখন আরাম করে সেছি তখনই প্ল্যাটফর্মে ওদের দেখতে পেলাম। বাবা, মা এবং সে। অত ফর্সা এবং স্বাস্থ্যবতী য়ে জলপাইগুড়িতে দেখা যেত না। বুঝলাম ওরা তখনও জায়গা পায়নি। এই সময় আমাদের লতে আসা এক বন্ধু বলে উঠল, 'এইরে! মুশকিল হলো!'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে?'

সে বলল, 'ওই ফ্যামিলিটাকে দেখছিস, ওরা আমাদের পাড়ায় থাকে। আমাকে দেখতে পেলেই সাহায্য করতে বলবে।' গোবিন্দ তখন মুখে পান পুরছিল। ওই বয়সে আমরা তখনও কেউ নেশা-টেশা করি না। কিন্তু গোবিন্দ কলেজে ঢোকার পর একসঙ্গে পান, নস্যি এবং সিগারেট খেতে শুরু করেছিল। একটু বেশি রকমের বেপরোয়া কথাবার্তা বলত। গোবিন্দ খুব অনিচ্ছার সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়েই সোজা হয়ে বসল, 'কি আশ্চর্য! তোর পাড়ার লোক আর তুই অ্যাভয়েড করছিস? কলেজে পড়ি বলে কি আমাদের মন থেকে ভদ্রতাবোধটুকুও লে যাবে। আমাদের এখানে প্রচুর জায়গা রয়েছে, চল, ওদের ডেকে নিয়ে আসি।'

আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করে গোবিন্দ বন্ধুটিকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল। অজিত গোয়েঙ্কাতে পড়ত। একটু গম্ভীর প্রকৃতির। জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি হলো?'

আমি দেখলাম ততক্ষণে ওরা পৌছে গেছে ভদ্রলোকের সামনে। বন্ধুটি সম্ভবত প্রস্তাবটা ল। শুনে ভদ্রলোকের মুখ উদ্ভাসিত। গোবিন্দর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল বন্ধুটি। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম গোবিন্দ ওঁদের প্রণাম করে বিগলিত ভঙ্গীতে কিছু বলছে। তারপরই মালপত্র সমেত ওরা এগিয়ে আসতে লাগল কামরার দরজার দিকে। অজিত বলল, 'আমি কিন্তু

আমার বাঙ্ক ছাড়ব না. আগে থেকে বলে দিচ্ছি।'

বসার জায়গা প্রচুর ছিল কিন্তু মালপত্র গুছিয়ে ওরা বসার পর মনে হচ্ছিল যে জায়গা নেই এইসময় হুইস্‌ল বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিতেই আমাদের তুলতে আসা বন্ধুরা নেমে গেল। দে গেল যত লোক যায় তার কয়েকগুণ তুলতে আসে। এখন কামরার চেহারা ছিমছাম।

ভদ্রলোক মোটাসোটা, গোলগাল, ফর্সা। সেই বয়সে আমার ওঁকে বৃদ্ধ বলে ম হয়েছিল। কিন্তু হিসেব করলে দেখা যেত ওঁর বয়স পঞ্চাশের নিচেই। কুড়ি বছরের চো পঞ্চাশকে বৃদ্ধ বলে ভাবে কিন্তু পঞ্চাশে পা দিলে নিজেকে যুবক ভাবতে খারাপ লাগে না অসুবিধেও হয় না। সেসময় মানুষ বয়সের আগেই বুড়ো হয়ে যেত। আমার মাকে তাঁর পঁয়ত্রি বছর বয়সে যে কায়দায় শাড়ি পরতে দেখেছি পঁচাত্তরেও সেটা অক্ষুণ্ণ আছে। অর্থাৎ পঁয়ত্রিশে মা বয়স্কা হবার চেষ্টায় নেমে গিয়েছিলেন। এই ভদ্রমহিলাও ঠিক একই পথে এগিয়েছেন। পর প্রায়-সাদা শাড়ি. মাসীমা মাসীমা ভাব মুখ চোখে অথচ বয়স বোধহয় চল্লিশ পার হয়নি ওইসময় সেটা স্বাভাবিক ছিল। বোধহয় এই কারণেই বঙ্কিমের নায়িকারা তেরো বছর বয়ে যুবতী হয়ে গিয়ে দারুণ সব সংলাপ বলত।

কিন্তু ওঁদের পাশে আমার মুখোমুখি যে বসেছিল তাকে আমার মালা সিনহা বলে ম হলো। একটু নেপালি নেপালি মুখ, কিন্তু চোখ যেন দশমুখে কথা বলছে। পাতলা লাল ঠোঁ হাসি চেপে রেখেছে। ওর পরনের হলুদ স্কার্ট গায়ের রঙের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গেছে। (বসেছে গোবিন্দর পাশে, গোবিন্দ জানলায়। আমাদের সঙ্গে গোবিন্দই ওদের পরিচয় করি দিল। এমন ভঙ্গীতে কথা বলছে যেন বহুকাল ধরে ওদের চেনে। ভদ্রলোক বললেন, 'তোম না থাকলে খুব অসুবিধে হতো বাবা। কি বলে যে ধন্যবাদ দেব...।' গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ ব উঠল, 'ছি ছি ছি! একি কথা বলছেন। আপনারা আমাদের পিতামাতার মতো, আমরা (সামান্য কর্তব্যটুকু করেছি।'

ভদ্রলোক স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'শুনলে! আজকালকার ছেলে মানেই অভদ্র নয়!'

ভদ্রমহিলা সস্নেহে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কোলকাতায় যাচ্ছ?'

প্রশ্নটা আমার উদ্দেশ্যে ছিল কিন্তু গোবিন্দ জবাব দিল, 'হ্যাঁ মাসীমা। আমরা সবাই কলে পড়ি। অজিত আর নৃপেন পড়ে গোয়েঙ্কাতে, সমরেশ স্কটিশে আর আমি প্রেসিডেন্সিতে।'

ভদ্রলোক চোখ বড় করলেন, 'প্রেসিডেন্সি কলেজ? তার মানে তুমি তো খুব ভাল ছেলে

'ওই আর কি। পড়াশুনা তো করতেই হয়।'

আমার পাশে বসা অজিত চিমটি কাটলো। গোবিন্দ পড়ে সুরেন্দ্রনাথে, যে নম্বর পে পাশ করেছে তাতে প্রেসিডেন্সির গেট পার হওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু ও বেমালুম গুল মে যাচ্ছে। অজিতের কেন, আমার পক্ষেও হজম করা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমরা যাচ্ছি বেড়াতে। আমার বোন থাকে বেলগাছিয়ায়। দি সাতেক থাকব। ওর তো এবার ফাইন্যাল ইয়ার। যেতেই চাইছিল না পড়া ছেড়ে।'

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'পড়াশুনায় বুঝি খুব ভাল?'

মেয়েটি শরীর মোচড়ালো, 'মা, কথা বলার আর কোনো সাবজেক্ট পেলে না?'

ভদ্রলোক বললেন, 'থাক থাক। আবার পড়ার কথা কেন ?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'মেয়ের আমার খুব ইচ্ছে পাশ করে কলকাতায় পড়তে যাবে। আমার ভয় করে।'

আমার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললেন বলে গোবিন্দকে সুযোগ না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভয় কেন ?'

'বাব্বা ! কলকাতার কি কম দুর্নাম ! একটু পা ফসকালেই আর দেখতে হবে না।'

অজিত প্রথম কথা বলল, 'ঠিক বলেছেন।'

গোবিন্দ মাথা নাড়ল, 'মোটেই ঠিক নয়। যে যেমন সে তেমন হয়। এইতো আমার মাসতুতো বোনেরা বেথুনে পড়ছে, ওরা কি খারাপ হয়েছে ? আপনি ও নিয়ে চিন্তা করবেন না মাসীমা।'

ট্রেন চলছিল শিলিগুড়ির দিকে। অজিত ফিসফিস করে বলল, 'শালা !' আমরা সবাই জানি গোবিন্দর কোনো মাসী নেই যে তার মেয়ে থাকবে।

এবার মেয়েটি কথা বলল। তার মুখ আমার দিকে কারণ আমরা মুখোমুখি বসে, 'আপনারা চারজন কলকাতায় একসঙ্গে থাকেন ?'

ওর পাশ থেকে গোবিন্দই জবাব দিল, 'না, না। ওই যে বললাম, সবাই আলাদা কলেজে পড়ি। তাই থাকার হোস্টেলও আলাদা। তুমি কলকাতার দ্রষ্টব্য জিনিসগুলো দেখেছ ?'

মাথা নাড়ল মেয়েটি। তার ফোলানো চুলের প্রান্ত গোবিন্দর কাঁধ কান স্পর্শ করল, 'নাঃ। কে নিয়ে যাবে ? বাবা তো কলকাতায় গিয়ে নড়তেই চায় না।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ওকথা বলো না টুকি। গতবার তোমাকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখিয়েছি।'

'ওঃ, শুধু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। আমার খুব ইচ্ছে মেট্রো সিনেমায় সিনেমা দেখতে। আর যেখানে সিনেমার শুটিং হয় সেখানে গিয়ে উত্তমকুমারকে সামনাসামনি দেখার খুব ইচ্ছে আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা বললেন, 'ও ইচ্ছে আমারও আছে।'

গোবিন্দ কিছু বলার আগেই অজিত বলল, 'এটা খুব সামান্য ব্যাপার।'

টুকি চোখ বড় করল, 'সামান্য ব্যাপার ?'

'হ্যাঁ। আপনারা গোবিন্দকে ধরুন। ওর মেসোমশাই-এর খুড়তুতো ভাই হলো উত্তমকুমার। ও প্রায়ই উত্তমকুমারের বাড়িতে যায়, খেয়ে আসে।' অজিত আমাদের অবাক করে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে টুকি উত্তেজিত গলায় গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের নিয়ে যাবেন ? প্লিজ !'

গোবিন্দ খুব দ্রুত তার ঘাবড়ে যাওয়া ভঙ্গীটা কাটিয়ে উঠতে পারল, 'এ আর কি ব্যাপার ! যে কোনোদিন গেলেই হয়। তবে আগে থেকে জানিয়ে গেলে ভাল, নইলে এত শুটিং থাকে যে ওকে সবসময় বাড়িতে তো পাওয়া যায় না।'

টুকি বলল, 'আচ্ছা ওঁকে দেখতে কি রকম ? এই চাওয়া পাওয়া, একটি রাতে যেমন

দেখতে লেগেছে ঠিক সেইরকম তো?'

'আরও ভাল। অনেকের তো ছবিতে ভাল চেহারা আসে না, ওকে সামনাসামনি দেখতে বেশি ভাল লাগে।' গোবিন্দ গম্ভীর মুখে বলল।

সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল টুকি, 'ওঃ, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম!'

ভদ্রমহিলা চোখ পাকালেন, 'ও তাই? অথচ আজ সকালেও আসতে চাইছিলি না!'

ট্রেনে এক নাগাড়ে বেশিক্ষণ কথা বলা যায় না। একসময় আমরা চুপচাপ হলাম। রাতের অন্ধকার নেমে গেছে একসময়। হঠাৎ অজিত আমাকে বলল, 'একটু ওপাশে চল তো!'

কিছু না বুঝেই ওকে অনুসরণ করলাম। টয়লেটের সামনে এসে অজিত বলল, 'এটা ঠিক হচ্ছে না।'

'কোনটা?' বুঝতে পারিনি তখনও।

'তুই লক্ষ্য করিসনি, গোবিন্দ টুকির হাত ধরে বসে আছে?'

'যাঃ। কি যে বলিস?'

'চল, গিয়ে দেখবি। আমি আগাগোড়া আড়চোখে দেখেছি। প্রথমে গোবিন্দ ওর পাশে রাখা টুকির হাতের আঙুল ছুঁল। টুকি একটু সরিয়ে নিয়ে আবার হাত আগের জায়গায় রাখল। গোবিন্দ দ্বিতীয়বার আঙুল স্পর্শ করতেই টুকি হাতটা চেপে ধরল। আর সেই থেকে ওরা ওইভাবেই বসে আছে। ওপাশে বসে আছে বলে টুকির বাবা মায়ের চোখে পড়ছে না ব্যাপারটা। দ্যাখ, ওঁরা এত ভাল, ওঁদের মেয়ের সঙ্গে এমন করা খুব অন্যায় হচ্ছে।'

আমার খুব খারাপ লাগছিল। গোবিন্দ আঙুল ছোঁয়ার চেষ্টা করলেই টুকি কেন ওর হাত ধরবে? ওরকম মিষ্টি রহস্যময়ী মেয়ে কি এটা করতে পারে? ফিল্মে মালা সিনহার হাত ধরতে নায়ককে কত কাজ করতে হয়। আর গোবিন্দ তো টুকিকে মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে প্রথম দেখল। এইসময় শিলিগুড়ি স্টেশন চলে এল। ব্যাপারটা সাময়িক ভুলে আমরা দরজা দিয়ে স্টেশনের আলো দেখতে লাগলাম।

বাড়ি থেকে রাতের খাবার করে দিয়েছিল। ওঁরা যখন নিজেদের টিফিন ক্যারিয়ার বের করলেন আমরা আমাদের খাওয়া শুরু করলাম। ওঁরা অনুরোধ করলেন ওঁদের আনা খাবার নিতে। গোবিন্দ এক কথায় রাজী হয়ে গেল। আমরা রাজী হইনি। গোবিন্দ ওভাবে রাজী না হলে কি করতাম জানি না।

ওপরের দুটো বাঙ্ক আমাদের দখলে। ঠিক ছিল দুজন করে একটা বাঙ্কে শোব। লম্বা বাঙ্কে দুদিকে মাথা করে শোওয়ায় আমরা তখন অভ্যস্ত। হঠাৎ গোবিন্দ বলল, 'এই শোন, এতটা পথ মেসোমশাই মাসীমা বসে বসে যাবেন, এটা কি ঠিক হবে? ওঁরা বরং ওপরের বাঙ্ক দুটোয় শুয়ে যান।'

কথাগুলো বলল ওঁদের শুনিয়ে। ভদ্রমহিলা দ্রুত মাথা নাড়লেন, 'না বাবা। আমি আর ওপরে উঠতে পারব না।'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'এই বেশ আছি। একটা তো রাত, দিব্যি বসেই চলে যেতে পারব।'

গোবিন্দ বলল, 'শোওয়ার জায়গা আছে যখন তখন বসে যাবেন কেন? কোনো ভয় নেই, আমরা আপনাদের ধরে তুলে দেব। খাওয়া শেষ করে বাথরুম থেকে ঘুরে আসুন।'

টুকি বলল, 'যাও না মা, তোমার বেশ এক্সপেরিয়েন্স হবে।'

অজিত আর পারল না। খাওয়া শেষ করেই উঠে দাঁড়াল, 'গোবিন্দ, শোন, কথা আছে।'

গোবিন্দ উঠে গেল। হঠাৎ টুকি নিচু গলায় আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের ওই বন্ধুটা ন কেমন।'

'কে ? অজিত ? না তো। খুব ভাল ছেলে ও।'

'তাহলে আমাদের পছন্দ হয়নি।'

'না না আপনি ভুল বুঝছেন,' কথাটা বলে ভিড় ঠেলে আমি দরজার কাছে চলে এলাম। খানে অজিতের সঙ্গে গোবিন্দর চাপা গলায় তর্ক চলছে। অজিত বলছে, 'কোথাকার কে তার ক নেই তুই তাদের দাতব্য করছিস ? আমাদের সঙ্গে আগে কথা বলার প্রয়োজনও মনে করলি ?'

'কোথাকার কে বলিস না। পরে তো সম্পর্কও হতে পারে।' গোবিন্দ প্রতিবাদ করল।

'পরে সম্পর্ক হবে মানে ?' অজিত অবাক।

'দ্যাখ অজিত। টুকিকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। ওর যখন কোনো প্রেমিক নেই তখন ় ভালবাসা বিয়ে পর্যন্ত গড়িয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তখন ওঁরা আমার কে হবেন ?'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'টুকির কোনো প্রেমিক নেই ?'

'না। আমাকে ও বলেছে।'

'কখন বলেছে ?' অজিত হতভম্ব।

'একটু আগে।'

অজিত আমার দিকে তাকাল, আমরা ওসব সংলাপ শুনতে পাইনি। অজিত জিজ্ঞাসা রল, 'এই অল্প সময়ের মধ্যে তোদের প্রেম হয়ে গেল ?'

'এটাই তো স্বাভাবিক। লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট।'

'তুই মরবি গোবিন্দ। এর আগে দুদুবার প্রেম করতে গিয়ে মার খাওয়ার হাত থেকে চেছিস।'

'অতীতের কথা আমি ভুলে যেতে চাই। যাহোক, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি তোদের দেখে। অবস্থা ! দুজন বৃদ্ধবৃদ্ধার প্রতি তোদের কোনো সহানুভূতি নেই ? ছি ছি !' গোবিন্দ ফিরে ল।

আমি অজিতকে বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজী করালাম বাঙ্কের দখল ছেড়ে দিতে।

ট্রেন চলছিল। ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাকে ওপরে তুলে দেওয়া হলো। বোঝা গেল ন্যের সাহায্য ছাড়া ওঁদের পক্ষে নিচে নেমে আসা খুব মুশকিল হবে।

হঠাৎ গোবিন্দ টুকিকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি এই বেঞ্চিতে শোবে ?'

টুকি বলল, 'পাগল। ট্রেনে আমার ঘুম আসে না।'

গোবিন্দ আমাদের দিকে তাকাল, 'তাহলে তোরা অ্যাডজাস্ট করে শুয়ে পড়। আমরা গল্প তে করতে চলে যাব। টুকি জানলার পাশে বসেছিল, গোবিন্দ তার পাশে। আমরা কথা না ড়িয়ে শোওয়ার চেষ্টা করলাম। ট্রেনের দোলায় বেশ মজা আছে। আমার ভাল ঘুম হয়। কানে

'মানে ?'

'এখন যা বলব তা কৈফিয়তের মতো শোনাবে। শুধু জেনে রাখুন, মেয়েদের মন খুব অ
দুর্বল হয় যদি জানে কেউ অসহায় হয়ে তার সাহায্য ভিক্ষে করছে। কিন্তু টয়লেটে জোর ক
ঢুকে যে পুরুষ শরীর স্পর্শ করতে চায় তাকে কোনো মেয়ে শ্রদ্ধা করতে পারে না। অবশ্য আপ
আমাকে ঘেন্নাই করতে পারেন।'

নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস সেদিন বিকেল পাঁচটায় শিয়ালদায় পৌঁছেছিল। লক্ষ্য করে
এপারের ট্রেনে এসে টুকি তার মা বাবার মাঝখানে বসেছে। গোবিন্দর সঙ্গে একটাও ক
বলেনি। ট্রেন থেকে নামবার আগে একটা কাগজের টুকরো আমার হাতে দিল টুকি, মুখে কি
বলল না। ওরা চলে যেতে গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কিরে ওটা ?'

আমি কাগজটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে বলেছিলাম, 'জানি না।'

গোবিন্দর সঙ্গে টুকির আর কোনো সংলাপ হয়নি তা আমি জানি। এর পরে একাধি
মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে গোবিন্দ তার যোগ্য সহধর্মিণী পেয়েছে। সুখে কিনা জানি না, স্বস্তি
জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে ওরা। অজিত এখনও জলপাইগুড়িতে, বছর তিরিশের পর ওর স
সেদিন দেখা হলো সুবোধের বাড়িতে। স্বভাব আমার মতো থাকলেও ও এখন বেশ বিষয়
আমার বন্ধুবান্ধবরা সব এখন প্রৌঢ় হতে চলেছে। আমি একটু মোটাসোটা হয়েছি। মানসিকত
কোনো পরিবর্তন হয়নি। নিজেকে যুবক ভাবতে বিন্দুমাত্র খারাপ লাগে না আজও।

গত বছর পুজোর লেখা লিখতে দার্জিলিং-এ গিয়েছিলাম। আমার এক বন্ধুর চমৎক
একটা গেস্ট হাউস আছে সেখানে। ভোর পাঁচটায় উঠি। মুখ ধুয়ে লিখতে বসি ফ্লাস্কে রাখা
খেয়ে। মাঝে নটার সময় একটু ব্রেকফাস্ট। টানা একটা পর্যন্ত লেখা। তারপর লাঞ্চ। সামা
ঘুম। ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে চা খেয়ে সেজেগুজে বেরিয়ে পড়ি। দার্জিলিং-এ প্রচুর পরিচিত
ম্যাল ঘুরে কারও না কারও বাড়িতে আড্ডা খাওয়াদাওয়া শেষ করে বাড়ি ফিরি রাত দশটায়

সেদিন বিকেলে ম্যালে গিয়ে স্টেপ অ্যাসাইডের গা বরাবর বেঞ্চিতে গিয়ে বসেছিলাম
ভাল ট্যুরিস্ট এসেছে সামারে। ঘোড়াওয়ালাদের সুদিন। এখন ভর বিকেল। হঠাৎ এক
কিশোরী আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ধবধবে ফরসা। পরনে জিন্সের ওপর পুলওভার
সুন্দরী।

'এক্সকিউজ মি ! আপনি কি সমরেশ মজুমদার ?'

মাথা নাড়লাম। এরপর ও অটোগ্রাফের খাতা বের করবে। অভিজ্ঞতা তাই বলে। কি
মেয়েটি বলল, 'আমার মা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'তোমার মা ?'

'হ্যাঁ। ওইখানে বসে আছেন।'

আমি দেখলাম, ভানু ভক্তের মূর্তির পাশে একটি বেঞ্চিতে দুজন মানুষ বসে আছে
পুরুষটি আমার বয়সী, মহিলা—খুব চেনা লাগছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি কথা বলতে চান উনি ?'

'জানি না তো। বোধহয় ব্যক্তিগত।'

'ওঁর পাশে কে বসে আছেন ?'

'আমার বাবা।'

'তুমি কি কর ?'

'আমি লরেটোতে পড়ি ফাইন্যাল ইয়ার।'

'আমার লেখা পড়েছ ?'

'সরি ! আঙ্কল ! আপনার আনন্দমেলায় দু-একটা লেখা পড়েছি। আমি কোনো ইন্টারেস্ট পাই না। অবশ্য আমাদের বাড়িতে আপনার সব বই আছে। আটানব্বুইটা বই, তাই না।'

'মাই গড ! কে পড়ে ?'

'মা।'

'তোমাব মায়ের নাম কি ?'

'সন্ধ্যাতারা দত্ত। আগে রায় ছিল।'

এ নামের কাউকে আমি চিনি না। আমার মুখ দেখে মেয়েটি বলল, 'আমার মায়ের ডাক-নাম টুকি !'

টুকি ! আমি ওই নামের কাউকে মনে করতে পারলাম না। তিরিশ, বত্রিশ বছর বড় নিষ্ঠুর সময়। বললাম, 'চল, আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।'

ম্যালের ন্যাড়া প্রাঙ্গণ ধরে আমরা এগোতেই দেখলাম ভদ্রমহিলা বেঞ্চি ছেড়ে এগিয়ে আসছেন। ভদ্রলোক তেমনই বসে আছেন। মুখোমুখি হতেই মেয়েটি বলল, 'বাই আঙ্কল !' সে চলে গেল বাবার কাছে।

ওর যাওয়া দেখার পর ভদ্রমহিলা হাসলেন, 'চেনা যাচ্ছে ?'

এখন বড় কষ্টের সময়। পঁয়ত্রিশ বছরের স্মৃতি হাতড়ে যাওয়া যে কি যন্ত্রণার তা অনুভব করলাম।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমি টুকি। নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে শিয়ালদায় গিয়ে একটা ঠিকানা দিয়েছিলাম, মনে আছে ?'

হুড়মুড়িয়ে সব মনে পড়ে গেল। বললাম, 'হ্যাঁ। কেমন— !'

তুমি না আপনি বলব বুঝতে পারছিলাম না।

'কেমন কি ?'

'কেমন থাকা হচ্ছে ?'

সে হাসল খুব ; বলল, 'খুব ভাল। ওই আমার স্বামী, আর মেয়ে। কিন্তু একটাই প্রশ্ন, ঠিকানা দিলাম, তবু যাওয়া হলো না কেন ?'

'গেলে কি হতো ?'

'কি হতো আমি জানি না। কিন্তু আমি যে তাকে ভুলতে পারি না।'

'কাকে ?'

'যে টয়লেটে ঢুকে আমার শরীর স্পর্শ করেছিল আমি তাকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম।

ভেবেছিলাম তাকে ঠিকানা না দিয়ে তার বন্ধুকে দিলে সে নিজেকে শোধরাবে। আর বন্ধু নিশ্চয়
তাকে নিয়ে আমার মাসীর বাড়িতে আসবে। যাকগে! সে কেমন আছে?'

গলার স্বর যেন ভাঙল। বললাম, 'ভালই আছে।'

'ভালো থাকলেই ভাল। আচ্ছা, আসি।'

'একটা কথা—।'

সে দাঁড়াল।

'আমি কেমন আছি তা তো একবারও জিজ্ঞাসা করা হলো না।'

'আমি যে উত্তরটা জানি।' সে হাসল।

আমি অবাক, 'কি করে?'

'প্রত্যেকটা লেখা পড়ে। পড়তে পড়তে সব জেনে যাই। আচ্ছা, এলাম। আমার মেয়ে
বাবাকে উদ্বিগ্ন করার কোনো মানে হয় না।'

সে চলে গেল। আমি ভাবতে বসলাম। আমার লেখায় কি আমাকে পাওয়া যায়? নিজেকে
নিয়ে তো কিছুই লিখি না আমি। সত্যি কি লিখি না?

॥ ৮ ॥

আসলে ওই ট্রেনটার সঙ্গে আমি এবং আমার যৌবন
এমনভাবে জড়িয়ে আছি অথবা আছে যে বারেবারে লেখায়
ফিরে আসে। আগেরবার বলেছি তখন ট্রেনযাত্রায় কোনো
কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে হতো না। সারারাত বসে এসেছি
কিন্তু হৈ হৈ করে সময় কাটিয়েছি। স্টিমারে সকরিকা
মণিহারিঘাট পেরিয়ে আসার সময় দোতলায় যাওয়া
বরাদ্দ ছিল প্রথম শ্রেণীর টিকিটধারীদের। আমরা জনতার
সঙ্গে নিচের ডেকে থাকতাম এ ওর গায়ে গা লাগিয়ে। কিন্তু
ওই বয়সে নিষিদ্ধ জগতের ওপর আকর্ষণ থাকবেই। তাই পাহারাদারকে ফাঁকি দিয়ে আমরা
দোতলায় উঠে যেতাম। মুষ্টিমেয় কিছু যাত্রী ডেক-চেয়ারে বসে আছেন। তাঁদের সামনে
উর্দিপরা বেয়ারা ব্রেকফাস্ট দিয়ে যাচ্ছে। কোনো হৈচৈ নেই। নীলু ডালিং কাম হিয়ার, রেলিং-
এ অত ঝুঁকো না, প্লিজ! খুকী ব্রেকফাস্টে কি নেবে? মালবিকা, আমার মাফলারটা—! ইয়ে
মিস্টার গুপ্তা, দার্জিলিং-এ কোথায় উঠছেন? উইন্ডসর না প্ল্যান্টার্সে? এইরকম সংলাপ শোনা
যেতো। আমার মতো আধা মধ্যবিত্ত সংসার থেকে আসা তরুণের কাছে কিরকম সিনেমা সিনেমা
মনে হতো? দু'-একজন মহিলাকে কিরকম পুতুল পুতুল মনে হতো দূর থেকে।

তারপর ফারাক্কায় ব্রিজ তৈরি হলো। স্টিমারগুলো কোথায় গেলো কে জানে। ট্রেনটার য় গেলো কমে। সন্ধ্যেবেলায় শিয়ালদা ছেড়ে ভোর ভোর নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছে যেতো। খন ট্রেন সময়ে চলত। প্রথম চাকরি করার বছরগুলোতেও দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত। রিজার্ভেশন চালু হলো। সেটা সবাই মানত। একসময় সেটা চুকলো। টয়লেটের লায় স্মাগলাররা চোরাই মাল রাখতে লাগল। জল নেই, আলো নেই, পৌঁছাবার সময়ের ঠিক-গনা নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষ এটা মেনে নেয়। আমিও নিতাম কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী যেই আমাকে কটু আশীর্বাদ করলেন তখন মনে হলো দ্বিতীয় শ্রেণীতে কোনো ভদ্রলোক যেতে পারে? জার্ভেশন করে ট্রেনে উঠে দেখি আমার সিটে অন্য যাত্রী বসে আছেন। তাঁরও একই নম্বর। ইসব অসুবিধে ইন্ধন যোগালো। দমদম থেকে বাগডোগরা পঁয়তাল্লিশ মিনিট, সেখান থেকে নিয়ে শিলিগুড়ি আধঘন্টা, শিলিগুড়ি থেকে স্টেটবাসে জলপাইগুড়ি এক ঘন্টা। সকাল টায় প্লেন ধরলে সাড়ে বারোটার মধ্যে বাড়িতে পৌঁছে যাই। ঠাট্টা করে বলি দমদম থেকে গডোগরায় আসতে যা সময় লাগে তার প্রায় ডাবল লাগে সেখান থেকে জলপাইগুড়িতে ৌছাতে। দার্জিলিং মেল কখন পৌঁছেছে ভাই? চার ঘন্টা লেট ছিল। শুনে স্বস্তি পাই।

এসব কথা লিখছি বলে পাঠক ভাবতেই পারেন লোকটার পয়সা হয়েছে বলে প্লেনে চড়ছে, গলায় শোনানোর কি আছে! আসলে প্লেনে চড়া, আরামে যাওয়া-আসা একটা নেশার তো। বিদেশে কয়েকবার গিয়ে সেটায় মজে গেছি। হ্যাঁ, পয়সা না থাকলে অবশ্যই পারতাম , আর দিন দিন যা ভাড়া বাড়ছে কদিন পারবো জানি না। যখন পারবো না তখন বাড়ি থেকে ব হব না। কিন্তু পাঠকদের একটি অভিজ্ঞতা নিবেদন করি।

বছর দশেক আগে গাড়ি কেনার পর লক্ষ্য করলাম রাস্তার তাবৎ মানুষ আমার ওপর রক্ত। গাড়ি কিনেছেন বলে মাথা কিনে নেননি! অতো হর্ন বাজানোর কি আছে, আস্তে যেতে রেন না ইত্যাদি সংলাপ শুনতে হতো। গাড়ির সামনে কেউ বা কারা হেঁটে গেলে হর্ন জালেও পথ ছাড়তো না। গাড়িতে উঠে বুঝতে পারলাম এই কলকাতার পথচারীরা আইনের নো তোয়াক্কা করেন না। তাঁরা যাঁর যেমন খুশি হাঁটবেন, ড্রাইভার সেটা দেখে গাড়ি লাবেন। তা একবার চারটি ছেলে আমাকে ঘিরে ধরলো, 'আপনি এত হর্ন দিচ্ছেন, রাস্তাটা আপনার বাবার? মানুষ হাঁটতে পারবে না?' ইত্যাদি ইত্যাদি। মুখ বুঁজে চলে এলাম। ক'দিন দেখি ওদের তিনজন বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে, বোধহয় অনেকক্ষণ বাস আসেনি বলে পেজে বেশ ভিড়। আমি গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তারা কোথায় যাবে? ধর্মতলা শুনে ঠে পড়তে বললাম। তারা আমায় চিনতে পারেনি। গাড়িতে উঠে খুব ধন্যবাদ জানাল তারা। ট বাদেই হাতিবাগানের মোড়ের ওপর জনতা দেখে আমি হর্ন দিলাম। কেউ শুনতে পাচ্ছে । আমি একটু একটু করে এগোতে চেষ্টা করছি। হঠাৎ শুনি দু'জন দুই জানলা দিয়ে মুখ বের রে চেঁচাচ্ছে, 'এই যে দাদারা, আপনারা কি কানের মাথা খেয়েছেন, সরে যান। রাস্তা গাড়ির ন্য, একটু ছোঁয়া লাগলে তো গালাগাল দেবেন। কবে যে আপনারা ডিসিপ্লিন শিখবেন!' হাসি পেয়েছিল। ওদের কিছু বলিনি। এই হলাম আমরা।

বছর তিনেক আগে বেলা দুটোর সময় জানতে পারলাম আমাকে আজই জলপাইগুড়িতে

যেতে হবে। আগামীকাল সকাল এগারটার মধ্যে একটা জরুরী মিটিং আছে। আজকের প্লে
চলে গিয়েছে। দার্জিলিং মেল লেট না করলে ওই সময়ের মধ্যে পৌছে যাব। বাধ্য হয়ে শিয়াল
স্টেশনে গেলাম। সেকেন্ড ক্লাস বা এ সি টু টায়ারে কোনো টিকিট নেই। ফার্স্টক্লাসেরও অব
তথৈবচ। টি টি বললেন, 'এ সি ফার্স্টক্লাসে যাবেন ? একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

প্রায় প্লেনের সমান ভাড়া তবু রাজী হলাম। তিনিই টিকিট কেটে দিলেন। সুন্দর ছিমছ
খুপরিতে ঢুকতেই দেখলাম একপাশের বার্থে খুব শীর্ণ এক প্রৌঢ় শুয়ে আছেন। তাঁর বুক পর
কম্বল টানা। ভদ্রলোকের মাথার পাশে বেশ স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী মধ্যবয়স্কা এক মহিলা
আছেন। টি টি আমাকে পাশের বার্থটি বরাদ্দ করে দিয়ে চলে গেলেন। চতুর্থ বার্থটি এখন
খালি।

স্যুটকেস সিটের নিচে চালান করে জানলার পাশে বসলাম। মোটা কাচ, পর্দা থাকায় বি
দেখার উপায় নেই। শীততাপনিয়ন্ত্রিত কামরায় জানলার পাশে বসার সুখ পাওয়া যায় না।
আরামের জন্যে কিছু শৈশবীয় সুখ তো ছেড়ে দিতেই হয়।

'দরজাটা বন্ধ করে দেবেন ? বড্ড আজেবাজে লোক প্যাসেজ দিয়ে যায়।' অনুরোধ
বলার ধরনে কর্তৃত্ব আছে। দেখলাম সুন্দরীর মুখে বিরক্তি। উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিল
এখন এই চার দেওয়ালের পৃথিবীতে আমরা তিনজন।

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। আধা শোওয়া অবস্থায় জিজ্ঞাসা করে
'কতদূর ?'

'এন জে পি।'

'আমরা দার্জিলিং।'

'আচ্ছা।' একটু আবাক হলাম। ওই শরীর নিয়ে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কেউ পাহাড়ে
না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওখানেই থাকেন ?'

'না। বছরে দু'বার যাওয়া অভ্যেস। গেলবার যাওয়া হয়নি শরীরের জন্যে। আসলে
জায়গাটা আমার বেশ স্যুট করে। আমি বি আর মিত্র, এলগিন রোডের বিরাট ওষুধের দোক
আমার। পাশের বিউটি পার্লার আমার স্ত্রী চালান। আপনি ?'

'আমি সামান্য লেখালেখি করি।'

'কিরকম ?'

'এই গল্প-উপন্যাস--।'

'বাংলায় ?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'হ্যাঁ।'

বি আর মিত্র বললেন, 'আমার আবার ইংরেজি ছাড়া পড়ার হ্যাবিট তৈরি হয়নি। গর্ব ব
ব্যাপার নয় কিন্তু কি করবো, হয়নি।'

মিসেস মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নামটা—।'

বললাম। লক্ষ্য করলাম তাঁর মুখে কোনো ভাবান্তর হলো না। অর্থাৎ তিনিও কোনো
রাখেন বলে মনে হলো না।

ট্রেন চলছিল। দেখলাম মিসেস মিত্র খুব যত্ন করছেন স্বামীকে। একসময় জিজ্ঞাসা রলাম, 'আপনার অসুস্থতা কি ধরনের ?'

'পড়ে গিয়ে মেরুদণ্ডে চোট লাগে। হাঁটার ক্ষমতা চলে গেলো। ভারতবর্ষের কোনো টমেন্ট বাকি রাখিনি। তারপরই স্ট্রোক হলো। বাঁ দিকটা পড়ে গেছে। ফিজিওথেরাপি করে রে একটু সাড় এসেছে।' মিস্টার মিত্র বললেন।

মিসেস মিত্র বললেন, 'তুমি কিন্তু বেশি কথা বলছো !'

'অনেকদিন পর। দাও, এবার তেষ্টা পাচ্ছে।'

মিসেস মিত্র আমাকে আড়াল করে ব্যাগ খুললেন। গ্লাসে কিছু ঢালছেন। হুইস্কির গন্ধ নাকে ল। জল মিশিয়ে স্বামীর হাতে দিতেই তিনি বললেন, 'তুমি নিলে না ?'

'নাঃ।' মাথা নাড়লেন মিসেস মিত্র, 'খেতে অসুবিধে হবে না তো তোমার ?'

'না না। ওঁকে অফার কর।'

মিসেস মিত্র তাকালেন, 'মিস্টার মজুমদার, ডিনারের আগে উনি এক পেগ হুইস্কি খান াজ। অনেকদিনের অভ্যেস। ডাক্তারও নিষেধ করেননি। আপনি নেবেন ?'

'অনেক ধন্যবাদ। আমি হুইস্কি খাই না। তবে আপনি ইচ্ছে করলে নিতে পারেন।'

মিস্টার মিত্র বললেন, 'নাও। একা একা খাওয়া যায় না। ওষুধ মনে হয়।'

একটু মিথ্যে বললাম। সে-সময় মদে আমার তেমন আপত্তি ছিল না। মাঝে মাঝে পার্টিতে লে খাই। কিন্তু ট্রেনের কামরায় অকস্মাৎ অনিচ্ছা পেয়ে বসেছিল।

এবার মিসেস মিত্র নিজের গ্লাস ভরলেন। লক্ষ্য করলাম স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে গল্প রছেন। আমি একটা বই-এর পাতায় মন দিলাম। এক পাত্র শেষ হলে মিসেস মিত্র হটবক্স লে খাবার বের করে স্বামীকে খাইয়ে দিলেন। মুখ মুছিয়ে দিয়ে আমাকে বললেন, 'এক্সকিউজ , ওর পক্ষে তো টয়লেটে যাওয়া সম্ভব নয়—।'

আমি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভাবতে খুব ভাল লাগছিল মিসেস ত্রের মতো আধুনিকা তাঁর স্বামীকে এমন যত্নের সঙ্গে দার্জিলিং-এ বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন। র্থ এবং স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর মানবিক গুণগুলোকে ধ্বংস করতে পারেনি। অবশ্যই এর জন্যে তাঁকে ম স্বার্থত্যাগ করতে হচ্ছে না। ভাল না বাসলে এটা করা অসম্ভব।

যখন ভিতরে ফিরে এলাম তখন মিস্টার মিত্র ঘুমোচ্ছেন। দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে াকে শুইয়ে দিয়েছেন মিসেস মিত্র। রুগ্ন শরীর পরিশ্রমের ধকল আর সামলাতে পারেনি। সেস মিত্রের সামনে যে দ্বিতীয় মদের গ্লাস তা বুঝতে অসুবিধে হলো না। তবে তাঁর কানে খন গান শোনার যন্ত্র, চোখ বন্ধ।

বর্ধমান পেরিয়ে গেলে আমি খাবার বের করলাম। দোকান থেকে কেনা। মিসেস মিত্র াখ খুললেন, 'আমার কাছে বাড়ির খাবার অনেকটাই রয়েছে, আপত্তি না থাকলে—।'

'না না। এতে আমার অসুবিধে হবে না।'

কান থেকে যন্ত্র সরিয়ে মিসেস মিত্র বললেন, 'আপনার "সওয়ার" আমার ভাল লেগেছে।'

'সেকি ? আপনি আমার লেখা পড়েছেন ?'

'যারা দেশ পড়ে তারা তো পড়তে বাধ্য হয়। অবশ্য আমি "সওয়ার" অন্য পত্রিক পড়েছি। আপনি সত্যি ড্রিঙ্ক করেন না, না আজ করছেন না ?'

হেসে ফেললাম, 'কোনো কোনো দিন ইচ্ছে করে না, ধরে নিন আজ সেরকম দিন

'সত্যি কথাটা বলার জন্যে ধন্যবাদ।' উনি গ্লাস শেষ করে কানে যন্ত্র চাপালেন। সঙ্গে স জগৎ-সংসার বিস্মৃত হয়ে গেলেন। যন্ত্রে কি গান বাজছে তা আমার শোনার কোনো উপায় নেই খাওয়াদাওয়া শেষ করে শোওয়ার ব্যবস্থা করলাম। মিসেস মিত্র আবার কথা বললেন, 'আপ কি আলো না নিবালে ঘুমোতে পারেন না ?'

হেসে জবাব দিলাম, 'আপনার দরকার হলে আলো জ্বেলে রাখতে পারেন।'

'অনেক ধন্যবাদ। আমার একটু দেরি করে শোওয়া অভ্যেস।'

শুয়ে পড়লাম। চোখ বন্ধ করে ওই দম্পতির কথা ভাবছিলাম। ভদ্রলোকের মতো রু প্রায় অথর্ব স্বামীকে বয়ে এখানে ওখানে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন ভদ্রমহিলা, যিনি এখনও যথে সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী. অত্যন্ত গভীর প্রেম ছাড়া এমন হতে পারে না। কিন্তু সেই সঙ্গে এ বসে মদ্যপান এবং গান শোনা ঠিক মিলছে না. অতীতের দৃষ্টান্তগুলো থেকে এটা আলাদ এইসব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বুঝলাম ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। ঘড়ি দেখলাম, রাত তিনটে আলো জ্বলছে তখন। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পেলাম মিসেস মিত্র বন্ধ জানলায় মাথা রেখে ঘুমি আছেন বসে থাকা অবস্থাতেই। তাঁর সামনের ছোট্ট টেবিলে আধ-খাওয়া গ্লাস পড়ে রয়েছে মিস্টার মিত্র একই ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে। একবার ভাবলাম ভদ্রমহিলাকে ডেকে তুলে ওপরের বা শুতে বলি। কিন্তু সেটা উনি পছন্দ নাও করতে পারেন।

নিচে নেমে দরজা খুলে টয়লেটে গেলাম। ফিরতেই দেখলাম মিসেস মিত্র সোজা হ বসে আছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঘুমোবেন না ?'

'ঘুমিয়েছি।'

'ওভাবে বসে বসে কি ঘুম হয় ?'

'আমি তো এভাবে ঘুমোতেই অভ্যস্ত।'

'সেকি ? বাড়িতে খাটে শোন না ?'

'দিনের বেলায় ও যখন জেগে থাকে তখন সেই সুযোগ পাই।'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'আসলে ও খুব ভয় পায়। জেগে থাকলে কোনো প্রবলেম নেই। ওর মনে হয় ঘুমো ঘুমের মধ্যেই মরে যেতে পারে এবং ও টের পাবে না। তাই কিছুতেই ঘুমোতে চাইত না। আ মাথার পাশে বসে থাকলে শান্তি, ভরসা পায় বলে ঘুমোতে পারে।'

আমি হতবাক। নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা কতদিন সম্ভব ?'

উনি হাসলেন, 'প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হতো। দিনের বেলায় ঢুলতাম, শরীরে ব্যথা হ যেতো। ধীরে ধীরে শরীর বেশ মানিয়ে নিল ব্যবস্থাটার সঙ্গে। আজকাল আমার মনে হয় অনে ব্যাপারেই কি হবে কি হবে ভেবে আমরা বাড়াবাড়ি করি। কিন্তু ঘটনাটা যখন ঘটে যায় ত

দিব্যি মেনে নিই। আপনি শুয়ে পড়ুন।'

'আপনি কি জাস্ট একজন হাউসওয়াইফ ?'

'না। ও অসুস্থ হবার আগে থেকেই বিজনেস দেখা শুরু করেছি।'

'উনি একা পারতেন না ?'

'না। তাছাড়া বড্ড খরচের হাত ওর। আপনি শুয়ে পড়ুন।'

'নাঃ। আপনি বসে থাকবেন আর আমি ঘুমোবো এটা হয় না।'

উনি হাসলেন, 'আপনার সঙ্গে আমার এমন কোনো সম্পর্ক তৈরি হয়নি যে এভাবে বসে বসে রাত শেষ করবেন। আমি যখন ওর পাশে গতকাল জেগে বসেছিলাম তখন নিশ্চয়ই আপনি আপনার বাড়িতে ঘুমোচ্ছিলেন।'

'ঠিক কথা। কিন্তু আমার জাগতে ইচ্ছে করছে।'

'আপনি লেখক। আপনাকে বোঝাবো এমন ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু এটা এক ধরনের রোমান্টিকতা। খুব খারাপ অসুখ।'

'তাই ?'

'ঠিক। তা ছাড়া ও জেগে উঠে যদি দ্যাখে আপনিও আমার সঙ্গে রাত জাগছেন তাহলে, পুরুষমানুষের মন, কিছুই অনুমান করা যায় না।'

'এটা কি বললেন ? আমরা জানি মেয়েদের ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা সঠিক।'

'তর্ক শেষ হবে না।' উনি হাসলেন।

অতএব আবার শুয়ে পড়েছিলাম। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ট্রেন থামলে উনি যেভাবে হুইলচেয়ার আনিয়ে কুলিদের পিঠে চাপিয়ে মিস্টার মিত্রকে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে গেলেন তাতে ওঁর প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। যাওয়ার আগে ওঁরা যথেষ্ট ভদ্রতা করে বিদায় নিয়ে গেলেন, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে যোগাযোগের কথা একবারও বললেন না। এই দম্পতি ক্রমশ আমার মন থেকে মুছে গেল।

সেবারও নিউ জলপাইগুড়িতে নেমে এক ঘণ্টার দূরত্বে জলপাইগুড়ি যেতে আমাকে বেগ পেতে হয়েছিল। কোনো ট্রেন নেই। বাইরে বেরিয়ে বাস পাইনি। সেই শিলিগুড়ি শহরে অথবা জলপাইমোড়ে যেতে হবে রিকশা নিয়ে বাস পেতে গেলে। বাধ্য হয়ে ট্যাক্সি নিলাম। তিনশো টাকা খরচ করে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে বাড়ি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পকেটে অর্থ যদি না আসে তাহলে ভারতবর্ষের মানুষের আরাম পাওয়ার কোনো উপায় নেই। অল্প বয়সে যা ছিল অ্যাডভেঞ্চার, তা এখন হয়েছে দুঃস্বপ্ন। মাত্র ছশো কিলোমিটার পথ অথচ কি অবহেলায় তাকে দুর্গম করে রাখা হয়েছে। কিন্তু এও তো ঠিক, প্লেনে গেলে আমি মিত্রদম্পতিদের দেখতে পেতাম না।

বছরখানেক বাদে প্রকাশকের অফিস ঘুরে একটি চিঠি আমার কাছে এল। মিসেস মিত্রের লেখা। লিখেছেন আমার মতো ব্যস্ত মানুষের পক্ষে একরাত্রের ট্রেনের স্মৃতি মনে না থাকাটাই স্বাভাবিক। তবু যদি মনে পড়ে আর হাতে সময় থাকে তাহলে যদি একবার তাঁদের এল. [illegible]ন রোডের বাড়িতে যাই তাহলে সবাই খুশি হবেন। মিস্টার মিত্রের শরীর মাঝখানে খুব খারাপ হয়েছিল, এখন একটু ভাল।

স্বাভাবিক ভদ্র চিঠি। কিন্তু এটা লিখতে ওঁদের একবছর লেগে গেল। ওঁদের ঠিকানা আমি জানি না, জানা সম্ভব ছিল না, কিন্তু এভাবেই আমার কাছে চিঠি আসতে পারতো।

সত্যি বলতে কি, সেই রাত্রে ওঁদের সম্পর্কে যে আগ্রহ আমার হয়েছিল আজ তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। একজন অত্যন্ত অসুস্থ এবং ভীতু মানুষ যিনি প্রতি রাত্রে স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করে যাচ্ছেন বসিয়ে রেখে, তাঁর সম্পর্কে কৌতূহল কেন থাকবে! যাইনি। তাছাড়া কলকাতায় প্রতিটি দিন একটা না একটা ঝামেলায় কেটে যায়, সময়ও পাই না।

হঠাৎ এক সন্ধ্যে পার হওয়া সময়ে এলগিন রোড ধরে ফিরছিলাম, মনে পড়ল ঠিকানাটা। ড্রাইভারকে বললাম। সে গাড়ি দাঁড় করালো একটা নতুন মাল্টিস্টোরিড বাড়ির সামনে। অর্থবান মানুষের বাস সেখানে। নিচের বোর্ডেই নাম দেখা গেল। তিনতলায় আট নম্বর ফ্ল্যাটে থাকেন।

বেল টিপলাম। তৃতীয়বারে আলো জ্বলল, কীহোলে দেখা গেল সেটা। তারপর দরজা সামান্য খুলল, পাল্লা দুটো ছোট্ট চেনে আটকানো, 'কে?'

নাম বললাম।

'এক সেকেন্ড।' মিসেস মিত্রের গলা। দ্রুত চলে গেলেন।

ফিরে এলেনও তাড়াতাড়ি। দরজা খুলে বললেন, 'আসুন।'

'অসময়ে এসে বিরক্ত করলাম?'

'না। বসুন।' উনি কিরকম আড়ষ্ট। পরনে কালো জামা, কালো শাড়ি।

সুন্দর সাজানো বসার ঘর। তিন দিকে তিন ঘরে যাওয়ার দরজা। বসার পর বাঁ দিকে তাকাতেই ওপাশের ঘরে একটা ডাইনিং টেবিল দেখতে পেলাম। মনে হলো কেউ খাওয়া শেষ না করে উঠে গেছে।

'আপনি কি ডিনার করছিলেন?'

'অ্যাঁ?' ভদ্রমহিলা অন্যমনস্ক ছিলেন, বললেন, 'হ্যাঁ, ওই আর কি!'

'আপনি খাওয়া শেষ করুন।'

'নাঃ। আর ভাল লাগছে না।'

'মিস্টার মিত্র কোথায়? মানে, জেগে আছেন?'

'না। ও মারা গিয়েছে।'

আমি খুব দুঃখিত হলাম। বললাম সেকথা, 'সরি।'

'না। এটা তো হতোই। আপনি আমার একটা উপকার করবেন?'

'নিশ্চয়ই। বলুন।'

'কয়েকটা ফোন করবেন। আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। নাম্বারগুলো লিখে দিচ্ছি।' একটা কাগজে তিনটে নাম্বার লিখে আমাকে দিলেন মিসেস মিত্র।

'কি বলতে হবে?'

'এরা ওর আত্মীয়। স্বজন নয়। দেখা করতেও আসতো না। তবু ভদ্রতা করে জানানো দরকার। আমি হিন্দু সৎকার সমিতিকে ফোন করেছি। ওরা নটার সময় আসবে। এখন একঘন্টা সময় আছে।'

আমি কিছুই বুঝতে না পেরে তাকিয়ে ছিলাম। উনি আমার দিকে তাকালেন, 'আপনাকে বলা হয়নি, ও ঘণ্টাখানেক আগে মারা গিয়েছে।'

'মাই গড ! কোথায় ?'

'পাশের ঘরে। আপনি ফোনগুলো করে দিলে আমার দায় বাঁচে।'

ঠিক নটায় হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়ি এলো। তার আগে কয়েকজন আত্মীয়। যেভাবে কেউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ইজিচেয়ারে শুইয়ে স্বামীকে দার্জিলিং-এ নিয়ে গিয়েছিলেন, সেইভাবে মিসেস মিত্র স্ট্রেচারবাহকদের হাতে মিস্টার মিত্রকে তুলে দিলেন। মুখাগ্নি ইত্যাদির কাজ অনেক বছর বাদে আসা ভাইপো করবে, শ্মশানে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না মিসেস মিত্র।

সবাই বেরিয়ে গেলে আমার বিদায় নেবার পালা।

বললাম, 'আসি।'

'আসুন।'

'আপনি একা হয়ে গেলেন।'

'হ্যাঁ। না আসুন, ফোন করলে ভাল লাগবে।'

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?'

'বলুন।'

এত বছর ওঁর জন্যে প্রাণপাত করে এই সময়টায় এমন স্থির আছেন কি করে ?'

'ওটা করেছিলাম বলেই একসময় বিরক্তি এসেছিল। সেটা প্রকাশ করতে চাইনি বলে মনে মনে একা হয়ে গিয়েছিলাম। আজ ও চলে যাওয়ার পর নিজের কথা ভাবতে পারলাম। রাত্রে ঝামেলা বাড়লে খাওয়া হবে না বলে খেতেও বসেছিলাম। আপনি আসায় সেটায় বাধা পড়ল। মিস্টার মজুমদার, প্রেম বলুন, ভালবাসা বলুন, একতরফা দীর্ঘকাল বয়ে গেলে সব অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যায়।'

আমি বেরিয়ে এলাম। পেছনের দরজা বন্ধ হলো। আজ অনেক অনেক বছর পরে সেই রাত এলো যে রাতে বিছানায় পা ছড়িয়ে বালিশে মাথা রেখে মিসেস মিত্র ঘুমোতে পারবেন। পারবেন তো ?

দীপকবাবু প্রশ্নটা করতেই মিসেস রায় উঠে দাঁড়ালেন, 'কি আশ্চর্য ! এই তো এলেন।' ভদ্রমহিলা ভেতরে চলে গেলেন। দীপকবাবু গল্প জুড়লেন। বুঝলাম ভদ্রলোক কথা বলতে খুব ভালবাসেন। তিনি দার্জিলিং-এ আছেন পঁচিশ বছর। আগে জমি পাওয়া যেত, সস্তাও ছিল এখন সব পাল্টে যাচ্ছে। বিয়ে-থা করেননি, একা মানুষ, ব্যবসা থেকে যা পান তাতে সোনাদায় কিছু দাতব্য প্রতিষ্ঠান খুলতে পেরেছেন। আমি লিখি শুনে বললেন, চলে আসুন মশাই সোনাদায়। নির্জনতা কাকে বলে ঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন।

.সেদিন রাত আটটা পর্যন্ত আমাদের গল্প হলো। দীপকবাবুর কথায় মিসেস রায় খুব হাসছিলেন। লক্ষ্য করলাম সেই যে অরবিন্দ রায় ভেতরে গিয়েছেন আর ফিরে আসেননি। অথচ ওঁর অনুপস্থিতি নিয়ে এঁদের কোনো দুশ্চিন্তা নেই। আটটার সময় বললাম, 'এবার আমাকে উঠতে হয়।'

দীপকবাব্ বললেন, 'যাবেন ? ঠিক আছে, আলাপ করে ভাল লাগল।'

কুন্তলা রায় বললেন, 'রাত হয়েছে, একা যেতে পারবেন তো ?'

দীপকবাবু বললেন, 'ঠিক বলেছ। চল ওঁকে আমরা ছেড়ে আসি।'

আমার আপত্তিতে কান দিলেন না দীপকবাবু। দরজা বন্ধ করে কুন্তলা আমাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠলেন। লক্ষ্য করলাম, উনি অরবিন্দবাবুকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করলেন না। ওঁরা বসেছিলেন সামনে, আমি পেছনে। হোটেলের দরজায় নামিয়ে দিয়ে কুন্তলা বললেন, 'দার্জিলিং-এ যখনই আসবেন দেখা করবেন।'

বললাম, 'বেশ।'

দীপকবাবু বললেন, 'পরে তো রইল, এখন যে কদিন আছেন, রায়-বাড়িতে ঢুঁ মারবেন। রোজ সন্ধ্যেবেলায় আমি ওখানে আসি।'

'রোজ ?' না বলে পারলাম না।

'একা মানুষ মশাই, কুন্তলার হাতের রান্না খাওয়ার জন্যে সোনাদা কোন ছাড়, শিলিগুড়ি থেকে রোজ আসা যায়। আচ্ছা, গুড নাইট।' গাড়িটা চলে গেল।

রায় পরিবারে কোনো সমস্যা আছে কিনা সেটা ওঁদের নিজস্ব ব্যাপার। তা নিয়ে আমি কেন ভাবতে যাব ? তবু মনে হচ্ছিল দীপকবাবুর সঙ্গে কথা বলার সময় কুন্তলা দেবী অনেক স্বচ্ছন্দ ছিলেন যা অরবিন্দবাবুর বেলায় দেখিনি। পরিচয় করিয়ে দেবার সময় কুন্তলা দেবী কিন্তু বলেননি দীপকবাবুর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কি ?

সেবার বেশ ব্যস্ত থাকায় আর ওঁদের বাড়িতে যেতে পারিনি। এর পরের বার দার্জিলিং গিয়েছিলাম বছর তিনেক পরে। প্ল্যান্টার্স ক্লাবে উঠেছি। সময়টা ছিল জুনের প্রথম। দার্জিলিং-এ তখনও বর্ষা নামেনি। আমার এক চা-বাগানের মালিক বন্ধু এসেছিলেন দেখা করতে। হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম দীপকবাবুর কথা। কেমন আছেন ইত্যাদি। ব সহজেই চিনতে পারলেন। বললেন, 'খুব স্যাড ব্যাপার, ভদ্রলোক খুব অসুস্থ।'

'কি হয়েছে ?'

'মাঝরাতে সোনাদায় ফেরার সময় অ্যাকসিডেন্ট করেছিলেন। শিরদাঁড়ায় লেগেছিল

অনেক চেষ্টা করেও আর বিছানা থেকে নামতে পারেননি। ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছেন। তার ওপর শুনছি হার্ট-অ্যাটাক্ড হয়েছিল। চিনলে কি করে?'

বললাম, 'এক রাত্রের আলাপ। এখানকার এক ভদ্রলোক মিস্টার অরবিন্দ রায়ের বাড়িতে।'

মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সত্যি বলতে কি, সেবার আমার সঙ্গে দীপকবাবু অত ভাল ব্যবহার করা সত্ত্বেও তাঁকে মেনে নিতে পারিনি, পারিনি অরবিন্দবাবুর কথা ভেবে।

পরদিন বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে জলাপাহাড়ের দিকে গেলাম। সুন্দর বিকেল। ঠাণ্ডা অল্প। বাঁ দিকে পুরোটা ভ্যালি জুড়ে অদ্ভুত স্নিগ্ধতা। রায়বাড়ির গেট বন্ধ। ওটা খুলে ভেতরে ঢুকতেই দরজা খুলে গেল, 'আরে আপনি? কবে এলেন?'

'গতকাল। কেমন আছেন?'

'ভাল। কোথায় উঠেছেন?'

'প্ল্যান্টার্স ক্লাবে।'

'আসুন, আসুন।' সমাদর করে বসালেন কুন্তলা।

দেখলাম ঘরের আসবাব পাল্টেছে। আরও চিত্তাকর্ষক। জিজ্ঞাসা করলাম, 'রায়সাহেব কোথায়? বাড়ি ফেরেননি এখনও?'

'আর বলবেন না, ও খুব বিপাকে পড়েছে।'

'কি রকম?'

'ও এমনিতে বড্ড কুঁড়ে। বাজারটাজার পর্যন্ত করে না। অফিস আর বই নিয়ে পড়ে থাকে। তা সেই লোককে কোম্পানি দিল্লীতে পাঠিয়েছে একটা বিশেষ কাজ দিয়ে। যাওয়ার সময় এমন ভাব করছিল যে চাকরি ছেড়ে দিতে পারলে বেঁচে যায়। এত করে বলে দিলাম গিয়েই যেন ফোন করে কিন্তু খবর দেয়নি একটাও।'

'কদ্দিনের জন্যে?'

'দিন দশেক। চারদিন হয়ে গেল।' কুন্তলা উঠে দাঁড়ালেন, 'বসুন, চা আনি।'

'না, না। আমি চা খেয়ে বেরিয়েছি, ব্যস্ত হবেন না।'

'আপনার তো এখন লিখে বেশ নাম হয়েছে। 'উত্তরাধিকার' খুব ভাল লাগছে।'

'ধন্যবাদ।' আমি দীপকবাবুর প্রসঙ্গ তুলতে যাচ্ছিলাম, এই সময় গাড়ির শব্দ কানে এল। গাড়িটি থামলো গেটের গায়ে। কুন্তলা নিচু গলায় বললেন, 'আপনার সঙ্গে একজন দারুণ লোকের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।'

যে ভদ্রলোক এলেন তাঁকে পোশাকে পুরোদস্তুর সাহেব বলা যায়। কুন্তলা বললেন, 'আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। ইনি লেখক সমরেশ মজুমদার আর ইনি আমাদের পারিবারিক বন্ধু অসিতবরণ সোম। টি-প্ল্যান্টার।'

ভদ্রলোক হাত বাড়ালেন, 'গ্লাড টু মিট ইউ।'

আমি করমর্দন করতে বাধ্য হলাম। উনি বসলেন।

কুন্তলা বললেন, 'মিস্টার মজুমদার এর আগেও এ বাড়িতে এসেছেন।'

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন। আমার মনে হলো কুন্তলা যেন কৈফিয়ৎ দিলেন।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো। সেটা অবশ্য কুন্তলাই বেশি বললেন। ভদ্রলোকের চেহারা বে সৌম্য, কিন্তু একটু বেশি গম্ভীর। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিস্টার মজুমদার, আজ ডিনা করছেন কোথায় ?'

'ক্লাবেই।'

'তাহলে আপনাকে অনুরোধ করব আমার ওখানে ডিনার করতে। কুন্তলা, চল, আমর বেরিয়ে পড়ি।' ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন।

কুন্তলা বললেন, 'সেকি ! আমি যে রান্না করে রেখেছি। না, আজ বাইরে খাওয়া চল না। আপনিও এখানে খেয়ে যাবেন সমরেশবাবু।'

অসিতবরণ কাঁধ ঝাঁকালেন, 'ও কে ! দেন লেটস স্টার্ট ড্রিঙ্ক।'

কুন্তলা বললেন, 'বাঃ, উনি আপনার পথের পথিক কিনা জিজ্ঞাসা করুন।'

অসিতবরণ প্রশ্ন করলেন. 'আপনার আপত্তি আছে ?'

বললাম, 'আমি ঠিক অভ্যস্ত নই।'

অসিতবরণ মাথা নাড়লেন, 'কম্পানি দেবেন। দ্যাটস অল।'

ভদ্রলোক সম্পর্কে আমার আগ্রহ বাড়ছিল। অতএব রাজী হলাম। আমরা ভেতরের ঘ গেলাম। সেখানে বোতল গ্লাস সাজানো হলো। একটি নেপালি কাজের মেয়ে কিছু খাদ্যদ্র দিয়ে গেল। মেয়েটিকে এর আগের বার দেখিনি।

পান শুরু করতেই ভদ্রলোক বিদেশি মদ গ্লাসে ঢেলে কুন্তলার সামনে এগিয়ে দিলেন কুন্তলার মুখে সামান্য অস্বস্তি, কিন্তু সেটা দ্রুত কাটিয়ে উঠলেন। গল্প শুরু হলো। অসিতবর পান শুরু করার পরই অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। তাঁর মুখে অনেক রকম গল্প শোনা গেল। রা ন'টায় খাবার দিলেন কুন্তলা। তারপর ওঁরা জোর করেই আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। নামবা সময় কুন্তলা বললেন, 'দার্জিলিং-এ যখনই আসবেন দেখা করবেন।'

কথাটা এর আগের বারেও শুনেছি। খুব ধন্দে পড়ে গেলাম। কুন্তলার ভূমিকা কি দীপকবাবুর সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক দেখেছি, অসিতবরণ তো প্রায় সেই সম্পর্ক নিয়ে রয়েছেন আর এসব ব্যাপার ওঁর স্বামী অরবিন্দ রায় সহ্য করেন কি করে ? ঠিক করলাম সোনাদায় গি দীপকবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসব।

দার্জিলিং থেকে সোনাদা বেশি দূরের পথ নয়। শেয়ারের জিপে স্টেশনের সামনে নে খোঁজখবর করতে দীপকবাবুর হদিস পেতে বেশি দেরি হলো না। বাড়িটা ছোটখাটো, সুন্দর পাহাড়ি রাস্তার বাঁকেই বাড়ি। দরজা খুলল একজন নেপালি মহিলা। আমার উদ্দেশ্য জানাতে মহিলা বললেন, 'সাহেবের বেশি কথা বলা নিষেধ আছে। আপনার নাম বলুন, আমি ওঁ বলছি।'

নাম বললাম। মহিলা চলে গেলেন। এই বাড়িতে আর কেউ থাকে বলে মনে হচ্ছে না কোনো শব্দ নেই। এখান থেকে রোজ দীপকবাবু দার্জিলিং-এ যেতেন কুন্তলার হাতের রা খেতে। মহিলা ফিরে এসে যে ঘরে নিয়ে গেলেন তার খাটে শুয়ে আছেন যে ভদ্রলোক।

যে সেই রাত্রে দেখা দীপকবাবু তা না জানলে বিশ্বাস করতাম না। এত রোগা কোনো মানুষ হয়ে যায় জানতাম না। তিনটে বালিশ পিঠে রেখে কোনোমতে মাথা উঁচু করে আছেন। শরীর াদরে ঢাকা। আমাকে দেখে হাসলেন, 'কি সৌভাগ্য!' কণ্ঠস্বর জড়ানো। বললাম, 'গতকালই াপনার কথা জানলাম।'

কপালে হাত ছোঁয়ালেন ভদ্রলোক, 'মরেই যেতাম। কুন্তলা না থাকলে মরে যেতাম।'

চমকে উঠলাম। কথা বলতে পারলাম না কিছুক্ষণ।

দীপকবাবু বললেন, 'অ্যাকসিডেন্টের পর বুকের অসুখ। এই তো চেহারার হাল। কারও াঁচতে ইচ্ছে করে? কিন্তু কুন্তলা শীত গ্রীষ্ম বর্ষা উপেক্ষা করে রোজ দুপুরে আসে। আমাকে পরিষ্কার করিয়ে খাইয়ে ফিরে যায়। তখন মনে হয় আর একটা দিন বাঁচি। এই মহিলাকে ওই ঠিক করে দিয়েছে। আই অ্যাম রিয়েলি গ্রেটফুল টু হার।'

'তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন।' ওই তিনটে শব্দ কোনোমতে বললাম।

'দেখা যাক। কদ্দিন আছেন এবার?'

'আজই চলে যাব।'

এবার মহিলা বললেন, 'আর কথা বলবেন না। ম্যাডাম জানলে রাগ করবেন।'

নমস্কার করে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু সোনাদা থেকে চলে এলাম না। দীপকবাবুর বাড়িতে যেতে হলে স্টেশনের পাশের রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। দুপুর হতে বেশি দেরি নেই। কুন্তলা দার্জিলিং থেকে যেভাবেই আসুন তাঁকে এই পথ ধরতে হবে। ওঁর সঙ্গে কথা বলে যাওয়ার ইচ্ছে হলো। অথচ দুপুর দুটো বেজে যাওয়ার পরও আমি কুন্তলার দেখা পাইনি। দীপকবাবুর কথা অনুযায়ী এর অনেক আগেই কুন্তলার এসে যাওয়ার কথা। মনে হলো হয়তো অন্য কোনো পথ আছে, যা আমি জানি না, সেই পথেই কুন্তলা চলে গিয়েছেন। ফিরে এলাম।

বছর দুয়েক বাদে আবার দার্জিলিং-এ গিয়েছি। সেবার গাড়িতে। সোনাদা আসতেই ড্রাইভারকে বললাম বাঁ দিকে যেতে। দীপকবাবুর বাড়ির সামনে পৌঁছে দেখলাম বাচ্চরা হৈ চৈ করছে। একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করে জানলাম দীপকবাবু মারা গিয়েছেন বছর দেড়েক আগে। এঁরা দীপকবাবুর এই বাড়ি তাঁর উত্তরাধিকারিণীর কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন। উত্তরাধিকারিণী কে জানতে চাইলে ভদ্রলোক বললেন, 'দার্জিলিং-এ থাকেন ভদ্রমহিলা। মিসেস কুন্তলা রায়।'

মিসেস কুন্তলা রায় কি করে দীপক সেনের উত্তরাধিকারিণী হলেন তা নিয়ে ভেবে কোনো লাভ নেই। ভদ্রলোক মারা গিয়েছেন এবং মারা যাওয়ার আগে যে কৃতজ্ঞ ছিলেন কুন্তলার প্রতি তাও জানি। অতএব উইল করে যেতেই পারেন। কিন্তু অসিতবরণের কথা আমি ভুলতে ারছিলাম না।

এবার দার্জিলিং-এ এসেছি কিছুটা কাজ নিয়ে। একটা টি ভি সিরিয়ালের শুটিং-এর ব্যবস্থা করতে। সঙ্গে পরিচালক রয়েছেন। খুব ঘোরাঘুরি করতে হলো। ক্যাভেন্ডার রেস্টুরেন্টের ছাদে রোদ-ছাতার তলায় বসে কফি খেতে আমার খুব ভাল লাগে। পরিচালক গিয়েছেন পুলিশের নুমতি চাইতে। আমি একাই সেখানে বসেছিলাম। সেই ওপেন এয়ার রেস্টুরেন্টে ট্যুরিস্টরাই

রয়েছেন। হঠাৎ কানে এল, 'ওঃ, নো ডার্লিং, এখানে না।'

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম একটি সুপুরুষ যুবকের সঙ্গে কুন্তলা দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। ম
ফেরাতেই ওঁর নজর আমার ওপর পড়ল। প্রচণ্ড অবাক হলেন মহিলা। তারপর দ্রুত এগি
এলেন, 'আপনি এখানে ? আশ্চর্য ! দার্জিলিং-এ এসে আমার সঙ্গে দেখা করেননি ? কি অন্য
করেছি বলুন তো ?'

হেসে ফেললাম, 'এতগুলো প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে কি করে দেব ?'

'আমার চিঠি পেয়েছিলেন ?'

'না তো।'

'আপনার পাবলিশার্সের ঠিকানায় লিখেছিলাম। আপনি দীপককে দেখতে গিয়েছিলে
তাই ওর মৃত্যুসংবাদটা জানিয়েছিলাম।'

'ওঃ ! আপনি কেমন আছেন ?'

'আছি। আসছেন তো বাড়িতে ?'

'যাব। অরবিন্দবাবুর খবর কি ?'

'নতুন নতুন বই কিনছে আর পড়ছে।' কুন্তলা ইশারা করে যুবককে ডাকলেন, 'আল
করিয়ে দিচ্ছি। রজত দত্ত। তিনটে চায়ের বাগানের মালিক। বিদেশে ছিল। এখানে মন বসা
অসুবিধে হচ্ছে। রজত, ইনি একজন নামকরা লেখক।'

রজত সৌজন্য বিনিময় করে বলল, 'আমি খুব দুঃখিত, বাংলা উপন্যাস গল্প পড়ার অভ্যা
তৈরি করতে পারিনি। কুন্তলা যদি অভ্যেসটা করিয়ে দেয় তাহলে নিশ্চয়ই আপনার লেখা পড়
কিন্তু ডার্লিং, এখানে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। লেটস গো।'

স্পষ্ট বুঝলাম কুন্তলার মুখে অস্বস্তির ছায়া পড়ল এবং সরেও গেল। আবার আমাকে ওদে
বাড়িতে যাওয়ার অনুরোধ করে তিনি চলে গেলেন সেই যুবকের সঙ্গে। আর আমার মনে পড়
অসিতবরণের কথা। তিনি এখন কোথায় ?

সেই সন্ধ্যেবেলায় আমার প্ল্যান্টার বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মারতে মারতে জানতে পারল
অসিতবরণ এখন কলকাতার উডল্যান্ড নার্সিংহোমে আছেন। অতিরিক্ত মদ্যপানে তাঁর লিভ
শেষ অবস্থায় পৌঁছেছে। ভদ্রলোকের বিশাল সম্পত্তি, চা বাগানগুলোর দায়িত্ব নেবার জ
একমাত্র তাঁর বোনের ছেলে রজত দত্ত ছাড়া আর কেউ ছিল না। রজত আমেরিকায় থাকত
এখন ওই সুবাদে দার্জিলিং-এ। কিন্তু লোকটা চায়ের ব্যবসা বোঝে না, মনও নেই বোঝা
তার চেয়ে মহিলাদের সম্পর্কে আগ্রহ অনেক বেশি।

আর ইচ্ছে হলো না কুন্তলার সঙ্গে দেখা করতে।

এর পর দার্জিলিং-এ গিয়েছিলাম বছর তিনেক আগে। কি মনে হতে বিকেলবেলায় হাঁট
হাঁটতে সোজা ওদের বাড়িতে। দরজা খুললেন অরবিন্দ রায়। বেশ বুড়িয়ে গেছেন ভদ্রলো
প্রথমে চিনতেই পারছিলেন না। পরিচয় জানার পর হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমি শেষ হ
গেছি সমরেশবাবু।'

মনে মনে বললাম, শেষ আপনি অনেককাল আগে হয়েছেন, টের পাননি অন্ধ হয়ে ছিল

বলে। অরবিন্দবাবু বললেন, 'দাঁত থাকতে আমি দাঁতের মর্ম বুঝিনি। সংসারের কোনো ঝক্কি আমি নিতে চাইনি, সব ও সামলেছিল। ওর কোনো সাধ-আহ্লাদ আমি মেটাতে পারিনি। এখন অনুশোচনায় জ্বলে পুড়ে মরছি।'

'কুন্তলা— ?'

'নেই। ক্যানসার ধরা পড়ার মাত্র ছ'মাসের মধ্যে চলে গেল সে। অনেক পুণ্য করেছিল বলে বেশি যন্ত্রণা পায়নি। ও চলে গেলে আমার চোখ ফুটল। ওর জন্যে সারাজীবন আমি কিছু করিনি। অথচ ও আমার জন্যে বিস্তর করে গেছে। ওঃ।'

ফিরে এলাম। মনটা ভারি হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মনে হলো আমি কয়েক বছর আগে উডল্যান্ড নার্সিংহোমে গিয়ে অসিতবরণের সঙ্গে দেখা করলে উনি অবশ্যই কুন্তলার প্রশংসা করতেন, যেমন দীপকবাবু করেছিলেন।

মেয়েরা কেমন হয় ঈশ্বরও জানেন না বলে প্রবাদ আছে, মেয়েরা যেমন হয় তা জানার পর বিস্ময় থৈ পায় না। কুন্তলাকে আমি বুঝতে পারিনি। আর এখন কেউ আমাকে কুন্তলা সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চাইলে আমি কি নিন্দে করতে পারব ? একটুও না।

॥ ১০ ॥

বছর পাঁচেক আগে এক রবিবারের সকালে আমার একতলার বসার ঘরে যে মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছিল তাকে দেখেই মনে হয়েছিল সাহায্য চাইতে এসেছে। গায়ের রঙ ময়লা, বেশ রোগা, লম্বা, পরনের শাড়ি অতি সাধারণ, জামা সম্ভবত ফুটপাত থেকেই কেনা। পায়ের দিকে তাকালাম। মানুষের আর্থিক অবস্থা তার জুতো এবং চটি থেকে খানিকটা বোঝা যায়। সে-দুটির অবস্থা বেশ করুণ। ঘরে দুজন অতিথি ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি চাই ?'

মেয়েটি, ওর বয়স তখন বছর বাইশেক হবে, কথা বলতেও লজ্জা পাচ্ছিল। মুখ নামিয়ে কিভাবে বলবে তাই হয়তো ভেবে পাচ্ছিল না। উটকো মেয়ে অর্থ সাহায্য চাইলে আমি বিব্রত হব জেনেও প্রশ্ন করলাম, 'কিছু দরকার আছে ?'

মেয়েটি তার ব্যাগ খুলল, একটা ভাঁজ করা কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দয়া করে যদি পড়েন— !'

'কি এটা ?'

'গল্প।'

'তুমি গল্প লেখো ?'

'চেষ্টা করছি।'

এ ধরনের অনুরোধ প্রায়ই আসে। বললাম, 'দিন সাতেক বাদে খোঁজ নিও।' সে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে চলে গেল। যাওয়ার ভঙ্গীতে মনে হলো যেতে পেরে বেঁচে গেল।

অতিথিরা চলে যেতে গল্পটি পড়ার চেষ্টা করলাম। হাতের লেখা খারাপ নয়। কিন্তু বড্ড বানান ভুল। আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। দেড় পাতা পড়ার পর মনে হলো কিস্যু হয়নি, কখনও হবে না।

সাতদিন বাদে মেয়েটি এল। সেদিন একা ছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কতদূর পড়াশুনা ?' সে এসে বসেছিল খানিকটা দূরে, তক্তপোশের ওপর।

'স্কুল ফাইন্যাল!'

'বাংলা বানান ভুল লিখলে তার আর যাই হোক গল্প লেখা হবে না।' খুব রূঢ় হয়ে কথা বলতে গিয়ে সামলে নিলাম। মেয়েটার চোখ দুটো অদ্ভুত। এমন করুণ চাহনি আমি কখনও দেখিনি।

'খুব ভুল আছে ?'

'খু-উ-ব। কদিন ধরে লিখছ ?'

'একবছর। আপনি পুরোটা পড়েননি, না ?'

'পড়তে পারিনি। আচ্ছা, তুমি আমার কাছে লেখা নিয়ে এলে কেন ? আমি তো কোনো কাগজের সম্পাদক নই যে তোমার লেখা ছেপে দিতে পারব।'

মেয়েটি মাথা নামাল, 'আপনি সাতকাহন লিখেছেন—।'

'তো ?'

'তাই আসতে ভরসা পেলাম।'

'কোথায় থাক তুমি ?'

'ভাটপাড়া।'

'আরে ব্বাস! অতদূর থেকে তুমি রোজ কলকাতায় আসো ?'

'রোজ আসি না। তবে ভাটপাড়া তো এমন কিছু দূর নয়, কত লেখক রোজ আসে।'

'কি কর তুমি ?'

'টিউশুনি করি।'

'সর্বনাশ!' হেসে ফেলি, 'বাচ্চাদের ভুল বানান শেখাচ্ছো না তো ?'

সে কথা খুঁজে পেল না, 'আমি বানানগুলো ঠিক করে দেব ?'

'না। আবার যদি গল্প লেখো তাহলে ঠিকঠাক করে নিয়ে এসো।'

ভেবেছিলাম মেয়েটি আর আসবে না। কিন্তু সাতদিনের মাথায় এলো। এবার বানান ভুল নেই। ট্রেনের একটি হকারকে নিয়ে গল্প লিখেছে। সেই হকারের দুঃখ-বেদনার গল্প। অনেকটা প্রভাবতীদেবী সরস্বতী, নিরুপমা দেবীদের আদলে। মাঝে মাঝে লেখিকা বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন কোন লেখকের বই পড়েছ ?'

'বেশি পড়িনি। শুধু নবকল্লোল পড়ি। আর হঠাৎ আপনার সাতকাহন পেয়েছিলাম বলে পড়েছি।'

'আচ্ছা, এত কিছু থাকতে তোমার গল্প লেখার সাধ কেন হলো ?'

সে মাথা নিচু করল।

'তুমি ছবি আঁকতে পারতে। আরও অন্যকিছু—। চাকরি খুঁজতে পারতে।'

'আমি অনেক জায়গায় আবেদন করেছি, ডাক পাইনি। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে কার্ড আছে। একটাও ইন্টারভিউ আসেনি।'

'তাই ভাবলে গল্প লিখে রোজগার করবে ?'

'না-না—।'

'তাহলে ?'

'লিখলে মন হালকা হয়, তাই।'

'একটা হকারের কথা লিখে তোমার মন হালকা হয়েছে ?'

'না, তা ঠিক নয়।'

'তোমার মনে খুব বোঝা আছে নাকি ?'

সে মুখ নামাল।

'কাউকে ভালোটালো বেসেছিলে ?'

সে দ্রুত ঘাড় নাড়ল, 'না।'

'তাহলে হালকা করার কথা উঠছে কেন ?'

এবার দেখলাম ওর চোখ উপচে জল। দ্রুত আঁচল চাপা দিল মুখে। আমি এমনটা হবে ভাবিনি। একটি অল্পবয়সী মেয়ে আমার সামনে বসে কাঁদছে, দৃশ্যটি মোটেই সুখকর নয়। অনেক সান্ত্বনা এবং কিছুটা উৎসাহ দিয়ে বিদায় করলাম।

কিন্তু মেয়েটি আবার এল নতুন গল্প নিয়ে। লক্ষ্য করলাম লেখার ভঙ্গীতে একটু উন্নতি হয়েছে। এবারও পাড়ার এক বউদিকে নিয়ে গল্প। বললাম, 'শোন, এবার যদি লিখতে হয় তাহলে নিজেকে নিয়ে লিখবে। নিজের কথা।'

'নিজের কথা ?'

'হ্যাঁ।'

'যা সত্যি সব ?'

'তুমি যত অকপট হবে তত তোমার লেখা পাঠকদের ভাল লাগবে।'

সে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল, 'এই গল্পটা ছাপা যায় না ?'

'কোথায় ?'

'নবকল্লোলে ?'

'গিয়ে জমা দিয়ে এসো। দ্যাখো, ওঁরা কি বলেন!'

'আপনি যদি নবকল্লোলে থাকতেন তাহলে এটা ছাপতেন ?'

মাথা নাড়লাম, 'না। তবে অন্য কেউ কি করবেন জানি না।'

'তাহলে দেব না।'

'তোমার বাড়িতে কে কে আছেন ?'

'সবাই। মা-বাবা-কাকিমা, আমার বোন।'

'বোন কি করে?'

'বি. এ. পাশ করেছিল। এখন বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে—।'

'বোনের বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে, তোমার আগে?'

মেয়েটি মাথা নামাল, 'আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।'

'আচ্ছা! তিনি কি বাইরে আছেন?'

'না। দেশের বাড়িতে।'

'দেশ কোথায়?'

'ডায়মণ্ডহারবার লাইনে। গ্রামে বাড়ি। মুদির দোকান আছে, বড়সড়।'

'বাঃ। তা তুমি স্বামীর সঙ্গে না থেকে ভাটপাড়ায় আছো কেন?'

'ওখানে থাকা সম্ভব হয়নি।'

'কেন?'

'ওরা চান না বলে।' মেয়েটি উঠে দাঁড়াল, 'আমি নতুন গল্প নিয়ে সামনের রবিবা
আসব। আপনি থাকবেন?'

বুঝলাম মেয়েটি আর ওই প্রসঙ্গে যেতে চায় না। মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম।

এবার মেয়েটি আমার কাছে কৌতূহলের বিষয় হয়ে গেল। অল্প বয়সী, হোক না কা
এবং রোগা, কিন্তু ছিমছাম, চোখ দুটো ভারি ভাল, শ্বশুরবাড়িতে না থেকে বাপের বাড়ি
আছে। স্বামী নেয় না বলে একটা কথা চালু আছে এদেশে। কিন্তু নেব না বললে তো আ
ছেড়ে দেবে না, অবশ্য মেয়েটির যদি তেমন কোনো বড় দোষ থাকে তাহলে আলাদা কথ
তবে একটি স্কুল ফাইন্যাল পড়া মেয়ে যে স্বামীর সঙ্গে থাকতে পারছে না এবং নিজের ম
ভার কমাতে গল্প লিখছে, এই ব্যাপারটা বেশ অভিনব মনে হলো।

মেয়েটি আবার এল। সঙ্গে নতুন গল্প। এত ধৈর্য আমি কখনও দেখাইনি। যদি দেখত
মেয়েটির লেখার হাত ক্রমশ ভাল হচ্ছে তাহলে আলাদা কথা ছিল। ও প্রায় একই জায়গায় পা
খাচ্ছে। তবে এবারের লেখায় কোনো বানান ভুল নেই। ওর সামনে বসেই গল্পটি পড়লা

এ দেশের আর পাঁচটা অতি সাধারণ মেয়ের মতো গল্পের নায়িকার বিয়ে হয়েছিল যার স
তার বাবা-মা অন্যত্র থাকেন, সে থাকে তার পিসিমার সঙ্গে। গ্রামে বিশাল মুদির দোকান ছাড়া
গঞ্জে পিসিমার শ্বশুরবাড়ির সূত্রে পাওয়া জমিজমা রয়েছে। একমাত্র ভাইপো হিসেবে পাত্র স
পাবে। মেয়েটির বাবা-মা নিশ্চিত ভবিষ্যত বুঝে সম্বন্ধ পাকা করে মেয়ে দিয়েছিল। বিয়ে কর
এসে ছেলে ছিল গম্ভীর, তাই বাসর জমেনি। গল্পে লেখিকা এই বাসর প্রসঙ্গ অনেকটা লিখেছে
বিয়ের পর কালরাত্রিতেই শ্বশুর-শাশুড়ি যে এ বাড়ির লোক নয় তা বুঝে গেল মেয়েটি। পর
দুপুরে বউভাত শেষ করে তাঁরা ফিরে গেলেন নিজের বাড়িতে। পিসশাশুড়িই সব দেখাশো
করতে লাগলেন। ফুলশয্যার রাত্রে বাড়ি ফাঁকা। কাজকর্ম মিটে গেলে সে ঘরে ঢুকল। চাঁ
রাত ছিল। স্বামী এসে পাশে শুয়ে বলল, 'বড্ড ঘুম পাচ্ছে।' তার চোখে ঘুম আসছিল না।

রাতের কত রঙিন বর্ণনা সে শুনেছে বান্ধবীদের কাছে। হঠাৎ লক্ষ্য করল স্বামী উঠে যাচ্ছে পাশ থেকে, চুপিচুপি। মিনিট পনের চলে গেলে সে খানিকটা কৌতূহলেই ঘরের বাইরে এল। সুনসান উঠোন, ঘর-দোর। শুধু পাশের ঘরে শব্দ হচ্ছে। সে সেই ঘরের দরজায় হাত রাখতেই ওটা খুলে গেল। জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে ঘরে। এবং পিসিমার সঙ্গে স্বামীর শরীরের লড়াই সে অবশ চোখে দেখে চিৎকার করে উঠল পরক্ষণেই।

ছুটে ফিরে গিয়েছিল ঘরে। কি করবে বুঝে পাচ্ছিল না। হাউহাউ কান্না ছাড়া আর কিই-বা সে করতে পারত। মিনিট পনের বাদে পিসশাশুড়ি এল ঘরে, 'অ্যাই মেয়ে, চুপ কর। চেঁচালে গলা টিপে মেরে ফেলব। ফুলশয্যার রাত্রে বাড়ির বউ গলা ফাটিয়ে কাঁদলে এ বাড়ির সুনাম বাড়বে ?'

ভয়ে সে ককিয়ে উঠে থেমে গিয়েছিল।

পিসশাশুড়ি সামনে এসে দাঁড়াল, 'শোন মেয়ে, আজ যা দেখলি তা যেন কেউ না জানতে পারে। আমার যখন বারো বছর বয়স তখন বিয়ে হয়েছিল। সাড়ে বারোতেই বিধবা। আর তখন তোর স্বামীর বয়স দুই। আমার কোলেপিঠে মানুষ। আমি ছাড়া কারও সঙ্গে শুতো না। আমার যখন চব্বিশ তখন তার চোদ্দ। নিজের সঙ্গে অনেক লড়াই করেছি। বাকি জীবন কি নিয়ে থাকব ? পৃথিবীর সব মেয়ে স্বামীর কাছে যে আনন্দ পায় তা কখনই পাব না আমি। এ বাড়িতে বিধবার বিয়ে হয় না। যখন তোর স্বামী শিশু ছিল তখন থেকেই সে আমার শরীর না খুঁটে ঘুমোতে পারত না। বড় হয়েও ওই অভ্যাস যায়নি। তাই যখন সম্পর্কটা পাল্টে গেল তখন প্রতিজ্ঞা করলাম আর ওকে ছাড়ব না। সেও আমাকে ছাড়া কোনো মেয়ের কাছে যাবে না।'

মেয়েটি ককিয়ে উঠেছিল, 'তাহলে বিয়ে দিলেন কেন ?'

'না দিয়ে উপায় ছিল না। পাড়ার লোকজন, আত্মীয়স্বজন ফিসফিস করছিল। আমার শরীর দেখে চোখ টাটায় তাদের। মুখে না বললেও আমাদের সম্পর্কটাকে সন্দেহ করে। ওইসব মুখ চাপা দিতে নিজে দাঁড়িয়ে বিয়ে দিলাম। এখন সব মুখ বন্ধ। তোকেও এ বাড়িতে মুখ বন্ধ করে থাকতে হবে।' পিসশাশুড়ি চলে গিয়েছিল।

স্বামী ফিরে এসেছিল ভোর রাত্রে। সে অনেক মিনতি করেছিল। স্বামী শুধু বলেছিল, 'পেটভরে খাবে থাকবে, মেয়েছেলের এর চেয়ে বেশি কি চাই ?'

সে পারেনি। পালিয়ে এসেছিল ভাটপাড়ায়। প্রথম প্রথম কাউকেই বলতে পারেনি। শেষপর্যন্ত মাকে বলেছিল। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনি মা। দ্বিরাগমনের পর স্বামী এল নিতে। এসেছিল ভোরবেলায়। এসেই চলে যাবে। রাত কাটাবে না। মা কিছুতেই রাজী নন। তিনি জামাইকে রাত কাটাতে বলছেন। জামাই বলল, 'রইল আপনাদের মেয়ে, আমি চললাম।'

তারপর চিঠিপত্র : সবই বাবা লেখে। মেয়ের দোষ থাকলে ক্ষমা করে ফিরিয়ে নিতে। সে আপত্তি করলেও ওরা লেখে। বড় মেয়েকে স্বামী নেয় না প্রচারিত হয়ে গেলে ছোট মেয়েকে বিয়ে দিতে পারবেন না ওঁরা। হঠাৎ রাত দশটায় স্বামী এল। মা যত্ন করে খাইয়ে পাঠিয়ে দিল ঘরে। সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কখন ফিরে যাবে ?' স্বামী বলেছিল, 'ভোর ভোর।'

উত্তর শুনে বেরিয়ে গিয়েছিল সে। মা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কিরে ? চলে এলি ?'

সে জবাব দিয়েছিল, 'চোরের মতো রাত্রে এসে যে রাতেই ফিরে যাবে তার কথা গ্রামের কেউ জানতে পারবে না। তারপর আমার যদি কিছু হয়ে যায় কি জবাব দেবে ? কেউ কি বিশ্বাস করবে তোমার জামাই এসেছিল ? জামাই-এর পিসিমাই গাল ফুলিয়ে আমাকে নষ্ট মেয়েছে বলে গালাগাল দেবে।'

গল্প এখানে শেষ। গল্প হিসেবে বেশ ভাল জায়গায় শেষ করেছে মেয়েটি। বললাম, 'সামান্য ঠিকঠাক করলে ভাল লাগবে গল্পটা।'

'পড়লেন ?'

'না পড়ে বলছি নাকি ? তুমি তো পড়তে দেখলে।'

'আমি এই গল্প কাগজে পাঠাবো ?'

'নিশ্চয়ই। তবে একটু সংশোধন করে। বাসরের বর্ণনা কমাও।'

'পড়ে আর কিছু মনে হলো না ?'

আমি ওর দিকে তাকালাম, 'তারপর ?'

'বাবা সহজে হাল ছাড়তে চাননি। একদিন প্রায় জোর করে মা আর আমাকে নিয়ে ট্রেনে চেপে ওদের গ্রামে পৌঁছালেন। ওরা দরজা খুলল না। কথা বলতেই চাইল না। আমরা যখন ফিরে আসছি গ্রামের পঞ্চায়েতের লোকেরা আসার কারণ জেনে সাহায্য করতে চাইল। আমাদের নিয়ে আবার ওরা ফিরে গেল ওই বাড়িতে। এবারও যখন দরজা খুলছে না তখন ওদের গ্রামের লোকজন দরজা ভাঙল। আমার স্বামীর সঙ্গে মারপিট হলো। বুঝলাম স্বামীর ওপর ওদের রাগ ছিল। স্বামী দৌড়ে চলে গেল সামনে থেকে। পিসশাশুড়ি বাড়িতে ছিল না। পরে শুনেছি থানায় আমাদের বিরুদ্ধে ডায়েরি করেছে, লোকজন নিয়ে আমরা নাকি ওকে মারতে গিয়েছিলাম।'

'তারপর ?'

'আমার হাতে বা কপালে বিয়ের চিহ্ন রাখিনি। আমার কাছে ওই মানুষটার কোনো দাম নেই। আমার এখন একটা কাজ দরকার। টিউশনির টাকায় হাতখরচ চলে যায়। কলকাতা যাওয়া আসা, কাগজ কেনা চলে। কিন্তু আর কতদিন আমি বাবার ঘাড়ে পড়ে থাকব বলুন ?'

সে চলে গেল। মেয়েটির জন্যে কিছু একটা করার কথা যখন ভাবছি তখন সে আবার এল একটি পত্রিকা হাতে নিয়ে। মুখ উজ্জ্বল। তার গল্প ছাপা হয়েছে। তারা ওকে পঞ্চাশ টাকাও দিয়েছে। উৎসাহ দিলাম। বললাম, 'আরও লেখ।'

সে বলল, 'এই গল্পটা ওরা পড়বে। আমি পত্রিকায় দাগ দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

আমি কিছু বলিনি। সে ফিরে এল মাস দুয়েক বাদে। হেসে বলল, একটা ছোট কাগজে বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাজ পেয়েছে। যা যোগাড় করবে তার পনের পার্সেন্ট ও পাবে। এর মধ্যে কিছু যোগাড়ও করেছে।

বলতে চাইলাম, সাবধানে কাজ করতে। একজন স্বামীকে সে দেখেছে, কিন্তু বাইরে যে ওর স্বামীর মতো লোকের সংখ্যা অনেক।

বছরখানেক বাদে সে এল, 'সমরেশদা গল্প চাই। আমি পত্রিকা বের করছি।'

বললাম, 'সেকি ? একি পাগলামি করছ। কত খরচ, চালানো মুশকিল।'

বলল, 'আমার ছেলেমেয়ে থাকলে তাদের তো চালাতে হতো। হতো না?'

আমি আর জবাব দিইনি। গল্প দিয়েছিলাম। মফস্বল থেকে বেরুনো একটি সাধারণ পত্রিকা আমার সামনে। সাধারণ কিন্তু সর্বাঙ্গে অসাধারণের গৌরব ছড়ানো।

॥ ১১ ॥

একটা পুরনো গল্প বলি। পুরনো বলছি এই কারণে যাকে নিয়ে এই গল্প তাঁর কথা এর আগেও আমি লিখেছি। লেখার সময় যতটুকু জানতাম ততটুকু। এই সিরিজে ওঁর কথা না লেখা অন্যায় বলেই লিখছি।

চুরাশি সালে আমি প্রথমবার আমেরিকায় গিয়েছিলাম। কুইন্স-এ যে বাড়িতে থাকতাম তার মালিক আমেরিকায় বড় চাকরি করলেও আমারই মতো আড্ডাবাজ, নাটক সাহিত্য পত্রিকা করিয়ে টগবগে মানুষ। নাম মনোজ ভৌমিক। আমি যাওয়ায় মনোজ ছুটি নিয়েছিল। যে কদিন ওর বাড়িতে ছিলাম রুটিনটা ছিল এইরকম—আমরা ঘুম থেকে উঠতাম দুপুরে। চা খেতে খেতে খানিকটা গপ্পো। তারপর স্নান এবং ভাত খেতে বিকেল। তারপর আড্ডা। রাত আটটা নাগাদ আবার পেটে কিছু পুরে বেরিয়ে যেতাম। সারারাত ধরে নিউইয়র্কের পথে পথে গাড়ি নিয়ে টহল মারতাম। বাসনা ছিল রাতের জীবন দেখব। চুরাশি সালের নিউইয়র্কের রাত এখনকার মতো ভয়ঙ্কর ছিল না। তখন কালো মানুষেরা শান্ত ভদ্র ব্যবহার করত। যে কোনো কারণেই হোক এখন তারা রীতিমতো ভয়ঙ্কর হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যের পর ম্যানহাটনে হাঁটতে আর সাহস হয় না আজকাল।

অথচ তখন স্বচ্ছন্দে আমরা সারারাত এ বার থেকে ও বার, এই পাব থেকে ওই ক্লাব ঘুরে বেড়িয়েছি, বিশেষ বিশেষ রাস্তায় যে সব রাতের মহিলা অপেক্ষায় থাকে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওদেশে ওদের হুকার বলে। অনেক গল্প জড়ো হয়েছিল ওদের ঘিরে।

সেটা ছিল শুক্রবারের রাত। ওই রাতটার বিশেষত্ব হলো সারাদেশ জুড়ে শনি এবং রবিবার ছুটি। অতএব যা কিছু আনন্দ তা শুক্রবার রাত থেকেই ওরা উপভোগ করে। মনোজ গাড়ি থামাল যেখানে, তার উল্টো দিকে ক্লাবের নিওন সাইনে জ্বলছে নিভছে 'সিঙ্গলস ক্লাব' শব্দ দুটো। মনোজ বোঝালে যে সব নারী পুরুষ একদম একা, যাদের বন্ধুত্ব দরকার তারা এই রকম ক্লাবে এসে বন্ধু বা বান্ধবী খুঁজে পেতে পারে। যদি মতের মিল হয় তাহলে শুক্রবার রাত থেকে রবিবার একসঙ্গে থেকে যে যার বাড়িতে ফিরে যাবে। সেই থাকাটা পছন্দসই হলে আবার সামনের শুক্রবার দেখা করবে। অনেক ক্ষেত্রে এরা বিয়ে-থা করে সংসার করছে। এখানে যারা যায় তাদের সবাই হয় চাকরি করে নয় ব্যবসা। এইসব বলে মনোজ আমায় প্রবোধ দিল, 'আপনি

তো এদেশে একলাই। চলুন, আপনার ভাগ্যে কি আছে দেখি।'

জ্যাকেট এবং জুতো ছাড়া প্রবেশ নিষেধ। ভাগ্যে ও দুটো আমাদের ছিল। ভেতরে ঢুে দেখলাম বিরাট হলঘর। একদিকে বার-কাউন্টার। টেবিলে টেবিলে জোড়ায় জোড়ায় মে পুরুষ। মনোজ অনেক খুঁজল। কোনো মহিলা একা নেই। সে খুব আক্ষেপ করল, আমরা ব দেরি করে এসেছি। এর মধ্যেই ওরা সেট হয়ে গেছে। যাকগে একটা বিয়ার খেয়ে এখান থে চলুন।

আমেরিকার নিয়ম অনুযায়ী যেহেতু গাড়ি চালাচ্ছে তাই মনোজ কোনোরকম মদ তা বিয় হলেও, খায় না। সে কোক নিল, আমি বিয়ার। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমরা চুমুক দিচ্ছিলাম সামনে কাউন্টারের ওপাশে বারম্যান। হঠাৎ আমার নজরে পড়ল আমাদের দু হাত দূরে একজ মহিলা দাঁড়িয়ে বিয়ার খাচ্ছেন। পরনে জিনস এবং জ্যাকেট। চুল কাঁধের ওপর থোকা থোকা মুখ দেখতে পাচ্ছি না। মনোজকে ইশারা করে দেখালাম। মনোজ বলল, 'মনে হচ্ছে আপনা লাক ভাল। যাই শ্রীমুখ দেখে আসি।'

সে কোকের টিন হাতে নিয়ে যেন আকাশ দেখতে যাচ্ছে এমন মুখ করে এগিয়ে গে মহিলাকে পেছনে রেখে। তারপর ফিরে এল দর্শন করতে করতে। পাশে এসে বলল, 'ব্যা লাক, পিসিমা পিসিমা চেহারা।'

কয়েক সেকেন্ডও যায়নি মহিলা ঘুরে দাঁড়ালেন। স্পষ্ট ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি মনে করবেন না, পিসিমা পিসিমা চেহারার মানে কি?'

মনোজ আমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলেছিল। ওখানে কারও বাংলা বোঝার কথা নয় ভদ্রমহিলাকেও বাঙালি বলে মনে হচ্ছে না। অথচ পিসিমা শব্দটা স্বচ্ছন্দে উচ্চারণ করলেন

মনোজ তোতলালো,'আসলে পিসিমা, মানে, আমরা বাঙালিরা, একটু গম্ভীর প্রকৃতি মহিলা, মানে যার সঙ্গে রঙ্গরসিকতা করা যায় না—।' ও ইংরেজি শব্দ খুঁজে পাচ্ছিল না।

মহিলা ইংরেজিতে বললেন, 'কিন্তু পিসিমা তো কারও মেয়ে, কারও বোন, কারও ম কারও স্ত্রী যার সঙ্গে প্রেমট্রেম আছে। তাই না?'

মনোজ মাথা নাড়ল, 'তা ঠিক। তবু—!'

এবার মহিলা স্পষ্ট বাংলায় বললেন, 'তবু পিসিমাকে দূরের মানুষ মনে হয়, তাই না

আমরা দুজনেই একসাথে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, 'আপনি বাঙালি?'

মনোজ খুব লজ্জায় পড়েছিল। মহিলা হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'আমার নাম ফরিদা মজি এখানকার ইউনিভার্সিটিতে পড়াই। একশভাগ বাঙালি। বাংলাদেশে বাড়ি। আপনারা?'

মনোজ নিজের পরিচয় দিয়ে আমার পরিচয় জানাল।

সঙ্গে সঙ্গে ফরিদা আমার হাত ধরলেন, 'আরে ব্যস। আপনি 'উত্তরাধিকার' লিখেছেন

আমি সত্যি অবাক। এরকম চেহারার মহিলা যাকে সিঙ্গলস ক্লাবে পিসিমা বলে মনে হচ্ছি তিনি আমার লেখা পড়েছেন? কি রকমের ভাল লাগা মনে ছড়ালো আজ তার ব্যাখ্যা করা স নয়।

ফরিদা বললেন, 'এক কাজ করা যাক। আমার বাড়ি খুব কাছেই। আপনাদের যদি আপ

থাকে, চলুন ওখানে গিয়ে আড্ডা মারি।'

আমরা রাজী হয়ে গেলাম। গাড়িতে মিনিট দশেক লাগল। একটা আকাশছোঁয়া বাড়ি। ই প্রথম দেখলাম প্লাস্টিকের কার্ড ঢুকিয়ে মূল দরজা খোলা যায়। লিফটে অনেক ওপরে উঠে লাম। আবার কার্ড ঢুকিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খোলা হলো। বসার ঘর চমৎকার সাজানো। রপাশে বই-এর মেলা। ফরিদা আমার জন্যে হুইস্কি নিয়ে এলেন। নিজেও নিলেন। মনোজ থারীতি কোকে থাকল।

আমি বইগুলো দেখছিলাম। আরবি থেকে শুরু করে ইংরেজি, কি নেই। আমার ত্তরাধিকার' এবং 'বড় পাপ হে' দেখতে পেলাম। আর দেখলাম শামসুর রাহমানের গোটা শেক বই। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি শামসুর রাহমানের কবিতার ভক্ত ?'

'হ্যাঁ। আমি শামসুরের ভক্ত। আমরা বন্ধু। ও নিউইয়র্কে এলে আমার কাছে থাকে।'

শামসুর রাহমান বাংলাভাষার শ্রদ্ধেয় কবি। ঢাকার মানুষ হলেও আমার সঙ্গে ভাল লাপ। কিন্তু সেই মুহূর্তে ওঁকে একটু ঈর্ষা করেছিলাম। গল্প শুরু হলো। ফরিদা বেশ বড়সড় ্যাটে একাই থাকেন। পড়ানো ছাড়া কবিতা লেখেন। বাংলা এবং আরবিতে। ইংরেজিতে ক্ষতা তো আছেই। ওঁর কবিতার হাত যে ভাল তা বুঝতে দেরি হলো না। ভদ্রমহিলা চমৎকার ল্প করতে পারেন। নিজের সম্পর্কে যা বলেছিলাম তা ওঁর ভাষায় বলি। 'আমি মশাই একেবারে াঠ বাঙালি। আপনারা কাঠ বাঙাল বলেন, আমি বলি বাঙালি। ছেলেবেলায় মা-মাসি-ঠাকুমার াঁচল ধরে ঘুরে বেড়াতাম। উঠোনে একটা ডুমুর গাছ ছিল। তার তলায় দুপুরবেলায় বসে াকতাম পাহারা দিতে। ঠাকুমা আচার শুকোতে দিতেন তো। পুরুষমানুষ সম্পর্কে আগ্রহ ছিল । কিন্তু গল্পের বই পড়তাম। তিলোত্তমার থেকে অচলাকে খুব কাছের মানুষ বলে মনে হতো। া পড়াশুনায় একটু ভালই ছিলাম। পাশটাস করে গেলাম। বাবা বিয়ে দিলেন এক ছেলের ঙ্গে। সে নিয়ে এল বিলেতে। কিন্তু তার সঙ্গে আমার বনল না। বনল না বললাম, দোষ কার বশি তা নিয়ে তর্ক হবে তাই ব্যাখ্যা করছি না। পৃথিবীর সবচেয়ে কুখ্যাত খুনীও নিজের স্বপক্ষে কছু কথা বলে। তালাক হয়ে গেল। বিয়ে করলাম আবার। ইনি একজন ব্রিটিশ। খুব ভিজাত। আমি তখন আদবকায়দা শিখে গিয়েছি। বাংলায় কথা বলি না। তবে একা থাকলে ংলার কবিতা লিখি, পড়ি। সেই বিয়েও টিকলো না। চলে এলাম আমেরিকায়। কলেজে াকরি পেলাম। আবার বিয়ে হলো। তিন তিন বার। এবার অধ্যাপক। মাস্টারমশাই লোকটি ন্দ নয়। কিন্তু বউয়ের চেয়ে বই তাঁর বেশি প্রিয় হয়ে গেল। আমি যে একটা মানুষ তা তাঁর ানে নেই। শেষ পর্যন্ত এই বাঁধনও ছিঁড়লো। এখন একাই আছি। কলেজে পড়াই। লিখি আর ড়ি। মাসে একবার সিঙ্গলস ক্লাবে যাই। এই যেমন আজ গিয়েছিলাম।'

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কেন গিয়েছিলেন ?'

'দেখুন মশাই, আফটার অল আমি একজন মানুষ। পছন্দসই একটা পুরুষের দেখা পেলে ার সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে না কেন ? আচ্ছা, আপনারা তো বিবাহিত, একা নন। াপনারা কেন গিয়েছিলেন ওখানে ?'

মনোজ জবাব দিয়েছিল, 'স্রেফ কৌতূহলে। সমরেশকে একটু অভিজ্ঞ করতে।'

ফরিদা হাসল, 'খুব অন্যায়। ধরুন কোনো মেয়ে যে একা, তার ভাল লাগল আপনাদে
কাউকে। তখন কি তাকে বলতেন যে আপনারা বিবাহিত ?'

মনোজ বলেছিল, 'নিশ্চয়ই। হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে পালাতাম।'

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'ঢাকায় যান না।'

'যাই। গিয়ে সেই যে বাসায় ঢুকি আর বের হই না। একটা শীতলপাটি আছে। তা
ছেলেবেলায় ঠাকুমার পাশে আমি শুতাম। বুড়ি এখনও বেঁচে আছে। গেলে তাঁকে জড়িয়ে ধ
শুই যখন তখন যে আরাম হয় তার কোনো তুলনা নেই।'

'আপনার এই তিন বার বিয়ের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই ওঁদের মধ্যে ?'

'বাবা অসন্তুষ্ট। মা-ও। গেলে গম্ভীর হয়ে থাকেন। ঠাকুমা কিন্তু আমার ওপর রা
করেননি। বলেন, বাঙালি মেয়ে কি সাধ করে স্বামীর ঘর ভাঙে ? তাও তিন তিন বার ? নিশ্চয়
ও সহ্য করতে পারেনি। এই কথাটা একজন অশিক্ষিতা বৃদ্ধা বলেছেন ভাবা যায় ?'

প্রায় ভোর ভোর আমরা ফিরে এসেছিলাম। ফরিদার ব্যবহার, কথাবার্তায় আমরা দু'জ
মুগ্ধ। টেলিফোনে যোগাযোগ ছিল। আমার একার পক্ষে ফরিদার কাছে কুইন্স থেকে ম্যানহাটা
সে সময় যাওয়া সম্ভব ছিল না। এই নিয়ে ফরিদা ঠাট্টা করতেন টেলিফোনে। এর মধ্যে মনো
ওর বাড়িতে একটা পার্টি দিল। নিউইয়র্ক নিউজার্সির কিছু শিক্ষিত বাঙালিকে নেমন্তন্ন করল
সেই সঙ্গে ফরিদাকেও।

পার্টিতে যাঁরা এলেন তাঁদের বেশির ভাগই স্বামী-স্ত্রী। শুনতে পেলাম ফেরার সময়
গাড়ি চালাবেন কারণ স্বামী মদ্যপান করবেন। ফরিদা এলেন একাই। এসে হৈ চৈ শুরু করলে
লক্ষ্য করলাম ওঁর খোলামেলা কথাবার্তা, বিয়ার খাওয়া অন্য মহিলারা পছন্দ করছেন ন
পুরুষরা সেটা উপভোগ করলেও স্ত্রীদের জন্যে মুখ খুলছেন না। পার্টি শেষ হলো রাত বারোটা
পর। ফরিদার সঙ্গে গাড়ি নেই। টিউব এবং বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মনোজ অতিথিদের অনুরো
করল ওঁকে ম্যানহাটনে নামিয়ে দিয়ে যেতে। কিন্তু সবাই নাকি যে পথে বাড়ি ফিরছে সেই প
ম্যানহাটন পড়ে না।

ফরিদা বললো, 'আমি ফকির লোক, গাড়ি নাই। কি আর করি. রাতটা এখানে কাটি
ভোরবেলায় ফিরে যাব। ঠিক আছে ?'

মনোজ সম্মতি দিল। কিন্তু ওর স্ত্রী সেটা পছন্দ করছিলেন না। যদিও তাঁর পক্ষে অ
কিছু করা অসম্ভব ছিল। আমার শোওয়ার ঘর ফরিদাকে ছেড়ে দিলাম। সবাই চলে গে
মনোজের স্ত্রী তাঁর বেডরুমে চলে গেলে আমি আর মনোজ বসার ঘরে বসে আড্ডা মারছিলা
মনোজ কফি বানিয়ে নিয়ে এল। ঘরে গরম বলে আমরা গেঞ্জি আর পাজামা পরে ছিলাম। হ
ফরিদা বেরিয়ে এলেন। তাঁর পরনে পেটিকোট আর ব্লাউজ। এসে বললেন, 'বাঃ, আপন
কফি খেতে খেতে আড্ডা মারছেন আর আমি বাদ ?'

মনোজ বলল, 'আসুন। কিন্তু এ কি পোশাক আপনার ?'

ফরিদা বিরক্ত হলেন, 'কেন ? আপনারা যদি গেঞ্জি গায়ে বসে থাকতে পারেন তাহ
আমি ব্লাউজ গায়ে থাকতে পারব না কেন ? এর মধ্যে কোনো অশ্লীলতা কি আছে ?'

মনোজ বলল, 'তা নেই অবশ্য–

ফরিদা বললেন, 'আসলে দেখতে অভ্যস্ত নন। তাই না? আফ্রিকার গ্রামে যেসব আদিবাসী মেয়ে নগ্ন বুকে কাজ করে যায় তাদের দেখলে কিন্তু আপনাদের অশ্লীল মনে হয় না।'

হয়তো গলা শুনেই মনোজের স্ত্রী বেরিয়ে এসেছিলেন। ফরিদাকে এইভাবে দেখে তাঁর চোখ কপালে উঠেছিল। পেছন থেকে ইশারায় তিনি মনোজকে উঠে আসতে বলেছিলেন। বেচারা মনোজ। তবে আড্ডা বেশিক্ষণ জমেনি। ফরিদা জানিয়েছিলেন তাঁর ঘুম পাচ্ছে।

ভোরবেলায় চলে গিয়েছিলেন ফরিদা। যাওয়ার সময় বলেছিলেন, 'সুতির শাড়ি পরে এসেছিলাম তো, এটা পরে গতরাত্রে শুলে আজ বেরুতে পারতাম না। আমি আবার অন্যের ব্যবহার করা কাপড় একদম পরতে পারি না।'

সেবার আর ফরিদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়নি।

বছর দুয়েক পরে হঠাৎই তিনি হাজির আমার কলকাতার বাড়িতে। হৈ হৈ করে বললেন, 'এবার এখানে আছি একদিন। ঢাকায় যাচ্ছি। অনেক কবিতা লিখেছি। দিন, একটা সিগারেট দিন।'

কোনো বাঙালি মেয়ে সবার সামনে এভাবে যে সিগারেট চাইতে পারেন তা দর্শকরা কল্পনা করেনি। ফরিদা নির্বিকার।

নব্বই সালে আমেরিকায় গেলাম। গিয়েই ফরিদাকে ফোন করলাম। জানা গেল সেই ঠিকানায় তিনি নেই। তখন মনোজও পৃথিবীতে নেই। ফরিদার সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছিল না। হঠাৎ ফরিদাই আমাকে ফোন করলেন। আমি ছিলাম নিউজার্সির সিদ্ধার্থ দত্তের বাড়িতে। ওঁর গলা পেয়ে অবাক, 'আপনি কি করে জানলেন আমি এখানে?'

'নামকরা লোক এলে লোকে তো বলাবলি করেই। কেমন আছেন?'

'আছি। খুব খারাপ লাগছে মনোজের কথা ভাবলেই!'

'লোকটা কিরকম ফাঁকিবাজ বলুন তো। টুকুস করে চলে গেল।'

'আপনি এখন কোথায়? কি করছেন?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'আমি? চাকরিবাকরি ছেড়ে দিয়েছি। হাডসনের ধারে একটা ফ্ল্যাটে আছি। আমি আর এক ভদ্রলোক। তার প্রেমে ডুবে আছি। আসুন না।'

যেতে হলো। ভাবলাম আবার জীবন শুরু করেছেন ফরিদা। চতুর্থ বার?

হাডসনের ধারে প্রচণ্ড হাওয়া। খুঁজে পেতে দেরি হলো না। ফরিদা দরজা খুললেন। কিন্তু একি চেহারা হয়েছে তাঁর? এত রোগা কোনো মানুষ হতে পারে! পরনে পাজামা এবং ফতুয়া। গাল বসে গেছে। হাসলেন, 'আসুন।'

দুখানা ঘর। যে ঘরে বসলাম সেখানে বসার জায়গা পাওয়াই মুশকিল। সর্বত্র বই ছড়ানো। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কার প্রেমে ডুবে আছেন?'

উনি হাত ঘোরালেন। 'দেখুন না। লোকটা কিরকম জ্বালাচ্ছে।'

দেখলাম, বইগুলো রবীন্দ্রনাথের অথবা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত। তাহলে সেই লোকটা রবীন্দ্রনাথ? শুনলাম সব। কিছুদিন থেকেই তাঁর মনে হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথকে জানা দরকার। সেই

রবীন্দ্রনাথ যিনি আন্তর্জাতিক। ভাবা মাত্রই চাকরি ছেড়ে দেন। ম্যানহাটনের ফ্ল্যাট ছেড়ে এ
ছোট ফ্ল্যাটে চলে আসেন। বই কেনেন প্রচুর। এখন দিনরাত পড়া আর লেখা। প্রচুর সময়
দিলে একাজ হবে না। জমানো টাকা শেষ। বেকার ভাতায় চলছে। যা পান তাতে ফ্ল্যাটের ভা
মিটিয়ে দিন সাতেক মোটামুটি খাওয়াদাওয়া। বাকি তিন সপ্তাহ দুধ পাঁউরুটি, জল পাঁউরু
মদ সিগারেট ত্যাগ করতে হয়েছে টাকার জন্যে। এই কাজ শেষ করতে আরও মাস আটে
লাগবে। প্রায় না-খাওয়া আর প্রচুর পরিশ্রমের জন্যে ওজন কমছে শরীরের। কিন্তু মন ভ
উঠছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই প্রেম না হলে বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন হয়ে যেত।

আমি অবাক। বললেন, 'পাশের ঘরটা খালি। কেউ যদি ডিস্টার্ব না করে তাহলে ভা
দিতে পারি। তাতে কিছু খাবার কিনতে পারি।'

বললাম, 'তেমন লোকের খবর জানি না। তবে আমি আজ আপনাকে খাওয়াবো।'

'আজ ? অসম্ভব। আজই একটা চ্যাপ্টার শেষ করতে হবে। আপনি যদি বন্ধু ভাবেন গো
বিশেক টাকা দিয়ে যান, পরে কিছু খাবার আনিয়ে নেব।'

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'সিগারেটের প্যাকেট রাখব ?'

'না। আমি যে নেশায় আছি তার কাছে ওটা জোলো।'

'নেশা !'

'হ্যাঁ। রবীন্দ্রনাথের চেড়ে বড় নেশা বাঙালির আর কি হতে পারে।'

॥ ১২ ॥

একই বিষয় নিয়ে একনাগাড়ে লিখে যেতে যেমন বিরা
আসে, পড়তেও তাই। কিন্তু এই বিষয়টির আকর্ষণ আমা
কাছে আলাদা বলেই পাঠকের ওপর অত্যাচার চালিয়ে
যেতে পারছি। বেশ কিছুদিন ধরে পাঠিকারা চিঠি লিখছেন,
যাঁদের কথা লিখছি তাঁরা যে সবাই আধুনিকা, প্রাচীনাদের
সম্পর্কে কিছু লিখছি না কেন ? বুঝতে পারছি তাঁরা
কোনো কোনো সংখ্যায় চোখ বোলাতে পারেননি। প্রাচীনাদের
সম্পর্কে লিখতে গেলে, আমি যেমন দেখেছি, প্রায়ই একই
রকম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নিজেকে বঞ্চিত করে, যন্ত্রণা দিয়ে তাঁরা আশেপাশের
মানুষকে সুখী করার চেষ্টা করতেন। কেউ কেউ লিখেছেন রবীন্দ্রনাথেব অনেক সন্তান ছিল।
তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে কিরকম সম্পর্ক ছিল ? ঝগড়াঝাঁটি হতো না ? রাগ করে বাপের
বাড়ি চলে যাওয়ার কথা ভাবতেন না মহিলা ? অথবা তোমার হাতে পড়ে আমার জীবন শেষ
হয়ে গেল জাতীয় বাক্য কি একবারও বলেননি ?

কোনো বিবাহিত দম্পতি দীর্ঘকাল একসঙ্গে বাস করলে সংঘাতশূন্য মসৃণ জীবনযাপন করতে পারেন বলে আমার মনে হয় না। বিখ্যাত মানুষেরাও এর ব্যতিক্রম নন। তবে এখন মন সংঘাতগুলো প্রকাশ্যে চলে আসে সহজেই তখন সেই রীতি ছিল না। একান্নবর্তী পরিবারে দাম্পত্যকলহ পর্দার ওপারেই থেকে যেত। রবীন্দ্রনাথের মতো অভিজাত পরিবারে সেটা তো রুচিবহির্ভূত ছিল। তাছাড়া মৃণালিনী দেবীকে আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথের আলোয়। যদি ভুলে যাই বিশ্বকবির স্ত্রী নন, একজন নারী তিনি এবং তাঁর গল্প যদি একান্তে শুনতে পেতাম তাহলে নিশ্চয়ই অনেক অভিমান এবং অভিযোগের কথা জানতাম।

লক্ষ্য করবেন, কয়েকজন বিবাহিতা মহিলা একত্রিত হলে তাঁদের স্বামীদের প্রসঙ্গ উঠবেই। প্রতিটি মহিলাই দাবি করবেন তাঁর স্বামীর মতো বাস্তবজ্ঞানবর্জিত পুরুষ তিনি কখনও দ্যাখেননি। স্বামীদের সমালোচনা করতে থাকেন শতমুখে কিন্তু সেসব করার সময় ভাবখানা এমন থাকে যেন মা হাঁটি হাঁটি পা পা করা শিশুর দৌরাত্ম্য সামলাতে পারছেন না। এই যে সমালোচনার মধ্যেও স্নেহ স্নেহ ভাব তা দেখাতে মহিলারাই পারেন।

আমার এক বন্ধু ভাল কথা বলেছিল। দুটি নারীপুরুষের মধ্যে কিছু মিল থাকলে তাদের রাজযোটক বলা হয়। ধরা যাক, একজন মহিলার স্বভাব, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একজন পুরুষের হুবহু মিল, কার্বনকপি বলা চলে। এদের রাজযোটক বলা চলে। অতএব এদের বিবাহিত জীবন পরম সুখের হবে বলে আশা করা যায়। বন্ধু বলল, 'শান্তির হতে পারে কিন্তু কিছুতেই সুখের নয়। কারণ একজন আর একজনের কাছে নতুন কিছু পাবে না, যা পাবে তা তার আছে। ফলে একঘেয়েমি এসে যেতে বাধ্য। জীবনটা আলুনি হয়ে যাবে তাদের। আবার এমন দম্পতির দেখা পাওয়া যায় যাদের মধ্যে কোনো মিল নেই। এ চলে উত্তরে তো ও দক্ষিণে। তবু প্রেম আছে। কারণ তারা নিজেদের জগৎ থেকে বেরিয়ে একটি তৃতীয় ভুবন তৈরি করেছে যেখানে দুজনে ভাল থাকে। সেই তৃতীয় ভুবন প্রেম থেকে তৈরি। নিজেদের ভুবনে যখন ফিরে যায় তখন সংঘাত লাগে, দুঃখ পায়, দুঃখ দেয়, সেইটে নুনের কাজ করে, জীবনে স্বাদ আনে। যাঁরা জানেন তাঁরা বলতে পারবেন বন্ধুর এই বিশ্লেষণ সঠিক কিনা।

বছর পাঁচেক আগে অফিসে গিয়ে শুনলাম এক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন দেখা করবেন বলে। সাধারণত অভিনয় করতে ইচ্ছুক নবাগতরাই এই কাণ্ডটি করেন। প্রথম প্রথম উৎসাহ বোধ করতাম। শেষে আতঙ্কিত হতাম। তবু ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দিতে বললাম। ছিপছিপে সুদর্শন মধ্যতিরিশের একজন পুরুষ, হাতে হেলমেট নিয়ে ঘরে ঢুকে নমস্কার করলেন। গম্ভীর গলায় বললাম, 'বলুন?'

'আপনার দেখা পাব, এ আমাদের কি ভাগ্য!'

'কি ব্যাপার, বলুন?' জিজ্ঞাসা করলাম, 'অভিনয়?'

'হ্যাঁ। তবে আমি নই। আমার স্ত্রী। ওর বিশেষ ইচ্ছে সিরিয়ালে অভিনয় করে। বাড়িতে বসে থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে। বিয়ের আগে স্কুলে-কলেজে অভিনয় করত। শাপমোচনে শ্যামার পার্ট করেছে। ফর্সা, লম্বা, সুন্দরী বলতে কোনো বাধা নেই। মুশকিল হলো যে-সে জায়গায় নিয়ে যেতে তো পারি না, তাই আপনার কাছে এসেছি।'

এরকম প্রস্তাব নিয়ে সচরাচর কেউ আসেন না। সাধারণত বিবাহিতা গৃহবধূদের ক্ষে আমি একটু আপত্তি করি। তাঁরা স্বচ্ছন্দে শান্তিতে সংসার করুন, কি দরকার বাইরে বাড়ানোর ! বললাম, 'উনি সাঁতার জানেন ?'

'হ্যাঁ ! বিয়ের আগে রেগুলার হেদোয় সাঁতার কাটত !'

'সাইকেল দিলে চালাতে পারবেন ?'

'নিশ্চয়ই !'

আমি একটু অবাক হলাম। সাধারণত যারা অভিনয় করতে আসে তারা মনে করে কোনো ব্যাপারই নয়, চর্চা বা অভিজ্ঞতার কোনো দরকার নেই। তাদের যখন বলি সাঁতার অ সাইকেল চালানোর কথা, তখন না বলে। আমার কাছে ব্যাপারটা একই।

'আপনি ওঁর ছবি এনেছেন ?'

'আপনি যদি বলেন ওকে একঘণ্টার মধ্যে আনতে পারি।'

আনতে বললাম। ঠিক একঘণ্টার মধ্যে তিনি এলেন। মুখচোখ তাকানোয় অভিজ্ঞ ছাপ স্পষ্ট। ওঁরা দুজন আমার সামনে বসলেন। মহিলার শাড়ি পরার ধরনে আধুনিক ব্যাপ স্যাপার প্রকট। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার স্বামী বললেন অভিনয় করতে চান !'

'হ্যাঁ ওর ইচ্ছে, আমারও।'

'আপনার বাড়িতে কোনো অসুবিধে নেই ?'

'ও মা, আমরা তো দুজন, অসুবিধে কোথায় ?'

'দেখুন, ভোর সাতটায় আসতে হবে, কাজ শেষ হতে হতে বিকেল হয়ে যেতে পা রাত্রে শ্যুটিং থাকলে এগারোটা-বারোটা হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি থাকব। কোনো সমস্যা হবে না।'

ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার কাজকর্ম ?'

'পৈতৃক ব্যবসা আছে। রোজ যেতে হয় না।' হাসলেন তিনি।

বললাম, 'ঠিক আছে। ভেবে দেখি। আপনার সঙ্গে মানায় এমন কোনো চরিত্র পে জানিয়ে দেব। আপনাদের নাম ঠিকানা লিখে দিয়ে যান।'

ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, 'না, দাদা। আমি এখান থেকে উঠছি না।'

'তার মানে ?' আমি অবাক।

'আপনাকে কথা দিতে হবে আমাকে নিচ্ছেন।' আবদার ঝরে পড়ল গলায়।

'দেখুন, এই মুহূর্তে যে চরিত্রটি নতুন আসছে তাতে আপনাকে মানাবে না। পরে ভ চরিত্র পেলেই আপনাকে জানাব।'

স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন, 'মানাবে না বলছেন কেন ? কি ধরনের চরিত্র ?'

'একটু প্রোভোকেটিং, চলাফেরা, আমরা যাদের খারাপ মেয়ে বলি, তাই।'

মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কতক্ষণ দেখা যাবে ?'

'তিনটে সিন আছে। দুটো এপিসডে।'

স্বামী বললেন, 'খারাপ হলেও টিভিতে তো বেশি খারাপ দেখাতে পারবেন না। তা

চরিত্রের মুখে সংলাপ নেই ?'

'বাঃ। তা থাকবে না কেন ? এইসব মেয়েরা বোবা হয় না।'

'তাহলে কেন বলছেন ও পারবে না ?'

'একটু দক্ষ অভিনেত্রী না হলে এসব পার্ট ফোটানো মুশকিল। দর্শককে বিশ্বাস করাতে হবে হাঁটা তাকানো দিয়ে যে সে খারাপ। উনি বাড়ির বউ, যে জীবনযাপন করেন প্রথম দিকে সেরকম রোল পেলে সুবিধে হবে।'

ভদ্রমহিলা স্বামীর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসলেন। স্বামীর চোখে উৎসাহ। স্বামী বললেন, যাও তো, দাদাকে হাঁটাটা দেখিয়ে দাও।'

বলামাত্র ভদ্রমহিলা ঘরের এক কোণে চলে গেলেন। তারপর যে ভঙ্গিতে শরীর দুলিয়ে হাঁটলেন, আমার ক্যামেরাম্যান দেখলে চেঁচিয়ে বলতো, ওয়ান শট, ও কে !

'কি ? হয়নি ?' ভদ্রমহিলা চেয়ারে ফিরে এলেন।

হজম করতে অসুবিধে হচ্ছিল। বললাম, 'ঠিক আছে, তবে একটু ভেবে দেখি।'

এবার স্বামী বললেন, 'দাদা, আমরা আপনার ভাইবোনের মতো। আপনি যদি আমাদের না দ্যাখেন তাহলে ওর স্বপ্ন কখনও সার্থক হবে না। ওর স্বপ্ন আমারও স্বপ্ন।'

ওঁরা যদি আমার ভাইবোন হন তাহলে ওঁদের সম্পর্ক কি ?

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাদা, আপনি কোথায় থাকেন ?'

'শ্যামবাজারে।'

'ও, তাহলে তো খুব ভাল হলো। আমরা থাকি সার্কুলার রোডে। আমাদের বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দিন না, খুব অবাক হয়ে যাবেন।'

'অবাক হবো কেন ?'

'উঁহু, না, সেটা এখনই বলব না। কবে আসছেন ?'

'সে একদিন যাওয়া যাবে।'

স্বামী বললেন, 'না দাদা। আপনাকে কথা দিতে হবে। আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব। না হয় বাড়ি ফেরার সময় কিছুক্ষণ থেকে গেলেন।'

বললাম, 'খামোকা বাড়িতে যেতে বলছেন কেন ?'

'ওই যে, দাদা বলেছি আপনাকে।' স্বামী বললেন।

এবার রূঢ় কথাটা বললাম, 'দেখুন ভাই, আপনারা জোর করছেন বলে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু এই অভিনয় জগতে এলে সাংসারিক অসুবিধে হবেই। আপনাদের সুন্দর দাম্পত্য জীবনে ছায়া পড়বে তার। ভেবে দেখুন।'

স্ত্রী বললেন, 'অসম্ভব। আমাদের কী মিল তা আপনি জানেন না। আমি মিষ্টি ভালবাসি না, ও তাই। মুসুরি ডাল আর আলু-পোস্ত দুজনের ফেবারিট। ওর জামার রঙ আর আমার শাড়ির রঙ দেখুন এক। সন্ধ্যা মুখার্জীর গান ছাড়া আমাদের কারো গান ভাল লাগে না। বিয়ের পর আজ অবধি আমরা একরাতের জন্যেও আলাদা হইনি। আমাদের কখনও ভুল বোঝাবুঝি হবে না।'

স্বামী বললেন, 'সত্যি বলতে কি, আমরা সন্তান আনতে চাইনি, কারণ ও চায় না ওকে

ছাড়া আমি আর কাউকে ভালবাসি।'

স্ত্রী বললেন, 'নিজেরটাও বল।'

'হ্যাঁ। আমিও।' স্বামী হাসলেন।

এরকম অবস্থায় কথা দিতে হলো। তবে বলে রাখলাম, পরিচালক যদি রিহার্সাল দে
অপছন্দ করেন তাহলে আমার কিছু করার থাকবে না।

এর পর কয়েকদিন ধরে ফোন। স্বামীই ফোন করেন। কবে আমি ওঁদের বাড়িতে যা
আমার বোন নাকি আমাকে দেখতে অধীর হয়ে উঠেছেন। আমি এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। এই স
রিহার্সাল শুরু হতে ওঁদের খবর পাঠানো হলো। পরিচালককে পরিচয় করিয়ে দিলাম। রিহা
রুমে সাধারণত আমি যাই না। হঠাৎ দেখি স্বামী ফিরে আসছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হলে

স্বামী বললেন, 'পরিচালক বললেন কোনো দর্শক থাকতে পারবে না। আসলে আ
সামনে থাকলে ও বেশ উৎসাহ পায়।'

একটু পরে পরিচালক এল। বলল, 'দাদা, এতো নার্ভাস মেয়েকে দিয়ে তো চলবে ন
চেহারাপত্তর ঠিক আছে। কিন্তু জড়তা কাটছে না।'

কি মনে হতে বললাম, 'আর একবার রিহার্সাল দাও। আর তখন এই ভদ্রলোককে স
থাকতে দিও। ইনি মহিলার স্বামী।'

পরিচালক অবাক হলো, কিন্তু আপত্তি করলো না।

রিহার্সালের পর বেরিয়ে এসে আলাদা ডেকে পরিচালক বলল, 'কি ব্যাপার বলুন তো
তাজ্জব ব্যাপার! এবার মহিলা একদম পাল্টে গেলেন। কি স্বচ্ছন্দ অভিনয়, একটুও জড়
নেই। জীবনে এত অল্প সময়ে কাউকে উন্নতি করতে দেখিনি।'

রিহার্সাল শেষ হতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় দে
ওঁরা দাঁড়িয়ে আছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার?'

স্বামী বললেন, 'স্কুটারটা গোলমাল করছে বলে গ্যারেজে দিয়েছি। ট্যাক্সির জন্যে দাঁড়ি
আছি। আজ আমরা খুব খুশি।'

'বাড়িতে যাবেন তো?'

'হ্যাঁ, দাদা।'

'আমি তো সার্কুলার রোড দিয়েই যাব শ্যামবাজার। আসতে পারেন।'

ওঁরা খুব খুশি হয়ে গাড়িতে উঠলেন। এবার মেয়েটি বললেন, 'দাদা, আমি তো পাস ক
গেছি। এখন আমাদের বাড়িতে যেতে নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি হবে না?'

বললাম, 'ঠিক আছে, আর একদিন হবে।'

কিন্তু ওঁরা দুজনে মিলে এমন আরম্ভ করলেন যে না বলতে পারলাম না শেষপর্য
সার্কুলার রোডের এক ফ্ল্যাট বাড়ির তিনতলায় ওঁরা থাকেন। বেশ সাজানো-গোছানো ফ্লা
বসার ঘরে স্বামী-স্ত্রীর বিশাল বাঁধানো ছবি। কিন্তু এত ঘনিষ্ঠ অবস্থার ছবি আমি কোথাও কাউ
টাঙাতে দেখিনি। সেই সাগরিকা ছবির শেষ দৃশ্য মনে করিয়ে দেয়।

বসার পর জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিসে অবাক হবো বলছিলেন সেদিন?'

'আগে বলুন আমাদের আর আপনি বলবেন না দাদা।' স্বামী বললেন।

হেসে বললাম, 'ঠিক আছে।'

এবার আমার লেখা তিনটি বই নিয়ে এলেন স্ত্রী। বললেন, 'দেখুন।'

আমি যেন খুব অবাক হলাম, এমন ভাব দেখালাম, খুশিও। নাম সই করে দিতে হলো। স্ত্রী বললেন, 'দাদা, আপনার ভদকা চলবে?'

এবার সত্যি অবাক হলাম।

আজকাল বাঙালিরা মদের ব্যাপারে তেমন নাক-উঁচু নয়। তিরিশ বছর আগে যত বাঙালি মদ খেত এখন তার পঞ্চাশ গুণ খেয়ে থাকে। কিন্তু তখন যত লোককে রাস্তায় মাতলামি করতে দেখা যেত এখন তার দশ ভাগও দেখা যায় না। মাতাল দেখা যেত বাংলা নাটক এবং সিনেমায়। ইংরেজি ছবিতে এখন মাতাল খুঁজতে মাইক্রোসকোপ লাগবে। আবার দক্ষিণ কলকাতার বঙ্গ পরিবারে মদের যে চল, উত্তর কলকাতায় অতটা নেই। হয়তো পুরনো শহর বলেই পৈতৃক বাড়িতে থাকার জন্যে গুরুজনদের উপস্থিতিতে উত্তরের বাঙালি এখনও মদ খেতে সঙ্কোচ করে। কিন্তু যেখানে গুরুজন নেই সেখানে তারা স্বাধীন। মনে রাখতে হবে এরা সবাই শিক্ষিত, মার্জিত এবং ভদ্রলোক। ব্যক্তিগতভাবে পরিমিত মদ্যপান সম্পর্কে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু উত্তর কলকাতার একটি ফ্ল্যাটে কোনো মহিলার মুখে ওই প্রস্তাব শুনতে আমি অভ্যস্ত নই। বললাম, 'না, ভাই। এখন আমি ওসব খাব না।'

ওঁরা যেন খুব কষ্ট পেলেন। কফি এল। সঙ্গে প্যাটিস। স্বামী বললেন, 'এই, দাদাকে তোমার ছবির অ্যালবাম দেখাও না।'

স্ত্রী বললেন, 'দেখাচ্ছি, দাদা তো এখনই চলে যাচ্ছেন না।'

বললাম, 'কিন্তু আমার তাড়া আছে, যেতে হবে।'

স্ত্রী স্বামীকে ইসারা করলেন, 'এই, যাও, নিয়ে এসো।'

স্বামী ছটফটিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'দাদা, পাঁচ মিনিট গল্প করুন, আমি যাব আর আসব।'

আমাকে বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। ব্যাপারটা খুব নাটকীয়। ওঁদের নিজেদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো ব্যাপারে কথা হয়েছে যা আমি জানি না।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি জন্যে গেল ও?'

'আসুক না, দেখবেন।' স্ত্রী হাসলেন। তারপর ভেতরে গিয়ে একটা অ্যালবাম নিয়ে এলেন, 'জানেন, এর সবকটা ছবিই ওর তোলা। ক্যামেরায় কি ভাল হাত। আমি কত বলেছি তুমি ফিল্মে ক্যামেরাম্যান হও, কিন্তু কিছুতেই রাজী নয়।'

অ্যালবাম খুললাম। প্রথম ছবিটি কনে বেশে। সুন্দর। তারপর জিনস এবং শার্ট। স্মার্ট লাগছে। পরের ছবিগুলো দেখে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। হিন্দি সিনেমার উঠতি নায়িকাদের লাস্যময়ী স্বল্পবেশের ছবিও লজ্জা পাবে এগুলোর পাশে। শুধু বেশ কম নয়, মুখ-চোখ শরীরের মোচড়ে আসমুদ্র আমন্ত্রণ।

'আমার ফিগার কি খুব খারাপ দাদা?' ফিসফিস স্বরে প্রশ্ন।

'না, ঠিকই আছে।'

'অনেক কষ্টে মেনটেইন করছি। আজকাল তো ক্যামেরার সামনে তেমন সিন থাকে এইরকম পোজ দিতে হয়, না দাদা ?'

বললাম, 'এই ছবি তুলতে ও আপত্তি করেনি ?'

হেসে উঠলেন স্ত্রী, 'ও মা, আপত্তি করবে কেন ? ও বলে, সৌন্দর্য একা দেখে কি সুখ হয় ? সব্বাই যদি দেখে ভাল বলে তাহলে তার সুখই আলাদা।'

'কিন্তু এতে তো বাইরে থেকে বিপদ আসতে পারে ?'

'কি বিপদ ?'

'পথটা পিছল।'

'জানি তো। সেই জন্যে আপনার কাছে নিয়ে গেছে ও।'

'দেখ তোমাদের এত মিল, স্বামী-স্ত্রী হিসেবে চমৎকার মানিয়ে আছ. কি দরকার এসব করার ?'

চোখে চোখ রাখলেন তিনি, 'আপনি আমার পাশে থাকলে কোনো ভয় নেই। ওর জন্যে কোনো চিন্তা করবেন না, আমি ম্যানেজ করে নেব। তারপর ঠোঁট মুচড়ে তিনি বলেছিলেন, 'ভীষণ বোর্ হয়ে যাচ্ছি, জানেন !'

আমার মুখে কোনো কথা ছিল না। স্বামী ফিরে এলো একটু পরে। দারুণ একটা পাঞ্জাবি কিনে এনেছে আমার জন্যে। স্ত্রী বললেন, 'দাদা, এটা পরবেন। আমার আবদার।'

এই মহিলা এখন বাংলা টিভি সিরিয়ালে চুটিয়ে অভিনয় করছেন। খুব নামডাক তাঁর দেখা হলে দাদা বলে প্রণাম করেন। ওঁর স্বামী রোজ নিয়ে যাওয়া-আসা করেন। তবে স্ত্রী ফ্লোরে বা পরিচালকের বা প্রযোজকের ঘরে ঢুকলে হাসিমুখে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন। ওঁদের সংসার এখনও শান্তির।

॥ ১৩ ॥

নবকল্লোলে এই লেখা প্রকাশিত হবার পর থেকে আমি বেশ কিছু চিঠি পেয়েছি। বেশিরভাগ চিঠিতেই আমার সমালোচনা করা হয়েছে, আমার ভুল ধরিয়ে বলা হয়েছে মেয়েরা এমন কাজ করতে পারেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি মুশকিল হলো, আমি এ জীবনে যা দেখেছি, যাদের যেভাবে দেখেছি, তাই লিখেছি। ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে আমি বদলে দিতে পারি না। সেগুলোয় যদি অসঙ্গতি থাকে তাহলেও। কারণ ওরা ওইভাবেই ঘটেছিল। এইসব চিঠিপত্রের মধ্যে একটি চিঠি একদম অন্যরকম। সেটি লিখেছেন জনৈকা বাসন্তী দেবী। নাম

ঠিকানা দেননি। কিন্তু চিঠিটা আমাকে আকর্ষণ করেছে। তাই, এবারের লেখা বাসন্তী দেবীকে নিয়ে, অথবা তাঁর পুরো চিঠিটাই।

প্রিয়বরেষু, আপনার লেখা 'মেয়েরা যেমন হয়' পড়েছি। সবকটাই ভাল লেগেছে বললে মিথ্যে বলা হবে। তবে কোনো কোনো চরিত্র বেশ অবাক করে দিয়েছে, এই যা। আপনি বুদ্ধিমান মানুষ (আমি চালাক অথবা চতুর বললে রেগে যেতেন নিশ্চয়ই)। লেখার শিরোনামে একটা অস্পষ্টতা রেখেছেন। মেয়েরা কেমন হয় তা ঈশ্বরও যখন জানেন না তখন আপনি 'যেমন হয়' বলে সোনার পাথরবাটি আমাদের সামনে ধরেছেন যা সোনার না পাথরের তা বুঝতে হিমশিম খাচ্ছি। আচ্ছা, মেয়েরা কেন ? আপনি পুরুষরা যেমন হয় বলেও তো কিছু লিখতে পারেন ! নাকি পুরুষদের চরিত্রে কোনো রহস্য নেই, ভাঁজ নেই ? মেয়েরা গণেশের মতো, মা দুর্গার চারপাশে পাক দিয়ে যে জগৎ দ্যাখে তাতেই তৃপ্তি আর পুরুষরা কার্তিকের মতো সারা পৃথিবী ঘুরে আসে অথচ কি দ্যাখে তা তারাই জানে না। আপনি পুরুষমানুষ, অসন্তুষ্ট হতেই পারেন, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে।

এবার কাজের কথায় আসি। চিঠির নিচে আমার নাম পড়ে কি কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ? অবশ্য বাসন্তী নামে কোনো মহিলাকে তো আপনি চিনতেই পারেন।

আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল উনিশশো ষাট সালে। উঃ, কত দিন হয়ে গেল। ত্রিশ বছর। তখন আপনি স্কটিশ চার্চ কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়েন, হস্টেলে থাকেন। ছিপছিপে চেহারা ছিল, ফরসা ছিল না, কিন্তু কালো কখনই নয়। আচ্ছা, আমি 'কালো কখনই না' কেন লিখলাম বলুন তো ? এবারের বইমেলায় আপনাকে দেখলাম। শরীর বেশ ভারি হয়েছে কিন্তু গায়ের রঙ অমন পুড়ে গিয়েছে কি করে ? মুখের দুপাশে কালো ছায়া মাখামাখি। আমার স্মৃতির সঙ্গে প্রচুর তফাৎ। তাই।

কিছুই মনে পড়ছে না আপনার, তাই না। আচ্ছা, বিশদে বলি। আমরা থাকতাম গোয়াবাগানে। বনেদী বাড়ি বলে একটা কথা চাউর ছিল পাড়ায়। মা ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী। যেমন গায়ের রঙ তেমনি চোখমুখ। বাবার চেহারা ভাল ছিল না। ঠাকুর্দার সম্পত্তি ছিল বিস্তর। বাড়ি আসবাবপত্র থেকে শুরু করে অনেক কিছু রেখে গিয়েছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর কাকাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করেও বাবা যা পেয়েছিলেন তাতে আমাদের কোনো অভাব হবার কথা ছিল না।

বাবাকে আমি কখনও কোনো কাজ করতে দেখিনি। কিন্তু রোজ এগারটা নাগাদ স্নান-খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে যেতেন, ফিরতেন সন্ধ্যা নাগাদ। যেদিন কারও সঙ্গে কথা বলতেন না, হাতমুখ ধুয়ে ছাদের ঘরে ঢুকে যেতেন, সেদিন বুঝতাম ওঁর মন খুব খারাপ।

মন ভালো থাকলে সন্ধ্যের মুখ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন। সেসব গল্প হলো মানুষের উত্থান-পতন নিয়ে। কে শেয়ারে বড়লোক হয়ে গেল, কে ডুবল, সেসবের কাহিনী। আমাদের পছন্দ না হলেও শুনতে হতো। মা বলতেন, বাবা নাকি শেয়ার বেচাকেনার ব্যবসায় আছেন। এখন বুঝি, ব্যাপারটা দালালি।

তা যদ্দিন দালালি করতেন ঠিক ছিল, হঠাৎ ক্রেতা হলেন, শেয়ার কিনলেন এবং যথারীতি

ডুবলেন। তার ঢেউ এসে লাগল সংসারে। ঘরদোর আছে, আসবাব আছে, মায়ের গহনা আছে কিন্তু কাঁচা টাকা হাতে নেই বললেই চলে। এরকম পরিস্থিতি মা কিভাবে সামলেছিলেন তা তিনিই জানেন।

আমি তখন ক্লাস নাইনে উঠেছি, বোন ক্লাস এইটে। ছোট্ট ভাইটা ক্লাস টুতে। স্কুলের পড়ার বাইরে পড়া বুঝতে একজন মাস্টারের প্রয়োজন। কিন্তু সেসময় ভাল পড়ান যাঁরা, তাঁরা দুজনের জন্যে অন্তত পঞ্চাশ টাকা নিতেন। ওই টাকা দেবার ক্ষমতা মায়ের ছিল না। এক রবিবার সকালে বাবা বললেন, 'আজ সুবোধকে আসতে বলেছি। ওকে মাস্টারের কথা বলো। ও খোঁজখবর রাখে।'

সুবোধ হলো সুবোধমামা। স্কটিশচার্চ কলেজের কাছে বই-এর দোকান আছে। খুব মিশতে পারে। আমরা সুবোধমামাকে পছন্দ করতাম। সেদিন সুবোধমামাকে মা মাস্টারের কথা বললেন। সুবোধমামা মাথা চুলকে বললেন, 'দুই মেয়েকে সপ্তাহে তিন দিন পড়াতে হলে যে কোনো ভাল মাস্টার পঞ্চাশ-ষাট তো চাইবে।'

মা বললেন, 'অত টাকা কোত্থেকে দেব সুবোধ ?'

সুবোধমামা বললেন, 'একটা উপায় আছে। এই সবে যারা স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে কলেজে পড়ছে তাদের মধ্যে যারা ভাল ছাত্র এমন কাউকে রাখো। বুড়োদের থেকে তারা বেশি ভাল পড়াবে, টাকাও কম লাগবে।'

বাবা বললেন, 'কলেজে পড়ছে ? সে তো ছোকরা হবে।'

'হ্যাঁ। তা তো বটেই !'

'মেয়েরা বড় হচ্ছে, এই সময় ছেলেছোকরা মাস্টার বাড়িতে ঢোকাবে ? কি হতে কি হয়ে যাবে, তখন সামলাবে কে ?' বাবা রেগে গেলেন।

কিন্তু মা প্রতিবাদ করলেন, 'কি হতে কি হয়ে যাবে মানে ? আমার মেয়েরা সস্তা নাকি ? তাছাড়া আমাদের চোখের সামনে পড়াবে। দুই বোন একসঙ্গে বসে পড়বে, ওসব করার সাহস পাবে কি করে ?'

সুবোধমামা মাথা নেড়েছিলেন, 'ঠিক কথা। তার ওপর টাকাটার কথাও ভাবতে হবে।'

বাবা গম্ভীর হয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত বললেন, 'ছোটকাটাকেও তাহলে ওদের সঙ্গে বসিয়ে দিও। আর দেখেশুনে মাস্টার নিয়ে এসো।'

সমরেশবাবু, এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনার মনে পড়েছে। ছত্রিশ বছর আগে এক বিকেলে আপনি সুবোধমামার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। আপনার পরনে তখন ছিল ধুতি আর হাফ হাতা নীল শার্ট। আমরা দুই বোন আড়াল থেকে আপনাকে দেখে খুব হেসেছিলাম। আমাদের বাড়ির সামনে একটা হোর্ডিং ছিল, তাতে সিনেমার পোস্টার সাঁটা হতো। উত্তমকুমার ওইরকম পোশাক পরতেন তখন। মফস্বলের ছেলে হয়ে কলকাতায় পড়তে আসতেন ধুতি-শার্ট পরে। আমরা আড়াল থেকে আপনাকে দেখে বুঝে গেলাম আপনিও মফস্বলের ছেলে।

বাবা বললেন, 'সুবোধ যখন বলছে তখন আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি। সপ্তাহে ছয় দিন পড়াতে হবে। রবিবার ছুটি।'

আপনি করুণ গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছয় দিন ?'

সুবোধমামা বললেন, 'জামাইবাবু, ছয় দিন পড়লে মেয়েরা স্কুলের পড়া, হোম-ওয়ার্ক কখন করবে ? আজকাল তিন দিনের বেশি কোনো মাস্টার তো পড়ায় না।'

বাবা বললেন, 'এ তো মাস্টার নয়। অ্যাপ্রেনটিস। ঠিক আছে। তিন দিন। তবে পনের টাকার বেশি দিতে পারব না। আর ছোটকাকে পড়াতে হবে।'

আপনি সুবোধমামার দিকে তাকালেন। সুবোধমামা বাবার দিকে। মা বললেন, 'উঁচু ক্লাশের পড়ার সঙ্গে নিচু ক্লাশের পড়া মেলে নাকি ? ছোটকাকে পড়াতে হবে না। সপ্তাহে তিন দিন বড় দুজনকে পড়ালেই হবে। নাম কি ?'

সুবোধমামা বললেন, 'ওর নাম সমরেশ মজুমদার। জলপাইগুড়ির ছেলে।'

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা কি করেন ?'

'চা-বাগানে চাকরি করেন।'

দেশ কোথায় ছিল ?'

'নদীয়ায়।'

'হুঁ। একটা কাগজে নাম-ধাম সব কিছু লিখে দাও। আর দেখো বাপু, আমার স্পষ্টাস্পষ্টি কথা, ফক্কড়মি আমি একদম পছন্দ করি না। আসবে, পড়াবে, চলে যাবে। পড়াশুনার বাইরে কোনো কথা বলবে না, বুঝেছ ?'

আপনি তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়লেন। আমার মনে হয়েছিল আপনার সেসময় পনের টাকার খুব প্রয়োজন ছিল।

ঘরের অভাব ছিল না। কিন্তু আপনাকে নিয়ে বসানো হলো সেই ঘরে যেখানে বসলে বাবার ঘর থেকে আপনাকে দেখা যায়। ঠিক হয়েছিল আপনি সোম-বুধ-শুক্রবার বিকেল ছটায় আমাদের পড়াতে আসবেন। মা আমাদের নিয়ে গেলেন আপনার কাছে। আপনি মুখ নিচু করে বসেছিলেন। টেবিলের উল্টোদিকের দুটো চেয়ারে আমরা বসতেই ভাই পাশে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই বলল, 'এম্মা. মাস্টার বলে মনেই হয় না।'

আপনি মুখ তুলে ওকে দেখলেন, আমি খুব লজ্জা পেয়েছিলাম। মা বললেন, 'এই দুজন পড়বে। বড়র নাম বাসন্তী, ছোটর নাম হৈমন্তী। দুজনেই ফাঁকিবাজ। পড়ায় মন নেই। আপনি বকুনি দেবেন দরকার হলে।'

মা চলে গিয়েছিলেন ভাইকে নিয়ে। বাবা তখনই বসে গেছেন নিজের চেয়ারে। তাঁর নজর এই ঘরের টেবিলের দিকে। আমরা চুপ করে বসেছিলাম। আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন ক্লাশে পড় ?' আমি উত্তর দেবার আগেই বোন বলল, 'আমি এইটে, ও নাইনে।'

আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি কি পড়ানো হয় ?'

আমি জবাব দেবার আগেই ও ওরটা বলে গেল। বলে আমার সাবজেক্টগুলোও জানিয়ে দিল। আমার খুব রাগ হচ্ছিল। রাগ হলেই আমার নাকের ডগায় ঘাম ফুটে ওঠে।

আপনি পড়ানো আরম্ভ করলেন। প্রথমে ইতিহাস। দুটো আলাদা ক্লাশের ছাত্রীকে একসঙ্গে পড়ানো যে মুশকিল ব্যাপার সেটা আমিও বুঝতে পারলাম। আপনি যে এর আগে

কখনও টিউশুনি করেননি সেটা আপনার কথাতেই জানতে পারলাম। সেদিন যাওয়ার আগে আপনার একটা কথা আমার খুব ভাল লেগেছিল। আপনি মোগল সম্রাটদের নাম পরপর লিখতে বলেছিলেন। আমি লিখেছিলাম। দেখে খুশি হয়ে বলেছিলেন, 'এবার যদি তোমাকে তোমার পূর্বপুরুষদের নাম লিখতে বলি তুমি কজনের পারবে?' আমি বাবা এবং দাদুর নাম লিখেছিলাম। এবং তারপরেই মনে হয়েছিল কোথাকার কোন মোগল সম্রাটদের কথা আমি মনে রাখতে পারছি অথচ নিজের পূর্বপুরুষদের নাম জানি না। এটা খুব লজ্জার। আর একথা আপনার আগে কেউ আমাকে বলেনি।

মনে পড়ছে, সেদিন আমি চেষ্টা করেও আপনার সঙ্গে হুঁ অথবা না-এর বাইরে কোনো কথা বলিনি বা বলতে পারিনি। কিরকম লজ্জা আমাকে অবশ করে রেখেছিল। বোন কিন্তু সমানে বকে গেছে। একসময় সে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল, মাস্টারমশাই, আপনি খুব সিনেমা দ্যাখেন, না?' আপনি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন। বোন বলেছিল, 'আপনি উত্তমকুমারের মতো ড্রেস করেছেন, চুল আঁচড়েছেন।'

আপনি গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, 'এসব কথা বলতে নেই। তোমার বাবা রাগ করবেন।'

'শুনতে পেলে তো। ভাববে পড়া করছি।' বোন আরও নিচে নামিয়েছিল গলা। মা আপনাকে চা জলখাবার দিয়েছিল। আপনি আপত্তি করেছিলেন। মা বলেছিলেন, 'প্রথম দিন এ বাড়িতে এলে খেতেই হয়।'

আপনি বলেছিলেন, 'তাহলে আপনি আমাকে 'তুমি' বলবেন।'

মা খুশি হয়েছিলেন। বাবা বিরক্ত। পরে বলেছিলেন, 'মাস্টার মাস্টারের মতো থাকবে অত আদিখ্যেতা কিসের? কেমন পড়াল তোমাদের?'

বোন বলল, 'খুব ভাল।'

'হুঁ। রেজাল্ট ভাল না হলে আমি তোমাদেরই দায়ী করব।'

সেইদিন আপনার পাশে বাবাকে আমার ভিলেন বলে মনে হয়েছিল।

সমরেশবাবু, এসব আপনার মনে থাকার কথা নয়। অন্তত এত বিশদে। ঝাপসা ঝাপসা হয়তো মনে থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু আমার যে আছে তা এ লেখা পড়ে বুঝতেই পারছেন। আছে তার কারণ, আত্মীয়স্বজনের বাইরে আপনিই প্রথম একজন তরুণ যার সামনে আমি দুঘণ্টা বসেছিলাম। সেই আপনি যখন পরে এই সমরেশ মজুমদার হয়ে গেলেন তখন স্মৃতির ছবির চারপাশে ফ্রেম এসে গেল যাতে আর নষ্ট না হয়।

সমরেশবাবু, আপনি আমাদের মাত্র তিন মাস পড়িয়েছিলেন। নিয়মিত আসতেন। মা চা বিস্কুট দিতেন। সপ্তাহখানেক বাদে বাবা আর পাহারায় বসতেন না। আমরা আপনার কাছে মন দিয়ে পড়াশুনা করতাম। বোনই বেশি কথা বলত। আপনাকে নিয়ে আমি তখন খুব ভাবতাম। কোথায় কতদূরে জলপাইগুড়ির চা-বাগানে আপনার বাবা মা রয়েছেন আর আপনি এই শহরে একা হস্টেলে থাকেন! নিশ্চয়ই বাড়ির জন্যে মন কেমন করে আপনার! সেদিন আপনি আমার হাতের লেখার প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'রোজ পাঁচ পাতা করে যা ইচ্ছে তাই লিখবে।' আমি সেটা শুরু করেছিলাম। গাছ আকাশ অথবা চিল নিয়েই লিখতাম। আর অদ্ভুত কাণ্ড, লিখতে

লিখতে আপনি কখন লেখায় এসে যেতেন। তার একটাও অবশ্য আমি আপনাকে দেখাতে পারিনি। খুব লজ্জা হতো। লিখতাম আর ছিঁড়ে ফেলতাম।

এর মধ্যে বোন যে আপনাকে প্রেমপত্র লিখেছে তা আমি জানতাম না। হোম-ওয়ার্কের খাতার পাতার ভাঁজে চিঠিটা রেখেছিল সে। খাতা দেখতে গিয়ে আপনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। বোনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার উচিত এখন মন দিয়ে পড়াশুনা করা। এসব আর লিখবে না।'

'যা সত্যি তাই লিখেছি।' বোন কঠিন গলায় বলল।

'তোমার বয়সে এটা সত্যি হতে পারে না।'

'কেন?'

আপনি অসহায় চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন, 'তুমি ওকে বুঝিয়ে দিও তো।'

'ও কি বোঝাবে! এক বছরের বড় তো কি হয়েছে, আমি ওর চেয়ে বেশি বুঝি।'

'তোমার বাবা-মা জানলে দুঃখ পাবেন।'

'না জানালেই হলো। দুঃখ পাবে না।'

এই সময় মা চা নিয়ে আসতেই চিঠি সরিয়ে ফেললেন। আমার খুব কান্না পাচ্ছিল। ওখানে বসে থাকতে পারছিলাম না। পেটে ব্যথা হচ্ছে বলে উঠে এসেছিলাম। বাথরুমে ঢুকে খুব কেঁদেছিলাম।

আপনার সঙ্গে আমার প্রেম হয়নি সমরেশবাবু। কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল বোন যা বলেছে তা আমারও কথা। যা আমি বললে খুশি হতাম তা আগেভাগে বোনই বলে দিল। আর ও বলে দেওয়ায় বাকি জীবন আমাকে মুখ বন্ধ করে থাকতে হবে। তারপর থেকে আপনি যখনই আসতেন বেশ গম্ভীর হয়ে থাকতেন।

তিন মাস আপনি পড়িয়েছিলেন। প্রতি মাসে মা বাবার হাতে আপনার মাইনের টাকা দিয়ে বলতেন, 'মেয়েদের সামনে টাকা দেবে না। আলাদা দেবে।'

তিন মাস পরে সুবোধমামা এসে মাকে বললেন, 'আপনি আর আসবেন না। তিন মাসের কোনো মাইনেই নাকি আপনি পাননি! বাবার সঙ্গে মায়ের সেদিন তুমুল ঝগড়া হয়। বাবা জবাব দিয়েছিলেন, 'ওকে একসঙ্গে ছ মাসের টাকা দেব বলে মাসে মাসে দিইনি। তা ও পড়াবে না তো কি হয়েছে, তুমি নতুন মাস্টার দ্যাখো। টাকাটা খরচ হয়ে গেছে এবার, পরের বার হবে না।'

আপনাকে আমার বাবা পরিশ্রমের টাকা দেয়নি বলে খুব লজ্জা পেয়েছিলাম। কিন্তু একটু অভিমানও হয়েছিল। ছেড়ে দেবার আগে কথাটা আমাদের বলে গেলেন না কেন? বোনকেও তো বলতে পারতেন। ও আপনার সঙ্গে খুব কথা বলত যে!

আজ বাবা বা মা নেই। আপনার পরে তিনজনকে প্রেমপত্র লেখার পর বোন চতুর্থজনের সঙ্গে প্রেম করেছিল। সেই ছেলে এখন আই এ এস, আমার ভগ্নীপতি। বোন তার সঙ্গে দিল্লীতে থাকে। একটা মেয়ে ওদের। তারও বিয়ে হয়ে গেছে।

আমার কথা থাক। সে অন্য কাহিনী।

আপনার 'মেয়েরা যেমন হয়' পড়তে পড়তে মনে হলো, আমাকে আপনি কি বলবেন ? আমি কেমন হয়ে আছি, ছিলাম ? সারাজীবন এত মানুষ দেখে এসেছেন যে তিন মাসের এব ক্লাশ নাইনের লাজুক ছাত্রীকে কি মনে পড়বে ? তবে বোনকে তো পড়া উচিত। ওকে মনে করতে পারলে আমিও এসে যাব।

আসলে কি জানেন সমরেশবাবু, মেয়েরা মেয়েদের মতোই হয়। নইলে এই ছত্রিশ বছর ধরে একটা সতের বছরের তরুণকে কেউ মনে রেখে দেয় ?

॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণনগর থেকে জনৈক শিবনাথ দত্ত আমাকে একটি চিঠি লিখেছেন। খুবই সাধারণ কথাবার্তা কিন্তু চিঠিটা আমাকে মাঝে মাঝেই আক্রমণ করছে। শিবনাথবাবু ব্যক্তিগত জীবনে কি করেন তা লেখেননি। সে সব প্রসঙ্গ তিনি তোলেননি একদম। কিন্তু যেটা গতকাল পর্যন্ত মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল, তা এক কলমের খোঁচায়, অস্বাভাবিক বলব না, অস্বস্তিকর করে তুলেছেন ভদ্রলোক।

শিবনাথবাবু লিখেছেন, 'আপনার "মেয়েরা যেমন হয়" পড়ছি। আহামরি লেখা নয়। কিন্তু মশাই, আপনি মূল্যায়ন কিভাবে করছেন ? এককালে বাড়িতে মেয়ে জন্মালে হাহাকার পড়ে যেত। কোথাও কোথাও শুনেছি সদ্যজাত শিশুকন্যার মুখে নুন ঢুকিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা হতো। ছেলে মানে হীরের টুকরো, যত বাঁকা হোক, হীরে তো হীরেই। তা কখন একটু একটু করে সময়টা বদলে গেল, সেটা লক্ষ্য করেছেন ? এখন ছেলের চেয়ে বুড়ো বাপ-মাকে মেয়েরাই বেশি দ্যাখে। যে কোনো পরীক্ষায় ওপরের দিকে গড়পড়তায় মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের থেকে ঢের বেশি। আর তাদের মনে নিজের সংসার সম্পর্কে যে টান রয়েছে তা ছেলেদের মধ্যে নেই। তাই মেয়ে হলে এখন বাপ-মা আর অখুশি হয় না। মেয়ে পরের বাড়িতে বউ হয়ে গেলেও শনি-রবিবারে বাপের বাড়ির খবর নিতে আলসেমি করে না। তা লেখকমশাই, এসব তথ্য আপনার লেখায় নেই কেন ?'

শিবনাথবাবুর এই চিঠি আমাকে অস্বস্তিতে ফেলেছে, স্বীকার করছি। আমি গত চব্বিশ ঘণ্টায় টেলিফোনে, ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ নেবার চেষ্টা করলাম, পরিচিত বাবা-মায়ের ছেলেমেয়ের সংখ্যা কিরকম ? আমি কুড়িটি পরিবারের তথ্য পেয়েছি। এঁদের মধ্যে চৌদ্দটি পরিবারে সন্তানসংখ্যা দুটি। যার দশটি পরিবারে দুজনই কন্যা। বাকি চারটি পরিবারে দুজন পুত্র এবং কন্যা-পুত্র মিশিয়ে রয়েছে আধাআধি। এই চোদ্দটি পরিবারের বাইরে একক সন্তানের ছটি পরিবারেও মেয়ের সংখ্যা চার, ছেলের সংখ্যা দুই। অর্থাৎ গড়পড়তায় মেয়েরাই সংখ্যায় ভারী

ধরে নিতে পারি. প্রথম সন্তান কন্যা হবার পর বেশিরভাগ পিতা-মাতা দ্বিতীয় সন্তান পুত্র বে এই আশা করেছিলেন। কিন্তু দশটি ক্ষেত্রে আবার তাঁদের কন্যাসন্তান হওয়ায় তাঁরা তৃতীয় ন্তানের ঝুঁকি নেননি। কিন্তু যাঁদের প্রথম সন্তান মেয়ে হয়েছে, তাঁরা আর দ্বিতীয় সন্তানের দিকে া বাড়াননি কেন ? অথবা প্রথম সন্তান পুত্র হবার পরেও দ্বিতীয় সন্তানের প্রয়োজন অনুভব রেছেন কেন ?

আমি যে পরিসংখ্যান যোগাড় করেছি তা যাচাই করার ইচ্ছে হলো। এই-সব সন্তানদের যস চার-পাঁচ থেকে বাইশ-তেইশ পর্যন্ত ছড়িয়ে। কিন্তু যাচাই করার ইচ্ছে হওয়া মাত্র সেটা নয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার স্বভাব আমার নেই। জীবনে অনেকবার এমন সব অভিনব ইচ্ছে মনে সেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তা মন থেকেই উধাও হয়ে গিয়েছে। স্বপ্নবিলাসী বা অলস—এমন কটা সাইনবোর্ড আমার নামের আগে স্বচ্ছন্দে টাঙিয়ে দেন পরিচিত জনেরা। এক্ষেত্রে কি হতো নি না কিন্তু স্বপ্নাশিসের টেলিফোনটা আমাকে সচল করল। স্বপ্নাশিস হলো যতীনদার ছেলে। যখন জয়েন্ট দিয়ে যাদবপুরে সুযোগ পায় তখন যতীনদা পিতা হিসেবে আমাদের মিষ্টি াইয়েছিলেন। স্বপ্নাশিস টেলিফোনে বলল, 'কাকু, মা আপনাকে টেলিফোন করতে বলল। পজি হসপিটালে আপনার জানাশোনা কেউ আছে ?'

'হসপিটালে কি দরকার ?'

'বাবা ওখানে আছে। হার্টের প্রবলেম। মায়ের ধারণা ভাল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না।'

'সে কি ? যতীনদা হসপিটালে একথা কেউ বলেনি তো !'

'বাবা তো সেরকম নামী লোক নয় যে সবাই বলাবলি করবে। এখন বলুন, মাকে কি লব ? আছে কেউ জানাশোনা আপনার ?'

যতীনদা নামকরা লোক নন তা আমি জানি। কিন্তু স্বপ্নাশিসের মুখে কথাটা শুনতে একটুও াল লাগল না। আমাদের চারপাশে বিস্তর কাছের মানুষ ছড়িয়ে আছেন যাঁরা সাধারণ স্তরের লেও অনেক নামকরা লোকের চেয়ে প্রিয়তর। তবু জিজ্ঞাসা করলাম. 'কার আণ্ডারে যতীনদা াছেন তুই জানিস ?'

'কেন জানব না ? ডক্টর এস. কে. দত্ত। মা ওঁকে পছন্দ না করলেও হসপিটালে ওঁর বেশ াম রয়েছে। আপনি ওঁকে চেনেন ?' স্বপ্নাশিস প্রশ্নটা করল।

'না। চিনতে পারছি না। তবে তোমার মাকে বলো আজ বিকেলে আমি হসপিটালে যাব।'

সিভার নামিয়ে রেখে কিছুক্ষণ ভাবলাম। যতীনদা খুব হাসিখুশি স্বভাবের মানুষ, সিগারেট তেন না কখনও। তাঁরই হার্ট অ্যাটাকড করল ! স্বপ্নাশিস ওঁর ছেলে। একটি মেয়েও আছে। নক বছর যাইনি বলে সে কত বড় হয়েছে জানি না। কিন্তু যতীনদার স্ত্রী ডাক্তারের প্রতি ন্তুষ্ট কেন ? একজন চিকিৎসক ঠিক চিকিৎসা করছেন কিনা তা চিকিৎসাবিদ্যা না-জানা নো মানুষ বুঝবে কি করে ? অবশ্য এ ব্যাপারেও আমার বিস্ময় আছে। কলকাতা শহরে এমন া কিছু মানুষকে জানি যাঁরা সমস্ত রোগের স্পেশালিস্ট ডাক্তারদের নাম মুখস্থ করে খছেন। প্রসঙ্গ উঠলেই চোখ বড় করে বললেন, 'সে কি। ডক্টর এস. কে. ভদ্রকে চেনেন ? হার্টের এখন তিন নম্বর।' এরপর ডক্টর ভদ্রর কাজকর্মের বিস্তারিত বিবরণ শুনতে হয়।

এবং অবশ্যই এক এবং দুই নম্বরে যাঁরা আছেন, তাঁদের প্রসঙ্গ চলে আসে। এই ডাক্তারজাও কোনোকালে মেডিক্যাল কলেজে ঢোকার ছাড়পত্র পাননি। কিন্তু অসুখ-বিসুখ-ডাক্তা হাসপাতাল সম্পর্কে এঁদের কথাবার্তা শুনলে বিশেষজ্ঞ ছাড়া কিছু মনে হয় না। তা যতীনদা স্ত্রী সেই পর্যায়ের কেউ হলে আলাদা কথা।

বিকেলে হাসপাতালে গেলাম। ওই সময় রুগীদের বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনরা দেখা কর অনুমতি পান বলে বেশ ভিড় থাকে। আমি যতীনদার স্ত্রীকে খুঁজছিলাম। এই সময় একটি মে এগিয়ে এল। বছর কুড়ি-একুশ বয়স। লম্বা ছিপছিপে, কিন্তু মুখ-চোখে ক্লান্তি জড়ানো। সাম এসে বলল, 'কাকু, আমার নাম শ্রাবণী। আপনার জন্যে কার্ড নিয়ে অপেক্ষা করছি।'

শুনেছি পিতৃমুখী মেয়েরা জীবনে সুখ পায়। তাহলে যতীনদার মুখ বসানো শ্রাবণীর সু হওয়া উচিত। বললাম, 'তুমি দেখছি বেশ বড় হয়ে গেছ! কি করছ?'

'ডাক্তারি পড়ছি। মা ওপরে আছে কাকু!' মেয়েটি ভেতরে যাওয়ার অনুমতিপত্র আমা দিল।

সেটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাবা এখন কেমন আছেন?'

'এখনও ক্রাইসিস কাটেনি। ইনটেনসিভেই আছেন। বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া যায়'

'তাহলে! তোমরা কি করে সিদ্ধান্ত নিলে ডক্টর দত্ত ট্রিটমেন্ট ঠিক করছেন না!'

'এটা সিদ্ধান্ত নয়, দুদিন হয়ে গেল বলে মায়ের দুশ্চিন্তা হচ্ছে।'

'তোমার ভাই কোথায়?'

'ভাই নয়, দাদা। ও হাসপাতালে আসেনি। আপনি যদি ওপরে না ওঠেন তাহলে মা আমি নিচে পাঠিয়ে দিই।' মেয়েটি যেন অযথা সময় কাটাতে চাইছিল না।

'না। আমি ঘুরে আসি।'

ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে যদি কোনো রুগী থাকেন তাহলে তাঁর আত্মীয়দের কিছু কর থাকে না। তাছাড়া এখনও ওখানে থাকা রুগীরা ঠিকঠাক চিকিৎসা এবং যত্ন পান। ওপরে উ শুনলাম যতীনদার স্ত্রী আর এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে হার্ট অ্যাটাক কিভাবে হয়েছিল তার বিস্তারি ব্যাখ্যা করছেন। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে এলেন তিনি, 'ঠাকুরপো, দেখুন, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল! আমি যে কি করব ভেবে পাচ্ছি না।'

কাঁচের আড়াল থেকে যতীনদাকে দেখলাম। নাকে নল, হাতেও। শায়িত শরীরটায় প্র আছে কিনা বোঝা যাচ্ছিল না। আমি যতীনদার স্ত্রীকে ইশারা করলাম বাইরে বের হবার জন্যে নিচে নেমে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ডাক্তার কি বলছেন?'

'জিজ্ঞাসা করলে বলছেন প্রোগ্রেস করছে। কিন্তু আমি তো কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না।'

আমি কিছু বলার আগে শ্রাবণী বলল, 'মা, তুমি যে দুশ্চিন্তা করছ, সেটা যে সত্যি তার কোনো প্রমাণ নেই। আমি তোমাকে অনেকবার বলেছি আন্দাজে কথা বলা ঠিক হচ্ছে না।'

'আমি কি ঢাক পিটিয়ে বলতে গেছি?' যতীনদার স্ত্রী ক্ষুণ্ণ হলেন।

'তাহলে কাকু জানলেন কি করে?'

'সে যদি তোমার দাদা টেলিফোনে বলে থাকে তাহলে আমি কি করব ?'

'আশ্চর্য ! দাদা তো এখানে একদিনও আসেনি। আমি তোমাদের বুঝতে পারি না।' শ্রাবণী আমার হাত থেকে কার্ড নিয়ে ওপরে চলে গেল। যতীনদার স্ত্রী দ্রুত পরিস্থিতি সামলে নেবার চেষ্টা করলেন, 'আসলে আমার ছেলে না এই হাসপাতালের গন্ধ একদম সহ্য করতে পারে না। এখানে এলেই ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই আমিই বলেছি ওকে এখানে না আসতে।'

বললাম, 'শ্রাবণী তো ডাক্তারি পড়ছে। ওর ওপর ভরসা করা ভাল।'

'তাই তো করে আছি। বাপসোহাগী মেয়ে যে। দুদিন দুরাত এখানেই পড়ে আছে। স্নান-খাওয়া করতেও বাড়িতে যাচ্ছে না। এখানেই নমঃ নমঃ করে সেরে নিচ্ছে। তা ভালবাসা এক জিনিস আর বাস্তব আর এক জিনিস। মানুষমাত্রই ভুল হতে পারে। তুমি তোমার বাপের জন্যে খুব করছ, তার মানে এই নয় তোমার কোনো ভুল হবে না।' যতীনদার স্ত্রীর গলায় বেশ অভিমান।

বললাম, 'আমি দেখছি। এখানে কিছু পরিচিত ডাক্তার আছেন। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।'

বললাম বটে কিন্তু যতীনদার স্ত্রীর কথা বলার ধরন আমার ভাল লাগল না। নিজের মেয়ের সঙ্গে কথা বলার ধরনটি বড্ড কানে লাগল।

এর পর কয়েকদিন যতীনদাকে দেখতে গেলাম। লক্ষ্য করলাম শ্রাবণী হাসপাতাল থেকে নড়েনি। ওর দাদাকে দেখতে পাইনি। বউদি আসেন বিকেলে। যতীনদা একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন কি বুঝছেন ?'

যতীনদার স্ত্রী বললেন, 'যাই বলুন, বড্ড দেরি হচ্ছে ভাল হতে। ছেলে বলছিল ভাল নার্সিংহোমে দিলে এর মধ্যেই বাড়ি ফিরে যেতে পারত।'

'নার্সিংহোমে দিলেন না কেন ?'

'সে-সময় তো মাথা ঠিক ছিল না। মেয়ে বলল হাসপাতালে নিয়ে আসতে, তাই নিয়ে এলাম। অবশ্য ভাল নার্সিংহোমের খরচও অনেক। তবে মানুষটার জীবনের দাম নিশ্চয়ই তার চেয়ে বেশি।'

'তা তো ঠিকই, আপনার ছেলেকে দেখতে পেলাম না !'

'ও বলে, হাসপাতালে গিয়ে তো কিছু করার নেই। চুপচাপ বসে থাকতে হবে। খবরাখবর তো তোমার কাছে জানতেই পারছি।' যতীনদার স্ত্রী মাথা নাড়লেন, 'কথাটা ভাই মিথ্যে নয়। এসে পুতুলের মতো বসে থাকতে হবে। এর সঙ্গে, ওর সঙ্গে কথা বলেও আমার সময় কাটতে চায় না, ও আবার মুখচোরা ! তবে মনে হয়, সকালের দিকে দু-একবার এসে ঘুরে গিয়েছে।'

যতীনদা একটু সুস্থ হতেই কেবিনে চলে এলেন। বিকেলে গিয়ে দেখলাম শ্রাবণী কেবিনের বাইরে শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ? দুশ্চিন্তামুক্ত তো ?'

'মোটেই না। বাবার এখন রেস্ট নেওয়া দরকার। অথচ দেখুন না, কেবিনে একগাদা লোক তখন থেকে ঢুকে বকবক করে যাচ্ছে।' শ্রাবণী অভিযোগ জানাল।

'একগাদা লোক ঢুকল কি করে ?'

'একই কার্ড দেখিয়ে লোক তোলা হয়েছে।'

'তুমি কিছু বলছ না কেন ?'

'কি বলব ? মায়ের তো এটা বোঝা উচিত।'

ভেতরে ঢুকতে গিয়েও পারলাম না। ছোট কেবিনে পাঁচজন লোক। এক ভদ্রমহিলা বিস্তারিত গল্প করছেন, হার্ট অ্যাটাক যে হয়েছে তা তিনি কি কি সিমটম দেখে বুঝতে পেরেছিলেন। দেখলাম মিষ্টির প্যাকেট খোলা। যতীনদার স্ত্রী আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত, 'আরে আসুন, আসুন। মিষ্টি খান। দ্যাখো, কে এসেছে !'

যতীনদা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বিছানায় লেপ্টে থাকা শরীরে ক্লান্তি যেন চেপে বসেছে, হাসিতে তার ছাপ স্পষ্ট। বললাম, 'থাক, আর কথা বলতে হবে না। কিন্তু বউদি, এই ছোট কেবিনে এত ভিড় করা কি উচিত হচ্ছে ? পেশেন্টের ক্ষতি হবে এতে।'

'ক্ষতি হবে ?' যতীনদার স্ত্রী হকচকিয়ে গেলেন।

'হ্যাঁ। যতীনদা কিন্তু এখনও সুস্থ হননি !'

দেখলাম কাজ হলো। মানুষজন তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে। ওঁরা বেরিয়ে যেতে শ্রাবণী ভেতরে ঢুকল, 'থ্যাঙ্কস। আপনি খুব উপকার করলেন।'

শ্রাবণী তার বাবার পাশে টুলে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। যতীনদা চোখ বন্ধ করলেন, 'আঃ, আমি ভাবছিলাম কখন তুই আসবি।'

শ্রাবণীদের গল্প আমাদের জানা। হ্যাঁ, এটা ঠিক, গত দশ কি পনের বছর ধরে ছেলেদের থেকে মেয়েরা অনেক বেশি সংসারমুখী হচ্ছে, দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসছে। কিন্তু কেন ?

যে কোনো ঘটনা এমনি এমনি ঘটে না। নিশ্চয়ই কোনো কারণ তাকে ঘটতে সাহায্য করে। এখন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত পরিবারে সন্তানসংখ্যা দুই-এর বেশি খুব কমই দেখা যায়। এই দুই-এর মধ্যে যে বা যারা কন্যাসন্তান, তাদের জীবনে পড়াশুনাই আসল লক্ষ্য—এই বোধ শৈশবেই মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ফলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় মেয়েরা প্রথম দিকে উঠে এসেছে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অফিসের উঁচু পদগুলোতে এখন মেয়েদের ব্যাপক হারে দেখা যাচ্ছে। স্বীকার করতে হবে, এটা খুব ভাল লক্ষণ। একটি মেয়েকে তার পড়াশুনা শেষ করে চাকরিতে যোগ দিতে যে সময় প্রয়োজন হয়, তা মোটামুটি পঁচিশ বছর তো বটেই। এই এতটা সময় বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকার ফলে তার মনের শেকড় এখানেই নেমে যায়। আগে মেয়েদের বিয়ে হতো ষোল থেকে কুড়ির মধ্যে। স্কুল ফাইন্যাল বা পার্ট ওয়ান পাশ করেই বছর দশেক আগে বিয়ের পিঁড়িতে যেসব মেয়েদের বসতে বাধ্য করা হতো, তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তিনীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন বললে মিথ্যে বলা হবে না। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে কিন্তু মা-বাবার প্রতি যথেষ্ট টান শিক্ষার অভাব এবং পারিপার্শ্বিকের চাপে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না পাওয়ায় বুকেই চেপে রাখতে হতো। সে-ক্ষেত্রে শ্বশুরবাড়ির পরিবেশের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়া ছাড়া তাদের উপায় ছিল না। তাছাড়া তখন যে-বয়সে তাদের বিয়ে হতো সেই বয়সটা ছিল মানিয়ে নেওয়ার পক্ষে উপযুক্ত বয়স। এখন পঁচিশের নিচে মেয়েদের বিয়ে খুব কম ক্ষেত্রেই হচ্ছে। ওই বয়সের নিচে তাদের শিক্ষা শেষ হচ্ছে না। চাকরিতে ঢোকার পর মা-বাবা সম্বন্ধ করতে

গিয়ে হোঁচট খাচ্ছেন, আগেকার চোখে যে সব পাত্র তথাকথিত উপযুক্ত বলে মনে হতো এখন তাদের বিবর্ণ লাগছে। শিক্ষিতা, চাকরিরতা মেয়ের জন্যে সঠিক পাত্রের সন্ধান পাওয়া বেশ দুরূহ। সে-ক্ষেত্রে যদি মেয়ে নিজেই পাত্র নির্বাচন করে তাহলে বাবা-মা হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। পরিবর্তন যখন এই অবধি তখন পঁচিশ পেরিয়ে চাকরি করা মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে আর একটি আসবাব হয়ে থাকবে, এমনটা আশা করা কি যায়? আশা যাঁরা করেন তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করেন। সেই মেয়ে খোলা চোখে জগৎ দেখছে। বাবা-মায়ের প্রতি তার যদি টান থাকে তাহলে সে তার কর্তব্য করতে কোনো আপোস করবে না।

আর এই কারণেই আজকাল মেয়েদের এই ভূমিকা বেশি চোখে পড়ছে। বিবাহিত ছেলেদের হয়েছে মুশকিল। তার চাকরিরতা স্ত্রীর ইচ্ছে মেনে চলতে হচ্ছে তাকে। সেই ইচ্ছে মানলে লোকে তাকে শ্বশুরবাড়িমুখী বলে মনে করবেই। ইচ্ছে না মানলে বিরোধ। তাদের সন্তান বড় হতে না হতেই মামা-মাসির ন্যাওটা হয়ে উঠবে, কাকা পিসিদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়বে। আর এটা বেশি হয় যদি তার মায়ের শিক্ষা এবং রুচির সঙ্গে কাকা-পিসিদের শিক্ষা এবং রুচির কোনো মিল না থাকে। যাই হোক, এই পরিবর্তিত অবস্থায় নীট লাভ হচ্ছে মেয়েদের মা-বাবার। ওই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে দেখে পূর্ববর্তীরা নিশ্চয়ই ঈর্ষা করেন। ছেলে এবং ছেলের বউ দিল্লী-রাজস্থান বেড়াতে যাচ্ছে মা-বাবাকে বাড়ি পাহারায় রেখে, অথচ মেয়ে-জামাই তাঁদের নিয়ে যাচ্ছে পুরীতে জগন্নাথ এবং সমুদ্রদর্শন করাতে। এটা এখন স্বাভাবিক ঘটনা। এই যে শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার চল, তিরিশ বছর আগে ছিল না বললে বেশি বলা হবে না। নিজস্ব সংকোচ এবং অস্বস্তি তো ছিলই, এর সঙ্গে সামাজিক চাপও কাজ করত। ছেলেটির বাবা-মা হয়তো মুখে কিছু বলতেন না কিন্তু তার হয়ে তাবৎ আত্মীয়স্বজন কথা শোনাতে ছাড়ত না। তখনকার দিনের ধারণা অনুযায়ী একমাত্র ঘরজামাইরা এইরকম কাণ্ড করতে পারে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক শুধু শ্বশুরই নন, তিনি মেয়ের বাবা, এই বোধ তৈরি হতে অনেক বেশি সময় লাগল।

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল বিখ্যাত। পশ্চিম এবং পূর্ববাংলার ঘরে ঘরে একসময় সেই পুতুলগুলো গৃহবধূ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। শিবনাথবাবু দেখেছেন সেই পুতুলদের এখন কথা বলতে। কিন্তু কতটা কথা বলছে তারা? এই ছিয়ানব্বুই সালেও গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, ডাইনি অপবাদ দিয়ে প্রৌঢ়াকে মেরে ফেলে তার জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এখনও গ্রামে-গঞ্জে শোনা যাচ্ছে, স্বামী নেয় না। এই সব ঘটনা মোটেই বিক্ষিপ্ত নয়।

এরপরেও রয়েছে। যে শিক্ষিতা মেয়েটি শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়িতে চলে এসে বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি করল, তাকে প্রথমে সমঝোতা করার কথা বলেছে তার বাপ-মা। মেনে নিতে, মানিয়ে নিতে বলেছে। এই মেয়ের যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকত তাহলে তাকে মাথা নিচু করে ফিরে যেতে অথবা আত্মহত্যা করতে হতো। মেয়েটি যেহেতু চাকরি করে তাই তার দৃঢ়তা উপেক্ষা করা যায়নি। বিবাহ-বিচ্ছিন্ন হলো। এবার তার জায়গা বাপের বাড়িতে। কিন্তু সেখানে ভাই-এর বউ গম্ভীর মুখে থাকবে, সেটা দেখতে তার ভাল না লাগারই কথা। সে বাড়ি খুঁজতে লাগল ভাড়া দিয়ে থাকবে বলে। কলকাতার উত্তর এবং দক্ষিণ-অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া নিতে গিয়ে সে প্রশ্ন শুনল, 'আপনি বিবাহিতা? আপনার

হাসব্যান্ড কোথায় ?' অর্থাৎ হাসব্যান্ড জাতীয় প্রাণীটিকে না নিয়ে এলে আপনাকে বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে না। এক বাড়িওয়ালি তো বলেই দিলেন, একলা মেয়েছেলেকে বাড়ি ভাড়া দেওয়া আর হালপাল ছাড়া নৌকোয় ওঠা তো একই ব্যাপার। একজন কাউকে নিয়ে এসে বল তোমার স্বামী, আমি তার নামেই বাড়ি ভাড়ার রসিদ কেটে দিচ্ছি।'

বাড়ি যাঁরা ভাড়া দেন, তাঁদের দুশ্চিন্তা একা মেয়ে বাড়িতে ঢুকে অসভ্যতার বন্যা বইয়ে দেবে। এ তবু চাকরি করে, যদি ব্যবসা করত তাহলে তো ভাবাই যায় না। তা ধরা যাক, এই মেয়ে মধ্য কলকাতার পাঁচমিশেলি পাড়ায় বাড়ি ভাড়া পেল। এবার তার ওপর নজর গোটা পাড়ার। তাকে নিয়ে গবেষণা চলছে। কে যায় ? কে আসে ? কারও কারও উৎসাহ ঘনিষ্ঠ হবার। একলা মেয়েছেলে মানে তো বেওয়ারিশ মাল, গিয়ে দখল নিলেই হলো। আশেপাশের দু-চারজন গৃহস্থ মহিলা গায়ে পড়ে আলাপ করেছেন আর তাঁদের চোখ ঘুরেছে ছিদ্র খোঁজার আশায়। কিছু না পেয়ে তাঁরা শেষতক বলে বেড়িয়েছেন, 'নিশ্চয়ই অতীতে কোথাও কেচ্ছা করে এখন বেড়ালতপস্বী হয়ে বসে আছে।' ঘরে ঘরে চলছে স্বামীদের পাহারা দিয়ে রাখা, একলা মেয়েকে কি বিশ্বাস করা যায় ?

শিবনাথবাবু, এসব এই ছিয়ানব্বুই সালের ঘটনা। ওটা লিখতে গেলে এটাও লিখতে হয় আর মেয়েদের সুদিন ততদিন আসবে না, যতদিন না তারা শত্রুমুক্ত হবে। মুশকিল হলো, সেই যে বলে না, মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু, আমি ঠিক জানি না, তবে দেখেছি, হরিণের নিজের মাংস যেমন তার শত্রু, তেমনি একটি মেয়ে কখন আর একজনের শত্রু হয়ে যায় ! পুরো ব্যাপারটা হয়তো প্রাকৃতিক, আমি ঠিক জানি না।

॥ ১৫ ॥

অনেক কাল আগে একটি বই পড়েছিলাম। বইটির লেখক খুবই পণ্ডিত। তিনি লিখেছিলেন, ঈশ্বরীরা পুরুষ সৃষ্টি করেছিলেন। পুরুষের যে বিভিন্ন ধরনের ছবি তাঁদের মনে ছিল, সেইরকম গড়ে পৃথিবীতে পাঠাতে চেয়েছিলেন। নারীর স্রষ্টা ঈশ্বর। তাঁর যা-কিছু কামনা-বাসনা-প্রার্থনা চরিতার্থ করতে চেয়েছেন নারীর শরীর তৈরী করতে। কিন্তু ঈশ্বর একেবারেই খেয়াল করেননি, নারীর মন নিয়ে কিছু করা উচিত তা ভাবেননি। আর ওখানেই তাঁর হার হয়ে গেল

আমাদের পৌরাণিক আখ্যানগুলোতে দেখবেন দৈত্যরা প্রায়ই পৃথিবী অধিকার করে স্বর্গের দখল নিতে এগিয়ে গেছে। ছোটখাটো দৈত্য হলে দেবতারা, যেমন ইন্দ্র, কার্তিক তাদের ধ্বংস

করেছেন। কিন্তু শক্তিশালী দৈত্যদের পরাক্রমে দেবতারা স্বর্গ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হতেন। দেবতাদের পলিটব্যুরোর তিন প্রধান থর থর করে কাঁপতেন। তখন তাঁরা দেবীদের শরণাপন্ন হতেন। নিজেদের অস্ত্র দিয়ে দেবীদের যুদ্ধে পাঠিয়ে দিতেন। নিজেদের অক্ষমতা প্রমাণিত হলেও এঁদের লজ্জা বোধ ছিল না।

এই দেবীরা খুব শক্তিশালিনী ছিলেন বলে মনে হয় না। সবকটারই তো আমাদের ঘরের মা-বোনের মতো চেহারা। কালী একটু দুঃসাহসিনী বলে শরীরে কাপড়-চোপড় যে ঠিক ছিল না তা নজরে রাখেননি। আমাদের বাড়ির মেয়েরা হলে কখনই এই ভুল করত না। সেই দশ বছর বয়স থেকে তারা অন্যমনস্ক হাতে বুকের ওড়না অথবা আঁচল টেনে যাচ্ছে। এমনকি সেটি স্থানচ্যুত না হওয়া সত্ত্বেও অভ্যেস বদলে যায়নি। সেক্ষেত্রে কালীঠাকুরের দিগম্বরীরূপ অবশ্যই নিয়মভাঙা বেপরোয়া বিপ্লবের পর্যায়ে পড়ে। অতএব দেবী কালীকে বাদ দিয়ে অন্যান্য দেবীদের দিকে তাকালে তো অসহায়া বলেই মনে হয়। লক্ষ্মী নারায়ণকে, পার্বতী শিবকে চোখ রাঙাচ্ছেন এমনটা ভাবতে কষ্ট হয়। আর তাই দেবতারা ভাবতেন দেবীদের বেশ কব্জা করে ফেলেছেন। এই সুযোগ নিয়ে দেবতারা একটার পর একটা কেচ্ছা করে গেছেন কিন্তু দেবীদের চরিত্র থেকে গেছে পবিত্র। তিন শ্রেষ্ঠ দেব ছিলেন অনেক ঘোড়েল। দৈত্যদের বিরুদ্ধে নিজেরা যুদ্ধে না গিয়ে দেবীদের এক একজনকে স্তুতি করে ফুলিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিতেন। আর সেই সব মহিলা পৃথিবীর ভক্তদের রক্ষা করে নিজের মহিমা বাড়াবার লোভ সংবরণ করতে পারতেন না। আমাদের দুর্ভাগ্য ওঁদের কেউ দৈত্যদের হাতে পরাজিত হননি। হলে দেবতাদের হাঁড়ির হাল হতো।

কিন্তু দেবীরা কিভাবে যুদ্ধ করেছেন ? দুর্গার কথাই ধরুন। শিব এবং বিষ্ণু-ব্রহ্মারা তো অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাজিয়ে মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে পাঠিয়ে নিশ্চিত হলেন এই ভেবে যে হতভাগা অসুরটা এবার পটল তুলবে। দেবী এলেন যুদ্ধে। মহিষের শরীর থেকে স্বাস্থ্যবান পেশীবহুল সুদর্শন কোঁকড়া চুল অসুর বেরিয়ে এসে যুদ্ধ শুরু করতেই দেবী কি অপরূপ প্রশান্ত মুখে তার বুকে বল্লম ঠেকালেন ! দেবীর ঠোঁটে মোনালিসাকে ম্লান করা হাসি ফুটে উঠল। কেন ? কাউকে হত্যা করার সময় কেউ কি হাসে ? অথচ যে কোনো দুর্গাঠাকুরের দিকে তাকান, হাসি হাসি মুখ করে ফটোগ্রাফারের সামনে যেন পোজ দিচ্ছেন ! নাকি দেবী মনে মনে অসুরের স্বাস্থ্য এবং সাহসের প্রশংসা করছিলেন বলে মুখে প্রশান্তি ফুটে উঠেছিল ? জানি না। তবে জানি শিবঠাকুরেরা ওই দৃশ্য দেখতে পাননি। পাননি বলে আত্মসুখে মগ্ন ছিলেন। নারীর মন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই বলে লজ্জায় মাথা নোয়াতেন সামনে দাঁড়ালে। এসব কথা পণ্ডিতজনেরা নানান অছিলা নিয়ে অজস্রবার বলে গিয়েছেন। সেই অনেককাল আগে পড়া বইটি সেসময় কত আধুনিক ছিল জানি না, কিন্তু ক্রমশ অবাস্তব, অতি নাটকীয় বলে মনে হচ্ছে।

আঠারো বছরের অহনা আমার প্রতিবেশীর কন্যা। স্কুলের শেষ দুটো পরীক্ষায় দারুণ রেজাল্ট করে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয়েছে। আমার লেখা কিছু কিছু পড়েছে। এই সব মেয়েরা আজকের প্রজন্মের, চট করে এদের ভাললাগা আদায় করা খুব মুশকিল। একদিন অহনা এসে বলল, 'আচ্ছা কাকু, একটা কথা বুঝিয়ে বলবে ? এই যে তোমরা বল মেয়েদের মন ভগবান

বোঝেন না, মানুষ কি করে বুঝবে? ভগবান যে বোঝেন না তা তোমাদের কে বলল? এ
সব বলে গ্যাস দিয়ে মেয়েদের রহস্যময়ী বানিয়ে আখেরে তো তোমাদেরই লাভ।'

অহনার মুখের দিকে তাকালাম। পরিষ্কার মুখ। আমাদের তরুণকালে ওই বয়সী মেয়ের
কথা বলার সময় কীরকম নার্ভাস হয়ে যেত, নাকের ডগায় ঘাম জমত। অহনার সেসব বালাই
নেই। সোজা, সহজ ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে।

বললাম, 'আসলে মেয়েরা যা ভাবে তা মুখে বলে না বলে ওই প্রবাদ।'

'ছেলেরা বুঝি যা ভাবে তাই প্রকাশ করে?' ঝাঁঝিয়ে উঠল সে।

না, করি না। এই আমিই অনেক কথা অশান্তির ভয়ে চেপে যাই। অতএব স্বীকার করতে
বাধ্য হলাম। অহনা বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে কেন জানো? তুমি এঁড়ে তর্ক
কর না। যা সত্যি তা স্বীকার করতে পার। কিন্তু আমার বাবা পারে না। পারলে এত অশান্তি
হতো না।' অহনা চলে গেল।

আমার খটকা লাগল। অহনাদের আমি অনেক বছর ধরে জানি। যাতায়াত তেমন নেই,
ও-ই আসে হঠাৎ হঠাৎ, কিন্তু ওরা আমার অপরিচিত নয়। অহনার বাবা ব্যবসা করেন। গাড়ি
আছে। ভদ্রলোক প্রায় আমারই বয়সী। ব্যবসার কাজে মাঝে মাঝেই কলকাতার বাইরে যান
শহরে থাকলেও রাত করে বাড়ি ফেরেন। কিন্তু পাড়ার কেউ ওঁকে গলা তুলে কথা বলতে
শোনেনি।

অহনার মা সুন্দরী। একসময় তো রীতিমতো আকর্ষণীয়া ছিলেন। অস্বীকার করব না, বছর
কুড়ি আগে ওঁর দিকে তাকালে চোখ ফেরানো মুশকিল হয়ে যেত। কিন্তু বাঙালি মেয়েদের বিয়ের
আগে বা পরে শরীর নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো চেষ্টাই নেই। ফলে ভদ্রমহিলার শরীরের
এখানে-ওখানে ঈষৎ মেদ জমতে লাগল। এর ফলে উনি বেশ গিন্নি-গিন্নি দেখতে হয়ে গেলেন
কিন্তু মুখ-চোখ এখনও বেশ সুন্দর। এই দম্পতির মেয়ে অহনা। পড়াশুনায় বেশ ভাল। এখন
পর্যন্ত কারও প্রেমে পড়েছে বলে মনে হয় না। মেয়েরা যদ্দিন না কারও প্রেমে পড়ে তদ্দিন
তাদের মধ্যে অদ্ভুত সারল্য থাকে। তথাকথিত প্রেম মেয়েদের সংকীর্ণ করে দেয়, লুকোতে
শেখায়, ঈর্ষা বাড়িয়ে দেয়। অহনার মধ্যে এসব লক্ষণ এখনও ফুটে ওঠেনি।

তাহলে এমন কি হলো যা অহনাদের চিন্তিত করছে। ওর বাবা কী এমন আচরণ করছে
যা তাঁকে অবুঝ বলে মনে করতে সাহায্য করছে!

মাথায় কিছু ঢুকে গেলে সেটার সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাই না। এ আমার
অনেকদিনের অসুখ। পরের রবিবার সন্ধ্যেবেলায় ওদের বাড়িতে গেলাম। দরজা খুলে অহনার
মা সান্ত্বনা বললেন, 'আরে! কী সৌভাগ্য! আসুন আসুন।' ভেতরে ঢুকে সোফায় বসে জিজ্ঞাসা
করলাম, 'সে কোথায়?'

'অহনা? ও মামার বাড়িতে গিয়েছে। এমনিতে যেদিন যায় সেদিনই ফিরে আসে, তা
এবার বলল তিন রাত কাটিয়ে আসবে। তা অহনা নেই বলে কি আমাদের কোনো দাম নেই?'
সান্ত্বনা ঠাট্টা করলেন।

'তা নয়। কি খবর বলুন!' সান্ত্বনাকে দেখে এবং কথা শুনে মনেই হচ্ছিল না যে এ

বাড়িতে কোনো অসন্তোষ রয়েছে। অথচ— !

'গরীবের আর খবর! আপনি বলুন কি খাবেন? চা না কফি?'

'আমার জন্যে আলাদা করে কিছু বানাবার দরকার নেই।'

ভদ্রমহিলা কিছু ভাবলেন। তারপর গলা তুলে ডাকলেন, 'এই যে শুনছো? সমরেশবাবু এসেছেন। শুনতে পেয়েছো?'

অহনার বাবার গলা ভেসে এল, 'কে সমরেশবাবু?'

'আঃ!' সান্ত্বনা দ্রুত উঠে গেলেন। তারপরই অবশ্য স্বামীর পেছন পেছন তিনি ফিরে এলেন। অহনার বাবা হাতজোড় করে বললেন, 'হঠাৎ কি পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠল? অবশ্য আপনি তো আমাদের কাছে আসেননি, যার খোঁজে এসেছেন সেই বালিকা বাড়িতে নেই।'

'আমি কিন্তু কারও খোঁজে আসিনি।'

'তাই। এই তো কদিন আগে আপনার কাছ থেকে ঘুরে এসে কীসব উদাহরণ দিচ্ছিল। যাক গে। লিখছেন কেমন তাই বলুন। আমার অবশ্য পড়ার সময় হয় না। ব্যবসা এমন বাজে জিনিস, ওসবের জন্যে সময়ই পাওয়া যায় না।'

আমরা কথা বলছিলাম। যেসব কথা মানুষ ভদ্রতা করে বলে সেইসব কথা বেশিক্ষণ চালানো যায় না। কথাবার্তা তাই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল। সান্ত্বনাকে দেখছিলাম একবার ভেতরে যাচ্ছেন আবার বেরিয়ে আসছেন। অহনার বাবা বললেন, 'সমরেশবাবুকে চা-কফি কিছু দিলে না?'

সান্ত্বনা হাসলেন, 'জিজ্ঞাসা করেছি, উনি ওসব এখন খাবেন না।'

ভদ্রলোক নিঃশব্দে হাসলেন, 'কি ব্র্যান্ড চলে আপনার?'

'ব্র্যান্ড?' অবাক হলাম।

'আমি হার্ড ড্রিংকসের কথা বলছি। হুইস্কি খান তো?'

'কালেভদ্রে।'

'রোজ আর কে খাচ্ছে?' ভদ্রলোক হাত ঘোরালেন।

'বাঃ! বছর দশেক আগে রোজ ক্লাব থেকে খেয়ে আসতে।' সান্ত্বনা প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু তাঁর মুখে হাসি স্পষ্ট হলো।

'তখন মেয়ে ছোট ছিল। এখন বেশি হয়ে গেলে কথা বন্ধ করে দেয়।'

'বেশ করে।' সান্ত্বনা মাথা নাড়লেন।

'দাও গো। এখানেই গ্লাস আনো।'

'এখানে খাবে? ফট করে কেউ যদি এসে পড়ে। তার চেয়ে ভেতরে গিয়ে বসো তোমরা, আমি ব্যবস্থা করছি।'

অহনার বাবা উঠে পড়লেন। 'আসুন স্যার। আমরা সেফ জোনে চলে যাই।'

আমি স্থির করলাম ভেতরে যাব। এই সময় আমি অনেক ন্যাকামি করে বিদায় নিতে পারতাম। কিন্তু সেটা করলে এ বাড়িতে আসাটাই বৃথা হয়ে যেত।

ভেতরের ঘরে ঢুকে একটা সিঙ্গল খাট এবং জিনিসপত্র দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না

এই ঘর মেয়েরা ব্যবহার করে না। সেক্ষেত্রে এটি অহনার বাবার শোওয়ার ঘর। অর্থাৎ ভদ্রলোক স্ত্রীর সঙ্গে এক ঘরে শোন না।

একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক আরাম করে বিছানায় বসলেন। 'সাউথ ক্যালকাটায় এ ব্যাপারটা সহজ হয়ে এসেছে বলতে পারেন। চা-কফির মতো রাত সাতটা বাজলেই বাইরের ঘরে চালু হয়ে যায়।'

'রাত সাতটা ?'

'অবাক হচ্ছেন ? আমি মশাই এয়ারকন্ডিশন্ড ঘরে বসে বিকেল ছটাকে রাত বলতে শুনেছি। তা যা বলছিলাম, নর্থের সেটআপ এত পুরনো যে ব্যাপারটার ওপর একটা আব্রু রাখতে হচ্ছে। দুটো গ্লাস কেন ? তুমি নেবে না ?'

ট্রেতে গ্লাস, জল, বাদাম, আলুভাজা এবং হুইস্কির বোতল। সান্ত্বনা একটা ছোট টেবিলের ওপর সেটিকে রেখে খাটের পাশে এনে দিয়ে বললেন, 'পাগল ! আমার হাতে মদের গ্লাস দেখলে সমরেশবাবু গল্প লিখবেন, "আজকের পটেশ্বরী বউঠান"। ও পাঠশালায় নেই।'

অহনার বাবা হো হো করে হাসলেন। ঠিক সেই সময় বাইরের দরজায় শব্দ হলো। সান্ত্বনার কপালে ভাঁজ পড়ল। অহনার বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এই সময় আবার কে এল ? নিশ্চয়ই তোমার বাপের বাড়ির কেউ !'

'আহা ! তোমার ভাইটাই তো হতে পারে !'

'অসম্ভব। ওরা এত রাতে আমার কাছে আসে না।'

'আমার ভাইরাও এখন আসবে না।'

'দ্যাখো, টাকার দরকার পড়েছে হয়তো। জানে গৌরী সেন আছে—।'

'আশ্চর্য ! কবে একবার টাকা চেয়েছিল আর তুমি এখনও তাই নিয়ে খোঁটা দিয়ে চলেছ ! আমি খুলতে পারব না। তুমি যাও।'

গ্লাসে মদ ঢালা হয়ে গিয়েছিল। নিজেরটা হাতে নিয়ে অহনার বাবা বললেন, 'বিরক্ত করো না। এটা আমার সাধনার সময়। তুমি গিয়ে কাটিয়ে দাও। আমাকে খুঁজলে বলে দিও বাড়িতে নেই।'

এবার আরও জোরে কড়া নাড়ার শব্দ হলো।

অহনার বাবার গলার স্বর আচমকা নরম হয়ে গেল, 'প্লিজ, যাও। গিয়ে কাটিয়ে দাও। তুমি যদি হেল্প না কর তাহলে কোথায় যাই বল।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে আমি দেখছি।'

সান্ত্বনা মাথা নাড়লেন, 'না না, আপনি যাবেন না। যত খারাপ কাজ ও আমাকে দিয়ে করায় ! অথচ আমার বাপের বাড়ির লোকদের সহ্য করতে পারে না। ওদের দোষ কি তাই আজ পর্যন্ত জানলাম না।'

হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে অহনার বাবা বললেন, 'মুড নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তুমি দশভুজা, দরজা খুলে আপদ দূর করো।'

সান্ত্বনা শেষ পর্যন্ত গেলেন। দরজা খোলার শব্দ হলো। স্পষ্ট কানে এল, 'তোমরা কি

ঘুমোচ্ছিলে ? এত জোরে কড়া নাড়ছি, শুনতে পাচ্ছ না ?'

'তুই এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি ?'

'ওখানে থাকতে পারলাম না, তাই। বাবা কোথায় ?'

'ও ঘরে। এখন যাস না।'

'কেন ? ও, হুইস্কি নিয়ে বসেছে ?'

'ওই আর কি ! ব্যবসায় খাটাখাটুনি তো কম হয় না !'

'আমি তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইছি না।'

তারপর আর সংলাপ শুনতে পেলাম না। সান্ত্বনা ফিরে এলেন একাই, এসে চাপা গলায় বললেন, 'মেয়ে এসেছে। মেজাজ খারাপ।'

'কেন ? হোয়াই ? মামার বাড়িতে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। ওকে ডাক।'

'না। এখন না।' চোখ টিপলেন সান্ত্বনা।

অহনার বাবা কি বুঝলেন তিনিই জানেন, গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন, 'আরে, আপনি হাত গুটিয়ে বসে আছেন যে ! নিন।'

বললাম, 'অহনাকে কি বলেছেন আমি এসেছি ?'

সান্ত্বনা মাথা নাড়লেন, 'না। বললেই দেখা করতে আসত।'

'কিন্তু ওকে তো বলা দরকার। নইলে দুঃখ পাবে।'

'দুঃখ ? ওইটুকুনি মেয়ে দুঃখ পাবে বলে আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন মশাই ? তা ছাড়া ওর এখনও দুঃখ পাওয়ার বয়স হয়নি।'

'দুঃখ পাওয়ার বয়স আছে নাকি ?' আমি অবাক হলাম।

'মেয়েছেলের আছে। ওই যে বলে না, মেয়েদের মন বোঝা যায় না, রাবিশ। আমি সব বুঝতে পারি। এই যে ভদ্রমহিলা, একেও বুঝেছি।'

'চমৎকার !' গলাটা ভেসে এল দরজা থেকে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে অহনা। পরনে শাড়ি। বেশ লম্বা দেখাচ্ছে আজ ওকে।

'কিরে, চলে এলি ? আরে আমার এত বছর বিয়ে হলো, একবারই এক রাত্তির ছিলাম। ভাগ্যিস তোর ওপর মামার বাড়ির প্রভাব নেই। ওহো, আজ আমাদের খুব আনন্দ, সমরেশবাবু এসেছেন এ বাড়িতে।' গ্লাস শেষ করলেন অহনার বাবা। তারপর ইশারা করলেন আমাকে খাওয়ার জন্য।

'সমরেশবাবু এসেছেন এই আনন্দে হুইস্কি খুলে বসেছ ?'

'খুব। তাই। তুই তো জানিস আমার মধ্যে প্রিটেনশন নেই।'

'তাই নাকি ?'

'তাই নাকি মানে ? আমি মিথ্যে কথা বলছি ? সান্ত্বনা, দ্যাখো, তোমার মেয়ে কিন্তু খুব বেড়ে গিয়েছে।'

'যা সত্যি তাই বলেছে।'

'সত্যি ? আমি মিথ্যাবাদী ?'

'তুমি যা নও তাই নিজেকে ভাবো।'

'একশোবার ভাবব। আমি রোজগার করি, কারও কাছে হাত পাতি না তাই নিজের মতে চলি। আমার পথ কখনও ভুল হয় না।'

সান্ত্বনা বললেন, 'সমরেশবাবু, আমার খুব খারাপ লাগছে এসবের মধ্যে আপনাকে বসিয়ে রাখতে। কী লজ্জা!'

অহনা বলল, 'বাঃ! লজ্জা পাওয়ার কী আছে! উনি চরিত্র পাচ্ছেন। লাভ তো ওঁর হচ্ছে। তাই না?'

আমি বললাম, 'অহনা, আমার মনে হচ্ছে যে গলায় তোমার কথা বলা ঠিক নয়, সে গলায় তুমি কথা বলছ!'

'এরকম আর কি কি মনে হয়?'

'তার মানে?'

'আমার কথা বলার ভঙ্গিটা আপনার খারাপ লেগেছে। কিন্তু কেন আমি এভাবে কথা বলি তা জানতে চাইলেন না তো? বাবা তাঁর বন্ধুর সঙ্গে এই ঘরে বসে মদ খাচ্ছেন। এতে আমার কিছুই বলার নেই। কিন্তু কয়েকটা দৃশ্য আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। আমি যখন পাঁচ-বছরের ছিলাম তখন বাবা তাঁর ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বন্ধুকে এই ঘরে মদ খাওয়াতেন। আ মাকে বাধ্য করতেন পরিবেশন করতে। তখন মায়ের চেহারা খুব সুন্দর ছিল।'

'কি, কি বললি? এ কথা বলতে পারলি?' চিৎকার করে উঠলেন অহনার বাবা। আ ঘুরে ঠাস করে মেয়ের গালে চড় মারলেন সান্ত্বনা।

'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? ওপরে কাদা ছুঁড়লে সেটা নিজের গায়ে লাগে এ কথ জান না?'

অহনা আমার দিকে তাকাল, 'আমি কি অন্যায় করলাম?'

বললাম, 'ছেলেবেলায় যে ছবি তোমার মনে আছে তার ব্যাখ্যা বড়বেলার বুদ্ধি দিয়ে কর কেন?'

'আমি তো কোনো ব্যাখ্যা করিনি। ব্যাখ্যা করল এরা। মা, তুমি শুনলে দুঃখ পাবে, কি দুঃখ ভুলেও যাবে বাবার দিকে তাকালে। ছোটমামা প্রতিমাসের মাইনের দিন বাবাকে তি হাজার টাকা দিয়ে বাড়িতে তিন হাজার নিয়ে যায়। তাই ওদের বাড়িতে আলুর তরকারি আ ভাত ছাড়া কোনো রান্না হয় না। আমি গিয়েছিলাম বলে ছোটমামা ডিম আনতে দিয়েছিল। আমি বিকেলবেলায় মামাতো ভাইয়ের মুখে শুনলাম সে গত তিন মাস মাছ-মাংস-ডিম খায়নি এরপর আর ও বাড়িতে থেকে ডিমের ঝোল খেতে পারলাম না।' অদ্ভুত গলায় বলে গেল অহনা

অহনার বাবা বললেন, 'আশ্চর্য! এতে আমার কি করার আছে? কাউকে টাকা ধার দিয়ে যদি বলি শোধ করতে হবে না, তাহলে কি তোমাদের সুবিধে হবে? আমার টাকা আমি ফেরত নিয়েছি। তোমার মামা যেভাবে ফেরত দেবে বলেছিল সেইভাবেই। আমি তোমার মামা বলে দানসাগর করতে বসিনি।'

'একসঙ্গে প্রতিমাসে তিন হাজার না নিয়ে এক হাজার নিতে পারতে। তাহলে ওদের এ

দুরবস্থা হতো না! ছি ছি ছি!'

'দ্যাখো অহনা, আমি কিন্তু আমার মেজাজ হারিয়ে ফেলব। তোমার মামাকে আমি যেচে টাকা ধার দিইনি। তার প্রয়োজনে সে টাকা নিয়েছিল। যেভাবে শোধ করবে বলেছিল তাই করছে। এতে আমার অপরাধটা কোথায়?'

সান্ত্বনা এবার কঠোর গলায় বললেন, 'এই! তুই তোর ঘরে যা।'

অহনা এবার আমার সামনে এসে দাঁড়াল। 'কি বলেছিলাম আপনাকে? মুশকিল হলো শুধু বাবা নন, বাবাকে সাহায্য করছে মা-ও। কেন করছে? এর উত্তরটা আপনি জানেন?' রহস্যময় হাসি হেসে অহনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অহনার বাবা বললেন, 'তোমার জন্যে ও এত মাথায় উঠেছে!'

'আমার জন্যে? বেশ তাই যদি হয়, ও অন্যায়টা কি বলেছে? সত্যি কথা মুখের ওপর বলছে মেয়ে। আমি পারিনি, ও পেরেছে। সহ্য করতে পারছ না কেন? নিজের অন্যায় স্বীকার করতে লজ্জা কিসের?' সান্ত্বনা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

অহনার বাবাকে দেখলাম। ভদ্রলোক আমার উপস্থিতি যেন ভুলে গেছেন।

ছেলেবেলায় কোনো এক গ্রাম্যমেলায় শিবঠাকুরের মাটির মূর্তি দেখেছিলাম। স্পষ্ট ছবিটা মনে ছিল না। তবে শিবঠাকুরকে খুব কাহিল মনে হয়েছিল। মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কারণটা। মা বলেছিলেন, 'ওটা দেবতাদের লীলা। তুই বুঝবি না এখন।'

অহনার বাবা সেই ছবিটাকে স্পষ্ট করলেন।

॥ ১৬ ॥

উদ্যোগ নিয়েছিল স্বপ্না। প্রায় প্রত্যেক মাসেই সে দেখেছে অরুণরা জড়ো হয় আড্ডা মারতে। দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত। অরুণের বন্ধুরা সবাই বিবাহিত, ছেলেমেয়ে রয়েছে, কিন্তু আড্ডা চলার সময় ওদের দেখলে কে এ কথা বলবে! ভেতরের ঘরে মাঝেমধ্যে যে দু-একটা শব্দ ছিটকে আসে তা শুনে কান লাল হয়ে যায় স্বপ্নার। ঘুরে ঘুরে এর বাড়ি ওর বাড়িতে আড্ডা চলে, সঙ্গে তাস। শুধু প্রণববাবু আর বিকাশবাবুর বাড়িতে জায়গা নেই, মা-বাবা রয়েছেন, তাই ওদের বাড়ি বাদ।

স্বপ্নার এসব দেখে মনে হতো ছেলেরা যদি পঞ্চাশে পড়েও এরকম জমিয়ে আড্ডা মারতে পারে তাহলে মেয়েরা পারবে না কেন? কুড়ি বছর হলো বিয়ে হয়েছে স্বপ্নার। শ্বশুরবাড়িতে এসেই শ্বশুর-শাশুড়ির সেই যে সেবা শুরু করেছিল, তাঁরা মারা না যাওয়া পর্যন্ত রেহাই

মেলেনি। যে মেয়েকে বাবা মা লোডশেডিং-এর সময় পাখার বাতাস করতে দেননি তাকে এ বাড়ির সতীলক্ষ্মী সেজে সব কিছু করতে হয়েছে। বিয়ের আগে বয়স কম ছিল। মা যা শিখিয়ে দিয়েছিল তাই মান্য করেছে সে। কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ। স্কুলের বান্ধবীরা কোথায় চলে গেছে বিয়ের পর তা আর জানা নেই। পাড়ায় দুই বান্ধবী ছিল স্বপ্নার। বাপের বাড়িতে গেলে তাদের খবর পায় সে। একজন আছে কানাডায়, আর একজন অস্ট্রেলিয়ায়। কলকাতায় এলে প্রথমদিকে খোঁজখবর করেছে তারা। এক-আধবার দেখাও হয়েছে কিন্তু আগের মতো আড্ডা জমেনি। এখন তো কোনো যোগাযোগ নেই।

স্বপ্না একটু ফাঁপরে পড়ল। আজ নতুন করে ভেবে দেখল তার কোনো বান্ধবী নেই। যেটুকু কথাবার্তা তা স্বামীর বন্ধুদের স্ত্রীদের সঙ্গে এবং বেশির ভাগই টেলিফোনে। এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বলতে যা বোঝায় তা তৈরি হয়নি কখনও। স্বপ্নার মায়ের অথবা শাশুড়িরও কোনো বন্ধু ছিল না। বাঙালি মেয়েদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই পর্ব চুকে যায়। অথচ ছেলেদের দ্যাখো, সত্তর বছরের বুড়ো রকে বসে দিনরাত আড্ডা মেরে যাচ্ছে।

ভাবনাটা এই পর্যায়েই থাকত যদি না অরুণ এসে বলত সামনের শনিবার ওদের জোর আড্ডা আছে। মুকুন্দবাবু নতুন ফ্ল্যাট কিনেছেন সল্টলেকে। গৃহপ্রবেশ করার পর তালাচাবি দিয়ে রেখেছেন। সেখানেই বসবে আড্ডা। সেই রাতে কেউ বাড়ি ফিরবে না। বিকেল থেকেই নানান রকমের খাওয়াদাওয়া, মাঝরাত পর্যন্ত তাস পিটিয়ে সবাই ঘুমাতে যাবে। পরের সকালে চা খেয়ে বাড়ি ফিরবে সবাই। শুনে একটা কথাও বলেনি স্বপ্না। প্রতিমাসের আড্ডায় হচ্ছে না, এখন সারারাত চাই। যা ইচ্ছে করুক। তারপর ফোনের সংলাপ কানে আসতে লাগল। বন্ধুরা ফোন করছে মেনু নিয়ে। রেয়াজি মাটন, চিকেন এবং রুটি। মাছভাজা আর মেটের চচ্চড়ি থাকবে সন্ধ্যেবেলায়। টেলিফোনে অরুণ বলল, 'আমার তো ওসব খাওয়ার অভ্যেস নেই, তোমরা খাচ্ছ বলে না হয় সঙ্গ দিতে অল্পস্বল্প খাব। আউট হলে ভয় নেই, বাড়ি ফিরতে তো হচ্ছে না।'

হতভম্ব হয়ে গেল স্বপ্না আড়াল থেকে কথাগুলো শুনে। তার মানে মাছমাংস, তাস শুধু নয়, সঙ্গে মদও চলবে। আসল উদ্দেশ্য তাহলে ওইটেই, সারারাত আড্ডা মারার ব্যাপারটা বাহানা। ঠিক রাগ নয় কিন্তু নিজেকে প্রচণ্ড প্রতারিত বলে মনে হচ্ছিল। যে লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে কথা বলাতে হয়, তার মুখে এখন খই ফুটছে। যেন মুক্তি পাবে সেই আনন্দে অরুণের হৃদয় ধেই ধেই করে নাচছে। অরুণের গলা কানে এল, 'ব্রিজ রাত বাড়লে চলবে না একথা বুঝতে পারছি। তাহলে রামিই হোক, বিশ পয়সা পয়েন্ট। অ্যাঁ। চেলে? তিনতাসে আমার একদম লাক নেই, কলেজে থাকতে একবার খেলেছিলাম। ঠিক আছে যা বলছ তাই হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি আর বিকাশ ঠিক পাঁচটার মধ্যেই হাডকোর সামনে পৌঁছে যাব।'

টেলিফোন রেখে এঘরে আসতেই স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি জুয়ো খেলবে?'

'জুয়ো? ও শুনতে পেয়েছ।'

'উত্তর দিলে না কিন্তু।'

'ওই আর কি! একদিন একটু হৈচৈ করা।'

'তুমি মদ খাবে?'

'মদ ? আশ্চর্য। আমি, আমাকে কখনও মদ খেতে দেখেছ ?'

'শনিবার খাবে ?'

'দ্যাখো স্বপ্না, আমার বন্ধুরা সবাই ভদ্রলোক, জীবনে প্রতিষ্ঠিত। একদিন শখ করে যদি সবাই একটু-আধটু ড্রিঙ্ক করে তা নিয়ে মাথা ব্যথা করার কোনো মানে হয় না। আমরা খাই না, সেটা আমাদের ব্যাপার। এখন কলকাতার সত্তরভাগ মানুষ পরিমিত মদ্যপানকে খারাপ বলে মনে করে না। ডাক্তাররাই প্রেসক্রাইব করছে হার্ট ভাল রাখার জন্যে এক পেগ খেতে।'

'তুমি যা করছ তা যদি তোমার ছেলে করে তাহলে মেনে নিতে পারবে ?'

'এখন, এই স্কুলে পড়ার সময় করলে মানব না। পরে বড় হয়ে চাকরি-বাকরি করে যদি নিজেকে ঠিক রেখে করতে চায় তাহলে আপত্তি করব না।'

'বাঃ ! আচ্ছা, বাড়ি ফিরতে হবে না এই আনন্দে তুমি মদ খেয়ে ওখানে আউট হয়ে শুয়ে রইলে আর সেই সময় খোকার অথবা আমার মারাত্মক কোনো দুর্ঘটনা ঘটল, এরকম তো হতে পারে। পারে না ?'

'হওয়ার চান্স এক লক্ষে একবার। এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি, এই মুহূর্তেই আমার হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যেতে পারে। পারে না ? ব্যাপারটা সেই রকম। তুমি মিছিমিছি ভাবছ। আমরা কোনো অন্যায় করতে যাচ্ছি না।' অরুণ চলে গেল টয়লেটে।

তারপর থেকেই স্বপ্নার মনে হতে লাগল, ছেলেরা যদি পারে তাহলে মেয়েরা পারবে না কেন ? অবশ্য একথা ঠিক, পারতে হলে মেয়েদের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকা দরকার।

পরদিন অরুণ অফিসে বেরিয়ে গেলে সে মুকুন্দবাবুর স্ত্রী কল্পনাকে ফোন করল। স্বামীর বন্ধুদের টেলিফোন নম্বর যে পাতায় লিখেছে সেটাকে সামনে রাখল। কল্পনাই ফোন ধরল, 'ওমা, আপনি ? কি খবর ?'

'ভাল।' স্বপ্না হাসল, 'বিরক্ত করলাম ?'

'মোটেই না। মেয়ে, মেয়ের বাবা বেরিয়ে গেছে, এখন তো আমি ফ্রি। একদিন আসুন না আমাদের বাড়িতে। খুব ভাল লাগবে।'

'আসুন বললে যাব না। আমরা বোধহয় প্রায় সমবয়সী।'

'ও হ্যাঁ। বেশ, এসো। কবে আসবে ?'

'কোন বাড়িতে যাবো ? ভবানীপুর না সল্টলেকের ?'

'সল্টলেকের বাড়ি তো তালাবন্ধ।'

'বাঃ, সেখানে তো সামনের শনিবার আড্ডা বসছে শুনলাম।'

'হ্যাঁ। সবাই মিলে ওঁকে ধরল আর উনিও রাজী হয়ে গেলেন।'

'তুমি আপত্তি করলে না কেন ? মানে, সারারাত ধরে ওইসব—।'

'ওইসব মানে ?' কল্পনার গলায় সতর্কতা।

'ওই তাসটাস খেলা। তাস মানেই তো জুয়ো।'

'জুয়ো খেলবে বলে তো জানতাম না।'

'শুধু জুয়ো ? তার সঙ্গে পানও আছে।'

'পান ?'

'খিলিপান নয়। সুরাপান। আমাদের কাছে বন্দী থেকে থেকে বাবুদের প্রাণ আইঢাই কর বলে একদিনের জন্যে মুক্তির স্বাদ পেতে চাইছেন।'

কল্পনা বলল, 'ঠিক বলেছ। শনিবারের প্রোগ্রাম ঠিক্ হবার পর এই আমার কর্তার হাবভাব বদলে গেছে। যেন কাশ্মীর বা দার্জিলিং-এ বেড়াতে যাচ্ছে এমন ভাবভঙ্গি। তবে ওই যে বললে, পান, উনি কিন্তু দুটোর বেশি কখনই করেন না। এইতো গত রবিবার বিকাশবাবুরা এসেছিলেন, দু পেগ করে সবাই খেলেন।'

'তোমার বাড়িতে, মানে ভবানীপুরের বাড়িতে বসে খেল ?'

'হ্যাঁ। ও তো সবসময় বাড়িতেই খায়। আমিই টুকটাক ভেজে দিই।'

'তোমার মেয়ে ?'

'ও তো জন্মইস্তক দেখে আসছে। বাবাকে কখনও বেচাল হতে দ্যাখেনি। একদিন একটা মাতালকে রাস্তায় দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল, মা, এই লোকটা নিশ্চয়ই খারাপ মদ খায়, না ? বোঝ কাণ্ড !'

'তোমার খারাপ লাগে না ?'

'সত্যিকথা বলব ? আত্মীয়স্বজন হুট করে এসে পড়লে খুব অস্বস্তি হয়। আমার নিজের একদম ভাল লাগে না খেতে। কী মজা পায় কে জানে ! কিন্তু ওরা তো কেউ খেয়ে অসভ্যত করে না। কফি খাচ্ছে না ড্রিঙ্ক করছে বোঝা যায় না।'

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ফোনগুলো একের পর এক করে গেল স্বপ্না। অরুণের বন্ধুদের স্ত্রীর কেউ-ই ব্যাপারটা সমর্থন করছে না। দিনের বেলায় যতখুশি আড্ডা মারো কিন্তু রাত দশটার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসা উচিত। প্রণববাবুর স্ত্রী বললেন, 'কাউকে বলবেন না ভাই, ওর আবা অর্শ আছে। রাত জাগলেই পরদিন রক্তপাত হয়। তখন তো আমাকেই সেবা করতে হবে। অথ সেসব তোয়াক্কা করছে না এখন।'

'আপনি বুঝিয়ে বলেছেন ?'

'কে শোনে কার কথা ? উনি এখন মুক্তির স্বপ্ন দেখছেন।'

মুক্তির স্বপ্ন ! স্বপ্নার মনে হলো কথাটা ঠিক। যেন স্বামীগুলোকে ধরেবেঁধে খাঁচায় পু রাখা হয়েছিল, শনিবার সেসব বন্ধন ঘুচিয়ে আকাশে উড়ে বেড়াবে। ন্যাকামি ! বাড়িতে যখ থাকে তখন মেজাজ দেখলে ঔরঙ্গজেব বলে মনে হয়।

পরদিন কল্পনাই ফোন করল তাকে। অরুণ তখন অফিসে যাবে বলে জামাপ্যান্ট পরছে রিসিভার তুলে স্বপ্না সাড়া দিতেই কল্পনা বলল, 'শোন, কাল সারাদিন আমি ভেবে দেখলা তুমি ঠিক বলেছ। যারা যাচ্ছে তাদের প্রত্যেকের বউকে ফোন করেছি আমি। সবাই আমার স একমত। কিন্তু টেলিফোনে নয়, সামনাসামনি বসে আমাদের কথা বলা দরকার।'

মনে আনন্দ এল, কিন্তু ঘরে অরুণ থাকায় স্বপ্না নিস্পৃহ হবার ভান করল, 'বেশ তো কবে হবে দিন ঠিক করে জানিয়ে দিও।'

'কবে মানে ! আর দেরি নয়, আজই। তোমার বাড়িতে যদি সবাই দুটো নাগাদ যাই তাহে

কেমন হয় ? চারটের মধ্যে বেরিয়ে পড়ব। ওদের জানতে দেওয়া চলবে না।'

'ঠিক আছে।'

'তুমি অমন কাঠ কাঠ করে কথা বলছ কেন ?'

'এলে বলব।'

'অরুণবাবু এখনও বের হননি ?'

'না।'

রিসিভার নামিয়ে রাখতেই অরুণ জিজ্ঞাসা করল, 'কার ফোন ?'

'তুমি চিনবে না।' স্বপ্না ঘর থেকে বের হয়ে গেল অরুণের অবাক-দৃষ্টি এড়াতে। স্বামীর কাছে মিথ্যে বলতেও অস্বস্তি হয়। অভ্যেস নেই তো।

আড়াইটের মধ্যে সবাই এসে গেল। প্রত্যেকেই খুব উত্তেজিত। অলকবাবুর বউ কমলা বলল, 'শোন, তাস মদ চলবে, সঙ্গে আর কি থাকছে তা আমি জানি না।'

'আর কি মানে ?' কল্পনা চমকে উঠল, 'মেয়েমানুষের কথা বলছ ?'

'কি জানি ভাই। পুরুষমানুষকে চিতায় উঠলেও বিশ্বাস করা যায় না।'

কল্পনার মুখ শক্ত হয়ে গেল, 'ওসব চলবে না আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের মিসেস বক্সীকে বলে রাখব। উনি কড়া নজর রাখবেন। মেয়েমানুষ দেখলেই আমাকে ফোন করে দেবেন। তখন...।' কল্পনা বাকিটা শেষ করতে পারল না।

প্রণববাবুর স্ত্রী বললেন, 'এটা কি ঠিক হবে ? ঘরের ব্যাপার বাইরের লোককে জানানো ?'

শোভা বলল, 'তার চেয়ে যদি একটা ভিডিও ক্যামেরা থাকত, আগে থেকে ফিট করে দিয়ে আসতাম, সব ছবি উঠে যেত।'

প্রস্তাবটি মনের মতো হলেও বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। স্বপ্নাদের ভিডিও ক্যামেরা আছে। কিন্তু সেটা তো অনন্তকাল চালু রাখা যাবে না।

এতক্ষণ উসখুস করছিল স্বপ্না, এবার বলল, 'কিন্তু ভাই, সবার আগে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি করতে হবে। এটা খুব জরুরি।'

কল্পনা ভ্রু কোঁচকালো, 'বন্ধুত্ব ?'

'হ্যাঁ। আমরা যেন পরস্পরকে বন্ধু বলে ভাবি। ওরা যেমন পরস্পরের বন্ধু, আমরাও তেমন যদি না হই তাহলে।'

'তা তো বটেই।' শোভা বলে উঠল, 'বন্ধু হতে অসুবিধে কোথায় ? আমাদের সবার সমস্যা যখন এক তখন বন্ধু তো হয়েই গেছি।'

প্রণববাবুর স্ত্রী বললেন, 'এখন কি করলে ওদের জব্দ করা যায় ?'

এক এক জন এক এক রকমের রাস্তা বলতে লাগল। কিন্তু কোনোটাই লাগসই বলে মনে হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত স্বপ্না প্রস্তাবটা দিল, 'ওরা যদি সংসার ভুলে এই শহরের মধ্যেই আলাদা হয়ে আড্ডা দিয়ে রাত কাটাতে পারে তাহলে আমরাই বা তা পারব না কেন ? আমরা কেউ ছেলেমানুষ নই !'

কল্পনা বলল, 'ঠিক বলেছ। চমৎকার আইডিয়া। ওরা যা করছে আমরাও তাই করব
এই শনিবার ওরা যাচ্ছে, পরের শনিবার আমরা যাব। আড্ডা মারব, খাব, ফুর্তি করব, তা
পরদিন যে যার বাড়িতে ফিরে যাব, ঠিক ওদের মতন।'

প্রস্তাবটা প্রথমে সবার মনঃপুত হয়ে গেল। এটা শুধু বদলা নেওয়া নয়, বিরা
অ্যাডভেঞ্চার করা হবে। কিন্তু শোভা বলল, 'জানো ভাই, গত পাঁচবছর আমি এক দিনের জ
বাড়ির বাইরে যাইনি। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর ওই পর্ব মাথায় উঠে গেছে, আর কোথা
বেড়াতে যাব সে সময় উনি পান না।'

স্বপ্না বলল, 'এই তো সুযোগ। আমরা আমাদের মতো যাচ্ছি।'

প্রণববাবুর স্ত্রী বললেন, 'রাত্রে বাইরে থাকলে ওদের খাওয়া-দাওয়া—, মানে আমিই
করে থাকি। উনি তো জীবনে রান্নাঘরে ঢোকেননি।'

কল্পনা বলল, 'তা তোমার মনে বেশি দয়া জাগলে সকালে রেঁধে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখে যেও
রাত্রে তিনি গরম করে খাবেন।'

শোভা জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কখন যাব ?'

'বিকেল তিনটের সময় সবাই আমার বাড়িতে এসো। ওখান থেকে দল বেঁধে যাব আমরা
ওঃ, ভাবতেই কি রকম উত্তেজনা হচ্ছে!' কল্পনা বলল।

প্রণববাবুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, ওখানে গিয়ে আমরা কি করব ?'

স্বপ্না বলল, 'আড্ডা মারব।'

শোভা বলল, 'তাস খেলব। আমি টোয়েন্টিনাইন খেলতে পারি।'

কল্পনা বলল, 'ব্রে খেলা খুব সোজা, যে জানে না তাকে শিখিয়ে দেব।'

স্বপ্না বলল, 'ওরা তো খুব মদ খাবে। ভাববে আমরাও খাচ্ছি।'

কল্পনা বলল, 'খেলে মন্দ হয় না। আমার বাড়িতে একটা জিনের বোতল আছে। তোমা
বললে নিয়ে যেতে পারি।'

প্রত্যেকটা মুখের চেহারা পাল্টে গেল তৎক্ষণাৎ। শেষ পর্যন্ত প্রণববাবুর স্ত্রী বললেন, '
থাক। ওদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য থাকা উচিত।'

'পার্থক্য। হুঁ। এই যে আমরা মেয়েরা মেয়েরা যাচ্ছি, দেখো ঠিক ওরা সন্দেহ করবে
কোনো পুরুষমানুষকে নিশ্চয়ই নিয়ে যাচ্ছি। আমার জানা আছে।' কল্পনা বলল।

স্বপ্না প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্যে মেনু কি হবে জিজ্ঞাসা করল। সঙ্গে সঙ্গে নানান রকমে
খাবারের নাম উঠতে লাগল। ঠিক হলো ওখানে গিয়ে কেউ রাঁধবে না। যে যার বাড়ি থেকে
একটা পদ রান্না করে নিয়ে যাবে। বিকেল তিনটে থেকে অখণ্ড অবসর আর আড্ডা মারা যাবে

পরের দিনই অফিস থেকে ফিরে অরুণ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা নাকি আমাদের মতো
সারারাত আড্ডা মারতে চলেছ ?'

'কে বলল ?' স্বপ্নার একটুও ভাল লাগছিল না। খবরটা এখন কাউকে বলা হবে না এরক
ঠিক ছিল। আশ্চর্য, এর মধ্যেই বিশ্বাসঘাতকতা করল কে ?

'শুনলাম। বললাম ওটা ভাবনাতে থাকবে, বাস্তবে হবে না।'

'কেন ?' স্বপ্না ফোঁস করে উঠল।

'বেশ। হলে আমাকে বলো।' অরুণ সামনে থেকে সরে গেল।

ছেলেরা আড্ডা মারতে গেল। কল্পনাদের ওই ফ্ল্যাটে ফোন আছে। মেয়েরা ঠিক করেছিল য় কোনো একটা ছুতোয় ঘন ঘন ফোন করে ওখানকার অবস্থা জানতে চাইবে। কিন্তু রাত আটটা াজতে না বাজতেই বোঝা গেল রিসিভার নামিয়ে রেখেছে ছেলেরা। মেয়েরা পরস্পরকে ফোন করে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল, এর বদলা নিতেই হবে। ছেলেরা যা পারে তা তারা কেন পারবে না ?

রবিবার সকালে ছেলেরা ফিরে এল বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে। দেখলেই বোঝা যায় কেউ রাত্রে ঘুমোয়নি। মদ্যপান এবং তাস খেলার আকর্ষণ এত ? স্নান করেই যে যার বিছানায় শুয়ে নাক াকছে ভরসকালে, এ খবর টেলিফোনে জেনে নিল সকলে। জেনে রাগ বাড়ল আরও। ঘুমন্ত মুখগুলোতে এখন কী শান্তির আনন্দ ! বুক টাটিয়ে যায়।

শনিবার দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর স্বপ্না বলল, 'আমি বেরুচ্ছি। ফ্রিজে খাবার আছে, গরম করে নিও রাত্রে।'

'কোথায় যাচ্ছ ?'

'তোমরা যেখানে গিয়েছিলে !'

'সত্যি যাচ্ছ ? ভাবা যায় না।'

'কেন ? যেতে দেবে না নাকি ? স্বামী হিসেবে জোর ফলাবে ?'

'মোটেই না। শুধু বলেছি ভাবা যায় না।'

'তাই বল।' চুল আঁচড়ে নিল স্বপ্না।

'আমি বাড়িতেই আছি। যখনই ইচ্ছে হবে ফোন করো, গিয়ে নিয়ে আসব।'

স্বপ্না জবাব দিল না।

কল্পনার বাড়িতে গিয়ে শুনল প্রণববাবুর স্ত্রী ফোন করেছিলেন। তাঁর শাশুড়ি নাকি অসুস্থ, আসতে পারবেন না। কল্পনা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'ঢঙ ! বড় বড় কথা বলে শেষ মুহূর্তে না আসার বাহানা করল। আমরা মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু। না আসুক ও, আমরাই যাব। চল।'

কল্পনার ফ্ল্যাটটি সুন্দর। স্থিতু হবার পর সে বলল, 'প্রচুর দাম পড়েছে ভাই। আটশো টাকা স্কোয়ার ফুট। এখন বারোশো যাচ্ছে। ফ্ল্যাট সাজাতেই চার লাখ বেরিয়ে গেল। যা বাজার !'

শোনামাত্র মন খারাপ হয়ে গেল স্বপ্নার। অরুণের অত টাকা নেই। তাদের এখনও পুরনো ভাড়া বাড়িতেই থাকতে হচ্ছে। তা কিনেছে নাহয় দামী ফ্ল্যাট, আসা মাত্রই শোনানোর কি দরকার !

প্রথম আধঘণ্টা গল্পগাছা চা খাওয়া চলল। তারপর শোভা বলল, 'উঃ ! কি ভাল লাগছে। মুক্তি পেয়েছি আজ। নিজেকে এতদিন দাসী বাঁদী বলে মনে হতো।'

কল্পনা বলল, 'আমার স্বামীর মতো এত কুঁড়ে লোক আমি দেখিনি।'

স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল, 'কি রকম ?'

'কোনো কাজ করবে না। বাজারেও যাবে না। বাড়িতে থাকলে টিভির সামনে বসে

থাকবে। আর সারাক্ষণ পিটির পিটির।'

শোভা বলল, 'যতক্ষণ বাড়িতে না থাকে ততক্ষণ শান্তিতে থাকি। এসেই চা দাও, এ চাই, ওটা কর, হুকুমের শেষ নেই।'

সন্ধ্যে নাগাদ স্বপ্না আবিষ্কার করল ওরা এতক্ষণ শুধু স্বামীদের নিয়ে কথা বলে চলেছে আর সেগুলো শুধুই দোষ খোঁজা। সে বলল, 'এসব কথা থাক। এসো তাস খেলা যাক।'

কল্পনা বলল, 'তাই ভাল।'

তাস বের হলো। ব্রে'র নিয়ম শিখিয়ে দিচ্ছিল কল্পনা, শোভা হঠাৎ বলল, 'কি রকম বদম দ্যাখো, এতক্ষণ এসেছি একবারও ফোন করল না।'

স্বপ্না বলল, 'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

কল্পনা তাকাল, 'আচ্ছা, এমন তো হতে পারে আমরা চলে আসায় ওরা এই শনিবারে স্বাধীনতা পেয়ে গেছে।'

স্বপ্না চোখ বড় করল, 'ঠিক বলেছ। তাই একটুও বাধা দেয়নি। উল্টে বলেছে ফিরে যে চাইলে যেন ফোন করি। আমি নেই বলে বাবুর প্রাণ এখন সুখের গড়ের মাঠ হয়ে গেছে। হয় বন্ধুদের নিয়ে আসর বসিয়েছে।'

শোভা বলল, 'আচ্ছা, ফোন করে দেখি।'

ফোন করা হলো। একের পর এক নম্বরে। আশ্চর্য! প্রতিটি টেলিফোনই এনগেজ আটটা বাজল তবু লাইন পাওয়া গেল না। কল্পনা বলল, 'নিশ্চয়ই বাড়ির টেলিফোনের রিসিভ নামিয়ে রেখেছে।'

'কি হবে?' শোভা জিজ্ঞাসা করল।

'অসম্ভব। পরপর দুই শনিবার ওদের স্বাধীনতা দেওয়া যায় না। আমি বলি কি, ফিরে গি ওদের চমকে দিই। মুখগুলো কি রকম প্যাঁচা প্যাঁচা হয়ে যায় দেখি। কি বল?' কল্পনা সিদ্ধ নিল।

দরজা খুলে অরুণ বলল, 'একি? টেলিফোন না করে ফিরে এলে যে!'

'এলাম।' সোজা বাথরুমে চলে গেল স্বপ্না। বাড়িতে অরুণ একাই, কোনো আ বসায়নি। খুব রাগ হচ্ছিল তার নিজের ওপর, কল্পনাদের ওপর। তারপর মনে হলো চলে এ ভালই হয়েছে। কথা খুঁজে পাচ্ছিল না সে। মুখে যতই বলুক এভাবে বন্ধুত্ব তৈরি হয় না। ব বেড়ে গেলে মেয়েতে মেয়েতে বোধহয় সেটা হওয়া সম্ভব নয়। কারণ স্বামী নামক দেও মাঝখানে দাঁড়িয়ে যায়। তখন কথা বলা মানে সেই দেওয়ালে মাথা ঠোকা। তার চেয়ে যে নিজের মতো থাকাই ঢের ভাল।

॥ ১৭ ॥

গত মাসে জলপাইগুড়িতে গিয়েছিলাম। আমার মা এখনও আছেন, সেই টানেই বছরে কয়েকবার ওখানে যাই। যে শহরে আমার বাল্যকাল, কৈশোর কেটেছে, যৌবনের অনেকটা সময় যেখানে আমার স্বচ্ছন্দ বিচরণ, সেখানে আজকাল বেশীদিন থাকা হয় না। কাজের চাপ তিন রাত্তির পোয়াতেই কলকাতায় টেনে আনে। ফলে বাড়ি আর ঘনিষ্ঠ দুই দাদা, বন্ধু কল্যাণ সিকদার এবং অনুপ ঘোষকে কেন্দ্র করে সময় কেটে যায়। এই প্রসঙ্গে আর দুজনকে মনে থাকবে চিরদিন, মালা বউদি এবং কানাই ভট্টাচার্য। বেশ কয়েক বছর আমি স্মৃতিছড়ানো জায়গাগুলোতে যাই না। গেলে খারাপ লাগে।

এবার ভর বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার স্কুলের পথে হাঁটছিলাম। ডানদিকে মুনিয়াদিদের বাড়ি। মুনিয়াদির বয়স এখন নিশ্চয়ই সত্তর হবে। একসময় এই বাড়ি রমরম করত। ওঁর স্বামী রাজনীতি করতেন। ওঁর দেওর প্রফুল্ল চক্রবর্তী 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' নামের একটি সিনেমা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বাচ্চুর কথা মনে এল। আর সেই সঙ্গে মলয়দার কথা। আমরা স্কুলের ছাত্র, মলয়দা গান গাইতেন। খুব জমত তখন। এখন বাড়িটা নিঃসঙ্গ। ওঁদের জমিতে নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে। বুঝলাম জমি বিক্রি করে দিয়েছেন।

আর একটু এগোতেই ডানদিকে ঘটক বাড়ি। সেই আমলে রেডিওতে লীনা ঘটক খুব নাম করেছিলেন গাইয়ে হিসেবে। জলপাইগুড়ির মানুষজন রেডিও খুলে তাঁর গান শুনত। শুনেছি ওঁর স্বামী কলকাতার এ ডিভিশন ফুটবল টিমে খেলতেন। এই জলপাইগুড়ি থেকে দুজন ভারতবিখ্যাত ফুটবলার কলকাতা কাঁপিয়েছিলেন। একজন রুণু গুহঠাকুরতা, অন্যজন মণিলাল ঘটক। অনেক পরে সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদারও। এসব স্মৃতি ঘাঁটতে ঘাঁটতে সেই বাড়িটার দিকে নজর পড়ল। শীতের বিকেল বলেই সরু পথটা প্রায় শূন্য। দু-একটা রিকশা ছুটে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। ছোট দোতলা বাড়িটা অনেক পরে হয়েছে। ওখানে একটা কাঠের একতলা ছিল। ওপাশের মুদির দোকানটা এখনও তার প্রাগৈতিহাসিক চেহারা নিয়ে রয়েছে। বাড়িটার গা দিয়ে টিনের দরজা, যেটা খুলে উঠোনে যাওয়া যায় সেটার বয়স বোধহয় আমার সমান।

কলকাতায় থাকতেই খবরটা পেয়েছিলাম। শুনে বিষণ্ণ হয়েছিলাম। কিন্তু প্রতিদিনের কর্মব্যস্ততা ব্যক্তিগত শোক চমৎকার গিলে নেয়, নিয়েও ছিল। এখন মনে সেটা দুদ্দাড় করে ফিরে এল। আজকের এই আমি, আমার অস্তিত্ব তৈরি হতে যে যে মানুষ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের একজন এই বাড়িতে থাকতেন।

জয়ন্ত আমার বন্ধু ছিল। সেই সূত্রেই ওই বাড়িতে যাতায়াত। জয়ন্তর দাদা খুব সাত্ত্বি
চেহারার নরম মানুষ। বাবা সম্ভবত ওকালতি করতেন। এত ঘনিষ্ঠভাবে যে পরিবারের স
মিশেছিলাম তার কর্তা কি করতেন সেটা বলতে গিয়ে 'সম্ভবত' শব্দটা ব্যবহার করছি ব
অনেকেই অবাক হবেন। কিন্তু ঘটনা হলো, সেই পঞ্চাশের দশকে বালকেরা বন্ধুর বাবাকে নি
আদৌ কৌতূহলী ছিল না। তাঁরা কিছু করতেন এটুকুই যথেষ্ট। আর চল্লিশ পার হয়ে যাও
মানুষকে যখন বৃদ্ধ মনে হতো তখন ও নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন হতো না। আব
আবছা যেটুকু মনে আসছে, জয়ন্তর বাবা আদালতের সঙ্গে জড়িত কোনো কাজ করতেন। রো
ফর্সা চুপচাপ মানুষটির সঙ্গে আমার দেখা হতো খুব কম। আমি যখন বছর দশেকের তখন প্রথ
ও বাড়িতে যাই। স্কুলে যাতায়াতের পথে বাড়িটা চিনেছিলাম। রবিবার বিকেলে ওই টিনে
দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে জয়ন্তকে ডেকেছিলাম। কাঠের ঘরের দরজা খুলে যি
বেরিয়েছিলেন তাঁকে সেই বালকচোখে বেশ মোটাসোটা বয়স্কা মহিলা বলে মনে হয়েছিল
মুখখানা বেশ ঢলঢলে, গায়ের রঙ ফর্সা। হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুই কে রে?'

পরিচয় পাওয়ার পর ভেতরে ডেকে নিয়েছিলেন। হিসাব করলে হয়তো ধরা পড়বে তখ
তাঁর বয়স তিরিশের কোঠায় ছিল। সে এমন একটা সময় যে আমাদের চোখে ওই বয়সকে বিক
বলে না ভেবে উপায় ছিল না। আজ যখন পঞ্চাশ ছুঁয়ে আসা মহিলাকেও তাঁর কাজকর্ম, পোশা
এবং ব্যবহারের জন্যে বয়স্কা ভাবতে অসুবিধে হয় অথবা ইচ্ছে হয় না তখন অতীতের কথা ভে
নিজেকেই নির্বোধ ভাবি।

আমার মাকে দেখেছি খুব কম কথা বলতে। সব কিছুই করতো কিন্তু চুপচাপ। জয়ন্ত
মা কিন্তু আমায় কাছে টেনে নিয়ে নানান গল্প শুরু করলেন। আমার বাড়ির লোকজনদে
সম্পর্কে খবরাখবর নেবার পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'এবার বল তোর কি ভাল লাগে?'

বললাম, 'খেলতে। ক্রিকেট।'

'আর?'

'আর কিছু না।'

'বই পড়তে ভাল লাগে না?'

আমি থাকতাম ঠাকুর্দা এবং পিসিমার কাছে। পিসিমা নিগমানন্দজীর শিষ্যা ছিলেন। ত
কাছে কয়েকটা ধর্মগ্রন্থ ছিল এবং মহাভারত। শেষ বইটা তিনি আমাকে পড়তে দিতেন ন
ঠাকুর্দার কাছে ছিল বিশ কেজি ওজনের ওয়েবস্টার ডিক্সনারি, বিরুপাক্ষের লেখা কিছু ব
রামনাথ বিশ্বাসের বিশ্বভ্রমণ আর শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। রামনাথ বিশ্বাস সাইকেলে করে পৃ
দেখতে বেরিয়েছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতার গল্প পড়তে ভাল লাগত। কিন্তু বাকি বইগু
আমাকে আদৌ টানত না। অতএব মুখ বেজার করে বলেছিলাম, 'পড়ার বই তো পড়তেই হ
নইলে নতুন ক্লাশে উঠতে পারবো না যে।'

জয়ন্তর মা বলেছিলেন, 'সেসব বই না রে, গল্পের বই। রামের সুমতি পড়েছি
পড়িসনি? পথের পাঁচালি? ওহো, তাও না! যখের ধন! এম্মা! তুই কিরে!'

আমি গপ্পো বানালাম, 'ওসব বই পড়লে বাড়িতে বকবে।'

'তা কেন ? পড়াশুনা শেষ করে হাতে যখন সময় পাবি তখনই পড়বি। দাঁড়া, তোকে ামি একটা বই দিচ্ছি, সেটা পড়লে কেউ বকবে না।'

ততক্ষণে আমার নজরে পড়ে গেছে। এ ঘরে একটা খাটে বিছানা পাতা আছে বটে কিন্তু ার চেয়ে অনেক জায়গা জুড়ে আছে বই। আলমারিতে, র‍্যাকে, বিছানার মাথার পাশে। শুধু ই নয়। সেই সঙ্গে পত্রিকাও। যাতায়াত করার সুবাদে পত্রিকাগুলোর নাম জেনে গিয়েছিলাম। দশ, মাসিক বসুমতী, সচিত্র ভারত, দীপালী।

আলমারি থেকে একটা বই বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই বই-এর লেখকের াম শুনেছিস ?'

নামটা পড়ে মাথা নেড়ে না বলতে গিয়ে বলে ফেললাম, 'হুঁ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাই। াই না ?' আমার উত্তর শুনে উনি এত জোরে হেসে উঠলেন যে দুপদাপ শব্দ করে দুজন ছুটে সে দরজায় দাঁড়ালো। একজন আমার চেয়ে সামান্য বড়, অন্যজন অবশ্যই ছোট। এবং জনেই মেয়ে। বড়জন জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে মা ?'

জয়ন্তর বোন এরা ? কিন্তু সেসব ভাবার মতো অবস্থা নেই আমার। উনি হাসতে হাসতে বাব দিলেন, 'কী পাজি ছেলে দ্যাখ। নামের মিল দেখে ভাই বলে চালিয়ে দিতে চাইছে। ওরে বনীন্দ্রনাথ হলেন রবীন্দ্রনাথের ভাইপো। ভাই নয়।'

বড়জন জিজ্ঞাসা করল, 'এ কে মা ?'

জয়ন্তর মা বললেন, 'এর নাম সমরেশ। জয়ন্তর বন্ধু।'

'জয়ন্ত তো দাদার সঙ্গে বেরিয়েছে। বাড়িতে নেই।'

'তাতে কি হয়েছে। আজ থেকে আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম। তাই না ? নে, বইটা পড়ে াতদিনের মধ্যে আমাকে ফেরৎ দিবি।'

আমি বই হাতে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, তিনি আবার ডাকলেন, 'শোন। তোর নামে নাম কজন লেখক আছেন। কী ভাল লেখেন ভাবতে পারবি না। অবশ্য সেসব লেখা তুই এখন ঝবি না। বড় হয়ে তোকে তাঁর লেখা পড়তেই হবে। তিনি অবশ্য বসু।'

প্রায় তিন দশক বাদে এই ঘটনার কথা সমরেশদাকে বলি। সমরেশদা অবাক হয়ে তাকান, আশ্চর্য ! তারপরেও তুমি নিজের নাম পাল্টাওনি ? আমি যদি জানতাম আমার আগে সমরেশ জুমদার নামে কেউ লিখে প্রশংসা পাচ্ছে তাহলে কিছুতেই সমরেশ বসু নাম নিয়ে শুরু করতাম া।'

কিন্তু আমি তখন দশ বছরের এবং ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। ক্ষীরের পুতুল বইটি দেখে াকুর্দা বলেছিলেন, 'পড়তে পার তবে বিকেল চারটে থেকে ছটার মধ্যে অথবা রবিবার সকাল শটা থেকে এগারটার মধ্যে।' খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। বিকেলে যদি ক্ষীরের পুতুল নিয়ে বসি তাহলে খেলব কি করে ?

কিন্তু ওই কাল হলো। ক্ষীরের পুতুল, বুড়ো আংলা আমাকে নেশাগ্রস্ত না করলেও মাসীমা সম্পর্কে আকর্ষণ বাড়িয়ে দিল। ততদিনে মাসীমা বলতে শুরু করেছি। দেশে যখন 'সাহেব বিবি গোলাম' এবং 'রাধা' বের হচ্ছে মাসীমা তখন খুব সিরিয়াস। আমার মতো বালকের কাছে

নিঃসঙ্কোচে সমালোচনা করে যাচ্ছেন। বুঝি না বুঝি আমি শুনে যাচ্ছি। একটা কথা মনে আ
এখনও। 'জানিস, কোনো কোনো লেখক এমন জমিয়ে গল্প লেখেন শেষ পর্যন্ত না পড়ে মু
নেই। সেই গল্পের কোনো কোনো চরিত্রের সঙ্গে নিজের মিল পেলে তো কথাই নেই। শরৎচ
পারতেন, বিমল মিত্র পারেন। আবার কোনো কোনো লেখক এমন লেখা লেখেন যা পড়
বসে না ভেবে কোনো উপায় নেই। পড়া আর ভাবা সমান তালে তো চলে না) যেম
তারাশংকর, সতীনাথ ভাদুড়ি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার এক একজন, খুব কম, লেখ
আছেন যাঁর লেখা পড়ে মনেই হয় না গল্প পড়ছি। মনে হয় জীবনের ছবি দেখছি। এই যেম
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে মাস্টারমশাই নারা
গঙ্গোপাধ্যায়কে মাসীমার কথাগুলো বলেছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কতদূর পড়েছেন
বলেছিলাম, 'বোধহয় স্কুল শেষ করতে পারেননি।' আমার শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই, যাঁর লেখা
ভক্ত ছিলাম খুব, মানুষ হিসেবে যে কত বড় তার প্রমাণ দিয়েছিলাম একটি শব্দে, 'দুর্ভাগ্য'

এখানে বলে রাখা ভাল, মাসীমার সঙ্গে আমার আলাপচারিতার সময় জয়ন্ত কখনও থাক
কখনও না। কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসত না। আমি ততদিনে বাবুপাড়া পাঠাগারের সদ
হয়ে গেছি মাসিক চার আনা দক্ষিণা দিয়ে। প্রথম দিন যখন বই আনতে যাব মাসীমার সঙ্গে দে
করলাম। বললেন, 'ভারী বই আনতে হবে না। তুই গিয়ে হয় যখের ধন চাইবি নয়তো কা
ভ্রমর।'

কালো ভ্রমর পেলাম। মনে আছে বইটা নিয়ে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে ভারিক্কি চা
হেঁটেছিলাম। ঠাকুর্দা দ্যাখেননি। রাত্রে পড়তে পড়তে খেয়াল হলো বইটার কথা। অলসভা
উল্টে দেখলাম লেখকের নাম নীহাররঞ্জন গুপ্ত। চোখ বোলাতে বোলাতে আবিষ্কার করলা
ছাড়তে পারছি না। তখন আমার স্কুলের বই পড়ার সময়। এই সময় গল্পের বই পড়লে ঠাকু
ছেড়ে দেবেন না। কিন্তু জীবনে বোধহয় সেই প্রথম তঞ্চকতা করতে শিখলাম। পড়ার বই সাম
রেখে কালো ভ্রমর শেষ করলাম। রাত্রে শুয়ে শুয়ে মনে হচ্ছিল আমি যদি কিরীটি রায় হ
পারতাম!

এরপর মাসীমার কাছে নাম শুনি আর লাইব্রেরি থেকে বই আনি। দীনেন্দ্রকুমার, হেমেন্দ্রকুমা
নীহার গুপ্ত, মোহন সিরিজ শেষ করে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। সপ্তাহে তিনদিন বই পাল্টাই
হঠাৎ একদিন মাসীমা বললেন, 'এই ছেলে, একা একা বই পড়িস, আমার জন্যে একটা বই এ
দে তো! এই নে, চিরকুটে লিখে দিয়েছি।'

বইটার নাম পড়লাম। অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম'। লাইব্রেরিতে পাও
গেল। কিন্তু সেই বিকেলে মাসীমার হাতে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি। ঠাকুর্দার নির্দেশ রাস্তা
বাতি জ্বলবার আগেই বাড়িতে ফিরতে হবে। বইটা ঈষৎ মোটা। ভেবেছিলাম আমার পড়ে ফে
রহস্য কাহিনীগুলোরই সমগোত্রীয় এবং আকর্ষণীয়। লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তে গিয়ে কিন্তু মোটে
ভাল লাগছিল না। তিতাস বন্ধ করে পড়ার বইতে মন দিয়েছিলাম। পরদিন মাসীমাকে বইট
দিয়ে তাগাদা দিয়েছি যাতে তাড়াতাড়ি শেষ করেন। নইলে আমি নতুন বই আনতে পারব না
তিনদিন বাদে মাসীমা যখন বইটা ফেরৎ দিলেন তখন বলেছিলাম, 'তুমি পুরোটা পড়েছ?' উ

অবাক, 'কেন ?' বললাম, 'আমি দুটো পাতাও পড়তে পারিনি। একটুও মজা নেই। তুমি কি করে পড়লে ?'

হঠাৎ দেখি মাসীমার চোখের কোণে জল টলটল করছে। অন্যায় কি বললাম বুঝতে না পেরে আমি বোকা-বোকা চোখে তাকালাম। মাসীমা জল মুছে ফেলে বললেন, 'তুই যখন বড় হবি তখন বইটা পড়িস। তাহলে বুঝবি কত বড় অন্যায় কথা বলেছিলি। তিতাস, পথের পাঁচালি, হাসুলিবাঁকের উপকথা আমাদের গর্ব রে।'

মনে রাখতে হবে আমি তখনও রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র পড়িনি। মাসীমা তারপর থেকে আর আমাকে মোহন সিরিজ পড়তে দিতেন না। রাজসিংহ, কপালকুণ্ডলা আমাকে পড়তে হলো। গল্প ভাল লাগল কিন্তু লেখার ভঙ্গি আর ভাষা আমাকে স্বস্তি দিল না। তারপর শ্রীকান্ত। আহা, আমি যেন তিস্তার জলে নৌকো বেয়ে বেড়াতে লাগলাম। হু হু করে শরৎচন্দ্র শেষ করে ফেললাম। সেই বছরটা আমার যেন ঘোরের মধ্যে কাটল। তারপর রবীন্দ্রনাথ। না। তাঁর উপন্যাস আমাকে তেমনভাবে আপ্লুত করেনি। গোটা কয়েক পাতা পড়ে পড়িনি। যোগাযোগ পড়েই ভুলে গিয়েছি। চতুরঙ্গও তাই। শুধু শেষের কবিতা পড়তে গিয়ে খাতায় কোটেশন লিখেছি। উপন্যাস পড়ার সুখ পাইনি। এসব কথা আমি অকপটে মাসীমাকে বলতাম। তিনি হাসতেন, 'এসব বই তোকে আবার পড়তে হবে দেখিস। তখন বুঝবি আমার কথা।'

এই সব করতে করতে একসময় স্কুলের পড়া শেষ হলো। কলকাতায় কলেজে পড়তে আসব। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পড়া হয়ে গিয়েছে। একটু একটু করে ভালমন্দর ব্যবধান বুঝতে পারছি। মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি হাসলেন, 'চললি আমাদের ছেড়ে ?'

'চললাম মানে ? আমি তো গরমের ছুটি আর পুজোর সময় অনেকদিনের জন্যে আসব।'

'হ্যাঁ। তখন বেড়াতে আসবি। তাই হয় রে। কলকাতায় যাচ্ছিস, কত বড় বড় লেখকের সঙ্গে তোর আলাপ হবে। যখন আসবি তাঁদের কথা আমাকে বলবি।'

'বাঃ, যারাই কলকাতায় যায় তাদের সঙ্গে লেখকদের আলাপ হয় নাকি ?'

'সবার হয় না। তোর হবে। বই পড়ার নেশায় মজে গেছিস যে।'

তখনও সেই কলেজে ঢোকার সময়ে বিন্দুমাত্র বাসনা ছিল না লেখক হবার। তখন অভিনয়ের রুপোলী স্বপ্ন দেখতাম। কলকাতায় এসে যা হয় তাই হলো। মাঝে মাঝে যখনই জলপাইগুড়িতে যেতাম তখনই মাসীমার কাছে ছুটে যেতাম। মহিলা একই রকমের ছিলেন। সেই দেশ পত্রিকার লেখা নিয়ে সিরিয়াস আলোচনা। আফশোস করতেন ইংরেজিটা ভাল জানা নেই বলে। তাহলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখাগুলো গোগ্রাসে পড়ে ফেলতে পারতেন। বলতেন, 'অনুবাদে ঠিক মন ভরে না রে।' ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় জনের সঙ্গে আমার ভাব খুব। যেসব পত্রিকা আমার জন্মের আগে ও বাড়িতে ছিল সেগুলোর সন্ধান দিয়েছে সে। ছোট মেয়ে একটু বেশি গম্ভীর। কিন্তু এরা কেউ মায়ের স্বভাব পায়নি।

মেসোমশাই-এর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না। বোধহয় সেই কারণেই ও বাড়ির অর্থনৈতিক

কাঠামো একটু নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। মাসীমার জামাকাপড়ে এবং চারপাশের জিনিসপত্রে সেই ছবিটা আমার চোখে ধরা পড়লেও ওঁর ব্যবহারে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ ঘটেনি। সংসারের অভাব-অনটন নিয়ে তিনি কোনোদিন আমার সঙ্গে আলোচনা করেননি। আমি গেলেই ওসবের উর্ধ্বে উঠে এসে সাহিত্য সংক্রান্ত কথায় নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

মাঝে মাঝে মনে হয় তিনি কি আমার ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন ? আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে 'দেশ' পত্রিকায় আমার প্রথম গল্প 'অন্তরাত্মা' প্রকাশিত হলো। নতুন সংখ্যা হাতে পেয়ে তেইশ-চব্বিশ বছরের আমার মধ্যে যে আনন্দের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল তা বোধহয় আর কখনও জীবনে ফিরে আসবে না। সেই রাত্রে যাঁদের মুখ মনে পড়েছিল তাঁদের মধ্যে সবার আগে ছিলেন মাসীমা। প্রথমে ভেবেছিলাম চিঠি লিখে তাঁকে জানাব। পরে মনে হলো, যত অভাবই হোক, 'দেশ' তিনি রাখবেনই।

গল্পটি বের হবার দিন কুড়ি বাদে 'দেশ' কর্তৃপক্ষ একটি খামে করে গোটা পাঁচেক চিঠি আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। অচেনা পাঠকরা তাঁদের ভাললাগার কথা আমাকে জানিয়েছেন। ভেবেছিলাম মাসীমার চিঠি পাব, পাইনি।

তদ্দিনে চাকরি করছি। জলপাইগুড়িতে যাওয়া অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। খবর পেয়েছি মেসোমশাই মারা গিয়েছেন। মেজজন চাকরি করছেন, ছোটজনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। গেলাম জলপাইগুড়িতে। সেই বিকেলেই ওঁর কাছে। বয়স হয়েছে ঢের, সাদা কাপড়ে তিনি তখনও উজ্জ্বল। হেসে বললেন, 'আয় আয়। কেমন আছিস ?'

বললাম, 'ভাল।'

'বিবর, প্রজাপতি কেমন লেগেছে ?'

আমি অবাক। সাংসারিক অন্যান্য খবর দেয়া-নেয়ার বদলে সমরেশ বসুর বিতর্কিত উপন্যাস নিয়ে কথা শুরু করলেন। আলোচনা চলল। মাসীমার মতে স্বাধীনতার পর বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক সমরেশ বসু। অনেকক্ষণ উশখুশ করে শেষ পর্যন্ত না জিজ্ঞাসা করে পারিনি, 'আমার কয়েকটা লেখা বেরিয়েছে দেশ পত্রিকায়। পড়েছ ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পড়ব না কেন ?'

'কিছু বলছ না যে ?'

'আমি তো ভাল বলবই। মা-মাসীমা কি কখনও খারাপ বলে ? আর পাঁচজনে ভাল বললে তবেই তো সেটা ঠিক হবে।' উনি হাসলেন।

'তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ।'

এবার গম্ভীর হলেন, 'না রে। খারাপ লাগেনি। তবে শুরুর দিকে অনেকেই এরকম লেখে। খুব কম লেখকই চমকে দেন। যেমন সুবোধ ঘোষ, পরশুরাম। লিখতে লিখতে হাত তৈরি হয়ে গেলে যখন আসল লেখা লিখতে পারবি তখনই তো লেখক হবি।'

'আসল লেখা কি রকম ?'

'এ মা ! এত পড়ে তুই এই প্রশ্ন করছিস ? এখন তুই নিজের জন্যে লিখছিস। কেমন বানানো বানানো। যখন আমাদের জন্যে আমাদের কথা লিখবি তখনই আসল লেখা লেখা

বে।'

সেবার দেখলাম বাড়ি-ঘর বদলেছে। ছেলেরা চাকরিতে ঢোকায় আর্থিক অবস্থার বদল য়েছে বোঝা গেল। কাঠের বাড়ি-ঘরের জায়গায় ইঁট-সিমেন্টের ঘর-বাড়ি হয়েছে। সেই প্রিয় ান্নাঘর আরও প্রশস্ত। উঠোনটা ছোট হয়ে গিয়েছে।

'উত্তরাধিকার' উপন্যাসটি দেশ পত্রিকায় আমার প্রথম ধারাবাহিক। সেসময় প্রচুর চিঠি পতাম দেশ-বিদেশ থেকে। শেষ হবার এক সপ্তাহ পরে জলপাইগুড়িতে গেলাম। টিনের দরজা ুলে ভেতরে পা দিতেই চিৎকার কানে এল, 'আয়। কাছে আয়।'

দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। সমস্ত ভালবাসা একত্রিত হয়ে আমার পৃথিবীতে ছড়িয়ে াড়ল। মাসীমা বললেন, 'কি লিখেছিস রে ? উঃ ! প্রতি সপ্তাহে দেশ নিয়ে ভাবতাম এই বুঝি ামাদের ছেলেটা খারাপ লিখে ফেলল ! ভয়ে ভয়ে থাকতাম। কিন্তু বাবা, এই উপন্যাস তো াখানেই শেষ হবে না। তোকে আরও লিখতে হবে অনিমেষের কথা।'

'যাক, তোমার তাহলে ভাল লেগেছে!'

'শুধু ভাল ? খুব ভাল লেগেছে। গত দশ বছরে এত ভাল কোনো উপন্যাস লাগেনি।'

এত বড় সার্টিফিকেট আমার জন্যে ? স্পষ্ট মনে পড়ল তিতাসকে খারাপ বলায় ওঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল।

কালবেলা, কালপুরুষ এবং সাতকাহন। মাসীমা শুনেছি আমাকে নিয়ে গর্ব করতেন। সাতকাহনের মাঝপর্বে দেখা হতেই বললেন, 'এই বদমাস, দীপাবলীকে এত কষ্ট দিচ্ছিস কেন ?' তারপর হেসে বললেন, 'তুই খুব চালাক।'

বললাম, 'কেন ?'

'শরৎচন্দ্রের মন নিয়ে আজকের আধুনিক কলমে দীপাবলীকে লিখছিস। যেমন লিখেছিলি াধবীলতার জীবন। জানিস বাঙালি পাঠক এটা খুব পছন্দ করবে।'

'বাঙালি পাঠক করছে কিনা সেটা আলাদা কথা, তুমি কেন করছ ?'

'কারণ আমিও যে বাঙালি।'

দিন যায়, রাত যায়। ক্রমশ যোগাযোগ কমে আসে কালের নিয়মে। লেখা নিয়ে আমার ্যস্ততা যত বেড়েছে তত অসামাজিক হয়েছি আমি। এর ওপর আবার সিরিয়ালের ভূত চেপেছে াথায়। মাসীমার কথা তেমন মনে পড়ত না।

তারপর খবরটা পেলাম। হঠাৎ বুকের ভেতর হু হু ঝড় উঠল। এই যে আমি, সমরেশ জমদার, লিখে খাই, এসবই একজনের জন্যে। যে মানুষটি দশ বছরের কিশোরকে হাত ধরে াংলা সাহিত্যের উদ্যানে নিয়ে গিয়েছিলেন। যাঁর অ্যাকাডেমিক শিক্ষা বেশি ছিল না অথচ ামার দীক্ষা তিনি দিয়েছিলেন সুপটু মেজাজে। যতদিন নিঃশ্বাস পড়বে ততদিন আমার সমস্ত ্রা তাঁর কাছে ঋণী হয়ে থাকবে। জীবদ্দশায় যিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবন, কষ্ট আনন্দের থা কখনও আমাকে বলেননি, আর পাঁচটা মানুষের মতো সামান্য জিনিস নিয়ে ঘ্যানঘ্যানানি রেননি, যিনি শুধু সাহিত্যের দরজা একের পর এক আমার সামনে খুলে গেছেন, তাঁর ঋণ াধ করার ধৃষ্টতা আমার নেই।

টিনের দরজায় শব্দ করতে দোতলায় যেসব মহিলা বেরিয়ে এলেন তাঁরা এ বাড়ির বউ অনেক পরে এসেছেন। চিনতে পেরে খবর দিলেন জয়ন্তকে। লম্বা ফর্সা জয়ন্তর মাথাজো টাক। বেরিয়ে এসে বলল, 'সেই আসলি ? মা তোর কথা খুব বলত। আয়। ভেতরে আয়

হঠাৎ কি রকম কষ্ট ছড়িয়ে পড়ল শিরায় শিরায়। বললাম, 'না। আজ ভেতরে যাব না তার চেয়ে চল রাস্তায় হাঁটি।'

'একদম চিনতে পারবি না। নতুন নতুন বাড়ি, সব চেঞ্জ হয়ে গেছে।'

সেটাই নিয়ম। কিন্তু টিনের দরজা খুলে উঠোনে পা দিয়ে শূন্য বারান্দা অথবা তাঁর ঘ আমি দেখতে পারব না। জয়ন্তরা নিশ্চয়ই তাঁর ঘরভর্তি বইগুলোয় হাত দেয়নি। তবুও!

॥ ১৮ ॥

ক'দিন আগে কলেজ স্ট্রিটে গিয়েছিলাম। বই-এর দোকানে সামনে দিয়ে হাঁটছিলাম। আশাপূর্ণা দেবী আজ নেই অথ তাঁর বই দোকানে তো বটেই, দোকানের সামনে টেবি পেতে হকাররা বিক্রি করছেন এখনও। সেই প্রথম প্রতিশ্রুতি সুবর্ণলতা। মনে পড়ল, আশাপূর্ণা দেবী আমায় এক বলেছিলেন, লেখক যদি তার লেখায় সংসারী না হ তাহলে পাঠক তাকে কখনই আপনজন বলে ভাববে না কথাটা আমি ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিয়েছি। শরৎচন্দ্রে প বাঙালির অন্দরমহলের কাহিনী তাঁর মতো আর কে বলতে পারল ? একটু অন্যমনস্ক হ হাঁটছিলাম, হঠাৎ নিজের নামটা শুনতে পেয়ে দেখলাম সামনেই এক প্রকাশক দাঁড়িয়ে আছেন কলেজ স্ট্রিটে যে কয়েকজন অত্যন্ত ভদ্রমানুষ আছেন ইনি তাঁদের একজন। ওঁকে দেখলে আ কিন্তু অস্বস্তি হয়। অনেকবার অনেকদিন ধরে ভদ্রলোক আমার কাছে লেখা চেয়েছেন করবেন বলে কিন্তু আমি তাঁকে দিতে পারিনি। আমার যা লেখালেখি তা বহুদিন ধরে যাঁরা সম্প রেখে প্রকাশ করে চলেছেন, তাঁদের দিয়ে দেওয়ার পর আর কিছু সম্বল প্রতি বছর থাকে যে নতুন কাউকে দেব। তবু ভদ্রলোক ধৈর্য রেখে চলেছেন। কুশল বিনিময় করতে করতে হঠা মনে পড়ল ভদ্রলোক খুব পারিবারিক ঝামেলায় রয়েছেন বলে কেউ যেন বলেছিল। ব্যস. পর্যন্ত, তার বেশি কিছু শুনিনি। প্রসঙ্গ তুলতেই ওঁর মুখ খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল। বললেন, 'স আমার দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলব!'

রাস্তায় দাঁড়িয়ে যে কথা বলা যায় না, মনে চাপ থাকলে সেটাও সম্ভব হয়ে যায়। ঘটনাট এইরকম, উপযুক্ত পুত্রের বিয়ে দেবেন স্থির করার পর পাত্রীসন্ধান চলছিল। সল্টলেকে নিজে বাড়ি, ঝামেলা বলতে কিছু নেই। শেষ পর্যন্ত গড়িয়ার একটি পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধ হলো

মেয়েটি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছে, গ্রাজুয়েট। বিয়ে হয়ে গেল ধুমধাম করে। অষ্টমঙ্গলায় ছেলে শ্বশুরবাড়ি গেল বউকে নিয়ে। ফিরেও এল নিয়মমতো। প্রকাশক পুত্রবধূকে বললেন, 'এটা তোমার বাড়ি। কখনও কোনো অস্বস্তি মনে রাখবে না। আর সল্টলেক থেকে গড়িয়া বাস আছে। যখন মন চাইবে তোমার মাকে বলে চলে যাবে।' মেয়েটি চুপচাপ শুনে গিয়েছিল।

বিয়ের রেশ মিটতে যে কদিন সে কদিন কোনো অশান্তি হয়নি। দিন পনের বাদে এক সকালে মেয়েটি প্রকাশকের স্ত্রীকে বলল সে বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে চায়। মাত্র এক ঘণ্টার পথ, আপত্তির কারণ নেই। ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, 'বেশ তো, তুমি একা যাবে কেন, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিও, আমরা তিনটের সময় বের হব।'

কিন্তু সেদিন নানান বাহানায় সময় কাটিয়ে মেয়েটি খেয়ে উঠল আড়াইটের সময়। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। ভদ্রমহিলা বেশ কয়েকবার ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও সে উঠল না। প্রকাশকের শাশুড়ি বিয়ে উপলক্ষে এসে থেকে গিয়েছিলেন তখনও। পাঁচটা যখন বাজে তখন তিনি মেয়েটিকে ডেকে বললেন, 'ওরে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। এরপর তোর শাশুড়ি কি করে তোকে নিয়ে বেরুবে ? ওদিকের রাস্তাঘাট তো ওর অচেনা ! আজ যাওয়া হবে না।' মেয়েটি তবু মুখ থেকে চাদর না সরাতে তিনি জোর করে চাদর টেনে সরিয়ে দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি লাফিয়ে বাথরুমে চলে যায়। এবং মিনিট পাঁচেকের মধ্যে 'আমি আসছি' বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ায়। ঠিক ওই সময় প্রকাশক বাড়ি ফেরায় মেয়েটি জানায় সে তখনই বাড়ি যেতে চায়। স্ত্রীর কাছে ঘটনাটা শোনার পরেও প্রকাশক মেয়েটিকে নিয়ে গড়িয়ায় রওনা হন কারণ বউমার বয়স কম, ওকে কষ্ট দেওয়া ঠিক হবে না।

বাড়িতে ঢুকেই মেয়েটি তার বাবাকে প্রকাশকের সামনেই বলে, 'এ কোথায় তুমি আমার বিয়ে দিলে বাবা ? ওরা অশিক্ষিত, আনকালচার্ড !'

মেয়েটির বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন, 'কেন ? কি হয়েছে মা ? কি করেছে ওরা ?'

'আমাকে এখানে আসতে দিতে চাইছিল না তোমার জামাই-এর মা আর দিদিমা। আমি ঘুমোচ্ছিলাম যখন তখন জোরজবরদস্তি করে আমার গায়ের চাদর টেনে খুলে দিয়েছে।' মেয়েটি মাথা নাড়ল, 'ওই দুজন মহিলা কী ডেঞ্জারাস ভাবতে পারবে না।' বলে মেয়েটি ভেতরে চলে গিয়েছিল। প্রকাশক এইসব সংলাপ শুনে হতভম্ব।

এবার মেয়েটির বাবা গর্জন করে উঠলেন, 'আপনারা ভেবেছেন কি ?'

প্রকাশক বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনি উত্তেজিত হবেন না, ঘটনাটা কিন্তু এমন নয়।'

'নয় মানে ? একটি যুবতী মেয়ের শরীর থেকে চাদর টেনে খুলে দেওয়া বর্বরতা নয় ?'

'বউমা খেয়েদেয়ে শুয়েছিল—।'

'কি করে শুয়েছিল তা আমি জানতে চাই না। মেয়েদের গা থেকে চাদর টেনে তোলা মানে তাকে লজ্জায় ফেলা, এই বোধ কি আপনাদের আছে ? এ তো দুঃশাসনের মতো আচরণ।'

'আপনি ভুল করছেন বেয়াইমশাই। আমার শাশুড়ির আশি বছর বয়স। তিনি নাতবউ-এর সঙ্গে মজা করতেই পারেন। কোনো ছেলে তো চাদর ধরে টানেনি, টেনেছেন ওর স্বামীর দিদিমা। এক্ষেত্রে দুঃশাসনের সঙ্গে তুলনা আসে কি করে ?'

'দিদিমা বলে কি সাতখুন মাপ হয়ে যাবে ? এটিকেট বলে কোনো কথা নেই ? ছি ছি ছি আমাদের পরিবারে এরকম আচরণের কথা আমি ভাবতেই পারি না। অশিক্ষিত মহিলা !'

'আপনি আমার শাশুড়িকে অযথা গালাগাল করছেন।'

'যা সত্যি তাই বলছি।'

'আশ্চর্য ! আপনি তো একবারও মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন না, কেন এই ঘটনা ঘটল : আমার স্ত্রী তাকে বলেছিলেন তিনটের সময় বেরিয়ে এবাড়িতে আসবেন। তাড়াতাড়ি খে নিতে। তা সত্ত্বেও সে আড়াইটের সময় খেয়ে চাদরমুড়ি দিয়ে শুতে চলে গেল। এটা কো ধরনের সভ্যতা ? কথাটা তাকে জিজ্ঞাসা করুন।'

'আপনারা তো ইচ্ছে করেই ওকে বেলা পড়ে গেলে খেতে দেন যাতে বিকেল বেলা জলখাবারের খরচ বাঁচানো যায়। জানি না ভেবেছেন !'

'কী বলছেন বেয়াইমশায় !'

বউমার বাবা প্রকাশককে বললেন, 'দেখুন মশাই, বিয়ের আগে আপনাকে বলেছিলা আমার ওই একমাত্র মেয়ে। অনেক আদরযত্নে মানুষ করেছি, আপনার এখানে যেন অযত্ন ন হয়। আপনি তখন বলেছিলেন ওকে নিজের মেয়ের মতো দেখবেন। অথচ বাস্তবে সেটা হচ্ছে না।'

প্রকাশক বললেন, 'না। আমাদের কাছে ও মেয়ে ছাড়া অন্য কিছু নয়। মনে হচ্ছে এট নেহাৎই ভুল বোঝাবুঝি।'

'একটা চাল টিপলে বোঝা যায় ভাত হয়েছে কিনা। এ তো পনেরোটা দিন। আমি বি কি ওদের আপনি আলাদা করে দিন। অষ্টপ্রহর আপনারা পাশে থেকে টিকটিক করবেন এ ওদে ভাল লাগার কথা নয়।'

'আলাদা করে দেব মানে ?'

'মানে আলাদা সংসার করুক। আমার বাড়ির কাছে ভাল ফ্ল্যাট খালি আছে।'

'এ আপনি কি বলছেন বেয়াইমশাই ?'

'ঠিকই বলছি। ছেলেকে মানুষ করেছেন বলে আর কতদিন নিজের মুঠোয় ধরে রাখবেন ধরে যদি রাখতেও চান তাহলে কি তারা সেটা খুশিমনে মেনে নেবে ? আপনার মতো বাবা এই ভুল করে থাকে। তারা ভাবে আমার খোকা আমি যা বলব তাই চিরকাল মেনে চলবে আরে মশাই সময় দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। আগেকার দিনে বিয়ে হলে ঘরে বউ আসতো, এখ ছেলেকে বের করে দিতে হয়।'

প্রকাশক স্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'আপনার উপদেশ শুনলাম। কি ছেলে তো আমাকে কখনও এমন ইচ্ছার কথা বলেনি !'

'দ্যাখো কাণ্ড। ছেলে মুখ ফুটে কখনও বলতে পারে ?'

'কিন্তু বেয়াইমশাই, বউমাকে আমরা বাড়ির মেয়ের মতো দেখতে চেয়েছি। তার কো অসুবিধে হোক আমরা চাইনি। মাত্র পনের দিন হলো তার বিয়ে হয়েছে। এর মধ্যেই আম ছেলে তার সঙ্গে একমত হয়ে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার প্ল্যান করেছে বলে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না

'পনের দিন ? এসব ব্যাপার পাঁচ মিনিটেই হয়ে যায়।'

'কিন্তু আমার কাছ থেকে চলে গিয়ে সে সংসার চালাবে কি করে ?'

'কেন ? সে আপনার ব্যবসা দ্যাখে। ব্যবসা থেকে যা প্রফিট হয় তার অর্ধেক আপনি দেবেন। বিয়ের আগে যা খবর নিয়েছি তাতে তো দিব্যি চলে যাওয়ার কথা।'

প্রকাশক উঠে দাঁড়ালেন, 'আমরা বোধহয় একটু বেশি ভাবছি। বউমা যদি মাথা স্থির রেখে চলেন তাহলে এসব সমস্যা হবেই না।'

'মাথা স্থির মানে ?'

'বউমা একমাত্র সন্তান। বোধহয় অল্পেই মাথা গরম হয়ে যায় তাঁর।'

'ও ! আপনি বলতে চাইছেন আমার মেয়ের মাথা খারাপ ?'

'ঠিক তা বলতে চাইছি না আমি।'

'আলবৎ বলেছেন। তাহলে শুনে রাখুন, আমার মেয়ে নয়, আপনার স্ত্রী আর শাশুড়ি শুধু অশিক্ষিতাই নয়, উন্মাদও। নইলে নতুন বউ-এর গা থেকে কেউ কাপড় কেড়ে নেয় ? আজকালকার আইন ওদের বুঝিয়ে দেবেন। বউ-এর ওপর শারীরিক কিংবা মানসিক অত্যাচার করলে জেলের ঘানি ঘোরাতে হবে। হ্যাঁ !'

বিপর্যস্ত মানসিকতা নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন প্রকাশক। ছেলের পরিবর্তিত যে আচরণের কথা বেয়াইমশাই বলেছেন তার এক বর্ণও তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

দরজা খুলে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'বউমা ?'

'উনি এখন কদিন বাপের বাড়িতে থাকবেন।'

কি ঘটনা ওখানে ঘটেছে তা জানতে চেয়েছিলেন স্ত্রী। যথেষ্ট উদ্বিগ্না ছিলেন তিনি। কিন্তু কাটিয়ে গেলেন প্রকাশক। খামোকা বাড়ির মেয়েদের মন বিষাক্ত করে দেওয়ার কোনো নে নেই। এসবের আগে তিনি ছেলের সঙ্গে কথা বলতে চান। অথচ শাশুড়ি, বউ-এর সামনে সব আলোচনা করা তাঁর ইচ্ছা নয়।

রাত্রে ঘুম হলো না। স্ত্রী কয়েকবার জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর কিছু হয়েছে কিনা। তিনি স্বীকার করলেন। পরদিন কলেজ স্ট্রিটের দোকানে যাওয়ার পথে তিনি ছেলেকে একা পেলেন। কিভাবে কথাটা তুলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না প্রথমে। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলেন, কি আজ বউমার ওখানে যাচ্ছিস ?'

'কেন ? কোনো দরকার আছে ?' ছেলে সরল গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'না। কাল সে চলে গেল আচমকা, ফিরে এল না—।'

'তুমিই তো সঙ্গে ছিলে—।'

'হ্যাঁ, ছিলাম।' প্রকাশক ইতস্তত করছিলেন, 'আসলে আমি ঠিক ওদের বুঝতে পারছি না।'

'কেন ? কোনো কথা হয়েছে ?'

'হ্যাঁ। বেয়াইমশাই বললেন তোদের আলাদা করে দিতে। ওঁর বাড়ির পাছে একটা ফ্ল্যাট খালি আছে। তুই তো আমাকে এসব কিছু বলিসনি !'

'আশ্চর্য !' ছেলে মাথা নাড়ল।

'তার মানে ?'

'গত পরশু আমি প্রথম এরকম প্রস্তাব শুনি। শুনে বলি যা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না তা সে যেন দ্বিতীয়বার উচ্চারণ না করে।'

ছেলের কথা শুনে প্রকাশকের বুক থেকে যেন বিরাট পাথর নেমে গেল। ছেলে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে তোমার কোথাও ভুল হয়ে গেছে বাবা।'

'ভুল ?'

'হ্যাঁ। এই সম্বন্ধ করার ব্যাপারে।'

'আমি তো যথাসাধ্য খোঁজখবর নিয়েছিলাম।'

'হয়তো। কি জানি ! মানুষ তো রাতারাতি পাল্টে যায় না।'

ছেলের সঙ্গে এ বিষয়ে আর কথা বলেননি। কিন্তু প্রকাশকের জানতে ইচ্ছে করছিল, বউমা ছেলের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করে। নতুন স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্ক ওদের মধ্যে আছে কিনা। কিন্তু সংস্কারবশত ছেলের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করতে পারেননি তিনি।

কিন্তু বাড়িতে অন্য প্রতিক্রিয়া দেখলেন। ইচ্ছে-অনিচ্ছের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন। স্ত্রীর কাছ থেকে তাঁর মা শুনেছেন। শোনার পরই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁর ছেলের কাছে ফিরে যাবেন। স্ত্রী তাঁকে অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি অটল। 'আমার জন্যে তোদের সংসারে অশান্তি এসেছে, এখানে আমার থাকা উচিত নয়।' ছেলে এসব শুনে তার দিদিমাকে বলল, 'তুমি যদি চলে যাও এখনই তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব। কারণ ওই অশান্তির মধ্যে আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়।'

দিদিমা নাতির হাত ধরে বললেন, 'তা কি হয় দাদু ! হাজার হোক তোর নতুন বউ, সামনে সারাটা জীবন পড়ে আছে। আজ ভুল বুঝে মাথা গরম করে ফেলেছে কিন্তু কাল নিশ্চয়ই নিজের ত্রুটি বুঝতে পারবে। তোকে এখন মাথা ঠাণ্ডা করে থাকতে হবে রে।'

ছেলে বলল, 'আমি একটুও উত্তেজিত হইনি। হলে ফুলশয্যার রাত থেকে আজ পর্যন্ত অনেক রাতেই তোমরা আমার গলা শুনতে পেতে।'

'ওমা, সেকি কথা ? নাতবউ কি রাতদুপুরে তোর সঙ্গে ঝগড়া করেছে ?'

'ঝগড়া কি একা করা যায় দিদিমা ? ওর পরিবার কত শিক্ষিত, ওর কাকা-মামা-দাদারা কেউ আমেরিকায় কেউ জার্মানিতে থাকে। সে-তুলনায় আমাদের বাড়ির লোকজনের কোনো স্ট্যাটাস নেই। এখনও আসনে বসে ভাত খাওয়া হয়। বাড়িতে কেউ এলে সিঙাড়া-মিষ্টি দেওয়া ছাড়া কিছু ভাবতে পারে না। স্যান্ডউইচ, হটডগ, বার্গার, ফ্রাই-এর স্বাদ তোমরা কেউ জানোই না।'

প্রকাশকের স্ত্রী এতক্ষণ শুনছিলেন চুপচাপ, এবার না জিজ্ঞাসা করে পারলেন না, 'তুই কি বললি ?'

'বলেছিলাম, এক এক বাড়ির রুচি-অভ্যাস এক এক রকমের হয়। কেউ তরকারিতে মিষ্টি খায় কেউ ঝাল। তাই বলে এমন নস্যাৎ করে দেওয়া ঠিক নয়। আসনে খেতে অসুবিধে হলে টেবিল-চেয়ার ব্যবহার করো। ডাইনিং টেবিল তো রয়েছেই। আর বার্গার হটডগ খেতে ইচ্ছে করলে তুমি নিজে তৈরি করে সবাইকে খাইয়ে দাও।'

প্রকাশকের স্ত্রী বললেন, 'আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে মাথা নেড়ে আমাকে বলেছিল জীবনে রান্নাঘরে ঢোকেনি। তা আমি বলেছি, মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছ তখন তো একটু-আধটু রান্না শিখতেই হবে। তাই শুনে ওর মুখ খুব গম্ভীর হয়ে গেল।'

দিদিমা বললেন, 'আমি বলি কি, এ নিয়ে যত কম কথা বলা যায় তত ভাল। নাতবউ-এর বয়স কম। মা-বাবার একমাত্র সন্তান তাই আদর পেয়েছে খুব। ওর ব্যবহার প্রথমদিকে খারাপ ঠেকতেই পারে, পরে দেখিস ঠিক হয়ে যাবে।'

ছেলে বলল, 'সব ঠিক আছে। একটি বাইরের মেয়ে কয়েকদিন হলো এ বাড়িতে এসে সমস্ত সিস্টেম পাল্টে দিতে পারে না। আর তার জন্যে তুমি চলে যাবে এও মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। তোমাকে থাকতে হবে। সে এ বাড়িতে না ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি কোথাও যাবে না।'

বউমা এলেন তাঁর বাবার সঙ্গে। এসে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। বেয়াইমশাই প্রকাশককে বললেন, 'মেয়েকে পৌঁছে দিয়ে গেলাম। দেখবেন ওর ওপর যেন কোনো অত্যাচার না হয়।'

'ছি ছি, এসব কি বলছেন ?'

'দেখুন মশাই, আমি সাবধানী লোক, আগে থেকে তাই বলে রাখলাম।'

অনেক অনুরোধেও সেদিন চা-জলখাবার খেলেন না বেয়াইমশাই।

বিকেলেও যখন বউমা ঘর থেকে বের হচ্ছেন না তখন প্রকাশকের স্ত্রী তাঁর কাছে গেলেন। 'তোমার কি শরীর খারাপ ?'

'না তো। আমার শরীর খারাপ হলে আপনারা কি খুশি হন ?'

'একি কথা বলছ তুমি !'

'যাকগে, কি বলতে এসেছিলেন তাই বলুন।' বউমা শুয়েছিলেন।

'সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ওঠো, বাইরে এসে চা-খাবার খাও।'

'ওগুলো কাজের লোককে দিয়ে এখানেই পাঠিয়ে দিন।'

'কেন ?'

'আপানার মা এ বাড়িতে থাকলে আমি ঘরের বাইরে যাব না।'

প্রকাশকের স্ত্রী স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

রাত্রে ছেলে বাড়ি ফিরল। সে তাদের ঘরে ঢুকতেই বাইরে থেকে এঁরা গোলমাল শুনতে পেলেন। বউমা নিচু গলায় বলছেন 'ছেলের গলা চড়া। প্রকাশক আর না পেরে ছেলের ঘরের দিকে এগোচ্ছিলেন বুঝিয়ে বলবেন বলে কিন্তু তাঁর স্ত্রী বাধা দিলেন, 'না, তুমি যাবে না। ওদের ব্যাপারটা ওদেরই সামলাতে দাও।'

'ব্যাপারটা তো শুধু ওদের নয় আমরাও জড়িয়ে আছি।'

'তা হোক।'

একসময় কথা কাটাকাটি থামল। ছেলে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এসে বলল, 'খেতে দাও।' প্রকাশকের স্ত্রী খাবার বেড়ে ছেলের জন্যে দিয়ে বললেন, 'বউমার খাবার নিয়ে যা।'

'কাজের লোককে দিয়ে পাঠিয়ে দাও।'

ব্যাপারটা এইভাবে চলছিল। ইতিমধ্যে প্রকাশকের শাশুড়ি ফিরে গেছেন। আত্মীয়স্বজন

মহলে এই অশান্তির খবর ছড়িয়ে পড়েছে। তারা সমব্যথা জানাবার নাম করে ভিড় বাড়াচ্ছে
মাঝেমাঝেই বউমা খুব সেজেগুজে বেরিয়ে যান। ফেরেন রাত্রে। আর প্রকাশকের স্ত্রী আবিষ্
করলেন ছেলের বিছানা আলাদা হয়েছে। বউমা শোন খাটে, ছেলে মাটিতে।

মাস তিনেক বাদে বেয়াইমশাই এলেন, 'এখন তো আর মেয়েকে আপনাদের কাছে ফে
রাখতে পারি না।'

'কেন ?'

'সে সন্তানসম্ভবা। এখন কোনোরকম মানসিক আঘাত বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটাতে পা
ওকে আমি নিয়ে যাব। আবার এখন স্বামীকেও কাছে পাওয়া উচিত ওর। আপনি আপন
ছেলেকে বলুন আমার ওখানে যেতে।'

'আমি বললেই ছেলে শুনবে ভাবছেন কেন ?'

'কেন ? আপনার ছেলের ওপর কি কোনো কন্ট্রোল নেই ?'

'সেকথা বলছি না। আপনার মেয়ে সন্তানসম্ভবা একথা সে-ও বোধহয় জানে না। আ
আপনার মুখে শুনলাম। এ বড় আনন্দের খবর। এখন তো এখানেই ওর থাকা উচি
শেষদিকে আপনার কাছে যাওয়াটাই শোভনীয়।'

বেয়াইমশাই কোনো আপত্তি শুনলেন না। মেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন। প্রকাশকের
ছেলেকে শ্বশুরবাড়ি যেতে বললেও সে প্রথমে রাজী হয়নি। অনেক বলার পর একরাত্রি গি
সেখানে। ফিরে এসে বলল, 'আর আমাকে যেতে বলো না ওখানে।'

কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করল।

বেয়াইমশাই জানালেন ছেলে যদি আলাদা বাসা ভাড়া না নেয় তাহলে তিনি মেয়ে
পাঠাবেন না। কারণ আজকের শিশু মানুষ করার আধুনিক প্রকরণ প্রকাশকের স্ত্রী জানেন ন

কলেজ স্ট্রিটের রাস্তায় দাঁড়ানো প্রকাশক বললেন, 'কিছুদিন হলো আমি আর আমার
আলাদা ফ্ল্যাটে চলে গিয়েছি, বউমা মেয়েকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে রয়েছেন। শুধু থাকা ত
কি! শুনেছি ছেলে আলাদা ঘরে থাকে। রোজ রাত্রে বাড়ি ফেরার আগে মায়ের কাছে খে
যায়।'

বললাম, 'নিজের বাড়ি ওদের ছেড়ে দিলেন ?'

'কি করব ? যে শিশু এসেছে বাড়িটা তারও। আমরা যখন থাকব না তখন তো সে
থাকবে।'

'কিন্তু এভাবে কদ্দিন চলবে ?'

জানি না। এখনকার আইনে বিবাহবিচ্ছেদ পাওয়া খুব শক্ত। আমি আদালতে বউ
বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনব ? অসহযোগিতার ? সেটা ধোপে টিকবে না। এখন যে মেয়ে আই
জেনে গিয়ে তার ব্যবহার নিজের মতো করতে চায় তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুব শক্ত
দেখি।' ভদ্রলোক চলে গেলেন।

এতদিন যে সমস্ত মেয়ের কথা লিখে এসেছি তাদের সামনে একে দাঁড় করিয়ে কো
সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। শুধু বলা যায়, এমনই হয়।

॥ ১৯ ॥

এক বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বন্ধুর একটি মেয়ে। যাদবপুর থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে এম. এ. দিচ্ছে। অত্যন্ত মেধাবী এবং গুণী মেয়ে। গুণী কারণ ও চমৎকার রবীন্দ্রসঙ্গীত গায় আর দারুণ ছবি আঁকে। বরাবর ভাল রেজাল্ট করে এসেছে। দেখতেও সুন্দরী। এক একটি মেয়ে আছে যে হাসলে চারপাশ পবিত্র হয়ে যায়, এও তেমনি।

বন্ধু বলছিলেন, 'খুব বিপদে পড়ে গিয়েছি ভাই। ী দিনরাত বলছেন মেয়ের বিয়ে দাও, বিয়ে দাও, কি করি বল তো ?'

বললাম, 'ভাল কথাই তো বলছেন। এম. এ.-র রেজাল্ট বের হলে বিয়ে দিয়ে দাও।'

'কার সঙ্গে দেব ?' বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন।

'আশ্চর্য ! ওর উপযুক্ত একটি সুপাত্রের সঙ্গে দেবে।'

'সেই সুপাত্রটি কোথায় পাওয়া যাবে ?'

'এবার আমি থতমত হয়ে গেলাম। এরকম একটি ব্রিলিয়ান্ট মেয়ের স্বামীকে ওইরকম অথবা ওর চেয়ে বেশি ব্রিলিয়ান্ট হতে হবে। প্রথম কথা, সম্বন্ধ করলে লোকে নিজের জাতের ধ্যে পাত্র খুঁজবে। বন্ধুটির সে ব্যাপারে কোনো রক্ষণশীল মনোভাব নেই। ছেলেটির বাড়িতে সুস্থ আবহাওয়া থাকলেই তিনি খুশি। কিন্তু এখন যত মেধাবী মেয়ে ওপরে উঠছে, সেই তুলনায় ছেলেদের সংখ্যা গড়পড়তায় বেশ কম। বললাম, 'এক কাজ কর। কাগজে বিজ্ঞাপন দাও। সংস্থা পাত্রপাত্রীর খবর দেয় সেখানে যাও। নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে কাউকে।'

এই কথাবার্তার মাস দুই পরে বন্ধু এলেন। বললেন, 'তোমার উপদেশ মতো কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। প্রচুর চিঠি এসেছিল। বেশির ভাগই বাজে। অনেক ঝাড়াই-বাছাই করার র তিনজন পাত্রের সন্ধান পেয়েছি। একজন থাকে দিল্লীতে। জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ড়ায়। দ্বিতীয়জন থাকে কলকাতাতেই। এম. এসসিতে ফার্স্টক্লাশ পেয়ে ডক্টরেট করছে। খন একটি মাল্টিন্যাশন্যাল কোম্পানিতে খুব বড় পোস্টে রয়েছে। তৃতীয়জন শিকাগোতে।'

খুশি হলাম, 'বাঃ, সুখবর। তা কলকাতা দিয়ে শুরু কর।'

'কিভাবে ? চিঠি দিয়ে বলব আমার মেয়েকে দেখে যান ? নাকি বলব আগে আপনার ছেলেকে দেখতে যাব ? চিরদিন তো পাত্রপক্ষই সেই অধিকার প্রথম পায়।'

'আগে সেটাই করলে।'

'বেশ। এবার ছেলে কিরকম তা জানব কি করে ?'

'বাঃ। এ আর বেশি কি! পাড়ায় খোঁজ-খবর নাও। অফিসে যাও।'

'ছেলেটি তার মায়ের সঙ্গে সল্টলেকে থাকে। সেখানে পাশের বাড়ির লোক কে এই নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। পাড়া বল্‌তে কিছু নেই। তাছাড়া বাইরে সে কি করছে তা প্রতিবেশীরা জানবে কি করে? আর অফিসে গিয়ে যদি জিজ্ঞাসা করি ছেলে কি রকম তাহলে কেউ সত্যি কথা বলবে? আর প্রশ্নটা কি করা যায়?'

'তাহলে?' আমি এবার ভাবতে বসলাম।

'আমার স্ত্রী বলছিলেন কোনো প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিকে দায়িত্ব দিতে। ওরা লুকিয়ে সব খবর এনে দেবে। কিন্তু মুশকিল হলো বিয়ের পর যদি ছেলে জানতে পারে আমি ওর পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছিলাম তাহলে কি আমাকে আর শ্রদ্ধা করবে? করবে না। খোদ কলকাতার ছেলের যখন এই অবস্থা তখন দিল্লী-আমেরিকার ছেলের সঠিক খবর পাওয়া অসম্ভব।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'ও কোন অফিসে কাজ করে?'

বন্ধু নামটি বলতেই মনে পড়ল ব্যানার্জীদা ওখানে কাজ করেন। নিশ্চয়ই চিনবেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম। ব্যানার্জীদাকে পাওয়া গেল।

'কি ব্যাপার ভাই সমরেশ?'

'ভণিতা না করে সরাসরি বলছি।'

'তাই বলো! এখানে টেলিফোনে ব্যক্তিগত কথা বেশি বলা নিষেধ।'

'অমলেশ চ্যাটার্জী বলে একটি ছেলে তোমাদের ওখানে আছে। তাকে চেন?'

'বিলক্ষণ। শুরুতেই আমার পোস্টে ঢুকেছে। আমার বয়সে কোথায় যাবে তা ভাবতে পারবে না। তা অমলেশকে কি দরকার?'

'ছেলেটি কেমন?'

'খুব স্মার্ট। সবকিছু ব্যালান্স করে চলে। তিন পেগের বেশি হুইস্কি খাবে না। শনিবার বাড়ি থেকে বের হয় না। বই পড়ে। শুক্রবার ক্লাবে গিয়ে একটু ফস্টিনস্টি করে। ওই বয়সে আমরাও করতাম। তখন অবশ্য ক্লাবে যাওয়ার পয়সা থাকত না।'

টেলিফোন নামিয়ে রেখে বন্ধুকে বললাম। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'ছেলেটি যা করে তা স্বাভাবিক। অন্তত এখনকার সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে। শুধু ওই শনিবারে বই পড়াটা ওর সম্পর্কে শ্রদ্ধা বাড়াল। কিন্তু আমার স্ত্রী ওই মদ্যপান এবং ফস্টিনস্টি মেনে নিতে পারবেন না।'

'বলার দরকার কি?'

'কি বলছেন? স্ত্রীর কাছে লুকিয়ে রাখব?'

'দেখুন, বিয়ের আগে এখনকার ছেলেরা এরকম করেই থাকে।'

'বিয়ের পরে যদি এটা বেড়ে যায়?'

মেনে নিতে হলো। আমরা দুজনেই স্বীকার করতে বাধ্য হলাম এখন মেধাবী ছাত্রীর বিয়ের সম্বন্ধ করা খুব মুশকিল। আগে ঘটক থাকতেন। তাঁরাই খবর আনতেন। সেই খবরে সন্তুষ্ট না হয়ে আত্মীয়স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের মাধ্যমে অনেকটা নিশ্চিত হয়ে বিয়ে দিতে

অভিভাবকেরা। এখন ঘটকের জায়গা নিয়েছে কিছু বিবাহসম্বন্ধ-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। তাঁরা যা তথ্য পান তার বেশি দায়িত্ব নেন না। আত্মীয়স্বজনের সংখ্যা তো এখন প্রায় কমেই গিয়েছে। আর অভিজাত পাড়ায় প্রতিবেশী আছেন নিশ্চয়ই কিন্তু তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে ওঠে না।

বন্ধু বললেন, 'ও যদি নিজে পছন্দ করে বিয়ে করত তাহলে সবচেয়ে ভাল হতো।'

আমি বললাম, 'নিজে পছন্দ করে বিয়ে করা মানে প্রেম করে তবে বিয়ে। আপনি বলছেন এতে আপনার কোনো আপত্তি নেই ?'

'না। মেয়ে শরীর এবং মনে সম্পূর্ণ অ্যাডাল্ট। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তা আর তাকে জানিয়ে দিতে হয় না। আজ বাদে কাল সে চাকরি করবে। অতএব সে যদি কাউকে নির্বাচন করে তাহলে নিজের উপযুক্ত ছেলেকেই নির্বাচিত করবে। তাছাড়া এ ব্যাপারে আমাদের কোনো দায়িত্ব থাকছে না। বিয়ের পর যদি কোনো গোলমাল হয় তাহলে অন্তত আমাদেরকে বলতে পারবে না তার ভবিষ্যত নষ্ট করেছি।' বন্ধু বোঝালেন।

বন্ধু চলে গেলে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। শোভাদির কথা মনে পড়ছিল। চল্লিশ বছর আগের যে সময়টায় আমি প্রায়-কিশোর, তখন শোভাদি আমাদের গর্বের নায়িকা। যেমন সুন্দরী তেমনি ভাল সেতার বাজায়। জলপাইগুড়ির বিখ্যাত গার্লস স্কুল থেকে অনেকগুলো লেটার নিয়ে পাশ করে আনন্দচন্দ্র কলেজে পড়ছে। ইচ্ছে করলেই কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হতে পারত কিন্তু অসুস্থ মা-কে ছেড়ে যেতে চায়নি। আমার সঙ্গে খুব ভাব ছিল শোভাদির। বিকেলবেলায় ছাদে বসে আমরা কবিতা বলতাম। আমি বই খুলে রাখতাম, শোভাদি স্মৃতি থেকে বলে যেত, থামলেই ধরিয়ে দিতাম। সবই রবীন্দ্রনাথের কবিতা। একবার শোভাদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুই বড় হয়ে কি হবি ?' তখন পাইলট হবার খুব শখ ছিল আমার। আকাশ ফুঁড়ে উড়ে যাব এদেশ থেকে ওদেশে। মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলব। শুনে শোভাদি হেসে বলল, 'বেশ তো। ধর পাইলট হতে পারলি না, তাহলে আমার কথা রাখবি ?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু পাইলট হতে পারব না কেন ?'

'পাইলট হতে হলে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে হয়। তোর আবার অঙ্কে যা মাথা। যাক গে, যদি না হতে পারিস তাহলে খুব বড় উকিল হবি ?'

'উকিল ?' আমার চোখের সামনে পাড়ার হরিপদ উকিলের কোট ভেসে উঠেছিল। ওটা যে এককালে কালো ছিল তা বুঝে নিতে হয়। কাছারিতে গিয়ে বসে থাকেন তিনি, কেউ মামলা করার সুযোগ দেয় না। ওঁরা খুব অভাবে আছেন। সেই উকিল হতে বলছে শোভাদি ?

শোভাদি বলে গেল, 'খুব বড় উকিল হবি তুই। আর যখনই শুনবি কোনো মেয়ের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, কোনো বউকে তার শ্বশুরবাড়ির লোক মেরে ফেলেছে, তখনই সেই মেয়েটির হয়ে মামলা লড়বি। যদি পয়সা না পাস তবু পাশে দাঁড়াবি। কথা দে।'

নির্যাতিতা অপরিচিতা মেয়েদের সাহায্য করার জন্যে কেন আমাকে উকিল হতে হবে বুঝতে পারিনি। ব্যাপারটা ভালও লাগেনি সেই বয়সে।

শোভাদিরা থাকত আমাদের পাশের বাড়িতে। তখনকার জলপাইগুড়ির বাড়িগুলোর

চারপাশে জমি এবং বাগান থাকত। তাই কোন বাড়ির ভেতর কি হচ্ছে তা প্রতিবেশীরা সহজে জানতে পারতো না। দুদিন শোভাদির দেখা না পেয়ে ঠিক করলাম ওর কাছে গিয়ে বলে আস আমার পক্ষে উকিল হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। আমাদের ক্লাশের নিশীথ বলেছে সে নাকি শুনেছে দশটা শকুন মরে গেলে একটা উকিল হয়। এটা কিভাবে সম্ভব বুঝতে না পারলে ব্যাপারটা খারাপ লেগেছিল। আমাদের এক আত্মীয় তাঁর জমি জবরদখল হওয়ায় মামলা করেছিলেন। তিনি প্রায়ই বাড়িতে এসে বলতেন তাঁর উকিল নাকি চশমখোর, প্রায়ই নানা বাহানা করে টাকা নিচ্ছেন আর কোনো কাজ হচ্ছে না। এসব শোনার পর ওই বয়সে মনে হয়েছিল শোভাদিকে আমার অনিচ্ছার কথা জানিয়ে দেওয়াই ভাল। শোভাদির বাড়িতে গেলাম। এবং ওই প্রথমবার শোভাদির বাবা গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাই ?'

আমি হকচকিয়ে গেলাম। এতদিন ওবাড়িতে আমাকে কেউ ওই প্রশ্ন করেনি। ত বললাম, 'শোভাদির কাছে এসেছি।'

'কে পাঠিয়েছে ?'

'কেউ না। আমি নিজেই এসেছি।'

'শোভার শরীর খারাপ। দেখা করতে পারবে না।' ভদ্রলোক কথাগুলো বলামা শোভাদির মাকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম, 'ওভাবে বলো না ওকে।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলেন, 'কিরে ? শোভার সঙ্গে কি দরকার ?'

'এমনি !' আমি কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

'তাহলে পরে আসিস। ও এখন ঘুমোচ্ছে।'

অতএব ওঁদের সামনে থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম, কিন্তু বুঝতে পেরেছিলা ওঁরা সত্যি কথা বলছেন না। শোভাদি কখনই এই সময় ঘুমোতে পারে না। ওঁদের কথাবার্তা মনেই হচ্ছিল না শোভাদি অসুস্থ। আমি রাস্তায় না বেরিয়ে ওঁদের বাগানে ঢুকে পড়লাম গাছগাছালির আড়ালে চলে এলাম বাড়ির পেছন দিকটায়। এবং তখনই শোভাদির গলা শুনতে পেলাম, 'কেন ? কেন তোমরা ওর সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দিলে না ! ও তো আমার চে ছোট।'

'যা করেছি বেশ করেছি।' শোভাদির মায়ের গলা, 'এখানকার কারোর সঙ্গে তুমি দে করতে পারবে না। তোমাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়া হবে। তারপর যা ইচ্ছে তা করো। আমাদের আর ভাবতে হবে না।'

'আমি এখন বিয়ে করব না।' শোভাদির গলায় কান্না।

'বিয়ে করব না !' বাঁকা গলায় শোভাদিকে নকল করলেন ওর মা, 'বুকের ওপর বসে উ হাঘরের ছেলের সঙ্গে প্রেম করবেন আর সেটা সহ্য করতে হবে।'

'ও মোটেই হাঘরের ছেলে নয়।'

'চুপ। তোর বংশে কেউ কখনও প্রেম করেছে ? কোনো ছেলে যা করতে সাহস পায়নি উনি মেয়ে হয়ে তাই করছেন। পাঁচজনে যে এখনও মুখে চুনকালি মাখায়নি তা আমাদে ভাগ্য।'

এসব কথা বোঝার বয়স তখন আমার হয়ে গিয়েছিল। আমি আবিষ্কার করলাম শোভাদি প্রেম করছে। কিন্তু কার সঙ্গে ? হাঘরে বলে যার উল্লেখ ওর মা করলেন তার নামটা তো শোনা গেল না। তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে বন্ধুদের ঘটনাটা বললাম। সেই বয়সের ছোট-ছোট বুকগুলো উত্তেজনায় ভরে উঠল। শোভাদি তখন আমাদের কাছে অশোকবনে সীতা আর ওর মা-বাবা রাবণ এবং তার চেড়ি। নিশীথ বলল, 'চল, সবাই মিলে গিয়ে ওকে উদ্ধার করে আনি।'

এই সময় অজিত জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু রামচন্দ্রটা কে ?'

এই নিয়ে জল্পনা চলল। কেউ হদিস পাচ্ছিলাম না। কিন্তু দেখা গেল কুমন আমাদের মনে, ওই ছোট্ট মনেও, একটা নির্লিপ্তি জন্ম নিচ্ছে। আমাদের কেউ নয়, কোনো অজানা পুরুষের সঙ্গে যে প্রেম করছে তাকে উদ্ধার করে কি হবে ? এই সময় অজিত মোক্ষম প্রশ্নটা করে বসল, 'ধর, আমাদের কারোর বোন যদি প্রেম করে তাহলে কি তাকে সার্পোট করব ? করব না। তাহলে শোভাদিকে হেল্প করতে যাচ্ছি কেন ?'

সঙ্গে সঙ্গে মতটা পাল্টে গেল সবার।

পরের দিন সকালে পাশের বাড়িতে হৈ হৈ কাণ্ড। শোভাদি মারা গিয়েছে। কিন্তু ডাক্তার রাজী হলেন না ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে। পুলিশ এল। জানা গেল শোভাদি আত্মহত্যা করেছে। আমাদের বন্ধুদের সূত্রে তখন সবাই জেনে গিয়েছে আত্মহত্যার কারণ। শোভাদির বাবা এবং মাকে পুলিশ থানায় নিয়ে গেল। মেয়ের মৃত্যুতে তাঁরা এত ভেঙে পড়েছিলেন যে পুলিশ বোধহয় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা সাজায়নি। পরের দিনই তাঁরা ফিরে এলেন। কিন্তু এর পরে কারও সঙ্গে মিশতেন না তাঁরা। শোভাদি তখন আমাদের চোখে বীরাঙ্গনা। প্রেমের জন্যে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি। আজও যখন শোভাদির কথা মনে আসে তখন তার উজ্জ্বল মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পাই। অত্যাচারিতা মেয়েদের পাশে দাঁড়াতে বলেছিল শোভাদি। নিজের কথা ভেবেই কি বলেছিল ?

চল্লিশটা বছর কি খুব বেশি সময় ? এই তো সেদিন বলে মনে হয় এখনও। আমাকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে শিখিয়েছিল শোভাদি। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ বাবা-মা ছেলেমেয়ের প্রেম সহ্য করতে পারতেন না। তাঁরা পছন্দমতো পাত্র বা পাত্রীর সঙ্গে মেয়ে বা ছেলের বিয়ে দেবেন এবং সেটাই শেষ কথা ছিল। দু-একটি ক্ষেত্রে ছেলে প্রেম করে বিয়ে করেছে এবং সেই বউ-এর সঙ্গে শ্বশুর-শাশুড়িকে থাকতে হয়েছে আর থাকাটা যে কত বিষময় তার খবর আমরা পেতাম। প্রেম করে বিয়ে হওয়া ছেলের বউকে কোনো শাশুড়ি মেনে নিতে পারতেন না। যাকে তিনি বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছেন সে কেন অন্যের মেয়েকে তাঁর অনুমতি ছাড়া মন দেবে ? এর সঙ্গে পারিবারিক মর্যাদা ইত্যাদিও জড়িয়ে ছিল। প্রেম সেসময় অপরাধের পর্যায়ে পড়ত। মেয়েকে লেখা প্রেমপত্র ধরা পড়লেই তাকে দরজা বন্ধ করে উপোস করিয়ে রেখে দেওয়া হতো। চড়চাপড়ও চলত। জলপাইগুড়িতে তখন পাড়ায় পাড়ায় কিছু ছেলে পাওয়া যেত যারা বাইরের পাড়া থেকে প্রেম করতে আসা ছেলেকে প্রহার করতে তৎপর ছিল। অথচ এরাই লাইন দিয়ে রূপশ্রী অথবা আলোছায়ায় গিয়ে উত্তম-সুচিত্রা, রাজকাপুর-নার্গিসের প্রেম দেখতো মশগুল হয়ে। আর বেশির ভাগ রক্ষণশীল পরিবার মেয়েদের সিনেমা

দেখতে পাঠাতেন যদি সেটা ধর্মমূলক বা জীবনীচিত্র হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অথব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আমাকেও দেখতে হয়েছে পিসিমার বালক-এসকর্ট হয়ে।

এ তো মাত্র চল্লিশ বছর আগের কথা। স্কটিশে পড়তে এসে দেখেছি বাবা ছাতি মাথায় করে মেয়েকে কলেজে পৌঁছে দিচ্ছেন এবং নিয়ে যাচ্ছেন। মেয়েরা অধ্যাপকের পেছন পেছন ক্লাশে ঢুকছে এবং শেষে বেরিয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যের পরে গার্জেন ছাড়া মেয়েদের ট্রামেবাসে দেখা যেত না পঁয়ত্রিশ বছর আগেও। দু বছর জুনিয়ার একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম বলে তার পিসিমা আমাকে সরষে ফুল দেখিয়ে ছেড়েছিলেন। বন্ধুদের বাড়িতে গেলে তাদের বাড়ির অবিবাহিতা মেয়ের দেখা পাওয়া বিরল ঘটনা ছিল।

আর আজ আমার বন্ধু বলে গেলেন তাঁর মেয়ে যদি পছন্দ করে কোনো ভাল ছেলেকে বিয়ে করে তাহলে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। এতে মেয়ের ভবিষ্যতে কোনো গোলমাল হলে তাঁর কোনো দায় থাকছে না। অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ বছরে এই সামাজিক পরিবর্তন চুপচাপ ঘটে গেছে। অর্থনৈতিক তোলপাড়ের সঙ্গে সামাজিক বৈষম্য মানুষের অনেক আঁকড়ে থাকা অবাস্তব ভাবনাকে খসিয়ে দিয়েছে মানুষেরই অজান্তে। এখন মেয়ে বা ছেলে প্রেম করছে শুনলে অভিভাবকেরা ব্যস্ত হন ওরা কবে বিয়ে করবে তাই ভেবে। যদি দুজনের বয়স বেশি না হয় অথবা অর্থনৈতিক স্থিরতা না থাকে তাহলে তাঁরা বুঝিয়ে বলেন, আগে নিজের পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াক তারপর যা ইচ্ছে করুক, তাঁদের কোনো আপত্তি নেই। অর্থাৎ তোমরা যদি ভুল কর তাহলে নিজের দায়িত্ব নিয়ে সেটা সামাল দিতে পারবে এই যোগ্যতা আসার পর ভুল করতে পার, এর আগে নয়। এর সঙ্গে আর একটি ব্যাপার যোগ হয়। ছেলেমেয়ে এখন বন্ধু হয়ে গিয়েছে বাবা-মায়ের। তাদের ভাল মাধ্যমে শিক্ষিত করে তোলার সময়ে কোনটা ভাল বা মন্দ তা বোঝার বুদ্ধি বিকশিত হচ্ছে দেখে বাবা-মায়েরা জেনে ফেলেন পাত্র নির্বাচনে ও ভুল করবে না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মেয়ে বা ছেলে প্রেম করবে অনেক ভেবেচিন্তে, দেখেশুনে, যাচাই করে। এতে বাবা-মা নিশ্চিন্ত হন।

কিন্তু মেয়ে প্রেম করে বিয়ে করছে আর তাঁদের কোনো দায়িত্ব নেই, ঘটা করে বিয়ে দিতে তাঁরা কার্পণ্য করছেন না. এই ব্যাপারটায় আমি একটু স্বার্থপরতার গন্ধ পাই। নিজের সন্তান প্রেম করে বিয়ে করছে। সেই বিয়ে যদি ঠোক্কর খায়, যদি মেয়ে তার ভুল বুঝতে পারে তাহলে বাবা-মায়ের দায়িত্ব থাকবে না মেয়ের পাশে দাঁড়াবার ? নাকি দাঁড়ালেও নিজেদের দায়ী বলে মনে না হওয়ায় তাঁরা আত্মতৃপ্তিতে ভুগবেন ? তাঁরা যদি সম্বন্ধ করে বিয়ে দিয়ে দেখতেন পাত্র নির্বাচনে ভুল হয়ে গিয়েছে তাহলে নিজেদের দায়ী ভাবতেন কিন্তু মেয়েটা যে জ্বলে-পুড়ে মরত ? সেই ক্ষতে কোন মলম বোলাতেন তাঁরা ?

একথা অনস্বীকার্য, আজকাল, যাদের বয়স পঁচিশের কম, তাদের বিয়ে নিয়ে একদম ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না। আমরা ছেলেমেয়েদের মানুষ করাই বন্ধুর মতো। তাদের সবরকম চাহিদা ছেলেবেলা থেকেই পূর্ণ করেছি। তারা যেমন ভাল রেজাল্ট করছে তেমনি স্বাধীনভাবে ভাবতে শিখছে। আর সেই স্বাধীন মতামতকে আমরা গুরুত্ব দিয়ে এসেছি। তাই বিয়ের পর সে যদি শ্বশুরবাড়িতে বিপরীত পরিবেশ দ্যাখে, রুচির পার্থক্য চোখে পড়ে এবং তার মতামতকে

যদি শ্বশুরবাড়ির লোকজন গুরুত্ব না দেয় তাহলে তার পক্ষে মানিয়ে থাকা সম্ভব হয় না। এই ছেলেমেয়েরা ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনো কিছুকে মেনে নিতে শেখেনি। হঠাৎ করে তাদের মধ্যে ওই স্বভাবটি চাওয়া বোকামি। ফলে সম্বন্ধ করা বিয়ে দশটার মধ্যে পাঁচটাই আর টিকছে না। এসব ক্ষেত্রে কেউ কেউ গুরুতর কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না কিন্তু সামান্য পার্থক্য যে এদের কাছে কত বড় হয়ে উঠছে তা তাঁরা অনুধাবন করতে পারেন না। শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে আসা মানেই ডিভোর্স নয়। আলাদা থাকার অভ্যেসও তৈরি হয়ে যাচ্ছে তাই! ফলে এখনকার বাবা-মা সম্বন্ধ করে বিয়ে দিতে ভয় পাচ্ছেন। এবং সেখানেই স্বার্থপরতার প্রশ্ন উঠছে।

কদিন বাদে বন্ধুর বাড়িতে গেলাম। বন্ধুর মেয়ে বাড়িতেই ছিল। সে আমাকে দেখতে পেয়েই গল্প জুড়ে দিল, 'আচ্ছা কাকু, তুমি মেয়েদের হয়ে এত ওকালতি কর কেন?'

'ওকালতি?' পট করে শোভাদির কথা মনে এল।

'হ্যাঁ। তোমার লেখায় শুধু মেয়েদের কষ্ট পাওয়ার কথা আর তাদের লড়াই।'

'সেটাই তো সত্যি। তাই না?'

'তুমি একটু বেশি আবেগ মেশাও।'

'তা হবে। এবার বল, তোমার খবর কি?'

'ভাল আছি।'

'প্রেমট্রেম করছ?'

'ধ্যেৎ! এমন কোনো ছেলে পেলাম না যার সঙ্গে প্রেম করা যায়।'

'সহপাঠীরা?'

'ওদের এখনও ম্যাচিওরিটি আসেনি।'

'সম্বন্ধ করব?'

'করতে পার। মনের মতো না হলে কিন্তু ছেড়ে চলে আসব।' সে হাসল, 'এই যে আমার বাবা-মা দিন-রাত ঝগড়া করে কি করে আঠাশ বছর একসঙ্গে আছে কে জানে।'

'সেই কারণটা জানতে চেষ্টা কর না কেন?'

'লোকলজ্জা, ভয়, কে কি বলবে তাই নিয়ে আশঙ্কা। আমি তো ঠিক করেছি বিয়ে করব না। ছেলেরা যদি বিয়ে না করে কাজ করতে পারে, আমিই বা পারব না কেন? সুখের চেয়ে স্বস্তিতে থাকা ভাল। কি বল কাকু?' সে হাসল।

এই মেয়েটির সংখ্যা এখন দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তারা কারও ঘাড়ে দায় চাপাতে চায় না আবার দায় নামিয়ে নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগও দিচ্ছে না।

॥ ২০ ॥

সঙ্গত কারণেই আসল নামটি বলতে পারছি না। ধরা যাক তার নাম নন্দিনী। নন্দিনীর কথা আমি প্রথম শুনি এক সহকর্মীর মুখে। ভদ্রলোক বিবাহিত কিন্তু কোথায় অফিসের কোন মেয়ে কি করে বেড়াচ্ছে তার খোঁজখবর রাখতে তাঁর অপরিসীম আগ্রহ। সরকারি অফিসে চাকরি পাওয়া যত সহজ, যাওয়া তত কঠিন। ফলে ভদ্রলোক সারাদিন ও চর্চাই চালিয়ে যেতেন। আমার পাশেই বসতেন তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনি নন্দিনী রায়কে দেখেছেন ?' আমি ঘাড় নেড়ে না বলতে তিনি কাঁধ নাড়ালেন, 'কি যে করেন।'

'কেন ? তিনি কে ?'

'আপাতত আমাদের ডিপার্টমেন্টে টেলিফোন অপারেটার হিসেবে আছেন, কিন্তু ওঁর মতো ক্ষমতা এই ডিপার্টমেন্টের কোনো ইউনিয়ন নেতারও নেই।'

'কিরকম ?'

'যে কোনো কেসে ওঁকে ধরলে অফিসাররা তো দূরের কথা, কমিশনারও চোখ বুজে করে দেবেন। দেখতে-শুনতে তেমন দারুণ নন, কিন্তু স্টাইলটি অসাধারণ।' ভদ্রলোক আরও কিছু তথ্য দিলেন। আমাদের ডিপার্টমেন্টের ওপরতলার সাহেবদের অনেকেই নাকি নন্দিনীর সঙ্গে দুপুরটা কাটাতে লাইন লাগান। রোজ একটা নাগাদ সে ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে আড়াইটের পর। ভদ্রলোক বললেন, 'আরে মশাই, একজন সাধারণ টেলিফোন অপারেটার রোজ রোজ ট্যাক্সিতে যাতায়াত করছে, টাকা কোত্থেকে আসে ?'

আমার সঙ্গে নন্দিনী রায়ের সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি। আমি সরকারের যে বিভাগে চাকরি করতাম, সেই বিভাগ অন্তত সাতটি বাড়িতে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল। নন্দিনী কাজ করতেন দূরের একটি বাড়িতে।

তখন বয়স কম। কি কারণে অফিস বেলা বারোটায় ছুটি হয়ে গিয়েছিল। পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম মেট্রোতে গিয়ে সিনেমা দেখলে কেমন হয় ! হঠাৎ চিৎকার শুনলাম আমার নাম ধরে কেউ ডাকছে। দেখলাম ডাকটা ভেসে আসছে একটা পুলিশের জিপ থেকে। কাছে যেতেই বিপুল বলে উঠল, 'চটপট উঠে আয়।'

বিপুলকে দেখে আমি চমকিত। জলপাইগুড়ির জেলা স্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়তাম কলকাতায় এসে বিচ্ছিন্ন। ও যে পুলিশের সার্জেন্ট হয়েছে জানাই ছিল না। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে আনন্দ হয় কিন্তু পুলিশের জিপে বসার অস্বস্তি সেই আনন্দটাকে চেপে রাখছিল।

কুশল বিনিময়ের পর বিপুল বলল, 'চল আমার সঙ্গে। একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার দেখতে পাবি।'

গাড়ি থামল পার্ক লেনের মুখে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা কি?' বিপুল বলল, 'একটা বাড়িতে রেইড করব। আয়।'

খবরের কাগজে পড়েছি কোথাও বেআইনি কিছু হলে পুলিশ তল্লাশি চালায়। মেট্রোতে সিনেমা দেখার চেয়ে জীবন্ত সিনেমার মতো ঘটনা দেখা অনেক বেশি আকর্ষণীয়। সেপাইদের হুকুম দিয়ে বিপুল উঠতে লাগল ওপরে, পেছনে আমি। রাস্তা থেকেই প্রায় খাড়া সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। দোতলায় যারা থাকে তারা নেমে যেতে পারবে এমনভাবে সিঁড়ি তৈরি। বিপুল চলে এল তিনতলায়। বন্ধ দরজায় কড়া নাড়ল।

ভেতর থেকে গলা ভেসে এল এক মহিলার, 'কে?'

বিপুল একেবারে ভিলেনের গলায় জবাব দিল, 'দরজা খুলুন।'

দরজাটা খুলল। দেখলাম মধ্যবয়সিনী একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলা দাঁড়িয়ে। পুলিশ দেখে একটু চমকে উঠেও নিজেকে সামলে নিলেন, 'আসুন, আসুন। কি সৌভাগ্য!'

বিপুলের সঙ্গে ভেতরে ঢুকলাম। বসার ঘর। টেবিলে তাস সাজানো। কেউ পেসেন্স খেলছিল। ভদ্রমহিলা আমাদের বসতে বলে নিজে আর একটি চেয়ার টানলেন।

'মিসেস স্টিফেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার বাড়ি সার্চ করা হবে।'

'কেন বলুন তো?'

'এ বাড়িতে আপনি মধুচক্র বসান। আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে আপনি অসৎ উদ্দেশ্যে যেসব ছেলেমেয়ে আসে তাদের ঘণ্টাপিছু ঘর ভাড়া দেন।'

ভদ্রমহিলা হাসলেন, 'কথাটা সত্যি নয় অফিসার। আপনি নিশ্চয়ই সার্চ করতে পারেন। তবে অনুরোধ করছি পাঁচ মিনিট পরে করবেন।'

'কেন?'

'আমার মেয়ে এখনই প্রাইভেট টিউটারের কাছে পড়তে যাবে। সে বেরিয়ে গেলে আপনি যদি আপনার কর্তব্য করেন তাহলে আমি খুশি হব।' ভদ্রমহিলা কথা বলছেন যখন, তখন পাশের দরজা থেকে একটি কিশোরী বই-এর ব্যাগ নিয়ে এ ঘরে এল। মিসেস স্টিফেন তাকে বললেন, 'খেয়ে যাও।'

মেয়েটি ঘরের এক কোণে টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে ঢাকা খাবার খুলল। বিপুল জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি?'

'সোফিয়া।'

'কোথায় পড়?'

'হ্যারিংটন গার্লসে।'

'কোন ক্লাশ?'

'সেভেন।'

অতি দ্রুত খাওয়া শেষ করে মেয়েটি ব্যাগ নিয়ে নিচে নেমে গেল। এতক্ষণে আমি লক্ষ্য করেছি এ ঘর থেকে ভেতরে যাওয়ার দরজা দুটো। একটা দিয়ে মেয়েটি বেরিয়ে এল। অন্য দরজাটি বন্ধ। বিপুল উঠে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে কাউকে না পেয়ে ফিরে এল। এসে বন্ধ দরজাটা দেখিয়ে হুকুম করল, 'ওটা খুলুন।'

এবার মিসেস স্টিফেন গলা পাল্টালেন, 'অফিসার। ওখানে আমার এক বন্ধু আর তার স্ত্রী রয়েছে। আসলে ওদের বাড়িতে জায়গা নেই আর লোকজন বেশি, ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গিয়েছে তাই নিজেরা কাছাকাছি হতে পারে না। ওদের ডিস্টার্ব করবেন না।'

বিপুল বলল, 'বাঃ! চমৎকার গল্প। দরজা খোলান। জলদি!'

মিসেস স্টিফেন বাধ্য হলেন দরজায় নক্ করতে। দ্বিতীয়বার শব্দ করার পর দরজা খুলল। কালো মাঝারি চেহারার এক ভদ্রলোক কোনোদিকে না তাকিয়ে এ ঘরের ভেতর দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। বিপুল তাঁকে দাঁড়াতে বলতেই ভদ্রলোক অসহায় হয়ে গেলেন। বিপুল নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'এখানে বসুন।'

ভদ্রলোক বাধ্য হলেন বসতে। মিসেস স্টিফেন ততক্ষণে পাশের ঘরে ঢুকে গিয়েছেন মিনিট তিনেক বাদে অল্পবয়সী একজন মহিলাকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন, 'এই যে, এ হলে আমার বান্ধবী মিসেস রায় আর উনি মিস্টার রায়।' এটুকু বলেই ক্ষান্ত হলেন না মহিলা বললেন, 'এঁরা খুব রেসপেক্টেবল মানুষ। মিসেস রায় সরকারি চাকরি করেন। উনি ব্যবসা

বিপুল কোন সরকারি অফিস জানতে চাইলে মিসেস স্টিফেনই নামটা বললেন। শুনে আমি নড়েচড়ে উঠলাম। এ তো আমারই অফিস।

বিপুল জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার পুরো নাম?'

'নন্দিনী রায়।'

'আপনি এই ব্যবসা কদ্দিন করছেন?'

'ব্যবসা?'

'নিশ্চয়ই। আপনার সরকারি চাকরি একমুহূর্তে চলে যাবে তা জানেন?'

আমার সহকর্মী কখনই বলেননি নন্দিনী বিবাহিতা কিনা। চোখের সামনে মহিলাকে দেখে কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। হয়তো মিসেস স্টিফেনের কথাই সত্য। বাড়িতে সমস্যা বলে ভদ্রমহিলা তেমন সুন্দরী নন, কিন্তু ছিমছাম হলেও চটক রয়েছে। আমি বিপুলকে একপাশে ডেকে আনলাম, 'শোন, এই মহিলা আমার অফিসে আছেন।'

'চিনিস?'

'নাম শুনেছি। এঁকে ছেড়ে দেওয়া যায় না!'

বিপুলের মুখে হাসি ফুটল, 'কি ব্যাপার গুরু?'

'কোনো ব্যাপার নয়। দেখে ক্রিমিন্যাল মনে হচ্ছে না!'

'ক্রিমিন্যালদের দেখে কিছু বোঝা যায় না।' বিপুল ঘুরে দাঁড়াল, 'ঠিক আছে মিসেস রায়। এ যাত্রায় আপনি বেঁচে গেলেন। আমার এই বন্ধুর অনুরোধে আপনাকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি পাই তাহলে বুঝতেই পারছেন—।'

নন্দিনী এবার আমার দিকে তাকাল। সেই চাহনি এখনও আমার মনে আছে। তারপর ওরা নেমে গেল। মিসেস স্টিফেনকে অনেক শাসিয়ে বিপুল নেমে এল রাস্তায়। নেমে বলল, তোর জন্যে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু এই সব মেয়ের পাল্লায় পড়িস না। এরা খুব ডেঞ্জারাস।'

এই ঘটনার কথা আমি অফিসে বলিনি। ব্যক্তিগত লজ্জার কথা প্রকাশ করে কোনো মেয়েকে ছোট করা অনুচিত বলে মনে করেছিলাম।

বছর খানেক বাদে চেতলায় গিয়েছিলাম এক বিকেলে। যাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম তিনি ছিলেন না। ফিরে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়াতেই দেখলাম একটা ট্যাক্সি এসে থামল এবং নন্দিনী রায় ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে একটা ওষুধের দোকানে ঢুকে গেল। মিনিট তিনেক বাদে সে দোকান থেকে বেরুতেই আমাকে দেখতে পেল। আমি অন্যদিকে মুখ সরিয়ে নিয়েছিলাম। এরপর কানে এল, 'শুনুন।'

পাশ ফিরে দেখলাম নন্দিনী দাঁড়িয়ে আছে, 'আপনি এখানে?'

না চেনার ভান করে লাভ নেই, বললাম, 'একটা কাজে এসেছিলাম।'

'আমি আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনি কি করেন, কোথায় থাকেন কিছুই জানি না।'

'হঠাৎ?'

'সেদিন আগ বাড়িয়ে উপকার করলেন কেন?'

'এমনি।'

'না। আগ বাড়িয়ে যারা উপকার করে তাদের মতলব থাকে। কিন্তু সেটা যে আপনার নেই তা এতদিনে বোঝা গেছে।'

'ও। আপনি যে ডিপার্টমেন্টে আছেন আমিও সেখানে কাজ করি। আপনার স্বামী কেমন আছেন?'

'স্বামী?' হাসল নন্দিনী, 'আমার বিয়ে হয়নি।'

'তাহলে সেদিন—?'

'উনি আমাদের ডিপার্টমেন্টেরই একজন কমিশনার। খুব ঘেন্না হচ্ছে, না?'

এর উত্তর আমার জানা ছিল না।

নন্দিনী বল্ল, 'আপনার হাতে সময় আছে?'

'কেন বলুন তো?'

'আপনাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই।'

'বাড়িতে?'

'হ্যাঁ। সাধারণ পাঁচটা নিম্নবিত্ত বাড়ি যেমন হয় আমাদের বাড়িও তেমন। আসবেন? প্লিজ আসুন না।'

অন্যরকম কৌতূহল হলো।

সেই বিকেলে নন্দিনী রায়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। পুরনো দোতলা বাড়ি। তিন ভাই তাঁদের পরিবার নিয়ে আলাদা থাকেন ওই বাড়িতেই। নন্দিনী যে ঘরে আমায় নিয়ে গেল সেই

ঘরের একটিমাত্র খাটে একজন বৃদ্ধা শুয়ে আছেন। আমরা ঢোকামাত্র তিনি জড়ানো গলায় বলে যেতে লাগলেন সেটা নালিশ, অনুযোগ এবং সব মিলিয়ে নিজের ওপর ধিক্কার প্রকাশ করা। নন্দিনী বৃদ্ধার কপালে হাত বুলিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমি দেখছি, তুমি শান্ত হও।'

বৃদ্ধা সেটা হতে চাইছেন না। খাটের একপাশে যে বয়স্কা মহিলা দাঁড়িয়ে তাকে কাজে লোক বলে চেনা গেল। হঠাৎ আমার ওপর চোখ পড়তেই বৃদ্ধা থেমে গেলেন। দ্রুত চাদর টে নিয়ে হাতড়ে হাতড়ে পাশ থেকে চশমা তুলে চোখে আঁটলেন। তারপর বেশ গম্ভীর গলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইনি কে?'

নন্দিনী বলল, 'আমরা একই অফিসে চাকরি করি।'

'ও। তুই তো কাউকে এ বাড়িতে নিয়ে আসিস না। তা হঠাৎ—।'

'এমনি।' এবার নন্দিনী ঘুরে দাঁড়াল, 'আমার মা।'

'আমি সমরেশ।' নমস্কার করলাম বৃদ্ধাকে।

'বসো, বসো। তুমি বলছি বলে কিছু মনে করো না। এই যে, দাঁড়িয়ে কি দেখছ, তাড়াতা চা বানিয়ে নিয়ে এস।' শেষের হুকুম কাজের লোককে।

বললাম, 'না না। চায়ের দরকার নেই।'

'তা বললে কি হয়। যাও।' বৃদ্ধা ধমকালেন।

নন্দিনী বলল, 'আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।' একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে সে ভেতর চলে গেল। অতএব বসতে হলো।

'কথা বলার লোক পাই না। কেউ তো আসে না এ ঘরে।' বৃদ্ধা বললেন।

'আপনার কি হয়েছে?'

'জীবন্মৃত হয়ে আছি বাবা,' স্ট্রোক হয়েছিল। বাঁ দিকটা পড়ে গিয়েছে। তার ওপর হার্টে ব্যামো। বিছানায় শুয়ে সব করি। ভগবান নিতে পারছে না ওই মেয়েটা আছে বলে। দুহাতে যমদূতকে ঠেকিয়ে রেখেছে।'

'আপনার ছেলেরা?'

'কাউকে দোষ দেব না বাবা। সবই গ্রহের ফের। তারা তাদের নিয়ে এত ব্যস্ত, এত সমস্যা তাদের যে আমাকে দেখার সময় পায় না। সংসারে যতক্ষণ মানুষকে মানুষের প্রয়োজন থাকে ততক্ষণই সে নিজের। ওদের আমাকে প্রয়োজন নেই।'

'হাজার হোক আপনি তো ওদের মা!'

'সংসারে বউ-ছেলেমেয়ে এসে গেলে মায়ের দাম কমে যায় বাবা। এই যে নন্দিনী আমার জন্যে এত করছে তার কারণ আমি ছাড়া তার কেউ নেই। আমি চলে গেলে সে অসহায় হয়ে পড়বে। এমনিতেই দাদারা তাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। আমি আছি বলে পারছে না। কিন্তু আমার তো চিন্তা হয়। মেয়েটার যদি একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হতাম। ছেলেদের সঙ্গে কাজ করে তবু কারও প্রেমে পড়ে না। অদ্ভুত মেয়ে! আর দ্যাখো, আমার পেছনে ওর মাসে দু'হাজারের বেশি খরচ। ওষুধ, আয়া, পথ্য—! ভয়ে আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি না কি করে ও এসব করছে!'

বৃদ্ধা সম্ভবত অনেকদিন পরে মন খুলে কথা বলছিলেন।

নন্দিনী এল। শাড়ি পাল্টেছে, ঘরোয়া হয়েছে। হালকা কথাবার্তা হচ্ছিল। চা এল। ...লাম। তারপর বৃদ্ধার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগোলাম। নন্দিনী আমার আপত্তি সত্ত্বেও ...গিয়ে দিতে এল। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় এক ভদ্রলোকের মুখোমুখি! কড়া গলায় জিজ্ঞাসা ...বলেন, 'কে?'

'আমার অফিসের— !'

'তাই? বাড়িতেও আমদানি করছ?'

'ভদ্রভাবে কথা বল। উনি আমার সহকর্মী।'

'আর ভদ্রভাবে কথা বলার মুখ রেখেছ তুমি! লজ্জায় তো মাথা কাটা যাচ্ছে।' ভদ্রলোক ...ভতরে চলে গেলেন। রাস্তায় নেমে এলাম আমরা।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার দাদা?'

'হ্যাঁ। মেজ।' তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'কি করি বলুন তো?'

আমি উত্তর দিলাম না।

'আমার অবস্থায় পড়লে আপনি কি করতেন?'

'জানি না।'

'মায়ের খরচ আমাকেই টানতে হবে। অফিস থেকে হাতে পাই চারশো টাকা। এই বিশাল ...রচ টানার তো এছাড়া কোনো উপায় নেই।'

হঠাৎ মাথায় আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'শুনেছি আপনার সঙ্গে ওপরতলার অফিসারদের ...রিচয় আছে। তাদের কাছে কেস নিয়ে গেলে তো ভাল রোজগার হতে পারে।'

'ঘেন্না লাগে।'

'কেন?'

'আমি নির্বাচিত কয়েকজনের সঙ্গে সময় কাটিয়ে টাকা নিই কারণ মাকে বাঁচিয়ে রাখতেই ...রে। যদি এটা বেশ্যাবৃত্তি বলেন, আমি জানি প্রতিবাদ করে কোনো লাভ হবে না। কিন্তু ওইসব ...অফিসারের কোনো অভাব নেই। আমাকে দয়া করার কোনো বাসনা তাদের হবে না। আমার ...ধ্যমে তারা পার্টির কাছে টাকা চাইবে, আবার আমাকে উপভোগ করবে কাজটা করে দিচ্ছে ...লে। এদের তো কেউ কিছু বলে না। এরা তো বেশ্যার চেয়েও অধম। তাই না?'

সেদিন মনে হয়েছিল নন্দিনী ঠিক প্রশ্ন উচ্চারণ করেছে। যত দিন গিয়েছে তত দিন মনে ...নে আমি নন্দিনীকে সমর্থন করেছি। এসব অনেক বছর আগের ঘটনা। গল্পটি সেখানেই শেষ ...য়ে যায়নি। নন্দিনীর সঙ্গে দেখা হয় এর বছর পনের বাদে। তখন সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি ...আমি।

অবিকল একই রকম রয়ে গিয়েছে নন্দিনী। শুধু সময় তার ছাপ ফেলেছে চোখে-মুখে। ...সেদিন সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছিল। পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে কাজ ছিল। দুপুরের পর ট্যাক্সি নিয়ে ...ফিরছি, হঠাৎ নজর গেল এক গাড়িবারান্দার তলায় নন্দিনী দাঁড়িয়ে।

॥ ২১ ॥

নন্দিনীর বাকি কাহিনী লেখার আগে অন্য একটা ভাব মাথায় ঢুকে পড়ল। এমন অনেক পেশা আছে যা পুরুষদের দখল ছিল প্রথম থেকেই। যেমন ওকালা অথবা দালালি। দালালি শব্দটা একসময় কখনই শ্র পেত না। দালালকে আমরা কখনই সম্মান জানাইনি দালালদের কাজটা ছিল যার আছে তার কাছে যার চ তাকে পৌঁছে দেওয়া এবং এ বাবদ বকশিস পেত তারা যেমন বাড়ির দালাল। বিয়ের ব্যাপারে দালাল বলতে এব সঙ্কোচ হওয়ায় বলা হতো ঘটক। এই দালালদের কাজ হাসিল করতে অজস্র মিথ্যে কথা বল হতো। সত্যি যে থাকত না তা নয়। নইলে পরে তারা কাজ করতে পারবে কি করে? ত দালালদের কাজ ছিল সীমিত জায়গায়। জমি বা বাড়ির দালালের পাশাপাশি আর এক দাল শ্রেণীর কথা শোনা যেত, মেয়েমানুষের দালাল। কিন্তু সেই দালাল মেয়েমানুষের প্রতিনিধি ন তাকে নিয়ে যে ব্যবসা করছে তার প্রতিনিধি। কর্মটি এখনও অনেকের আস্থাভাজন নয় ব বিজ্ঞাপনে দেখবেন লেখা হয়, দালাল নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিকাঠামো পাল্টা পাল্টাতে এমন অবস্থা হলো যখন ব্যবসার সব ক্ষেত্রে মিডলম্যান অথবা দালালদের ভূমিকা বে যেতে লাগল। দালাল শব্দটির বদলে এল এজেন্ট। আপনার প্রোডাক্ট যাতে ভালভাবে বি হয় তাই এজেন্সি এগিয়ে এল কমিশন নিয়ে কাজ করতে। ঘটকদের বদলে তৈরি হলো ম্যা ব্যুরো বা বিবাহসংক্রান্ত তথ্যকেন্দ্র। বেড়াতে বা কাজে কোথাও যাবেন, টিকিট দরকার, ত তৈরি হলো ট্রাভেল এজেন্সি। আরও বড় স্তরে যেখানে কোটি কোটি টাকার আন্তর্জাতিক ব্যব সেখানেও সেই ক্ষমতাসম্পন্ন এজেন্সি হাউস জন্ম নিল। ইউরোপ আমেরিকা জাপানে লেখ শিল্পীরা নিজেদের রোজগার এবং প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে দিলেন এজেন্টদের ওপর। অর্থ দালালরা সম্মানীয় হয়ে উঠল। আজ কোনো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ট্রাভেল এজেন্সি মালিককে দালাল বলে উড়িয়ে যে দিতে চাইবে সে-ই হাস্যাস্পদ হবে।

পাশাপাশি না হলেও, কাছাকাছি, ওকালতি পেশা ছিল বেশ সম্মানজনক পেশ ভাগলপুরের বিখ্যাত উকিল বা কলকাতা হাইকোর্টের বাঘা উকিল ইত্যাদি বলতে লোকে একজ বিদ্বান, লড়িয়ে এবং অর্থবান মানুষের ছবি কল্পনা করত। তখন মূলত মামলা-মোকদ্দমা হ আদালতে। জমিজমা, বিষয়-সম্পত্তি, খুন-খারাপি ইত্যাদিতে সীমিত। এরপর যখন আয়ব বিক্রয়কর সংক্রান্ত জটিলতা বাড়ল তখন সেখানে আইনের মারপ্যাঁচ দেখিয়ে উকিলরা তাঁ মক্কেলদের সুবিধে আদায় শুরু করলেন। এই ক্ষেত্রে একটু অন্য চিত্র তৈরি হলো। আদাল

মানুষ যায় ন্যায়বিচার পেতে। সেখানে উকিলরা আইনের ব্যাখ্যা করে সেই বিচার পেতে সাহায্য করেন। আয়করের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন। এখানে সরকার মনে করছে বেশি ট্যাক্স হবে, আযকরদাতার তা মনে হচ্ছে না। উকিল আয়করদাতার কাছ থেকে দক্ষিণা নিয়ে তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চান। এই ক্ষেত্রে আয়কর অফিসার একজন সরকারি প্রতিনিধিমাত্র, আদালতের সম্মানিত বিচারক নন।

অর্থনৈতিক চাপ, আদর্শচ্যুতি, নানান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয় মানুষকে এখন যে অসততার পথে ঠেলে দিয়েছে, সেই পথে চলতে গেলে আর যাই হোক পড়াশুনা করতে হয়। এখন একজন আয়কর অফিসার স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন, আপনি যে হিসেব দিয়েছেন তা মেনে নিলে আমার কি উপকার হবে? যে মাইনে পাই তাতে এ বাজারে কি চলে? আপনিই বলুন না! যে উকিল এখন পসার বাড়িয়েছেন তাঁর কোনো আইন জানার দরকার নেই। অ্যাকাউন্টেন্ট যে হিসেব মক্কেলকে করে দিয়েছেন তাই দাখিল করে পাশ করিয়ে নিতে পারেন তিনি খাম এগিয়ে দিয়ে। এখন এই উকিলদের রমরমা। অফিসাররা এঁদের কাছের লোক মনে করেন, কারণ স্পষ্ট। মক্কেলরা জানেন যে এঁকে ধরলে কাজ হাসিল হবে। চল্লিশ হাজার টাকা ট্যাক্স বাঁচাতে দশ হাজার খরচ করতে কোনো অসুবিধে নেই। আর সেই মধ্যমণি যখন সাহেবকে দশ দেবেন বলে মক্কেলের হাত থেকে বাণ্ডিল নিয়ে সাত দিয়ে তিন পকেটে রেখে দেন তখন কেউ বলার নেই। এর ওপর ওকালতির দক্ষিণা তো আছেই। এ কাজ করতে আইন জানার দরকার নেই। কোনোরকমে প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা পার হলেই যথেষ্ট। এর ফলে যাঁরা সত্যিকারের আইনজ্ঞ, সততার সঙ্গে কাজ করেছেন, তাঁরা পিছু হটে যাচ্ছেন। এই পেশায় বিরক্তি এসে গেছে তাঁদের। ভরসার কথা, এখনও কিছু সৎ এবং আইনজানা অফিসার আছেন যাঁরা ওই মধ্যমণিদের আস্কারা দেন না। এটা প্রচারিত হয়ে যাওয়ায় মক্কেলরা বাধ্য হন সেই ধরনের অফিসারদের কাছে কেস গেলে সত্যিকারের আইনজ্ঞের শরণাপন্ন হতে।

এই তথাকথিত উকিল এবং দালাল থেকে এজেন্টে রূপান্তরিত হওয়া পেশায় মেয়েদের একসময় দেখা যেত না। ঠোঁটকাটা মিথ্যে কথা বলতে হবে, ঘুষ দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে হবে, পার্টিকে চাপ দিয়ে টাকা হাতানো, এসবই পুরুষের কর্ম ছিল। ছলে বলে কৌশলে কাজ উদ্ধার করাই যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানে মেয়েদের যেতে রুচিতে বাধতো। কিন্তু বেঁচে থাকার সমস্যা যত বাড়তে লাগল তত ন্যায়বোধের মুখোশ খুলে পড়ল। একজন মহিলা সরকারি কর্মচারিণী অথবা অফিসার যখন তাঁর চক্ষুলজ্জা বাড়িতে রেখে অফিসে আসতে পারেন তখন ওই তথাকথিত উকিল অথবা দালাল বা এজেন্টের ভূমিকায় মেয়েদের যেতে অসুবিধে কোথায়? একজন এরকম মহিলা উকিল সমাজে বেশ শ্রদ্ধা পান। বিজ্ঞাপন বা ট্রাভেল এজেন্সি খুলে দু'পক্ষের মধ্যে দালালি করলে কেউ ছোট চোখে দ্যাখে না। মেয়েরা যেহেতু ছেলেদের চেয়ে বেশি গোছানো এবং সিরিয়াস, তাই কর্মক্ষেত্রে তাঁরা যখন নেমে পড়েছেন তখন দেখা গেল তাঁরাই বেশি দক্ষ। বাইরের জগতে মেয়েদের ভূমিকা আর মেয়েলি নয়।

নন্দিনীকে এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে।

অসুস্থ মায়ের চিকিৎসার দায়িত্ব ভাইরা না নেওয়ায় পুরো চাপ নন্দিনীর ওপর পড়েছিল।

যা মাইনে পেত তা দিয়ে সেই চাপ সামলে হয়তো কোনোভাবে বেঁচে থাকা যেত, কিন্তু নন্দিনী প্রেমে পড়ল একজন বিবাহিত ধনী অফিসারের যাঁর ঘুষের টাকা নিতে আগ্রহ বেশি ছিল। ঘুষ নেওয়া যেখানে স্বাভাবিক আচার বলে স্বীকৃত সেখানে প্রেমিকের পকেটভর্তি টাকা কোথা থেকে আসছে, প্রশ্ন করত না নন্দিনী। কলকাতার বড় বড় হোটেল, ট্যাক্সি চড়া সেই প্রেমিকের টাকায় যার শুরু, তার অভ্যেস পাল্টে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এরকম এক দুপুরে কারনানি ম্যানসনের একটা আন্টির ফ্ল্যাটে প্রেমিকের সঙ্গে গিয়ে সে পুলিশের হাতে পড়ে গেল। প্রেমিক টাকা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করলেও এক রাত হাজতে থাকতে হয়েছিল তাকে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করেছিল প্রেমিকের বন্ধু অন্য এক অফিসার। যে অভিযোগ নন্দিনীর বিরুদ্ধে ছিল তা ডিপার্টমেন্ট জানতে পারলে চাকরি চলে যাবে—শুধু এই ভয় দেখিয়ে বন্ধু অফিসার নন্দিনীকে ব্যবহার করতে লাগলেন। আর ব্যবহৃত হতে হতে নন্দিনী শেষ পর্যন্ত শিখে গেল কি করে রাঘব বোয়ালদের মনোরঞ্জন করে রোজগার করতে হয়। তার প্রেমিক ততদিনে চরিত্রবান হয়ে গিয়েছেন।

এই পর্যায়ে নন্দিনী আর একটা পথ নিতে পারত। ডিপার্টমেন্টের অনেক বড় বড় কর্তাকে সঙ্গ দিয়ে তাদের সঙ্গে যে আপাতসখ্যতা তৈরি হয়েছিল তার সুযোগ নিয়ে তথাকথিত দালালিতে নামতে পারত। যে সমস্ত জটিল কেস নিচের তলার অফিসাররা সমঝোতা করতে না পেরে বাড়তি ট্যাক্সের বোঝা পার্টির ওপর চাপিয়ে দেন, সেইসব কেস যাদের হাতে আসে তাদের তোয়াজ করে রফা করার চেষ্টা করতে পারত নন্দিনী। করলেই সে মোটা কমিশন পেতে পারত। কেউ কেউ তাকে ওই কাজে লাগাতেও চেয়েছিল। কিন্তু নন্দিনী ব্যাপারটাকে পেশা হিসেবে নিতে পারেনি। একজন বড়কর্তা তাকে বলেছিল, 'তোমাকে ভাল লাগে বলে হোটেলে এসে সময় কাটাই। যখনই তুমি ধান্দা নিয়ে আমার কাছে আসবে তখন মনে হবে তুমি আমাকে টুপি পরিয়ে অনেক বেশি রোজগার করছ। তখন তোমাকে আর পাত্তা দেব না।' নন্দিনী ভয় পেয়েছিল বলে ওই পথে এগোয়নি। কিন্তু ও ভুলে গিয়েছিল অপরাধীরা সবচেয়ে বেশি দুর্বল হয়। পাত্তা দেব না বলা আর করা এক ব্যাপার নয়। সময় যখন ছিল নন্দিনী তখন চালাক হতে পারেনি।

অন্যথা ব্যাপারটা এইরকম ছিল। বাড়তি টাকা পেয়ে নন্দিনী প্রয়োজনের সংজ্ঞা বদলেছিল ঠিক কিন্তু তারও সীমা ছিল। ট্যাক্সি চড়া, ভাল শাড়ি পরা, দামী হোটেলে খাওয়া এবং মায়ের জন্যে বড় ডাক্তার আর ওষুধপথ্যে সেই টাকা সে খরচ করতে ভালবাসত। ভবিষ্যতের কথা ভাবা তার চরিত্রে ছিল না যেমন তেমনি ওই প্রয়োজনগুলোর বাইরে অনেক অনেক রোজগার করার কথা সে চিন্তাও করত না। হয়তো তার মনে কোনো পাপবোধ কাজ করত বলেই ও একটা জায়গা পর্যন্ত গিয়ে আটকে যেত। আর তারপর যখন বড়কর্তারা অবসর নিতে লাগল একের পর এক, যখন নন্দিনীর বয়স তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতে লাগল তখন নগ্ন বাস্তব সামনে এসে দাঁড়াল প্রাচীরের মতো।

চাকরি ছেড়ে দিয়েছি অনেকদিন। ডিপার্টমেন্টের সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ কমে গেছে। নন্দিনীর কথাও ভুলে গিয়েছিলাম। আমার পাঠকরা জানেন, লেখালেখির পাশাপাশি বাংলা টিভি সিরিয়াল তৈরির নেশা সেই পঁচাশি সাল থেকে আমার মাথায় চেপেছে। প্রায়

শ্রদ্ধেয় সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে জোছন দস্তিদার মশাই-এর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। তখনও টিভি শৈশব অবস্থায়। সিরিয়াল দেখানো শুরু হয়নি। আমি গল্পের চিত্রনাট্য লিখলাম, জোছনদার পরিচালনায় হলো 'তের পার্বণ'। তারপর অরিজিৎ-এর সঙ্গে নিজেদের কোম্পানি টেলিফ্রেম। এসব নিয়ে খুব ব্যস্ত, সঙ্গে লেখালেখি।

সকালে লিখি, দুপুরে পূর্ণদাস রোডের অফিসে যাই। সিরিয়াল তৈরির আগে নানান কাজকর্ম। এর মধ্যে শিল্পী নির্বাচন হচ্ছে সবচেয়ে ঝামেলার। চরিত্র অনুযায়ী শিল্পী পাওয়া যায় না। কিন্তু শিল্পী হবার ইচ্ছে নিয়ে মানুষের আসার বিরাম নেই। পঞ্চাশ বছরের বাঙালি প্রৌঢ়াও যুবতীসাজের ছবি নিয়ে দেখা করেছেন যেমন তেমনি চোদ্দ বছরের কিশোরীও নিজেকে বড় সাজিয়ে ছবি তুলিয়ে এসেছে সুযোগ পাওয়ার জন্যে। ওসব ঘটনা নিয়ে আলাদা উপন্যাস হয়ে যায়। একদিন এক সুন্দরী এলেন। লম্বা, ভারী কোমর, উর্ধ্বাঙ্গ, দারুণ ফর্সা, গালে গোলাপি স্পর্শ। মুখ তেমন সুন্দর না হলেও ফিগার এবং রঙ সেটা পুষিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। মহিলার শাড়ি পরার ধরনে নিতম্ব যে চেহারা পেয়েছে তা তামিল ছবিতে দেখা যায়। মহিলার অভিনয় করার ইচ্ছে প্রবল। ওই একই ইচ্ছে নিয়ে তিনি নাকি মৃণাল সেনের কাছে গিয়েছিলেন। মৃণালবাবু বলেছেন মাদ্রাজে যেতে, গেলেই সুযোগ পেয়ে যাবেন। কিন্তু 'কলকাতা' ছাড়ার অসুবিধে আছে বলে আমাদের কাছে এসেছেন। সেসময় 'কলকাতা' বলে সিরিয়াল তৈরি হচ্ছিল। একটি এপিসোডে মিনিট পাঁচেকের একটি মহিলার চরিত্র ছিল যিনি শরীর ছাড়া কিছু বুঝতেন না। পরিচালকের ওঁর অভিনয় পছন্দ হচ্ছিল না। চেহারার মিল থাকলেও অভিনয় দক্ষতা নেই। ভদ্রমহিলা সেটা বুঝতে পেরে আমার কাছে এলেন, 'প্লিজ, আমাকে একটা সুযোগ দিন। আমার স্বামীর কাছে তাহলে মুখ দেখাতে পারব না।'

'কেন ?'

'উনি আমাকে ওয়ার্থলেস ভাবেন। আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি তা নই। তাছাড়া নন্দিনীদি বলেছে আপনাকে অনুরোধ করতে !'

'কে নন্দিনী ?'

মহিলা বড় চোখে তাকালেন, 'ওমা ! নন্দিনীদি বলল আপনি নাকি একসময় ওর অফিসে কাজ করতেন !'

আমি চুপ করে আছি দেখে বললেন, 'আপনি নাকি একবার ওকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন !'

চমকে উঠলাম। কত বছর হয়ে গেল। নন্দিনী কোথায় আছে, কেমন আছে কিছুই জানি না। অনুমান করতে পারি ওর অবসর নেবার অনেক দেরি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি নন্দিনীকে চেনেন ?'

'খুউব। প্রতি শনিবার দুপুরে ওর বাড়িতে যাই।'

'কোথায় থাকে ও ?'

'কসবা বাইপাসে ফ্ল্যাট কিনেছে।'

'আচ্ছা ! ওর মা কি এখনও আছেন ?'

'হ্যাঁ। ওই তো ওর সমস্যা।'

হয়তো এই সব তথ্য আমাকে দুর্বল করেছিল। তাই পরিচালককে অনুরোধ করেছিলাম মহিলাকে কাজটা পাইয়ে দিতে। তিনি অনুরোধ রেখেছিলেন। মহিলা কিন্তু খারাপ অভিনয় করেননি ক্যামেরার সামনে। ওঁর ফিগার দেখে অন্য কোম্পানির পরিচালকরা আমাদের কাছে খোঁজখবর নিয়েছিলেন।

এর কয়েকদিন পরে নন্দিনীর ফোন এল। প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে সে বলল তার বাড়িতে একদিন যেতে। তিন ঘরের ফ্ল্যাট কিনেছে ইনস্টলমেন্টে। এখনও চাকরি করছে। আর মাকে এনে রেখেছে নিজের কাছে। বলল, 'শনিবার আসবেন না প্লিজ।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন ?'

'সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না।' ঠিকানাটা দিয়ে দিল সে।

নানান কাজের চাপে ব্যাপারটা মাথা থেকে উড়ে গিয়েছিল। এর মাস তিন বাদে শ্রদ্ধেয় অভিনেতা দিলীপ রায়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম আড্ডা মারতে। বিকেলবেলায় ওঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে কসবা বাইপাসের মোড়ে আসতেই নন্দিনীর কথা মনে এল।

ঠিকানা খুঁজে ফ্ল্যাট পাওয়া বেশ মুশকিল। বেশির ভাগ ফ্ল্যাটই খালি, লটারিতে মালিকানা পেয়েও অনেকে আসেনি। তিনতলায় উঠে দেখলাম দরজার গায়ে নন্দিনীর নাম লেখা রয়েছে ভাবতে ভাল লাগছিল নন্দিনীর অবস্থার উন্নতি হয়েছে। নিজের নামে ভাল জায়গায় একটা ফ্ল্যাট করতে পেরেছে সে।

দরজা খুলল নন্দিনীই। খুলে যেন ভূত দেখল, 'আপনি ?'

'অসময়ে এসেছি ? আসলে এদিকে এসেছিলাম—।' আমি হাসলাম।

নন্দিনী কয়েক পলক দেখল, 'আসুন।'

ভেতরে ঢুকলাম। নন্দিনীর শরীর ভারী হয়েছে, চুলে সাদা ছোপ লেগেছে। বসার ঘরে পাঁচজনের বসার সস্তা সোফা। একটা টেলিফোন। বসতে যাচ্ছিলাম, নন্দিনী বাধা দিল, 'আপনি এ ঘরে আসুন।'

এইসময় জড়ানো গলায় পুরুষের অস্পষ্ট কথা এবং মহিলার হাসি কানে এল। নন্দিনী তাড়াতাড়ি যে ঘরে আমায় নিয়ে এল সেই ঘরের খাটে এক বৃদ্ধা শুয়ে আছেন একা। নন্দিনীর মা, আরও শীর্ণা হয়েছেন। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে নন্দিনী একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে মহিলার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'মা, দ্যাখো, সমরেশবাবু এসেছেন।'

বৃদ্ধা তাকালেন। আমাকে দেখলেন। তারপর জড়ানো স্বরে বললেন, 'কে ?'

'সমরেশবাবু। অনেকদিন আগে তোমাকে দেখতে গিয়েছিলেন।'

'লেখক ?'

'হ্যাঁ। নন্দিনী জবাব দিতেই ওপাশের ঘরে কেউ যেন চেঁচিয়ে কিছু বলল। নন্দিনী সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'আপনি মায়ের সঙ্গে কথা বলুন, আমি আসছি।'

দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল সে। বৃদ্ধা তাকিয়ে আছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেমন আছেন ?'

জড়ানো উত্তর এল, 'মরতে পারছি না। এই মেয়ে জোর করে বাঁচিয়ে রেখেছে। উঃ!'

তারপর আর কথা নেই। বাইরেও কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। চুপচাপ বসে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছিল। হঠাৎ বৃদ্ধা বললেন, 'আমাকে বাঁচাবে বাবা ?'

'কি করতে হবে বলুন ?'

'মেয়েটার জন্যে একটা পাত্র দেখে দেবে ?'

চমকে উঠলাম। নন্দিনীর বিয়ের বয়স অনেককাল পেরিয়ে এসেছে।

বৃদ্ধা বললেন, 'দোজবরে হোক যাই হোক। আছে কেউ ?'

'না। আমার সন্ধানে কেউ নেই।'

একটা বড় নিঃশ্বাস পড়ল। তারপর বললেন, 'আমার জাত নিয়ে আপত্তি নেই। মেয়েটাকে ভাল রাখবে এমন কাউকে পেলেই...। শোন, মেয়েকে বলবে না, আমার বিছানার তলায় একশোটা টাকা আছে। এই দিয়ে কাগজে একটা পাত্র চাই বিজ্ঞাপন দিয়ে দেবে ? মেয়ে শুনলে দিতে দেবে না!'

এই সময় নন্দিনী ফিরল। এবার মুখে হাসি। চেহারাই বদলে গেছে এর মধ্যে। 'কি মায়ের সঙ্গে গল্প হচ্ছে ?' আমার বিয়ের কথা বলছে নিশ্চয়ই। পাগল! তোমাকে আমি মরতে দেব না কিছুতেই।'

'এখন কি অবস্থা ওঁর ?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'প্যারালাইসিস হয়ে গিয়েছে শরীর। আমি যখন অফিসে যাই তখন দেখাশোনার জন্যে লোক থাকে। এখানে নিয়ে এসেছি বলে দাদারা নিশ্চিন্ত। আসুন, এ ঘরে বসবেন।' নন্দিনী আমাকে বসার ঘরে নিয়ে গেল।

সোফায় বসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারপর ? নতুন ফ্ল্যাট কবে হলো ?'

'বেশিদিন নয়। যা ছিল আর বাকিটা অফিস থেকে ধার করে জমা দিয়েছি। বাকিটা কিস্তিতে শোধ করতে হবে। আপনার তো এখন খুব নাম। ভাল লাগে। কি খাবেন ? চা, কফি, না—।' থেমে গিয়ে হাসল সে।

'থামলেন কেন ?'

'আপনাকে হুইস্কি কিংবা বিয়ার খাওয়াতে পারি।'

'সেকি ? ওসব বাড়িতে রাখছেন নাকি ?'

'আমি রাখি না। তবে যারা আসে তারা রেখে যায় অনেক সময়।'

'কারা আসে ?'

'আপনি বাড়িতে ঢুকে কিছু বুঝতে পারেননি ?'

'না। আমি কারো কারো গলা পেয়েছিলাম।'

নন্দিনী হাসল, 'এই ফ্ল্যাটে তিনটে ঘর। ওই ঘরে মা আর আমি শুই। কাজের লোক এই ঘরে রাতে আর দিনের বেলায় মায়ের ঘরের মেঝেতে শোয়।' এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। কথা বন্ধ করে রিসিভার তুলল নন্দিনী, 'হেলো! ও, কেমন আছেন ? আমি ভাল! না দাদা, আজ হবে না। না বুকড নয়, আমার আত্মীয়স্বজন এসেছেন। বুঝতে পারছেন, সামাজিকতা

বলে একটা কথা আছে। হ্যাঁ, নেক্সট উইকে ফোন করে আসবেন। বাই।' রিসিভার নামিয়ে নন্দিনী প্রশ্ন করল, 'বুঝতে পারলেন কিছু ?'

মাথা নেড়ে না বললাম।

'এক ক্লায়েন্ট এখন আসতে চাইছিলেন তাঁর বান্ধবীকে নিয়ে। ওই ঘরে এক ঘণ্টা থাকবে এবং আমাকে তিনশো টাকা দিয়ে যাবেন।'

'এসব করছেন নাকি আপনি ?'

'সপ্তাহে ছ'দিন করি। সোম থেকে শুক্র সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টার পর। শনিবার সারাদিন কি রবিবার একেবারে বন্ধ।'

'ওটা বাদ দিলেন কেন ?'

'সেদিন এমনিতেই ডিম্যান্ড কম। স্বামীরা বাড়িতে থাকে বলে বউরা তাদের বয়ফ্রেন্ডদে সঙ্গে বের হতে পারে না। তাছাড়া ও আসে।'

'ও মানে ?'

'আমার এক প্রেমিক ছিল, আপনার কি মনে আছে ? যাকে ভালবেসে আমাকে এক রা থানায় থাকতে হয়েছিল, আর পাঁচটা বাঙালি আটপৌরে মেয়ের মতো সংসার করতে পারলা না যার জন্যে, মনে পড়ছে ?'

'হুঁ। তিনি তো চরিত্রবান হয়ে গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ। সেই তিনি আসেন। সকাল এগারটা নাগাদ এসে খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম ক সন্ধ্যেবেলায় চলে যান। রবিবার আমাকে রান্না করতে হয়। এই বাজারে ট্যাংরা বা গলদা চিং খাওয়াতে হয়। উনি অবশ্য একটা পয়সাও দেন না।'

'ভদ্রলোকের তো অনেক বয়স হবার কথা।'

'সত্তর পেরিয়ে গেছেন। তবে শরীর এখনও শক্ত। মাকে প্রতিশ্রুতি দেন আমার জন্য ছেলে খুঁজে দেবেন বলে। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, ছেলে ওঁর সঙ্গে ঝগড়া করে আলাদা হ গিয়েছে। বউ মারা গিয়েছে বছর দশেক হলো। এখন বাকি কদিন ঝি-এর হাতের রান্না খান টাকা-পয়সায় ছাতা পড়ছে।'

'এরকম একটা লোককে আপনি এখনও...।'

'ওই তো মুশকিল। মেয়েরা প্রথমবার যার প্রেমে পড়ে তাকে ঘৃণা করলেও ভুলে যে পারে না। পরিষ্কার জল কাগজে পড়লে দেখবেন শুকিয়ে যাওয়ার পরেও দাগ রেখে যায়। এ তেমনি। লোকটা কোনোদিন আমার কাজে লাগেনি। আমার সর্বনাশ করেছে। একটা পয়সা আমাকে সাহায্য করেনি। তবু যখন আমার কাছে কেঁদে পড়ল তখন মুখের ওপর দরজাটা ব করতে তো পারলাম না। একবার অনুমতি পাওয়ার পর বাবুর কি হম্বিতম্বি। রবিবারে তিনি এ বাড়ির সম্রাট। সকালে ভোদকা নিয়ে আসেন। ভাজাভুজি দিয়ে প্লেট সাজাতে হয়। তিনি পা করে স্নান সারেন। তখন ভালমন্দ লাঞ্চ। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। সন্ধ্যের মুখে ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে বেরিয়ে যান।'

'চমৎকার।'

'না। একেবারে যে একতরফা করছি তা ভাববেন না। পাড়ার ছেলেরা জানে আমার স্বামী বাইরে থাকেন। প্রতি রবিবার সকালে আসেন আবার সন্ধ্যেয় কাজের জায়গায় ফিরে যান। এই জানাটা আমার উপকারে লাগে। চাঁদা চাইতে এলে বলি রবিবার আসতে। ও দিতে রাজী হয়। এই যে এত লোক রোজ এবাড়িতে আসছে, পাড়ার ছেলেরা কি চোখ বুঁজে থাকত যদি না দাদা তাদের হাতে প্রায় প্রতিমাসে শ'পাঁচেক টাকা দক্ষিণা দিতেন।'

'তাহলে ওই টাকাটা ওর পকেট থেকে বের হয়?'

'আজ্ঞে না। ঠিক মনে করে আমার কাছ থেকে চেয়ে নেন। তা নিক। এদেশে মেয়েদের একা থাকার যে সমস্যা তা শিশুদেরও নেই।'

'উনি এসব জানেন?'

'অবশ্যই। একটা কথাও বলেন না।'

এই সময় বেল বাজল। নন্দিনীর চোখ ছোট হলো। বললাম, 'চলি।'

'না, থাকুন।' সে উঠে দরজাটা সামান্য ফাঁক করল। 'ও, আপনি। না, আজ সম্ভব নয়। আমাদের আত্মীয়স্বজন এসেছেন।'

পুরুষটি কিছু বলল। নন্দিনীর গলা শুনলাম, 'আপনি ওকে ফোন করে জানিয়ে দিন, না আসতে। আচ্ছা।' দরজা বন্ধ করে ফিরে এল নন্দিনী, 'যেন মামার বাড়ি পেয়েছে। খবর না দিয়ে এসে পড়লেই হলো। হুঁঃ।'

'নন্দিনী, এই ব্যাপারটা বন্ধ করে দেওয়া যায় না?'

'না। মাসে সাত-আট হাজার যা পাই তাই জমা দিয়ে দিই বাড়ির দাম হিসেবে। যত তাড়াতাড়ি পারি দায়মুক্ত হতে চাই আমি। আমার যা মাইনে তা থেকে বাঁচিয়ে কলকাতা শহরে কঘরের ফ্ল্যাটও কেনা সম্ভব নয়। যেদিন দাম শোধ হয়ে যাবে সেদিন এসব বন্ধ করার কথা [ভা]বব।'

'কিন্তু পুলিশ জানতে পারলে—।'

'প্রমাণ করতে পারবে না। যারা আসে তাদের কেউ না কেউ আমার পরিচিত। বন্ধ দরজার [ভি]তরে কি হচ্ছে তা তাদের পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব নয়।'

'মা?'

'মা এখনও জানে না। ওর শরীর অবশ হয়ে যাওয়ায় পাশের ঘরে কি হচ্ছে তা জানতে [পা]রে না। দেখুন সমরেশবাবু, জীবনে অনেক ঠকেছি, অনেক দাম দিয়েছি, এখন আর নয়। [রি]টায়ার করার পর আমাকে দেখার কেউ নেই। আমাকে আমার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে [এই] সময়ে ভাবিনি।'

'কিন্তু এই কালো পথে টাকা রোজগার করা—।'

'টাকার গায়ে সাদা বা কালো ছাপ মারা থাকে না। একজন কালোবাজারি যখন লক্ষ [মা]নুষকে বঞ্চিত করে লাখ লাখ টাকা দিয়ে ধর্মশালা বানিয়ে দেয় তখন লোকে তাকে গালাগাল দেয় না। কি বলুন?' উত্তেজিত হয়ে কথাগুলো বলামাত্র বেল বাজল। নন্দিনী হতাশায় মাথা [না]ড়ল। তারপর উঠে দরজা খুলল সামান্য।

'ও তুমি ? সরি, তোমার বয়ফ্রেন্ড এসে চলে গেছে। অন্যদিন ফোন করে এসো ভাই
নন্দিনী বলল।

'চলে গেছে ?' মেয়েলি গলায় হতাশা।

'হ্যাঁ। ফোন না করে এলে এমন হবেই।'

'তাহলে আমি কি করব ? তিন ঘণ্টা সময় কোথায় কাটাই ! ভেতরে যেতে দেবে
নাকি ? কে আছে ?'

'যে আছে তাকে তুমি চেন। আচ্ছা, এসো।'

আমি দেখলাম সেই মহিলা ঢুকল। আজ তার পরনে টাইট প্যান্ট আর গেঞ্জি। উদ্ধ
শরীরের সবকটা খাঁজ আজ উগ্রভাবে স্পষ্ট।

'ওমা ! আপনি ! কখন এলেন ? আমার কি সৌভাগ্য !'

নড়ে বসলাম, 'এই তো। ভাল ?'

'ভাল কোথায় ! দেখুন না, আমার বয়ফ্রেন্ড চলে গেল।' হাতের লম্বা ব্যাগ রাখল
টেবিলে, 'আমাকে হুইস্কি কিনতে টাকা দিয়েছিল। এটা রেখে দাও নন্দিনীদি।' হুইস্কির বোত
ব্যাগ থেকে বের করে টেবিলে রেখে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি খাবেন ?'

'আপাতত ইচ্ছে নেই।'

'আমার খুব ইচ্ছে করছে।'

নন্দিনী বলল, 'তোমার যখন সময় কাটানোর প্রব্লেম তখন ওঘরে গিয়ে ওটা খেতে পার
দেখো মাতাল হয়ো না।'

বলামাত্র মহিলা বোতল নিয়ে চলে গেল পাশের ঘরে। নন্দিনী বলল, 'ও সিরিয়া
অভিনয় করতে চায় কেন জানেন ? ওই বাহানা দেখিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে
মাসে ছ হাজার রোজগার করে। পার সিটিং বয়ফ্রেন্ডদের কাছ থেকে দেড় হাজার করে নে
সপ্তাহে একবার।'

'একই বয়ফ্রেন্ড ?'

'না। চারজন আছে। ফিক্সড। বাচ্চা হয়নি। স্বামীর আয় বেশি নয়।'

'স্বামী মদের গন্ধ পাবে না ?'

'জানি না কিভাবে ম্যানেজ করে।'

'এরকম মেয়েকে আর আমার কাছে পাঠাবেন না।'

'মেয়েটা কিন্তু খারাপ নয়।'

'কোনো মেয়েই খারাপ হয় না। পুরুষরাই তাদের খারাপ করে। কিন্তু খারাপ হয়ে যাওয়া
পর তারা আর ভাল হতে চায় না, এই যা মুশকিল।' আমি উঠে দাঁড়ালাম। নন্দিনী বলল, 'কথাটা
কি আমাকে উদ্দেশ করে বললেন ?'

'না আপনাকে সমালোচনা করার অধিকার আমার নেই।'

এই সময় ভেতরের ঘর থেকে ডাক ভেসে এল, 'সমরেশদা !'

নন্দিনী বলল, 'যাওয়ার আগে দেখা করে যান। নইলে চেঁচাবে।'

দরজার পর্দা সরিয়ে এক পা এগোতেই চমকে উঠলাম। প্যান্ট আর গেঞ্জি ছেড়ে রেখেছে সে এর মধ্যে। বোতলের কিছুটা খালি। আমন্ত্রণের হাসি হেসে বলল, 'আমাকে আপনার কেমন লাগছে? সবাই বলে দারুণ। আপনি?'

'কেন ডাকলেন?'

'পাঁচশো টাকা দেবেন?'

'হঠাৎ?'

'হঠাৎ না। শাশুড়িকে দিতে হবে। যেদিন আসি ফিরে গেলে ওই টাকা দিতে হয়। দিলে বুড়ি তার ছেলেকে ম্যানেজ করে। ওর তো ড্রাগের নেশা আছে। না দিলে মা-ছেলে এক হয়ে পেটায় আমাকে। দিন না। আমি ওয়ান থার্ড নিচ্ছি। আপনি আমাকে সিরিয়ালে সুযোগ দিয়েছেন, তাই।' কেঁদে ফেলল মহিলা। পেছনে এসে দাঁড়াল নন্দিনী, 'আপনি চলে যান সমরেশবাবু। টাকাটা আজ আমিই ওকে দিয়ে দেব। দেখলেন তো, আমিই শেষ কথা নই, আমার চেয়ে আরও অসহায় মানুষ আছে। আপনি এলেন, অনেক ধন্যবাদ। আর বোধহয় আপনি আসবেন না। তার দরকারই বা কি। শেষ দেখা তো হয়ে গেল।'

॥ ২২ ॥

দেখতে দেখতে কলকাতায় সাঁইত্রিশ বছর হয়ে গেল আমার। সতের বছর বয়সে পড়তে এসেছিলাম এই শহরে। পড়াশুনা শেষ করে এই শহরে থাকার টানে সরকারি অফিসে একটা সাধারণ চাকরিতে ঢুকেছিলাম বত্রিশ বছর আগে। তখন আমার সেই বয়স যে বয়সে টাকাপয়সা, চাকরির স্ট্যাটাস নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতাম না। কিছু একটা করার নেশাই তখন মনে প্রবল হয়ে ডানা ঝাপটাতো। সেই চাকরিতে কিঞ্চিৎ উন্নতিও হয়েছিল নিয়মকানুন মেনে। বছর বারো আগে মনে হলো, অনেক হয়েছে, যে চাকরি কোনোদিন মন থেকে মেনে নিইনি সেখানে সেঁটে থাকার মানে হয় না, ছেড়ে দিলাম। তা এই পঞ্চাশ পার হওয়া শরীর এবং মনে মাঝে মাঝেই তরুণ বয়সটা ঢুকে পড়ে। যাঁদের সঙ্গে দীর্ঘকাল কাজ করেছি তাঁদের জগৎ আর আমার জগৎ এখন আলাদা। ক্বচিৎ কখনও দেখা হয়। অনেককেই ঠিক চিনতে পারি না। যে অফিসে দীর্ঘকাল কাজ করেছি, সরকারি আইন মেনে আমাকে সেখানে প্রতি বছর যেতে হয় আমার আয়ের হিসেব দাখিল করতে। যাঁরা এখন দায়িত্বে আছেন তাঁদের কাউকেই প্রায় চিনি না। তাঁরা জানেন আমি একসময় ওঁদেরই একজন ছিলাম। অথচ ব্যবহার সেই পর্যায়ে পাওয়া যায় যা অন্য করদাতার ক্ষেত্রে ওঁরা করে থাকেন। কষ্ট হয়, কিন্তু মেনে

নেওয়া ছাড়া উপায় কোথায় ? কখনও করিডোরে প্রাক্তন সহকর্মীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধ দেখায় তাঁদের। উল্টে শুনতে হয়, সুখে আছ, নাম হয়েছে, টাকা আসছে তাই চেহারাটা এখনও আগের মতো রেখেছ। আমার ছেলের জন্যে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দাও না।

শেষ অনুরোধটা সত্যি আন্তরিক কিন্তু আমার ক্ষমতা কোথায় ? হঠাৎ একটু অপ্রাসঙ্গিক কথা মনে এল। তখন আমি চাকরি ছাড়িনি কিন্তু লেখক হিসেবে একটু পরিচিতি হয়েছে। আমাদের একটা আড্ডা ছিল ল্যান্সডাউন রোডের গুহসাহেবের বাড়িতে। এমন অমায়িক ভদ্রলোক খুব কম দেখেছি। গুহসাহেব একসময় আমার ডিপার্টমেন্টের বেশ বড়কর্তা ছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ অফিসে হয়নি। উনি যখন অবসর নিয়েছেন তখন আমার গল্প 'দৌড়'-এর চলচ্চিত্র প্রযোজক বিশ্বরঞ্জনের মাধ্যমে ওঁর সঙ্গে আলাপ। গুহসাহেবের বাড়িতে তাস খেলতে যেত ওরা, আমি জুটে গেলাম। আমি ওঁর ডিপার্টমেন্টে অনেক নিচুতলার কর্মী জেনেও ব্যবহারের কোনো পরিবর্তন হয়নি ওঁর। জমিয়ে আড্ডা দিতেন। সেই আসবে গুহসাহেবের একজন জুনিয়ার অফিসার মাঝে মাঝেই আসতেন। তিনি তখন চূড়ান্ত ক্ষমতায় প্রমোশন পেয়েছেন। যেই তিনি জানলেন আমি তাঁরই ডিপার্টমেন্টের সামান্য কর্মী অমনি কাজের বাহানা দেখিয়ে তাস না খেলে চলে গেলেন। গুহসাহেব ব্যাপারটা বুঝে আমার কাছে ওঁর হয়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং ভদ্রলোককে নিষেধ করে দিয়েছিলেন আর তাসের আসরে না আসতে।

এর বেশ কয়েক বছর বাদে আমি যখন চাকরি ছেড়ে দিয়েছি তখন একটা বিশেষ কাজে উত্তরবঙ্গে যেতে হয়েছিল। দমদম এয়ারপোর্টে সিকিউরিটি সেরে প্লেনে ওঠার ডাকের জন্যে অপেক্ষা করছি এমন সময় সেই সাহেবের সঙ্গে দেখা। তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এখানে ?'

বললাম, 'কাজে যাচ্ছি।'

'কেউ বুঝি প্লেনের টিকিট দিয়েছে ?'

'না তো ! আমিই কিনেছি। কে আর দেবে ?'

'আপনি শুনেছি কিসব লেখেন ?'

'হ্যাঁ। চাকরি ছেড়ে দিয়েছি অনেকদিন।'

'লিখে খুব ভাল আয় হয় ?'

'কখনও-সখনও হয়। আপনি ?'

'আমি অফিসের কাজে যাচ্ছি।'

এরপর আমরা প্লেনে উঠলাম। আলাদা সিট। আমাকে রিসিভ করতে যারা গাড়ি নিয়ে এসেছিল তাদের সঙ্গে যেতে যেতে দেখলাম ভদ্রলোক ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে দরাদরি করছেন। আমি দাঁড়িয়ে গিয়ে ওঁকে অনুরোধ করলাম আমার সঙ্গে শিলিগুড়ি পর্যন্ত যেতে। বাগডোগরা থেকে উত্তরবঙ্গের যেখানেই যান, শিলিগুড়ি হয়েই যেতে হবে।

উনি খুশি হয়ে আমার সঙ্গে গাড়িতে উঠলেন।

একটু বাদেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার দেখছি বেশ খাতির। তা আপনি কি নিয়মিত ট্যাক্সপেয়ার?'

হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গেল। বললাম, 'আপনি যা মাইনে পান আমি তার চেয়ে বেশি ট্যাক্স । কিন্তু সেটা আমার পরিচয় নয়।' বলেই খুব খারাপ লাগল। নিজেকে ছোট মনে হলো। । মাথা নিচু করে বসেছিলেন।

বললাম, 'কিছু মনে করবেন না। কথাটা আমার বলা উচিত হয়নি। গুহসাহেবকে এই কথাটা আমি মরে গেলেও বলতে পারতাম না।'

হঠাৎ উনি আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'আমি এটা বুঝতে পারছি সমরেশবাবু। অবসর ; আর দু'মাস বাকি আমার। তখন তো আমাকে কেউ পাত্তা দেবে না। এই দেখুন, এখনই মার জন্যে কেউ গাড়ি পাঠায়নি। চাকরি গেলে সব হারিয়ে যায়। কিন্তু মনুষ্যত্ব কিছুই নষ্ট রে না।'

ধান ভানতে শিবের গীত গাইলাম। পাঠক মার্জনা করবেন।

গতমাসে ঝাড়গ্রামে গিয়েছিলাম একটি সাহিত্য সংস্থার আমন্ত্রণে। ওঁরা আমার জন্যে ঝাড়গ্রাম রাজবাড়িতে যে ট্যুরিস্ট লজ রয়েছে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। যদিও গরম ড়ছিল তবু জায়গাটিকে আমার ভাল লেগেছিল। রাজামশাই-এর বংশধর বোধহয় ওপরে থাকেন। শহরের বাইরে নির্জন সেই রাজপ্রাসাদে ভাল ফুলের বাগান রয়েছে।

সকাল নটার মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিলাম। উদ্যোক্তাদের বিদায় দিয়ে সবে চায়ের কাপ নিয়ে ই, দরজায় শব্দ হলো।

বললাম, 'আসুন।' বললাম কিন্তু বিরক্তও হলাম।

দরজা খুলে গেল। দেখলাম একজন প্রৌঢ়া অথবা বৃদ্ধা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। উঠে দাঁড়ালাম, 'ভেতরে আসুন।'

'বিরক্ত করলাম না তো!'

সত্যিকথা সবসময় বলা যায় না। বললাম, 'না-না। ঠিক আছে।'

'আপনি একটু মোটা হয়েছেন কিন্তু চেহারা একইরকম আছে।' ভদ্রমহিলা হেসে কথাগুলো বলে ঘরে ঢুকলেন।

আমি অবাক হলাম। এর অর্থ হলো ভদ্রমহিলা আমাকে আগেও চিনতেন। অথচ সাদা চুলের রোগা এই বৃদ্ধাকে কি আগে আমি দেখেছি? কিরকম চেনাচেনা লাগছে অথচ বুঝতে ছি না কোথায় দেখেছি। বললাম, 'বসুন।'

চেয়ারে বসে বললেন, 'বিরক্ত করলাম না তো!'

এবং তখনই বিস্মৃতির পর্দাটা সরে গেল সামনে থেকে। বললাম, 'চন্দ্রাদি!'

'এতক্ষণে চেনা গেল?' উনি আবার হাসলেন।

'একি চেহারা হয়েছে আপনার?'

'কেন? যেমন হওয়া উচিত তেমনই হয়েছে।'

'কিন্তু চুল এত সাদা, কী রোগা হয়ে গিয়েছেন!'

'বয়স তো ঢের হয়ে গেল। রিটায়ার করেছি তিন বছর আগে। আমি বুঝতে পারছিল আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত যে পারলেন তাই আমার ভাগ্য।'

'এভাবে লজ্জা দিচ্ছেন কেন ?'

'না, আসলে কাল থেকে ভাবছিলাম দেখা করতে আসব কিনা। মাইকে যখন এরা আপন নাম প্রচার করছিল তখন খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু আপনি যদি আমাকে চিনতে না পারে বছর তিরিশেক আগে আমরা একসঙ্গে কাজ করেছিলাম। আজ এত সাফল্য এসেছে আপন জীবনে যে একজন সাধারণ সহকর্মীকে ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক।'

কি বলব আমি ? কাজের গণ্ডী বেড়ে গেলে পরিচিতদের সংখ্যাও বাড়ে। সেটা এম পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে সকলের মুখ মনে পড়ে না আচমকা। কিন্তু এই সত্যি চন্দ্রাদির বেল খাটে না। আমি যে চন্দ্রাদিকে চিনতাম তিনি ছিলেন দোহারা গড়নের। গায়ের রঙ ফর্সা, এ মাথা কালো চুল যা খোঁপা হলে বেশ বড় দেখাতো। হালকা নীল শাড়ি পরতেন সেসময়। আম চেয়ে বয়সে অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও আপনি বলে কথা বলতেন। বিয়ে থা করেননি। সে চন্দ্রাদির সঙ্গে এঁর কোনো মিল নেই। একটুও না। তাই আচমকা চিনে ফেলা সম্ভব নয়।

'যাক গে, আপনার কথা শুনি। ছেলেমেয়েরা কি করছে ?'

'আমার দুটো মেয়ে। একজন কর্মজীবনে অন্যজন কলেজে।'

'সত্যি ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার সঙ্গে যখন পরিচয় হয়েছিল তখন—।'

'আমার বিয়েই হয়নি।'

'বাঃ ! এর মধ্যে কত দিন চলে গেল, না ! কিন্তু ওই বললাম, একটু মোটা হওয়া ছা আপনি একই আছেন। একরকম।'

'আপনার খবর বলুন।'

'আমার কথা বাদ দিন। সোনাদিকে মনে আছে ? স্বর্ণলতাদি ?'

'নিশ্চয়ই। আমাকে খুব ভালবাসতেন। ছানা খাওয়াতেন।'

'কোথায় আছেন জানেন ?'

'না।'

আমরা সেই সময়ের সহকর্মীদের প্রসঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। এঁদের অনেকেই আ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। চন্দ্রাদি না এলে হয়তো এ জীবনে ওঁদের কথা মনেই না। স্মৃতির ওপর বড্ড ধুলো জমে। আর ধুলো জমলেই তার জায়গা নতুন স্মৃতি দখল করে কিন্তু এখন বেশ ভাল লাগছিল। লক্ষ্য করছিলাম চন্দ্রাদি নিজের প্রসঙ্গে একটাও কথা বলেননি

বললাম, 'ঝাড়গ্রামে তো আপনার থাকার কথা নয় চন্দ্রাদি ?'

'কেন ?'

'যতদূর মনে পড়ছে বর্ধমানে আপনার বাড়ি ছিল।'

'ছিল। এখন ঝাড়গ্রামেই আমার সব।'

'সবাইকে নিয়ে আছেন ?'

'না। আমি এখানে একটা ওল্ড এজ হোমে থাকি। কিন্তু, বলা যেতে পারে সবাইকে নিয়েই থাকি। এসেছিলাম একজন মেম্বার হিসেবে, এখন দায়িত্ব আমার কাঁধে চেপেছে।' চন্দ্রাদি উঠে দাঁড়ালেন। 'আজ বিকেলে তো আপনার অনুষ্ঠান। কদিন কি এখানে থাকছেন ?'

'না। কালই ফিরে যাব।'

'এত অল্প সময় ?'

'আমি তো জানতাম না আপনি এখানে থাকেন।'

'জানলেই যেন অনেকদিন থাকার কথা ভাবতেন। অনুষ্ঠানের পরে একবার আমাদের ওখানে আসুন না। আমিই নিয়ে যাব।'

'চন্দ্রাদি, আমি জানি না উদ্যোক্তারা কি পরিকল্পনা করেছেন। যদি কোনো কিছু না থাকে তাহলে নিশ্চয়ই যাব। আপনি এখনই উঠছেন ?'

'হ্যাঁ। আমাকে একবার ডাক্তারখানায় যেতে হবে। ঠিক আছে, বিকেলে দেখা হবে।'

চন্দ্রাদি বেরিয়ে গেলেন। জানলা দিয়ে দেখলাম বাগানের মধ্যে দিয়ে তিনি হেঁটে বড় গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। ঠিকই, এঁর চেহারার সঙ্গে আমার জানা চন্দ্রাদির কোনো মিল নেই। রাস্তায় দেখা হলে চিনতে পারতাম না।

অঙ্কে আমি চিরকালই কাঁচা। সায়েন্স অথবা কমার্স নিয়ে পড়া হয়নি তাই। সরকারি চাকরিতে আমি ঢুকেছিলাম ইন্টারভিউ দিয়ে। সেসময় লিখিত পরীক্ষা হয়নি। সেটা হলে, এবং তাতে যদি অঙ্কের প্রশ্ন থাকত তাহলে নিশ্চিত চাকরি পেতাম না। দপ্তরে নতুন এলে ধরে নেওয়া হয় এ কিছুই জানে না। অতএব তাকে পোস্টিং দাও স্ট্যাটিসটিক ডিপার্টমেন্টে। সেখানে যা কাজ তার সবই অঙ্কের। ওই দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন সোনাদি। তাঁকে সাহায্য করতেন চন্দ্রাদি। এঁরা খুব খাটতো। ওই দপ্তরে যে পুরুষকর্মীটি ছিলেন তাঁর নাম সুনীলদা। রসিক মানুষ। বহুরূপীতে অভিনয় করেন। তাঁর ওপর ভার পড়েছিল আমাকে কাজ বোঝানোর। তিনি একটি রেজিস্টার আমাকে দিয়ে বললেন এটা থেকে নতুনটায় কপি করে যাও। নামের পাশে আনপেইড ট্যাক্সের অ্যামাউন্ট লেখা আছে। যদি দ্যাখো সেই অ্যামাউন্টের পাশে পেমেন্ট শো করা হয়েছে তাহলে নতুন রেজিস্টারে এই নাম তুলবে না। আর হ্যাঁ, পেন্সিলে লিখবে। কোনো বুদ্ধির দরকার নেই। বিকেল তিনটের সময় রিহার্সাল আছে বলে সুনীলদা চলে গেলেন। পাঁচটার সময় স্বর্ণলতাদি দূর থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ক' পাতা হয়েছে ?'

'পঁয়ত্রিশ পাতা।'

'বাঃ। এ দেখছি কাজের ছেলে !'

পরদিন অফিসে যাওয়ার পর সুনীলদা বললেন, 'কাল যা লিখেছিলে তা প্রথমে একটা রাবার দিয়ে মুছে ফেল। পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর আবার প্রথম থেকে লিখতে শুরু কর। আজ চৌত্রিশ পাতা লিখবে।'

অর্থাৎ রোজ এসে একই কাজ করো এবং মুছে ফেলো। তোমার আউটপুট শূন্য। এই

সুনীলদাকে যাঁরা বহুরূপীর নাটকে দ্যাখেননি তাঁরা দেখেছেন আমার 'কলকাতা' টিভি সিরিয়ালে। সেই বিখ্যাত কেয়ারটেকার নিবারণ ঢোলের ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি প্রচণ্ড জনপ্রিয় হয়েছিলেন। অথচ তাঁকে ওই ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজী করাতে আমার নাভিশ্বাস উঠেছিল। সেসব অন্য কথা। এই লেখার জন্যে নয়। সুনীলদা জনপ্রিয় হওয়ার কিছুদিন পরেই মারা গিয়েছিলেন। চন্দ্রাদি তো ওঁর নাম করলেন না আজ!

তা দ্বিতীয় দিনে সুনীলদার ওই আদেশ পেয়ে মান্য করতে পারিনি। টিফিনের সময় সুনীলদা বেরিয়ে গেলে স্বর্ণলতাদি বললেন, 'দ্যাখ তো চন্দ্রা, সুনীল ওকে দিয়ে কালকের কাজ মুছিয়ে ফেলেছে কিনা!'

চন্দ্রাদি এলেন। দেখলাম বাধ্য হয়েই এলেন। বললাম, 'না, আমি মুছিনি।'

'কেন মোছেননি?'

'তাহলে গতকালের মাইনেটা নিতে পারতাম না।'

চন্দ্রাদি আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর স্বর্ণলতাদির কাছে গিয়ে বললেন, 'এখনও এরকম ছেলে হয়। অবশ্য কদিন থাকবে তা জানি না।'

একটু একটু করে ওঁদের সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল। বয়সে ছোট ছিলাম বলে বেশ সুবিধে হলো। আমি মেসে থাকি জেনে স্বর্ণলতাদি বাড়ি থেকে নিয়ে আসা খাবার খাওয়াতেন। চন্দ্রাদি থাকতেন হোস্টেলে। মেয়েদের হোস্টেলে। জেনেছিলাম ওঁর পৈতৃক বাড়িতে মা, তিন ভাই এবং এক বোন রয়েছে। তাদের সব কিছু চলে চন্দ্রাদির পাঠানো টাকায়। সেসময় একজন কেন্দ্রীয় সরকারি আপার ডিভিশন ক্লার্ক চাকরিতে ঢুকে আড়াইশো টাকার বেশি মাইনে পেতেন না।

চন্দ্রাদি কম কথা বলতেন। একদিন বললেন, 'আমি যে হোস্টেলে থাকি, নইলে আপনাকে কিছু এনে খাওয়াতাম। ইচ্ছে থাকলেও তো উপায় নেই।'

বলেছিলাম, 'আপনি আমাকে আপনি বলেন কেন? কত ছোট আপনার চেয়ে।'

চন্দ্রাদি বললেন, 'আপনি আর তুমিতে কি পার্থক্য! একটা বললেই তো হয়।'

ততদিনে আমি চন্দ্রাদির সঙ্গে 'মেঘে ঢাকা তারার' নীতার মিল খুঁজে পেয়েছি। তখন চন্দ্রাদি সুন্দরী না হলেও যথেষ্ট লাবণ্যময়ী। বিয়ে করতে চাইলেই পাত্র পেতেন। আর আমাদের ডিপার্টমেন্টের অনেক সুপাত্র তাঁর সঙ্গে যে প্রেমে পড়তে উদগ্রীব এটা আমি ক্রমশ জেনেছিলাম কিন্তু চন্দ্রাদির তরফে কোনো উৎসাহ ছিল না বললে কম বলা হবে, তিনি নির্লিপ্ত ছিলেন পুরুষমহলে ওঁর নামকরণ করা হয়েছিল মিস আইস।

চন্দ্রাদির একটাই শখ ছিল, বই পড়তে খুব ভালবাসতেন। সেসময় আমি সবে একটু-আধটু লেখালেখির চেষ্টা করছি। কখনও কখনও আমাকে খুব সঙ্কোচের সঙ্গে বলতেন বিশেষ একটি বই যোগাড় করে দিতে পারব কিনা। একদিন স্পোর্টস-এর জন্যে অফিস তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গিয়েছিল। স্বর্ণলতাদি, চন্দ্রাদি কাজ করছেন দেখে আমি একটু থেকে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাড়ি যাবেন না?'

স্বর্ণলতাদি বললেন, 'বাড়ি যাওয়ার জন্যে তো ছুটি হয়নি। যারা মাঠে গিয়ে স্পোর্টস

দেখবে ছুটি তাদের জন্যে। আমরা মাঠে যাচ্ছি না তাই ছুটিও নেই।'

ততদিনে আমি একটু পুরনো হয়েছি। তাই রসিকতা করেছিলাম, 'ভারত সরকারের উচিত আপনাদের ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া।'

স্বর্ণলতাদি বললেন, 'যা গিয়ে বল না সরকারকে।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'এই যে মেয়েটা, আদর্শের হাঁড়িকাঠে মুণ্ডু ঢুকিয়ে বসে আছে, এর জন্যে খুব রাগ হয় আমার। তোর যে কবে চোখ খুলবে।'

চন্দ্রাদি বললেন, 'যার বারোতে হয় না তার বাহাত্তরেও হবে না। কেন মিছিমিছি চিন্তা করছেন ? আমি তো বেশ আছি!'

একদিন চন্দ্রাদি আসেননি অফিসে। টিফিনের সময় স্বর্ণলতাদির কাছে চন্দ্রাদির প্রসঙ্গ তুলতেই সব শুনতে পেলাম। বর্ধমানে পড়ার সময় চন্দ্রাদির সঙ্গে একজনের প্রেম হয়। বি. এ. পাশ করার পর ছেলেটি বিয়ের প্রস্তাব দেয়। চন্দ্রাদি রাজী তো ছিলেনই, ওঁর বাবাও আপত্তি করেননি। কিন্তু বিয়ের মাসখানেক আগে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে ওঁর বাবা মারা যান। ভদ্রলোক ছিলেন একমাত্র রোজগেরে। চন্দ্রাদি বড় মেয়ে, বাকিরা বেশ ছোট। সদাগরী অফিসে কাজ করে তিনি কিছুই জমাতে পারেননি। উল্টে অফিসে কিছু ধার রেখে গিয়েছেন। কপাল ভাল বাবার মৃত্যুর দু'মাদের মধ্যে চন্দ্রাদি এই চাকরি পেয়ে যান। ততদিনে অভাব এসে থাবা বসিয়েছে প্রবলভাবে। বিয়ের ব্যাপারটা তখন স্থগিত রেখে চন্দ্রাদি কলকাতায় এলেন চাকরি করতে। নিজের জন্যে যতটুকু না রাখলে নয় ততটুকু রেখে বাকি সবটাই তিনি পাঠিয়ে দেন মায়ের কাছে। মাস ছয়েক বাদে ছেলেটি এল কলকাতায়। চন্দ্রাদি তাঁকে তাঁর সমস্যার কথা বললেন। ভদ্রলোক সেটা মেনে নিয়ে বললেন, 'তুমি যা মাইনে পাবে তার পুরোটাই বিয়ের পর ওদের পাঠিও। তোমার রোজগারের একটি পয়সাও আমি চাই না।'

চন্দ্রাদি হাতে স্বর্গ পেয়ে ছুটি নিয়ে বর্ধমানে গিয়ে মাকে ওই কথা জানালেন। মা চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর কাঁদতে লাগলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, এখন ভাল ভাল কথা বলে চন্দ্রাদি বিয়ে করছেন কিন্তু কিছুদিন বাদেই এসব ভুলে গেলে তিনি অথৈ সাগরে পড়বেন। চন্দ্রাদি পড়াশুনা করেছেন তাঁর বাবার টাকায়। অতএব বাবার অবর্তমানে এইভাবে সংসারকে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেলে তাঁর পক্ষে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। চন্দ্রাদি অনেক বোঝালেন, প্রতিজ্ঞা করলেন কিন্তু মহিলা তা বিশ্বাস করলেন না। উল্টে বললেন, বিয়ে করার জন্যে তুই এত ক্ষেপে উঠেছিস ? নিজের ছোট ভাইবোনদের কথা ভাববি না!' আর সেই সঙ্গে ছোট ভাইবোনেরা কান্না জুড়ে দিল, দিদি বিয়ে করলে আমরা খেতে পাব না।

চন্দ্রাদি বাধ্য হলেন ছেলেটিকে জানিয়ে দিতে যে তাঁর পক্ষে বিয়ে করা অসম্ভব। ভাইবোনেরা যখন বড় হবে তখন তাঁর বিয়ের বয়স এবং ইচ্ছে চলে যাবে। তাই ছেলেটি যেন তাঁর জন্যে অপেক্ষা না করে সংসারী হয়।

স্বর্ণলতাদি মাথা নেড়েছিলেন, 'বাঙালি মেয়েদের মরণও হয় না। এখন ওর পরের ভাই বর্ধমানে চাকরি করছে। মেজভাই বি. এ. পাশ করেছে। বোন কলেজে পড়ে প্রেম করছে। কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে আর ভাইয়ের মাইনেতে চলে না বলে এখনও চন্দ্রাকে টাকা পাঠাতে

হচ্ছে। মা যে কখনও কখনও রাক্ষুসী হয় তা আগে জানতাম না।'

কিছুদিন বাদে চন্দ্রাদি বদলি হয়ে চলে গেলেন অন্য অফিসে। তখন কলকাতায় আমাদের দপ্তরের গোটা পাঁচেক অফিস ছিল বিভিন্ন জায়গায়। তিনি বদলি হয়েছেন ওরকম একটি অফিসে। তারপর থেকে ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি আর। স্বর্ণলতাদিও বদলি হয়েছিলেন পরের বছর। তদ্দিনে আমি অফিস জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। প্রথম প্রথম মনে পড়ত ওঁদের কথা। পরে ধুলো জমে গেল স্মৃতির ওপর। কিন্তু কখনও যদি কেউ লেডিস হোস্টেলের কথা বলত তখনই মনে পড়ত চন্দ্রাদির কথা। কিন্তু ওই পর্যন্ত। কয়েক বছর আগে আমাদের কোম্পানি থেকে 'লেডিস হোস্টেল' নামের সিরিয়াল বানালাম। বোলান গঙ্গোপাধ্যায় গল্প লিখেছিলেন। তাঁকে আমি চন্দ্রাদির কথা বলেছিলাম। বোলান কাছাকাছি একটি চরিত্র লিখেছিলেন।

অথচ আজ প্রথম দেখায় আমি চন্দ্রাদিকে চিনতে পারিনি। চেহারায় এত পরিবর্তন কোনো মানুষের হয় ? আজ চন্দ্রাদি কথা বলছিলেন একটু ঠুকে ঠুকে। এতে অবশ্য আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। জলপাইগুড়ি এবং আমার কলেজ জীবনের অনেকেই যাঁরা খুব সাধারণ জীবন যাপন করে এসেছেন, তাঁদের কেউ কেউ দেখা হলে ওইরকম ঠুকে ঠুকে কথা বলেন। যেন লিখে পরিচিতি পেয়ে আমি খুব অন্যায় করেছি। আর ওই বাবদ টাকা পাই যখন তখন আমার নাক উঁচু হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। পুরনো বন্ধুদের ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে সহজ। অতএব আমাকে আক্রমণ কর। অনেক ক্ষেত্রেই আমি চেষ্টা করেছি ওদের ভুল ভাঙাবার। এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি।

বিকেলে উদ্যোক্তারা আমাকে অনুষ্ঠানে নিয়ে গেলেন। ভিড় হয়েছিল খুব। অনুষ্ঠান শেষ হলো রাত সাড়ে আটটায়। মঞ্চে বসে দেখেছি চন্দ্রাদি সাদা জামা সাদা শাড়ি পরে বসে আছেন মাঝখানের চেয়ারে। অল্প সময় নিলাম আমার কথা বলতে। তারপর গল্প পড়তে হলো। শেষে দর্শকরা প্রশ্ন করা শুরু করলেন। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার হাতে মেয়েরা এত শ্রদ্ধার জায়গা পায় কেন ? মাধবীলতা, জয়িতা বা দীপাবলীর মতো চরিত্র কি করে আমি লিখলাম ?' এই প্রশ্ন অনেকেই করেন।

এর উত্তরে কিছুটা ভূমিকা করে আমি চন্দ্রাদির গল্পটা শোনালাম। বলতে বলতে দেখছিলাম ওঁর মুখের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। আমি ওঁর নাম বলিনি। কাহিনী শেষ হওয়ার পর মহিলারা সমস্বরে বলতে লাগলেন, আর নয়, এভাবে আত্মবিসর্জন করার দিন চলে গেছে

অনুষ্ঠান শেষ হলে জানতে পারলাম উদ্যোক্তারা আমার জন্যে ডিনারের ব্যবস্থা করেছেন এবং এখান থেকেই আমাকে যেতে হবে সেখানে। দেখলাম চন্দ্রাদি দাঁড়িয়ে আছেন কিছুদূরে. নিশ্চয়ই আমার জন্যে। এগিয়ে গিয়ে তাঁকে আমার সমস্যার কথা বললাম, তিনি মাথা নাড়লেন. 'এটাই স্বাভাবিক। আমি একটু বেশি আশা করে ফেলেছিলাম। ঠিক আছে, ভাল থাকুন, ভাল লিখুন।'

'আপনার ঠিকানাটা বলুন।'

'কেন ?'

'বলুন না।'

'যে কোনো অটো রিকশার ড্রাইভারকে বলবেন চিড়িয়াখানার কাছে বৃদ্ধাশ্রমে যাবেন। সে নিয়ে যাবে। একটু দূরে, তাই এ যাত্রায় আপনার সময় হবে না। আর কলকাতায় ফিরে গেলে নিশ্চয়ই ভুলে যাবেন। আচ্ছা, এলাম!' চন্দ্রাদি ধীর পায়ে চলে গেলেন।

ফিরতে রাত হলেও আমার ঘুম ভাঙল সাতসকালে। কাল রাত্রে কথা হয়েছে যেহেতু ভোরের ট্রেন ধরতে পারব না তাই একটা গাড়ি যাচ্ছে কলকাতায় সকাল দশটায়। আমাকে সেই গাড়িতে ওঁরা ফেরৎ পাঠাবেন।

ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙার পরে মনে হলো ঘণ্টা চারেকের মধ্যে যদি ফিরে আসতে পারি তাহলে চন্দ্রাদির বৃদ্ধাশ্রম দেখে আসা যেতে পারে।

একটা অটো নিয়ে ঝাড়গ্রাম শহরের বাইরে চিড়িয়াখানার দিকে যেতে যেতে বৃদ্ধাশ্রমটিকে খুঁজে বের করলাম। অটোওয়ালাও দেখলাম চেনে। ভাড়া মিটিয়ে ওকে ছেড়ে দিয়ে গেট খুলে ভেতরে ঢুকলাম। বেশ অনেকখানি জায়গা নিয়ে ওই আশ্রম। ডান দিকে লম্বা ব্যারাক বাড়ি, বাঁ দিকে বাগান। ফুল আছে সামান্য,শাক-সবজি এবং ফলই বেশি। ওই সকালে বেশ কয়েকজন বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাকে দেখলাম ঘুরে ঘুরে বাগানের কাজ করছেন। খবর দিতে চন্দ্রাদি বেরিয়ে এলেন একটি ঘর থেকে। আমায় দেখে তিনি রীতিমতো অবাক, 'একি ? আপনি ?'

'চলে এলাম।'

'আসুন আসুন।'

যে ঘরে তিনি আমাকে বসালেন সেটি অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জানলাম কলকাতার একজন ধনী ডাক্তার এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সন্তানহীন এবং বিপত্নীক ছিলেন। তাঁর ব্যাঙ্কে রেখে যাওয়া টাকা থেকে বছরে দেড় লক্ষ টাকার মতো সুদ পাওয়া যায়। এখন আশ্রমিকের সংখ্যা চব্বিশ। অথচ অনেকেই আবেদন করেছেন থাকার জন্যে। তাই স্থির হয়েছে এখানে থাকতে হলে প্রতি মাসে বারশো টাকা দিতে হবে। খাওয়া-থাকা ছাড়া বিরাট খরচ হলো ওষুধপত্র এবং চিকিৎসার। যাঁরা প্রথম থেকে আছেন তাঁদের কুড়িজনের পক্ষে টাকাপয়সা দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে খুব অসুবিধার মধ্যে চলছে বৃদ্ধাশ্রম। কোনো সরকারি অনুদান পাওয়া যায় না। চন্দ্রাদিকে সেই বৃদ্ধ ডাক্তার মারা যাওয়ার আগে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন আশ্রমের।

চা এল, সঙ্গে বিস্কুট। খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল। চন্দ্রাদি খুব খুশী আমাকে এখানে পেয়ে। হঠাৎ সুনীলদার কথা তুললাম। চন্দ্রাদি মাথা নাড়লেন, 'সব জানি। আপনি যখন প্রথম চাকরিতে ঢুকেছিলেন তখন কে জানত ভবিষ্যতের কথা। আমি কলকাতা সিরিয়াল দেখতাম আর ভাবতাম সেসব দিনের কথা।'

'আপনার মা ?'

'মা নেই। বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ভাইরা বিবাহিত। ভালই আছে।'

'আপনার সঙ্গে যোগাযোগ নেই ?'

'না।'

'কেন ?'

'আমি তো তেমন কিছু জমাতে পারিনি। যা পেয়েছি তা ওদের জন্যে খরচ করেছি। তা
প্রতি মাসে একদিনের জন্যে হলেও বর্ধমানে যেতাম। তখন মা বেঁচে। বড় ভাইয়ের বিয়ে হয়ে
গিয়েছে। একদিন সকালে শুনলাম ভাইয়ের বউ বলছে, 'দিদি এসেছে বলে দামী মাছ আনার
দরকার নেই। কেন যে ঘন ঘন এসে খরচ বাড়িয়ে দেয়!' সেবার ফিরে আসার আগে ভাই বলল,
'দিদি, তুই দু'তিন মাস অন্তর আসিস। আসা যাওয়ার খরচ তো আছে।'

চন্দ্রাদি হাসলেন, 'মা একটা প্রতিবাদও করলেন না। উল্টে বোনের বিয়ের সময় আমাকে
প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে লোন নিতে বাধ্য করালেন। তবু ওদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ
নেই। মা মারা যাওয়ার আগে বাড়িটা ভাইদের লিখে দিয়ে গিয়েছেন। আমার কথা কেউ
ভাবেনি। সেটাই তো স্বাভাবিক।' .

চন্দ্রাদি আশ্রম ঘুরিয়ে দেখালেন। দেখলাম আশ্রমের কর্মচারীকে নিয়ে এক বৃদ্ধ সম্ভবত
বাজারে যাচ্ছেন। চন্দ্রাদি ডাকলেন তাঁকে, 'শুনুন।'

বৃদ্ধ দাঁড়ালেন, আমার দিকে তাকালেন।

'ইনি সমরেশ মজুমদার। একসময় আমার সহকর্মী ছিলেন। এঁর কথা কাল বলেছিলাম।'

বৃদ্ধ নমস্কার করলেন, 'আপনার উত্তরাধিকার আমার প্রিয় বই।'

'ঠিক আছে। মনে করে কচুর শাক আনবেন। ঊর্মিলাদি খেতে চেয়েছেন।'

বৃদ্ধ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইনি কে?' 'ওঁর বাড়ি বর্ধমানে ছিল
ভাইপোদের সব দিয়ে এখানে চলে এসেছেন।'

'বিয়ে করেননি?'

'না।'

'চন্দ্রাদি, স্বর্ণলতাদির কাছে একজনের কথা শুনেছিলাম যিনি আপনাকে বিয়ে করতে
চেয়েছিলেন। ইনি কি সেই মানুষ?'

চন্দ্রাদি নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

আমার শরীরে বিদ্যুৎ বয়ে গেল যেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু আপনি আপনি করে কথা
বললেন কেন?'

'আপনি তুমিতে কি এমন পার্থক্য? তাছাড়া এই আশ্রমে কেউ আমাদের সম্পর্ক নিয়ে
কথা বললে নতুন কোনো লাভ কি হবে? ওকেও অস্বস্তিতে ফেলা, তাই না?'

সেই সকালে বিদায় নিয়ে চলে এসেছিলাম। বাঙালি মেয়েরা আর কতকাল এভাবে
নিজেকে নিঃস্ব করে যাবে? মাঝে মাঝে মনে হয় সেই দিন শেষ হয়ে গেছে। আজকের নতুন
মেয়েরা ওই ভুল আর করবে না যা তাদের মা-মাসিরা করে গেছে।

তবু একটু ভাল লাগা জন্ম নিল। শেষ বয়সে চন্দ্রাদি অন্তত একজন প্রকৃত বন্ধুর কাছাকাছি
আছেন। শত্রুরা তাঁর যৌবন কেড়ে নিলেও এই শান্তি ছিনিয়ে নিতে পারেনি।

॥ ২৩ ॥

এদেশে মেয়েদের বিয়ে হয়, ছেলেরা বিয়ে করে

বাড়িতে বয়স্কা অবিবাহিতা থাকলে আত্মীয়স্বজনরা বলেন, এখনও মেয়েটার বিয়ে হলো না, কী যে হবে! অবিবাহিতের বয়স বাড়লে শোনা যায়, 'অমুক এখনও বিয়ে করল না?' স্কুলের দুই বান্ধবীর মধ্যে বছর চারেক যোগাযোগ ছিল না। একজনের কপালে সিঁদূর, হাতে নোয়া উঠেছে। হঠাৎ দেখা হতেই অবিবাহিতা উচ্ছ্বসিত হলো, 'আরে, কবে বিয়ে হলো তোর?' দুই পুরনো পুরুষবন্ধুর হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে প্রশ্ন হয়, 'কিরে, বিয়ে থা করেছিস?'

পাঠক, এই বিয়ে হওয়া এবং বিয়ে করার মধ্যেই বাঙালির মানসিকতার সুস্পষ্ট প্রকাশ হয়েছে। বিয়ে যারা করে তারা সক্রিয়, উদ্যোগী এবং ক্ষমতাবান। পুরুষদের এই ভূমিকায় দেখা হয়েছে। বিয়ে যাদের হয় তারা যেন শালগ্রামশিলা, বাজারের পণ্য অথবা ব্যক্তিত্বহীন ছাগল-ভেড়া যারা নিজেরা কিছুই করতে পারে না। মেয়েদের এইভাবেই ভাবা হয়ে এসেছে এতকাল। এবং এই ভাবনা শুধু পুরুষদের নয়, মহিলাদেরও। মা মেয়ের বিয়ে হলো না বলে আক্ষেপ করেন, বিয়ে করল না বলেন না। যেন সব মেয়ে বিয়ে করার জন্যে হেদিয়ে রয়েছে, পুরুষরা দায় দেখিয়ে বিয়ে করে যায়। এই চিন্তাটা যখন মেয়েরাই মেনে নিয়ে বলে থাকেন তখন তাঁরা নিজেরাই নিজেদের শত্রু হয়ে যান। আক্ষেপের কথা হলো এই আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা তাঁরা বুঝতে পারেন না। নইলে কলেজে পড়া মেয়ে বলে, 'তোর কবে বিয়ে হলো?'

কিন্তু ক্রমশ সময় পাল্টাচ্ছে। আজকের শিক্ষিত স্বাবলম্বী মেয়েরা বলতে আরম্ভ করেছে, আমি বিয়ে করব না। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা যা খুব সম্প্রতি ঘটেছে তা মনে পড়ল। আমার এক বন্ধুর বাড়িতে যে মেয়েটি বছর আটেক হলো কাজ করছে, সে এসেছিল রেললাইনের ধারের এক বস্তি থেকে। তখন তার বারো বছর বয়স। বন্ধুর স্ত্রী তাকে রীতিমতো পাল্টে দিয়েছিল। চমৎকার রান্না শেখাই শুধু নয়, ঘর গুছিয়ে রাখা, বাইরের লোকের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলাও ওর আয়ত্তে এসে গেল। বন্ধুর স্ত্রী মেয়েটিকে একটি পার্লারে ঢুকিয়ে দিলেন কাজ শেখার জন্যে। সকালে বন্ধুর বাড়ির কাজ শেষ করে দশটা নাগাদ সে পার্লারে চলে যায়। খুব দ্রুত সে পার্লারের কাজে দক্ষ হয়ে ওঠে। রাত আটটায় বাড়ি ফিরে বন্ধুদের জন্যে রান্নার কাজে লেগে যায়। এর ফলে এক বছর বাদে মেয়েটির আয় প্রায় চোদ্দশ টাকায় পৌঁছে গেল। এই সময় মেয়েটির মা বন্ধুর স্ত্রীর কাছে এল, তার মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। ছেলেটি খুব ভাল, নেশাভাঙ করে না, ট্যাক্সি চালায়, কাঁচা পয়সা। ছেলের মামা এসে নাকি না জানিয়ে মেয়েকে দেখে গিয়েছে।

তাদের খুব পছন্দ হয়েছে। মেয়ের বয়স কুড়ি হয়ে গেল, এখনও যদি বিয়ে না হয় তাহলে মা রাত্রে ঘুমোতে পারবে না। দিতেই যখন হবে তখন দেরি করে লাভ কি।

মেয়েটি চলে গেলে অন্ধকার দেখবেন জেনে বন্ধুপত্নী খুব বিপাকে পড়লেন। এরকম বিশ্বাসী হাতে গড়া মেয়েকে তিনি কোথায় পাবেন ? এক রবিবার মেয়ে গেল বাপের বাড়িতে, সেখানে পাত্র আসবে তাকে দেখতে।

সন্ধ্যেবেলায় মেয়েটি ফিরে এলে বন্ধুপত্নী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে, পাত্র তোকে দেখতে এসেছিল ?'

মেয়েটি মাথা নামিয়ে বলল, 'হুঁ।'

বন্ধুপত্নী জানতে চাইলেন, 'কি বলল তারা ? পছন্দ হয়েছে ?'

মেয়েটি মুখ না তুলে বলল, 'হুঁ!'

হতাশা গোপন রেখে বন্ধুপত্নী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছেলেকে কেমন দেখতে ?'

'ভাল।' একই ভঙ্গি মেয়েটির।

'অ, তা দিন ঠিক হয়েছে ?'

'না।'

'কেন ?'

'ওদের কোনো দাবিদাওয়া নেই। সামনের মাসেই কাজ করতে চায়। কিন্তু শর্ত দিল, আমাকে কাজ ছাড়তে হবে। বাড়ির বউ হয়ে বসে থাকতে হবে।'

'হুঁ। তারপর ?'

'আমি বললাম এরকম ছেলেকে বিয়ে করব না।'

'তুই বিয়ে করবি না বললি ?'

'হুঁ।' বলে মেয়েটি ভেতরের ঘরে চলে গিয়েছিল।

বন্ধুপত্নী অন্য কারণে খুশি হলেও মেয়েটি সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। একটি অশিক্ষিতা, বস্তিতে বড় হওয়া বাঙালি মেয়ে খুব সামান্য হলেও স্বনির্ভরতা পেয়ে আত্মসম্মান বজায় রাখতে পেরেছে, মুখ ফুটে বলেছে সে বিয়ে করবে না। যারা ওর বিয়ে হওয়াতে আগ্রহী ছিল তাদের মুখের ওপর উচিত জবাব দিয়ে এসেছে। ছেলেটি আবার ফিরে এসেছিল। সে নাকি এমন স্বাধীনচেতা মেয়ে দ্যাখেনি। অতএব চাকরি করতে দিতে তার আপত্তি নেই। কিন্তু মেয়েটি ওই ছেলেকে বিয়ে করতে রাজী হয়নি আর।

এই প্রসঙ্গে আর এক মহিলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কলকাতার এক বিখ্যাত দর্জির দোকানে কাজ করেন তিনি। দর্জির দোকান বললাম কিন্তু সেটি এত বড় এবং এত আধুনিক যে আমাদের দেখা পাড়ার দর্জির দোকানের সঙ্গে কোনো মিল নেই তার। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত সেই দোকানে কলকাতার অভিজাত শ্রেণীর মহিলারা পোশাক তৈরি করাতে যান। ভদ্রমহিলার নাম, ধরা যাক সুজাতা। বয়স পঞ্চাশের আশেপাশে। এখনও সৌন্দর্য এবং যৌবন তাঁর শরীরে মিশে আছে। কাটার হিসেবে তাঁর খ্যাতি সর্বত্র। খদ্দেররা চান তাঁদের পোশাক যেন ওঁর হাত থেকেই শুরু হয়। কিন্তু সেই দিক দিয়ে চিন্তা করে দোকানের মালিক তাঁর বেতন তিন হাজারের

বেশি বাড়ানননি। এখানে সুজাতা আছেন কারণ সম্মানের সঙ্গে থাকা যাচ্ছে। এটুকুই তাঁর চাহিদা।

সুজাতা সিঁদুর পরেন না, হাতে শাঁখা বা লোহা নেই। আপাতচোখে তাঁকে অবিবাহিতা বা বিবাহবিচ্ছিন্না ভাবাই স্বাভাবিক।

সুজাতার কাহিনী আমি কিভাবে জেনেছি সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর।

সুজাতারা থাকেন শ্রীরামপুরে। ওঁর মা মারা গিয়েছিলেন দুই ছেলেমেয়েকে রেখে। সুজাতার ভাই দশ বছরের ছোট। স্কুলফাইন্যাল পাশ করার পর সুন্দরী মেয়ের জন্যে সম্বন্ধ আসতে আরম্ভ করলে সুজাতার বাবা ঠিক করলেন গলগ্রহ বিদায় করবেন। তাঁর আয় বেশি না থাকায় তিনি এমন পাত্র বেছে নিলেন যাদের দাবিদাওয়া নেই। ঘটকের মাধ্যমে পরিচয় হওয়ার পর ছেলেকে পছন্দ হলো। পাত্রপক্ষ মেয়েকে দেখে খুব খুশি। বিয়ের দিন ঠিক হলো।

বাবা এবং ভাইকে ছেড়ে যেতে হবে বলে সুজাতার মন যেমন খারাপ হয়েছিল তেমনি অনাগত ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্নের টানও তার ছিল। বিয়ে হলো, হৈচৈ করার লোক না থাকায় বাসরঘরের দরজা বন্ধ করলেন স্বামী। খুব ভদ্র ব্যবহার করতে করতে তিনি সুজাতাকে গ্রহণ করতে চাইলেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ বাঙালি মেয়ের মতো সুজাতা কৌমার্য হারাল, হারিয়ে সুখী হলো।

কিন্তু সকালে যখন বরপক্ষ নতুন বউকে নিয়ে যাত্রা করবে ঠিক তখনই বজ্রপাত হলো। এক মহিলা তাঁর দুই ভাইকে নিয়ে হাজির হলেন বিয়েবাড়িতে। মাত্র গতরাত্রে তাঁরা খবর পেয়েছেন এই বিয়ে হচ্ছে। ঠিকানা সন্ধান করে পৌঁছাতে তাই দেরি হয়ে গেল। তিনি দাবি করলেন পাত্র তাঁর স্বামী। রীতিমতো মা কালীকে সাক্ষী রেখে কালীঘাটে তাঁদের বিয়ে হয়েছে। সেখানে তোলা ছবি সঙ্গে এনেছেন তিনি। অতএব তাঁর স্বামী যদি আর একটি মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যান তাহলে তিনি এখান থেকে থানায় গিয়ে ডায়েরি করবেন।

হৈ হৈ শুরু হয়ে গেল। চাপে পড়ে পাত্র স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে সে ওই মেয়েটিকে বিয়ে করেছে। প্রেম করে বিয়ে বলে তার বাবা মানতে চাননি। ঘরে নেননি পুত্রবধূকে। দু বছর এভাবে চলার পর জোর করে ছেলের বিয়ে দিতে চেয়েছেন। সেই সুবাদেই এই বিয়ে। পুত্রবধূ এতকাল তার বাপের বাড়িতে ছিল চুপচাপ। সে যে দাবি নিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হবে তা তিনি কল্পনাও করেননি। পাড়ার লোকজন চেয়েছিল পাত্রকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে। সুজাতার বাবা এত ভেঙে পড়েছিলেন যে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। পাত্রপক্ষ চলে গেল সুজাতাকে না নিয়ে। একরাত্রের রঙিন স্বপ্নের মতো জীবন একমুহূর্তেই সাদা এবং নগ্ন হয়ে গেল চিরকালের মতো। সুজাতার ইচ্ছে হয়েছিল প্রতিশোধ নিতে। থানায় গিয়ে লোকটার বিরুদ্ধে মামলা করার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু এসবই করা হয়নি। বাবার শরীর নিয়ে এতই বিব্রত হয়ে পড়তে হয়েছিল যে নিজের কথা চিন্তা করার অবকাশ হয়নি। শেষ পর্যন্ত বাবা তাকে বলেছিলেন, 'ভুলে যা, ভুলে যা মা। ধরে নে তোর বিয়ে হয়নি।'

কিন্তু প্রকৃতি সেটা ভুলতে দিল না। এক রাত্রের সহবাস সন্তান এনে দিল শরীরে। সন্দেহ সত্যি বুঝতে বুঝতে যে সময় গেল সেই সময়ে মুক্ত হতে গেলে প্রাণের ঝুঁকি নিতে হবে। অতএব

সন্তান এল। এবং সুজাতা যা ভেবেছিল সেটাই সত্যি হলো। মেয়ে তার কোলে আসা মানে অনেক দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই ভবিষ্যতের জন্যে তোলা রইল।

মেয়ে পৃথিবীতে আসার বছর খানেকের মধ্যে সুজাতার বাবা মারা গেলেন। কোনো সঞ্চয় রেখে যাননি তিনি। নাবালক ভাই এবং শিশুকন্যাকে নিয়ে দারিদ্র্য কি জিনিস তা প্রত্যক্ষ করতে লাগল সুজাতা। বাবা বেঁচে থাকতেই সে টিউশুনি শুরু করেছিল। ওইটুকুনি শিশুকে ভাইয়ের ভরসায় রেখে সে টিউশুনির সংখ্যা বাড়াতে লাগল। কোনোরকমে বাড়ি ভাড়া আর দুবেলা যাহোক খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হিমশিম খেয়ে গেল সে। সুজাতা রাস্তা দিয়ে হাঁটতো মাথা নিচু করে। তার বিয়ের ব্যাপারটা পাড়ার সবাই জানতো। কিছু মানুষ সহানুভূতির চোখে দেখলেও কিছু পুরুষ তাকে খোলা ময়দান বলে ভাবতে শুরু করে দিল। আকারে ইঙ্গিতে নানান প্রস্তাব প্রতিদিন তার কাছে পৌঁছে দিত তারা। সুজাতা সুন্দরী, অভাবের সঙ্গে লড়াই করেও সন্তান হওয়ার পর সেই সৌন্দর্য যেন আরও বেড়ে গিয়েছিল। ঠিক এই সময় ঈশ্বর একটু প্রসন্ন হলেন নতুন যে ছাত্রীকে সে পড়ানো শুরু করেছিল, তার বাবা ওকে প্রস্তাব দিলেন জামাকাপড়ের কাটিং এবং সেলাই শেখার। দুপুরবেলার কয়েক ঘন্টার বিশ্রামের সময়টুকু চলে গেল।

দর্জির কাজের প্রাথমিক শিক্ষা হয়ে যাওয়ার পর টিউশুনির সংখ্যা কমাতে লাগল সুজাতা শুধু কাপড় কেটে ব্লাউজ বা সালোয়ার কামিজ বানানোই নয়, তাদের ডিজাইনের হেরফের করতে করতে নতুন নতুন কাটিং আবিষ্কার করতে লাগল সে। এই লাইনে হাতের কাজ ভাল হলে নাম ছড়িয়ে পড়ে। টাকার অঙ্ক সামান্য বাড়তেই টিউশুনি করা ছেড়ে দিল সুজাতা বাড়িতে একটি কাজের মহিলা রাখল। ভাইকে পড়াবার জন্যে কোচিং স্কুলের ব্যবস্থা করল

একটু একটু করে দীর্ঘকাল কেটে গেল। ভাই পাশ করে চাকরি নিয়েছে। মেয়ে গ্রাজুয়েট হওয়ার পর যে ছেলেকে পছন্দ করেছে, তার সঙ্গেই বিয়ে দিয়েছে সুজাতা। ছেলেটি জানত সুজাতার দুর্ভাগ্যের কথা। কিন্তু বিয়ে করার সময় যে উদার মানসিকতা দেখিয়েছিল সে তার জন্যে সুজাতা কৃতজ্ঞ। কিন্তু পরবর্তীকালে একটু একটু করে অন্য সন্দেহ দানা বাঁধল তার মনে মেয়ের শরীর সামান্য খারাপ হলেই জামাই তাকে দিয়ে যায় তার কাছে, যতদিন সুজাতা তাকে সুস্থ না করে তুলছে ততদিন ফিরিয়ে নেওয়ার নাম করে না। মেয়ের বাচ্চা হলো তার কাছেই জামাই ভাল করে জানে সুজাতার পক্ষে দু'দিন কামাই করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু তার কোনো বিকার নেই। আর এই কারণে সন্দেহ মনে দানা বাঁধে। কিন্তু সুজাতার কিছু করার নেই সেই এক বীভৎস ফুলশয্যার রাতের দায় তাকে বহন করে যেতে হবেই, এইভাবে মেনে নিয়েছে সে। ভাইয়ের বিয়ে হলো। সেই মেয়ে বাড়িতে এসে দেখল একজন স্বামী-পরিত্যক্তা মহিলা সংসারের হাল ধরে বসে আছে। যতই তাকে বোঝানো হোক সুজাতা স্বামী-পরিত্যক্তা নয়, স্বামীকেই সে ত্যাগ করেছে কিন্তু সেটা সে বোঝার চেষ্টা করে না। বিয়ে যখন হয়েই গিয়েছিল, সহবাস যখন করেইছিল তখন স্বামীর সংসারে গিয়ে থাকলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হতো? এবং এই ভাবনা থেকেই মেয়েটির ব্যবহারে পরিবর্তন এল। সংসারের কাজ যতটা কম করা যায় তাই করতে লাগল। সুজাতা প্রথম দিকে বলতে গিয়ে শুনেছে, 'সংসারের দায়িত্ব যে নিয়েছে তারই তো এসব করা উচিত। আপনার ভাইয়ের কি আমার হাতের রান্না খেতে ভাল লাগবে?

সুজাতা শান্ত গলায় বলেছিল, 'দ্যাখো, বাইরের কাজ সামলে ঘরের এসব ঝামেলা আর কতদিন সামলাবো বল ?'

'কেন ? এতকাল তো বেশ করছিলেন। এখন ঘোড়া দেখে খোঁড়া হতে চাইলে কি করে হবে।' ভাইয়ের বউ মুখের ওপর বলেছিল।

অতএব ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে রান্না সেরে সামান্য সেজে দোকানে যায় সুজাতা। ত নটায় বাড়িতে ফিরে আবার রান্নার ব্যবস্থা করতে হয় তাকে।

এখন এই পঞ্চাশ বছর বয়সে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যায় সে। তার ভাবার সময় বাসে পে দোকানে যাওয়ার সময়টায়। তখন খুব একা লাগে নিজেকে। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই কে মনের কথা বলা যায়। সুখদুঃখের দুটো কথা যার সঙ্গে আলোচনা করা যায় ! এই এতকাল জেকে আড়াল করে রেখে কি লাভ হলো তার ! এখনও তার শরীর পুরুষদের কাছে আকর্ষণের স্তু তা সে জানে। কিন্তু ব্যাপারটা ভাবলেই শরীর ঘিনঘিন করে ওঠে। শরীরের জন্যে নয়, মনের ন্যে সঙ্গী দরকার, আজ একথা বারংবার মনে হয়। সেই ভদ্রলোক, যিনি তাকে একরাত্রে তবিক্ষত করে চলে গিয়েছেন, তার কোনো হদিস সে জানে না। আদৌ বেঁচে আছে কিনা তাই কে জানে। হ্যাঁ, তিনিও এই এত বছরে তাকে বিরক্ত করতে আসেননি একটি বারের জন্যে। ময়ে এসব কথা জানে ! ওর বিয়ের সময় একটু দ্বিধায় ছিল সুজাতা। কিন্তু মেয়ে বলেছিল, 'যে নুষ আমার কাছে, তোমার কাছে মৃত, তাকে আবার কবর খুঁড়ে বের করার কি দরকার।'

খুশি হয়েছিল সুজাতা। ওই মেয়েই তাকে যা একটু বোঝে। কিন্তু তার এই নিঃসঙ্গতা দূর বার সামর্থ্য ওর কি করে হবে ! একজন পুরুষ যে তার দিকে বন্ধুর মতো হাত বাড়াবে, সমস্যা লে যার কাছে মন খুলে বলতে পারবে তেমন কেউ কি এই পৃথিবীতে আছে ? এখন শুধু এই চ্ছে বুকের মধ্যে পাক খায়। সেই সঙ্গে ভয়ও। যাকে বন্ধু বলে সে মনে করবে সে যদি জীবনকে মারও জটিল করে দেয় ? তাছাড়া এই বয়সে নিছক বন্ধুত্ব হলেই মেয়ে, জামাই, ভাই এবং তার ী কিভাবে নেবে ?

জামাই এবং ভাইয়ের বউয়ের মুখ মনে করতেই মাথা নাড়ল সুজাতা। না, ওরা কিছুতেই হ্য করতে পারবে না। বিয়ে দূরের কথা সামান্য বন্ধুত্ব ওদের চোখে অশ্লীল বলে মনে হবে। এবং তার প্রতিক্রিয়া পড়বে সংসারে। আশ্চর্য ! সুজাতা নিঃশ্বাস ফেলে, পঞ্চাশ বছর বয়সেও র স্বাধীনতা নেই। আর কতকাল অন্যের মন যুগিয়ে চলতে হবে তাকে।

সেদিন একটি দামী গাড়ি এল বাড়ির সামনে। ছুটির দিন। আটপৌরে হয়ে বাড়ির কাজ রছিল সুজাতা। ভাই এসে বলল, 'তোমাকে একজন মহিলা খোঁজ করছেন। পোশাক আর াড়ি দেখে মনে হয় বেশ বড়লোক।'

অপ্রস্তুত ভাব কাটিয়ে দ্রুত নিজের পরিবর্তন করে বাইরের ঘরে গেল সুজাতা। মহিলা দীর্ঘাঙ্গিনী, ফর্সা, অবাঙালি। তিনি বললেন, 'দিল্লীতে আপনার কথা আমাকে একজন বলেছিল। কলকাতায় এসে আপনার কাজ দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। দিল্লীতে আমার ফ্যাশান ডিজাইনের ব্যবসা আছে। তিনটে বুটিক চালাই আমি। আপনাকে আমার দরকার। আপনি আমার ওখানে জয়েন করুন।'

'দিল্লীতে ?'

'হ্যাঁ। ওখানে গেলে অনেক বেশি এক্সপোজার পাবেন আপনি। আরও নাম হবে কলকাতায় থাকলে সেটা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু—।'

'প্লিজ। আমি এখন আপনাকে আট হাজার দেব। প্লাস থাকার জন্যে একটা অ্যাকোমোডেশন আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবেন। আমি পার্ক হোটেলে উঠেছি। রুম নাম্বার তিনশ তি আপনি মনস্থির করে আজ বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করুন।' নিজের নামধাম ছাপানো ক সুজাতাকে দিয়ে ভদ্রমহিলা চলে গেলেন।

সুজাতা স্বপ্ন দেখতে লাগল। অত টাকা, অত সম্মান। সারাজীবনে সে যা ভাবতে পারে তা একমুহূর্তে তার হাতে এসে গেল ? তাহলে ঈশ্বর শুধু মেয়েদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাই করে না, পাশে এসেও দাঁড়ান। ভাই কাছে এল, ওই বিদেশ-বিভূঁইতে গিয়ে একা থাকবি দিদি ভাইয়ের বউ বলল, 'কে জানে মেয়েছেলেটার মতলব কি ! দিল্লীতে নিয়ে গিয়ে হয়তো ঝিগি করাবে। টাকাটাই কি বড় কথা !'

সুজাতা প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে গেল। একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে মেয়েকে নিয়ে নামছে জামাই। মেয়ের হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। জামাই বলল, 'আপনার মেয়ের পে যন্ত্রণা হচ্ছে। অ্যাপেন্ডেসাইটিস। ডাক্তার বলল এখনই অপারেশন করাতে। তাই ওকে দি গেলাম।'

এক মুহূর্তে মাটিতে নেমে এল সুজাতা। এগিয়ে গিয়ে মেয়ের হাত ধরে বলল, 'আয়

॥ ২৪ ॥

সদানন্দ মণ্ডল গ্লাসে চুমুক মেরে বলেছিল, 'দাদা, মেয়েদে উপর আপনার একটু বিশেষ টান আছে জানি। এই জঙ্গ বাস করি বলে ভাববেন না আপনার লেখাটেখা পড়ি না এই নবকল্লোলেই তো পড়েছি। কিন্তু তেমন মেয়ে পাল্লায় আপনি পড়েননি তাহলে বুঝতে পারতেন তেনা কী চীজ !'

সজনেখালিতে যেতে অনেকগুলো জায়গা প যাদের নামের শেষে রয়েছে খালি। বাস থেকে নেমে ন পেরিয়ে সাইকেল ভ্যানে বসে আবার নদীর ঘাটে পৌঁছে এই যাওয়াটা বেশ ঝকমারি কিন্তু কি মানুষ তো চিরকালই পাগলামি করেন। যেমন শান্তিনিকেতনে বাড়ি নেই, আত্মীয়স্বজন ে কিন্তু ওখানে গিয়ে আড্ডা মারার লোভে প্রতি বছর বার তিনেক যান এমন সাতজন লোকে

আমি চিনি। কথা নেই বার্তা নেই, হুট করে দীঘায় গিয়ে তাস খেলে সময় কাটিয়ে আসতে দেখেছি কয়েকজনকে। এরা বছরে অন্তত চারবার দীঘায় যায়। দীঘায় যায় কিন্তু সমুদ্র দ্যাখে না। হোটেলের ঘরে বসে তাস খেলেই সময় কাটায় অথচ দীঘায় যাওয়া চাই। তেমনি বছরে অত হ্যাপা সামলে সুন্দরবনে যাচ্ছে অন্তত দুবার এমন কয়েকজনের সন্ধান জানতাম। তাদের একজনকে ধরেছিলাম। আমার কখনও ওই অঞ্চলে যাওয়া হয়নি। সে প্রবল উৎসাহে ব্যবস্থা করল। কিন্তু সেদিন বাস থেকে নামা মাত্র আকাশে মেঘ, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। শেষ নদী পার হতে চাইল না মাঝি। ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে গেলেন সদানন্দ মণ্ডলের বাড়িতে। স্বাস্থ্যবান মানুষ। পরিচয় পেয়ে প্রায় পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে এলেন। আমি ছিটকে সরে গেলাম।

তখন দুপুর। কিন্তু রোদ নেই। সদানন্দ আমার গাইডকে বকুনি দিল, 'এমন অসময়ে দাদাকে এ অঞ্চলে নিয়ে আসতে হয় ? ছি ছি ছি। প্রকৃতি বলে কথা। এখন প্রকৃতি কাঁদবে। এ চলবে পুজো পর্যন্ত। যাক গে। আমি আছি। আমার একটা গেস্ট হাউস আছে, সেখানে দাদার খারাপ লাগবে না।'

না, সত্যি খারাপ লাগেনি। দুপুরে তিন রকমের মাছ দিয়ে ভাত খেয়ে ঘুম দিয়েছি জব্বর। ঘুম ভাঙতে দেখলাম হ্যাজাক জ্বলছে। আমার গাইড চা খাওয়ার পর কিন্তু কিন্তু করে বলল, 'সদানন্দ মণ্ডলের কাছে কেন এলাম জানেন ?'

'বিত্তশালী লোক, থাকার জায়গা দেবে, তাই।'

'না দাদা, ও সামনের বার এম. এল. এ. হবে। কিন্তু এখনও পাঁচটা ডাকাতের দলকে কন্ট্রোল করে। পশ্চিমবাংলার একমাত্র ওই দল পাঠিয়েছে বাংলাদেশে জলে ডাকাতি করতে। কিন্তু লোকটা গপ্পো পড়ে। আপনাকে শ্রদ্ধা করে।'

রাত আটটা নাগাদ সদানন্দ এল। সঙ্গে চারজন আগ্নেয়াস্ত্রধারী। তাদের বাইরে দাঁড়াতে বলে সে আমার সামনে এসে বলল, 'মাইরি, সত্যি বলছি, সাহিত্যিক মানে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলা মানুষ, এমন ভাবতাম। আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি ডাকাতিও করতে পারেন।'

আমার চেহারা ভাল কি মন্দ তা নিয়ে নানান ব্যাখ্যা থাকতে পারে, কিন্তু আমি ডাকাতি করতে পারি, চেহারা দেখে বোঝা যায়, এই প্রথম শুনলাম।

আমি গম্ভীর রইলাম। সদানন্দ বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, দিশি খাবেন না স্কচ ? এখানে দুটোই পাবেন।'

'দিশি খেতে পারব না বোধহয়।'

'তাহলে খাবেন না।' সে ইশারা করতে শিভ্যাস রিগ্যালের বোতল এসে গেল। এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায়, যেখানে বিদ্যুৎ আসেনি সেখানে এত দামী বিলিতি মদ এসে গেল কি করে ?

সঙ্গে এল পোনা, চিংড়ি আর ভেটকি ভাজা। তার পরিমাণ এত যে আমি এক মাসেও খেয়ে উঠতে পারব না। তারপর খাওয়া আর কথা চলছে। আমি শ্রোতা আর সদানন্দ বক্তা।

হঠাৎ সদানন্দ বলল, 'দাদা, আমি ভাবতে পারি না, যে মাধবীলতা বিয়ে না করে মা হলো

তাকে বাঙালি পাঠক মাথায় করে রাখল, অথচ গাঁয়ের কেউ ওই কাজ করলে কি রিঅ্যাকশন হতো ভাবতে পারবেন না।'

'মাধবীলতাকে মাথায় করে কে রেখেছে?'

'প্রচুর পাঠক! নইলে আপনার বই অত বিক্রি হতো?'

আমি প্রসঙ্গ পালটাতে চাইলাম, 'আপনি কিরকম মেয়েছেলের কথা বলছিলেন? বাঙালি মেয়ে?'

'অবশ্যই। আলাপ করবেন?'

'খুব আলাদা স্বভাবের হলে আলাপ করা যেতে পারে।'

'কিন্তু আপনি লেখেন শুনলে ও কিছুই বুঝতে পারবে না।'

'তার মানে?'

'ওর কাছে এসব একদম অজানা। কোনোদিন বই পড়েনি। সই করতে জানে। তিনটে স্পীড বোট আছে। গুলি চালায় ভাল। আজ অবধি কোনো পুরুষের সঙ্গে শোয়নি। কথাটা শুনে আমাকে খারাপ ভাববেন না দাদা।'

'বয়স কত?'

'আঠাশ হবে। ওর দলে কুড়ি-একুশজন পুরুষ কাজ করে।'

'তার মানে, মেয়েটি ডাকাত?'

'ওই আর কি!'

'বিয়ে থা হয়নি? বাপ-মা নেই?'

'বাপ-মা আছে। এ .ন রাজার মতো আছে। তবে বিয়ে করেনি সুন্দরী।'

'সুন্দরী? ওর নাম বুঝি সুন্দরী?'

'হ্যাঁ। তবে সুন্দরী একটা গাছের নাম। সুন্দরবনে হয়।' গলা নামাল সদানন্দ, 'পুরুষ মানুষে আসক্তি নেই ওর। কোনো পুরুষ ওর দিকে এগোলেই সর্বনাশ।'

'সর্বনাশ মানে? মেরে ফেলে?'

'না দাদা। ধরে খোজা করে দেয়। অথচ সুন্দরী মেয়ে দেখলে তুলে নিয়ে যায়। তার সঙ্গে ভালবাসার কথা বলে। একেবারে ব্যাটাছেলের স্বভাব।'

আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করব, না সদানন্দকে? এ ধরনের মহিলার গপ্পো পড়া যায় আরব্য রজনীতে অথবা মিশর কিংবা গ্রীসের ইতিহাসের কল্প-কাহিনীতে। কিন্তু খোদ সুন্দরবনে এমন মহিলা বেঁচেবর্তে আছেন ভাবতেই কিরকম লাগছিল। আমি শেষ পর্যন্ত ধরে নিলাম সদানন্দের নেশা হয়েছে। আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার আগেই সে ভাল পান করেছিল, এখানে এসেও করছে। একটা মানুষের সহ্যক্ষমতার সীমা থাকবে তো? কিন্তু বাকি রাত থাকতে হবে এখানে, লোকটাকে চটিয়ে কোনো লাভ নেই।

কিন্তু নির্বিকার মুখে বসে আছি দেখে বোধহয় সন্দেহ হলো সদানন্দর। চোখ ছোট করে আমায় দেখল, তারপর মাথা নাড়ল, 'নাঃ, নেশা হয়নি দাদা! আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন, তাই তো। কিন্তু আপনি গুণী মানুষ। তাই কিছু বলছি না। সুন্দরীর সঙ্গে আমার ব্যবসার সম্পর্ক।

মি তাকে খবর পাঠাতে পারি।'

'বেশ। আপনি যদি ব্যবস্থা করে দেন তাহলে কথা বলতে পারি।'

'মুশকিল হলো, এখন ও ঠিক কোথায় আছে তা জানতে কয়েক ঘণ্টা কেটে যাবে। াদের এখানকার নতুন আসা এস. আই. ও.র পেছনে পড়েছে। হাতেনাতে ধরবে এবং য়ে-সুঝিয়ে জেল যাতে কম হয়, গ্রেপ্তার হতে রাজী করাবে। একদিকে কর্তব্য আবার মনের সুড়ানি শুরু হয়ে গেছে লোকটার। বেশি দিন হাতে নেই ওর। তা এরকম ক্ষেত্রে যা হয়, য় মরিয়া হয়ে খোঁজখবর রাখে।' ওর কাছে গেলে বোধহয় জানা যাবে সুন্দরী এখন কোথায় ছে।' সদানন্দ উঠল।

মাঝরাতে সদানন্দ লোক দিয়ে জানিয়ে দিল এস. আই- ও ওর খবর জানে না। তাই এ ায় সুন্দরীর সঙ্গে দেখা করানো সম্ভব হচ্ছে না।

যে ভদ্রলোকের সঙ্গে এসেছি তিনি বললেন, 'এই সব ডাকাতদের সঙ্গে সখ্যতা না করাই ন। সদানন্দ সাহিত্যরসিক ডাকাত বলে আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম। যারা অক্ষর ন না তাদের কাছে যাবেন কেন আপনি?'

এই কথাটিকে ভারি অপছন্দ করলাম। যারা অক্ষর চেনে না তারা নানান কারণে সেটা ার সুযোগ পায় না। কিন্তু মানুষ হিসেবে তারা সাক্ষরদের থেকে কম কিসে? তাদের বনেও সমস্যা আছে, গল্প আছে। আমি যদি মানুষ নিয়ে লিখি তাহলে তারা বাদ যাবে কেন?

যাহোক, পরের দিন আকাশ পরিষ্কার। আমরা নদীপথে স্বচ্ছন্দে সজনেখালি পৌঁছে লাম। যাওয়ার পথে নৌকোয় বসে শুনলাম কাল রাতে মাতলায় দুটো বড় ডাকাতি হয়েছে। উ বলছে বাংলাদেশী ডাকাত, কেউ বলল সুন্দরীর দল। সজনেখালিতে পৌঁছে সুন্দরী পর্কে খোঁজখবর করতে সবাই চোখ বড় করে তাকাল। তারা বলল ও নাম যেন মুখে না নিই। ওয়ার টানে তার কানে চলে যাবে আমার কথা। মেয়েছেলে হলে তবু বাঁচার সুযোগ ছিল কিন্তু মি যখন পুরুষমানুষ তখন আমাকে বিপদে পড়তেই হবে। কারণ সুন্দরী পুরুষদের একদম হ্য করতে পারে না। আমি আরও জানতে পারলাম, আজ পর্যন্ত সুন্দরী বা তার দলের হাতে ানো মহিলা খুন হয়নি।

ব্যাপারটা অভিনব বলে মনে হলো। যে ডাকাতদলের কাছে মেয়েরা নিরাপদ সেই কাতদলকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া সহজ কর্ম নয়। পুরুষের কাজের প্রতিবাদ করবে র বাড়ির মহিলাই। বোধহয় এই কারণে আরও সাহসী হয়ে উঠেছে সুন্দরী।

তিন রাত সজনেখালিতে ছিলাম। যে-ই আসত তার সঙ্গে ইচ্ছে করেই সুন্দরীকে নিয়ে লোচনা করতাম। সে রাজী না হলেও আমি ওর সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাতাম। য়েমানুষ বলতে যা বোঝায় তা সুন্দরী নয়, ঈশ্বর ওকে সেটা করতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে ন্যরকম করে ফেলেছেন। ওর মধ্যে এমন কোনো কমনীয়তা নেই যে কোনো পুরুষ আকর্ষণ াধ করতে পারে। এর আগে যে কজন পুরুষ সেটা করে ওর বিরাগভাজন হয়েছে তারা তান্তই মূর্খ। সুন্দরী একজন ডাকাত, তার বেশি কিছু নয়।

সজনেখালি থেকে ফিরে আসার দিন নদীর ঘাটে সদানন্দ মণ্ডল দাঁড়িয়েছিল। তার পেছনে

জনা দশেক মানুষ। যেন নাটক দেখতে দাঁড়িয়ে আছে তারা। এই নৌকো থেকে নেমে ভ
রিকশায় মাইল কয়েক যাওয়ার পর আবার নদী পার হতে হবে। যাওয়ার সময় এখানেই সদা
মণ্ডলের আশ্রয়ে ছিলাম আমি।

'কেমন আছেন সদানন্দবাবু ?'

'আমি তো খারাপ থাকি না। থাকলে এই সব করেটরেও প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতে পারি
আমি ভালই আছি। মুশকিল হয়েছে আপনাকে নিয়ে।'

'কি রকম ?'

'কি বলেছেন আপনি ? সুন্দরী সম্পর্কে কুকথা বলেছেন সজনেখালিতে ?'

'আমি ? কুকথা ?'

'তাই তো প্রচার হয়েছে। সে তো রেগে কাঁই। ওখানেই মেরে ফেলত লোক পা
নয়তো আসার পথে নৌকো থেকে ফেলে দেওয়াতো। অনেক কষ্টে তাকে ধৈর্য ধরতে বলে
আপনার সঙ্গে কথা না বলে কিছু করতে নিষেধ করেছি।'

'তারপর ?'

'আপনি ভয় পাচ্ছেন না ?'

'আমি ভাবছি এটা কি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ? পুলিশ নেই ?'

'এ আপনি কি বললেন ? খোদ কলকাতা শহরে কিছু লোক তাদের যা-ইচ্ছে-তাই ক
না ? পুলিশ থেকেও কি কিছু করতে পারছে ?' সদানন্দ জিজ্ঞাসা করল।

'তা আমাকে কি করতে হবে ?'

'ওর সঙ্গে দেখা করুন। একটু বুঝিয়ে বলুন।'

'কিন্তু আজকে তো আমার সময় হবে না। এখন রওনা না হলে কলকাতায় পৌঁছাত প
না। ঠিক আছে, পরের বার হবে অথবা সুন্দরী যদি কলকাতায় আমার বাড়িতে আসে, স্বচ্ছ
আসতে পারে, তখন কথা হবে।'

'না দাদা। আপনি যদি না দেখা করে যেতে চান, ও আপনাকে কলকাতায় পৌঁছাত
না। আমি নিরুপায়।'

'নিরুপায় ? একজন ডাকাত যা চাইছে তা মেনে নেবেন ?'

সদানন্দ হাসল, 'সুন্দরী হাজার হোক একজন মহিলা। আপনি তো মেয়েদের
লেখেন। তাই না ? বলি কি ঘুরেই আসুন। ওই ভটভটিতে চলে যান, ভাল করে বুঝিয়ে ব
রাগ ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে।'

'আমি একা যাব ?'

'ওই তো লোক বসে আছে আপনাকে নিয়ে যাবে বলে।'

অগত্যা গাইডকে বাদ দিয়ে আমাকে একাই উঠতে হলো স্পীড বোটে। সঙ্গে সঙ্গে
চালু করে লোকটা তীব্র গতিতে চালাতে লাগাল। আমি দু'হাতে বোট আঁকড়ে বসে রইলা
এই নদীতে প্রচুর হিংস্র প্রাণী আছে। তাদের পেটে যাওয়ার কোনো বাসনা নেই আমার

একথা ঠিক, সুন্দরবনের এই অঞ্চলের ডাকাতদের সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা

না। কোথায় সজনেখালিতে বসে কি বলেছি তা বাতাসের আগে পৌঁছে গেল এদের কানে ? সুন্দরী মহিলা ডাকাত। এর আগে পুতলী বাঈ অথবা ফুলনদেবীর গল্প পড়েছি। তারা নির্যাতিতা হতে হতে বাধ্য হয়েছে ডাকাত হতে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তেমন কেউ বিখ্যাত মহিলা ডাকাত আছে বলে জানতাম না।

মিনিট পনের বাদে নদীর ধারে একটি বাড়ির সামনে গিয়ে বোট লাগল। লোকটা আমাকে ইঙ্গিত করল নামতে। ডাঙা থেকে বাঁশের পুল তৈরি করা আছে। কোনোরকমে তার ওপর উঠে ডাঙায় গেলাম। কেউ নেই কোথাও!

তারপরেই বারান্দায় দেখা দিল যে মহিলা সেই সম্ভবত সুন্দরী। কারণ তার চোখমুখে বেশ উদ্ধত ভাব, হাঁটাচলাতেও।

আমি হাত জোড় করে বললাম, 'নমস্কার। আমাকে সদানন্দ মণ্ডল এখানে আসতে বললেন। আপনি কি সুন্দরী ?'

'কেন ? আমাকে মেয়েছেলে বলে মনে হয় না ?'

'সেকি ? কেন মনে হবে না ?'

'তাই নাকি ? তাহলে যে শুনলাম আমি হিজড়ে, ছেলেরা গাধা তাই তাকায়।'

'এসব বানিয়ে বলা হয়েছে। আমি কাউকে হিজড়ে বলিনি।'

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সুন্দরী, 'অ্যাই! চোপ! জিভ টেনে উপড়ে দেব!'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম। মেয়েটি অন্তত বছর কুড়ি ছোট আমার থেকে। কিন্তু কী অবলীলায় আমাকে ধমকালো! আমি দেখলাম ভয় পেলে চলবে না। বেশ রুষ্ট গলায় বললাম, 'প্রমাণ করতে পারো আমি তোমাকে হিজড়ে বলেছি ?'

'কোনো প্রমাণের দরকার নেই। আমার লোক মিথ্যে বলে না।'

'হয়তো। এক্ষেত্রে কিন্তু সে মিথ্যে বলেছে।'

'সদানন্দদা বলছিল, বই লেখা হয় ?'

'হ্যাঁ।'

'সব আজেবাজে গল্প, যা জীবনে ঘটে না তাই নিয়ে সিনেমা করা হয় ?'

'না। সিনেমা করার জন্যে লিখি না আমি।'

'তাহলে কেন লেখা হয় ?'

একজন লেখকের কাছে এই প্রশ্ন চিরকালের। কেন লিখি ? ভাল লাগে বলে, সমাজ সংস্কার করব বলে না টাকা রোজগারের বাসনায় ?

বললাম, 'আর কিছু করার ক্ষমতা নেই তাই লিখি।'

চোখ বড় হয়ে গেল সুন্দরীর, 'আমার সম্পর্কে গালি দেওয়া হচ্ছিল কেন ?'

'দেখতে ইচ্ছে করছিল।'

'দেখতে ইচ্ছে করলে গালি দিতে হবে কেন ?'

'যদি কানে যায় তাহলে দেখা পেতে পারি, তাই।'

'বাঃ, বুদ্ধি আছে। দেখতে ইচ্ছে করছিল কেন ? খুব গল্প শোনা হয়েছে ? ভাল ফিগার,

রসে টৈটুম্বুর দেখ, তাই ?' চোখের কোণে তাকাল সুন্দরী।

'এসব খবর যাদের রাখার তারা রাখুক, আমার মনে হয়েছিল আর পাঁচটা মেয়ে যা পা৫ না তা যে পারছে সে আলাদা। তাই—।'

'মন ভেজানো হচ্ছে ?'

'একদম না। ওটা থাকলে তো ভিজবে।'

কথাটা শুনে হাততালি দিয়ে উঠল সুন্দরী। তারপর বলল, 'আসা হোক।'

এখন সে আমাকে তুমি বা আপনি বলে সম্বোধন করছে না। ওকে অনুসরণ করে দেখলা একটা বড় ঘরে বসে কয়েকজন মহিলা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। ওকে দেখে তাদে একজন বলল, 'সামনের মাসে আঠারোটা মেয়ের বিয়ে আছে। তার মধ্যে এগারোটা পাত্র দু'নম্বরী। টাকার ধান্দায় বিয়ে করছে।'

'বিয়ে ভেঙে দিতে বল।'

'এর আগের বার যাদের বিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, তাদের একজন মেয়ে আত্মহত করেছিল। তার চেয়ে ছেলেগুলোকে চাপ দিলে হয় না ?'

'অসম্ভব। ওরা ঠিক বুঝে যাবে সুন্দরী দয়া ভিক্ষে চাইছে। যেসব মেয়ে বিয়ে ভেঙে গে৫ গ্রামে থাকতে লজ্জা পাবে সে চলে আসুক এখানে।'

'ঠিক আছে।'

'শোন। ভয় দেখিয়ে দু'দিন কাজ হয়। সারাজীবন মাথা নামিয়ে কেউ থাকবে না। এ এগারোজনের মধ্যে সবচেয়ে খচ্চর কে ?'

'পটলখালির কানু রায়ের ছেলে উত্তম রায়।'

'কি করেছে সে ?'

'প্রায়ই কাকদ্বীপে যায়। ডায়মন্ডহারবারে। ওখানে ওর মেয়েমানুষ আছে।'

'সেই মেয়েমানুষটাকে ধরে নিয়ে এসো। তারপর উত্তম রায়ের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ও বাপকে বল বিয়ে দিতে। কাকে দেবে কাজটা ?'

'হাকিমকে দেবে ?'

'না। অজু মুখুজ্যেকে দাও। বামুনের ছেলে তো।' ঘুরে দাঁড়াল সুন্দরী, 'এই করতে দি যায়। আঠারোটা বলির পাঁঠা রেডি আছে আঠারো সংসারে। সামনের মাসে পুরুষের লালসা কাছে বলি হবে তাদের। লিখে তাদের রক্ষা করতে পারা যাবে ?'

'একদিনে সম্ভব নয়।'

'কতদিনে সম্ভব ? লেখালেখি তো সেই মহাভারতের যুগ থেকে চলছে তবু মেয়েমানুষে আঁচল ধরে টানা, তাকে ন্যাংটো করা আজও বন্ধ হলো না কেন ?'

'কিন্তু বাকি সাতজনের কথাও ভাবা উচিত।'

'কোন সাতজন ? যারা এখনও ভালভাবে বিয়ে করতে চায় ? তা বিয়ের পর মধু খাও৷ শেষ হলে এদের কজন ভাল থাকবে ?'

'তাহলে একটা কথা বলি। যাদের দিয়ে কাজ করানো হয় তারাও তো পুরুষ। ওই যেম

মুখুজ্যে !'

'জেলখানার কাজ কারা করে ? কয়েদীরা। তাই না ? তাছাড়া মুখুজ্যের কথা আলাদা। ও আমাকে ভোগ করতে চেয়েছিল বলে ওর অঙ্গচ্ছেদ করে দিয়েছিলাম। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে পায়ে পড়ল, কাছাকাছি থেকে যা বলব তাই করতে চায়। তাই থাকতে দিয়েছি। খুব কাজের লোক।'

'সুন্দরীর সন্তানবাসনা নেই ?' স্পষ্ট জানতে চাইলাম।

'পাগল ! এতগুলোকে নিয়ে হিমশিম খাচ্ছি। আমি ছেড়ে দিতে পারি এক শর্তে। সদানন্দদা বলেছিল মেয়েরা নাকি খুব বই পড়ে। তা সেইসব বইয়ে যদি লেখা হয় যে মেয়ে চোখের জল ফেলবে, সে মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু, তাহলে আমি ছেড়ে দিতে পারি। ব্যস !'

আমি অবাক। এরকম ডাকাত মেয়ে এখন পশ্চিমবাংলার ঘরে ঘরে বড় হচ্ছে। সুন্দরবনের সুন্দরী তাদের খবর এখনও জানে না।

॥ ২৫ ॥

মানুষের জীবনসীমা কচ্ছপের নয়। কচ্ছপ দীর্ঘ দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে। কিন্তু বেচারা তার শরীর নিয়ে বেশিদূর যেতে পারে না বলে তার চারপাশে যা ঘটে তাই দেখে যায়। একই জায়গায় আর কত ঘটনা ঘটতে পারে ! মানুষের গড়পড়তা আয়ু যদি সত্তর হয় তাহলে তার দেখা পৃথিবী ষাট বছরের বেশি হতে পারে না। ষাট বছরে সে আর কত দেখতে পারে ? যেসব পাখি পৃথিবীর এপার থেকে ওপারে উড়ে যায় তারাও কি খুব বেশি দ্যাখে ? আকাশ থেকে মাটির কতটা দেখা যায় আর যেটুকু যায় সেটুকু কতটা সত্যি ? এই যখন অবস্থা তখন একজন লেখকের অবলম্বন হলো দেখার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে গল্প তৈরি করা। নইলে তার ভাঁড়ার ফুরিয়ে যেতে বাধ্য। আমার এক বয়স্ক বন্ধু বলেছিলেন, 'তোমার বউদির সঙ্গে পঞ্চাশ বছর ঘর করছি। এখনও তাঁকে দেখে শেষ করতে পারলাম না। আহা, কি বৈচিত্র্য, ব্যবহারে কি ভেরিয়েশন, থই পাচ্ছি না হে।' এ যেন, কার্তিক উড়ল পৃথিবীর চারপাশে আর মায়ের চারপাশে পাক দিয়ে গণেশ পৃথিবী দেখল।

এইটুকু পড়ে পাঠক যদি মনে করেন আমার অবস্থাও তাই, মেয়েদের দেখে দেখে আমি পৃথিবী দেখার সাধ মেটাচ্ছি তাহলে ভুল করবেন। বুদ্ধিমান মাত্রই জানেন, মেয়েদের দেখা যায় না, শোনা যায়। প্রকৃতির নিয়মই হলো স্ত্রী-প্রাণীর চেয়ে পুরুষ-প্রাণী বেশি সুন্দর। অতএব সৌন্দর্য দেখার জন্যে মেয়েদের লক্ষ্যবস্তু করার কোনো যুক্তি নেই। পুরুষদের ভাল লাগে বলেই

মেয়েরা সুন্দরী। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ, চুনী উঠল রাঙা হয়ে— ।' কিন্তু মেয়েদের কথা শুনতে আমার আপত্তি নেই। এ জন্মে কত মেয়ের কথা শুধু চুপচাপ শুনে এলাম। এই শুনতে শুনতেই তাঁদের আবিষ্কার করার নেশা আমার। মুশকিল হলো, কিছুক্ষণ কথা বলার পর, অথবা কিছুদিন কথা বলার পর দেখেছি মেয়েদের বাক্যস্রোত কিরকম মিলেমিশে যায়। 'মেয়েরা যেমন হয়' লেখা শুরু করার পর পাঠক জানতে চেয়েছেন আজ পর্যন্ত কত মেয়েকে আমি দেখেছি যে এত বড় একটা রায় দেবার সাহস দেখাচ্ছি। এর উত্তরে আমি খুব বিনীত হয়ে জানাচ্ছি, গোড়ায় যা বলেছি, এক জীবনে খুব কম সময় পাওয়া যায় দেখার। আমি জন্মাবার আগে যেসব নারীচরিত্রের বর্ণনা বিভিন্ন বইতে করা হয়েছে সেগুলো পড়ে একটু আন্দাজ করেছি। যাঁদের কথা বইয়ে বিশেষ নেই তাঁদের গল্প শুনে কল্পনা করেছি, কিন্তু একবারও বলিনি মেয়েরা এমন হয়। এটা বলার ধৃষ্টতা আমার নেই।

জুলাই মাসে আমেরিকায় গিয়েছিলাম। ফিলাডেলফিয়া শহরে এবার প্রবাসী বাঙালিরা বঙ্গ সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। তাঁদের আমন্ত্রণে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল সেখানে। বিরাট হিলটন হোটেলে নানান অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ হাজার বাঙালি বিভিন্ন শহর থেকে এসে যোগ দিয়েছিলেন। প্রায় দুর্গাপুজোর আমেজ। তিনদিনের অনুষ্ঠান শেষ হলে আমি ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু সলিল আর দিলীপের সঙ্গে নিউ ইয়র্ক চলে এলাম। শহরের বাইরে সলিলের সুন্দর বাড়ি। ওর স্ত্রী শিপ্রার আতিথেয়তা তুলনাহীন। কিন্তু ওদের বাড়ি থেকে শহরে যাওয়ার কেনো বাস-ট্রেন নেই। যার যার গাড়ি একমাত্র ভরসা। দু'জনেই সকালে কাজে বেরিয়ে যেত। দিলীপ দুপুরে আমাকে তুলে নিয়ে শহরের কোনো পছন্দসই জায়গায় আমাকে ছেড়ে দিত। আবার সন্ধ্যায় ফিরিয়ে আনত।

এবার যে জায়গাটায় রোজ যেতাম তার নাম জ্যাকসন হাইট। এখানে বাংলাদেশের মানুষ সংখ্যায় বেশি। আছে স্প্যানিশ, ব্ল্যাক, গুজরাটি এবং কিছু সাদা আমেরিকান। আর এখানকার রাস্তাঘাটে মানুষ দেখা যায়। আমেরিকায় যা বিরল দৃশ্য।

দিলীপ আমাকে মুক্তধারা নামে একটি বাংলা বইয়ের দোকানের সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। ওই দোকানটি বিশ্বজিৎ সাহা নামের এক যুবকের। ওর ওখানে বসে বাংলা বইয়ের বিক্রি দেখতে খুব ভালো লাগত আমার। সেদিন মনে হলো একটু হেঁটে বেড়াই। হাঁটতে হাঁটতে স্প্যানিশ পাড়ায় চলে এসেছি। এখানকার স্প্যানিশরা একটু উদ্ধত প্রকৃতির। মেয়েদের ভাবভঙ্গিতে সেটা বেশি স্পষ্ট। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছি। এইসময় একটি মধ্যবয়সিনীকে দেখলাম এগিয়ে আসতে। গায়ের রঙ শ্যামলা। পরনে খাটো স্কার্ট, গেঞ্জি, হাই হিল, মাথার চুল লাল। চোখে রোদচশমা। এরকম চরিত্র এখানে প্রচুর। আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মহিলা দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার লাইটারটা একটু পেতে পারি?'

আমার সঙ্গে লাইটার ছিল না। কলকাতা থেকে নিয়ে যাওয়া দেশলাইয়ের বাক্স তখন চলছে। সেটা দেব কিনা যখন ভাবছি তখনই বিস্মিত কণ্ঠে বাংলা শব্দ শুনলাম, 'আরে সমরেশদা, আপনি এখানে?'

এবার আমি হতভম্ব। ভালো করে রোদচশমার বাইরে মুখের অংশে নজর বুলিয়েও
ানো পরিচিতির হদিস পেলাম না।

'আমাকে চিনতে পারছেন না! উঃ, কতদিন আপনার কথা ভেবেছি! আমি অঞ্জলি,
দবপুরের অঞ্জলি দত্ত। মনে পড়ছে না?'

সঙ্গে সঙ্গে মাথার ভেতর স্মৃতিরা হুড়মুড়িয়ে বলতে লাগল, আগে আমাকে দ্যাখ! অঞ্জলি?
কাণ্ড! বললাম, 'একি বেশ তোমার?'

'কেন? খুব খারাপ লাগছে দেখতে?' হাসল অঞ্জলি, 'যে দেশে যেরকম।'

'তা কেন? এখানে তো প্রচুর মেয়ে শাড়ি পরে ঘুরছে।'

'আমি তো তাদের সঙ্গে থাকি না। আপনি কেমন আছেন সমরেশদা?'

'ভালো।'

'আমার আজ খুব তাড়া আছে। বিকেলে কি করছেন আপনি?'

'বিকেলে সম্ভব নয়। আমাকে ফিরে যেতে হবে।'

'তাহলে আগামীকাল দুপুরে? সম্ভব হবে? কোথায় আসবেন?'

তুমি নিশ্চয়ই কোথাও থাকো!'

'থাকি।' একটু ভাবল সে। তারপর ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে আমায় দিয়ে বলল,
খান থেকে খুব কাছেই। বাঁ দিকে খানিকটা এগোলেই একটা বিগম্যাকের দোকান পাবেন।
র পাশের গলি দিয়ে ঢুকে তিন নম্বর বাড়ির তিনতলায়। আসবেন?'

'দ্যাখো, আমি যাঁদের কাছে আছি তাঁরা যদি গাড়ির লিফট দেন তাহলে নিশ্চয়ই তোমার
ঙ্গ দেখা করব। তুমি বরং আমার টেলিফোন নাম্বার রেখে দাও।' কাগজে লিখে রাখা বিরাট
লিফোন নাম্বার দিতেই অঞ্জলি তার কাজে চলে গেল।

অঞ্জলি চলে গেলেও আমি কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সেই অঞ্জলি যাকে আমি
তকাল ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে রাখার মতো তেমন কোনো জোরালো ঘটনা কি ঘটেছিল?

বছর দশেক আগের কথা। একটি মেয়ে টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করল আমি তাকে সময়
তে পারব কিনা, সে একটা মেয়েদের কাগজের তরফে সাক্ষাৎকার নিতে চায়। আমি তাকে
ময় দিলাম।

মেয়েটি এল। গায়ের রঙ শ্যামলা হলেও মুখচোখে শ্রী আছে। হালকা নীল রঙের তাঁতের
ড়ি পরে এল সে। কথা বলে বুঝলাম ভালো পড়াশুনা আছে। সাক্ষাৎকার নিতে এসেছে
থচ কিছুই জানে না আমর সম্পর্কে। এমন অনেক সাংবাদিকের মতো এ নয়। কালবেলার
ধবীলতার চেয়ে সাতকাহনের দীপাবলীকে এর বেশি ভাল লাগে। গর্ভধারিণীর জয়িতা বড্ড
শি সময়ের বাইরে। এই সব অভিমত দিয়েছিল। অনেকক্ষণ যে কথা বলেছি তা সে টেপ
রে নিয়ে চলে গেল।

তার দিন সাতেক বাদে সে এল লেখা নিয়ে। আমার সম্পর্কে প্রশংসা যেমন ছিল,
ালোচনাও কম ছিল না। মেয়েটিকে তাই আমার পছন্দ হলো। এবার খবর নিয়ে জানলাম
থাকে যাদবপুরে। পড়েছে ওখান থেকেই। নামী মেয়েদের কাগজে ফ্রিল্যান্স করে, চাকরি

পাওয়ার আশ্বাস এখনও পায়নি। সংসারে তেমন অভাব নেই কারণ ওর বাবা চাকরি করে
কিন্তু তিনি রিটায়ার করলেই বিপদ হবে। তার আগে ওর একটা চাকরি চাই। তখন সম্পর্ক সহ
অঞ্জলিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিয়ে করছ না কেন ?'

সে বলল, 'দূর, আমাকে কে বিয়ে করবে !'

এরপর তার লেখা কাগজে ছাপা হলো। আমার কাছে তার আসার দরকার নেই। আসে
না। হঠাৎ কয়েক মাস বাদে সম্পাদিকার সঙ্গে দেখা হতেই অঞ্জলির কথা মনে এল। আমি তাঁ
অঞ্জলির জন্যে কিছু করতে অনুরোধ করলাম। সম্পাদিকা প্রথমে মনে করতে পারছিলেন ন
তাঁর এক সহকারিণী মনে করিয়ে দিতেই তিনি বললেন, 'ওকে আপনি জানেন ? ও হ
আপনাকে ইন্টারভিউ করেছিল। যোগাযোগ আছে ?'

আমি না বলায় তিনি বললেন, 'মেয়েটি লেখালেখি ছেড়ে এখন সংসার করছে

শুনে খুশি হলাম। অঞ্জলি বিয়ে করেছে। এবং তারপর ভুলে গেলাম।

বছর তিনেক বাদে একদিন অঞ্জলি আমার কাছে এল। সেই একই পোশাক, রে
হয়েছে। বিবাহিতা মহিলার কোনো চিহ্ন ওর শরীরে নেই। হেসে বলল, 'আপনি হয়তো জা
না, আমার বিয়ে হয়েছিল।'

'হয়েছিল ?'

'বাবা দিয়েছিলেন। আমি মেনে নিতে পারিনি বলে কাউকে জানাইনি। কিন্তু ভা
ভদ্রলোক ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় মারা যাবেন। যাওয়ার আগে তিনি অবশ্য একটি কন্যাস
দিয়ে গিয়েছেন আমাকে।' অঞ্জলি মুখ নামাল।

'সেকি !'

'জানি না, হয়তো আমি তাঁকে মেনে নিতে পারিনি বলেই— !'

'তা কি হয় !'

'এখন আমার চাকরি দরকার। আমি জানি আমার কোনো টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকে
নেই। ভালো চাকরি আমি পেতে পারি না। কিন্তু, কিন্তু আমি মডেলিং করতে পারি। কি প
না ?'

'মডেলিং ?'

'কেন ? আমার চেহারা কি খুব খারাপ হয়ে গেছে ?'

'তা নয়। কারও সঙ্গে কি যোগাযোগ হয়েছে ?'

'না। আমি কাউকে চিনি না।'

'তাহলে ?'

'আপনার পরিচিত কেউ নেই ?'

সেসময় আমার মনে পড়েছিল মেহতাজীর কথা। উনি বিজ্ঞাপনের ছবি করেন। তাঁর ক
পাঠিয়ে দিলাম অঞ্জলিকে। মেহতাজী টেলিফোনে জানালেন মেয়েটিকে ঘষে-মেজে নি
ভালো কাজ দেবে। . .

এর পরে একটা বিস্কুটের বিজ্ঞাপনে অঞ্জলিকে দেখেছিলাম। তারপর ও এল সঙ্গে

ভদ্রলোককে নিয়ে। ভদ্রলোক বাঙালি, আমেরিকায় থাকেন। তিনি অঞ্জলিকে বিয়ে করে ওদেশে নিয়ে যেতে চান। সকন্যা। বিজ্ঞাপনের কাজ করতে করতে এঁর সঙ্গে অঞ্জলির আলাপ হয়েছে। অঞ্জলি বলেছিল, 'আপনার আশীর্বাদ চাই।'

বলেছিলাম, 'নিশ্চয়ই। প্রার্থনা করছি ভালো থেকো।'

তারপর আর দেখা হয়নি। এরকম অনেকেই তো আসে, তাই আলাদা করে মনে রাখার প্রয়োজন হয়নি। তারা আসে হঠাৎই, চলেও যায় তেমনি। আজ এতদিন পরে নিউ ইয়র্কের রাস্তায় অঞ্জলিকে দেখে আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। কোথায় তাঁতের শাড়ি আর কোথায় এই স্বল্প পোশাক!

পরদিন দিলীপের কাজ পড়ে গেল। আমি সলিলের শরণাপন্ন হলাম। সে আমাকে জ্যাকসন হাইটে নামিয়ে দিয়ে গেল। তখন সকাল দশটা। এর বেশি দেরি সলিলের পক্ষে করা সম্ভব নয়। আমার কিসের তাড়া, কেন এলাম সেকথা ওদের বলিনি। ও চলে গেলে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। বাংলাদেশের মাছের দোকান, মিষ্টির দোকানের সামনে দিয়ে হেঁটে স্প্যানিশ পাড়ায় চলে এলাম। একটু সময় লাগল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিন নম্বর বাড়ির তিনতলায় পৌঁছে গেলাম।

দরজা খুলল অঞ্জলি। আজ ওর পরনে শাড়ি। মাথার চুল ছেলেদের মতো কাটা বলে শাড়ির সঙ্গে ভালো লাগছিল না। গতকাল নিশ্চয়ই ও উইগ ব্যবহার করেছিল। হেসে বলল, 'আসুন। আমি দেড়খানা ঘর নিয়ে থাকি।'

ছিমছাম ছোট্ট ঘর। দেওয়ালে অঞ্জলির নানান ভঙ্গির বড় বড় ছবি। তার মধ্যে কয়েকটা ছবিতে যৌবন এমন প্রকটভাবে দেখানো যে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। অথচ এই ধরনের ছবি এখানকার ম্যাগাজিনে আকছার দেখা যায়।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'মেয়ে কোথায়?'

'স্কুলে। হোস্টেলে থাকে। শনিবার সকালে গিয়ে নিয়ে আসি, আবার রবিবার বিকেলে ফিরিয়ে দিই। জানেন, ও পড়াশুনায় খুব ভালো হয়েছে।' অঞ্জলি খুশিমুখে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাত খেয়ে আসেননি তো?'

হেসে বললাম, 'আমেরিকায় বাঙালি চাকরিজীবীরা কাজের দিনের দুপুরে ভাত খায় না। আমিও তাই অনুসরণ করছি। তবে ব্রেকফাস্ট এত খেয়েছি যে আর খাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না।'

'ওকথা শুনছি না। আপনি আসবেন বলে আমি রান্না করেছি। ইলিশ মাছের ঝাল, ভাজা, তেল আর ভাত। খেতে হবেই।' আবদার করল অঞ্জলি।

'ঠিক আছে। তোমার কথা বল।'

'আমার? আমি ভালো আছি।'

'কি রকম?'

'দেখছেন তো, এই ফ্ল্যাটে একাই থাকি। মাসে পাঁচশো ডলার ভাড়া দিই।'

'আর?'

হাসল অঞ্জলি, 'মডেলিং করছি। মাসে একটা কাজ পেলে চমৎকার চলে যায়।'

'পাও ?'

'হ্যাঁ। আপনাদের আশীর্বাদে আমার এই রঙ কাজে লাগছে এখানে। এরা সাদা বা কালোর বদলে শ্যামলা বেশি পছন্দ করে। তারপর আমার মুখে নাকি লাবণ্য-টাবণ্য আছে।' জোরে হাসল সে।

'তোমার বিবাহিত জীবন ?'

'সবার কপালে সব সয় না। তবে এই লোকটির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ও এখানে নিয়ে এসেছে, ওর জন্যে আমি এখানকার সিটিজেনশিপ পেয়েছি। এসব নাহলে আজ আমি মাসে চার হাজার ডলার রোজগার করতে পারতাম না। চার হাজার ডলার মানে প্রায় দেড় লাখ টাকা। কলকাতায় এটা ভাবতেও পারতাম না।'

'তিনি কোথায় ?'

'সহ্য করেছিলাম। ওর সব ভালো কিন্তু বিছানায় মারাত্মক রকমের হিংস্র। পৃথিবীর সমস্ত অশ্লীল শব্দ সেসময় না বললে সুখ হয় না ওর। শুধু বলা এক ব্যাপার ছিল, ও আমাকে বাধ্য করত সেসব বলতে। রাজী না হলে যন্ত্রণা দিত। শরীরে দাগ করে দিয়েছিল। অথচ অন্য সময় বেশ স্বাভাবিক। একদিন আর পারলাম না। পুলিশে ফোন করলাম। পুলিশ এসে ওকে অ্যারেস্ট করল। কিন্তু ও আমাকে ডিভোর্স দেবে বলে কথা দেওয়ায় আমি মামলা করিনি। সেই থেকে আলাদা।'

'আর বিয়ে করবে না ?'

'এখন অবধি কোনো ইচ্ছে নেই।'

'পুরুষরা জ্বালাতন করে না ?'

'করে না আবার ? কিন্তু তাদের মুখের ওপর বলে দিই আমি মডেল, বেশ্যা নই। আমি ভদ্রভাবে বাঁচতে চাই। মুখের ওপর কথা বলতে সব মেয়ের শেখা উচিত। না বললে ছেলেরা পেয়ে বসে। অথচ যেসব মেয়ে ফোঁস করতে জানে তাদের সঙ্গ ওরা এড়িয়ে যায়।'

'কলকাতার খবর কি ?'

'ভালো আছে সবাই। আমি মাসে পাঁচশো ডলার পাঠাই। আঠারো হাজার টাকায় তো ভালো থাকার কথা।'

'তাহলে তুমি ভালো আছ ?'

অঞ্জলি হঠাৎ অন্যমনস্ক হলো। তারপর বলল, 'সত্যি বলব ? আমি জানি না। কাজ সেরে যখন এই ফ্ল্যাটে আসি তখন খুব একা লাগে। দমবন্ধ হয়ে আসে। তখন মনে পড়ে গড়িয়াহাট রাসবিহারী এভিন্যুর কথা। জ্যাকসন হাইট থেকে বাংলা গল্পের বই কিনে এনে নিজেকে ভোলবার চেষ্টা করি। কিন্তু— !'

আমার কিছু বলার ছিল না। অঞ্জলি জোর করে আমাকে খাওয়ালো। খুব ভালো রান্না। বারংবার বলল শনিবার আসতে। মেয়ের সঙ্গে দেখা হবে তাহলে।

বেরুবার সময় জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজ তুমি একটাও সিগারেট খেলে না ? সেদিন তো আমাকে অপরিচিত ভেবে লাইটার চেয়েছিলে !'

সে লজ্জা পেল, 'সঙ্কোচ হলো।'

'কেন ?'

মুখ তুলল অঞ্জলি, 'আপনি যতই লিখুন মেয়েরা যে পাত্রে থাকে, জলের মতো সেই পাত্রের চেহারা নেয়, আমি কিন্তু তা মানি না। মেয়েরা যাকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে শুধু তার কাছেই মাথা নিচু করে থাকতে চায়। বুঝলেন মশাই!'

॥ ২৬ ॥

আজকাল প্রায়ই বিভিন্ন রকমের সভা-সমিতিতে যাওয়ার আমন্ত্রণ পাই। বেশির ভাগ অনুষ্ঠান আমি সভয়ে এড়িয়ে চলি। সেই একই মাল্যদান, সাজানো কথার ফুলঝুরি। আমার পূর্বসূরী লেখকদের কেউ কেউ এসব খুব ভালবাসতেন। কেউ না ডাকলে মন খারাপ হয়ে যেত তাঁদের। আমার উল্টোটা হয়।

তবে প্রতিবন্ধী অথবা সমাজসেবীদের অনুষ্ঠানে আমি যেতে আপত্তি করি না। নিজে কিছু করতে পারি না কিন্তু কেউ ভালো কাজ করলে পাশে দাঁড়াতে অসুবিধে কোথায় ? মানুষ হিসেবে এটুকু না করলে কি জবাব দেব ?

আজ বিকেলে বেহালায় গিয়েছিলাম। সমাজে যারা পতিতা তাদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করছে ক্যালকাটা সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ইউনিট। এটি একেবারেই দাতব্য প্রতিষ্ঠান। ডায়মণ্ডহারবার রোডের পাশে বিশাল জমি এঁরা যোগাড় করতে পেরেছেন। সেখানে প্রায় আশিজন মধ্যবয়সিনী থেকে বৃদ্ধা মহিলা বাস করেন। বিভিন্ন রকমের হাতের কাজ থেকে আরম্ভ করে কম্প্যুটারে ডাটা এন্ট্রি পর্যন্ত এঁদের দিয়ে করানো হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে আগামী বছরের মধ্যে এঁরা স্বাবলম্বী হয়ে যাবেন। আমাকে যে ভদ্রলোক নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি বিয়ে-থা করেননি। সত্তরের ওপর বয়স। বললেন, আপনারা গেলে মেয়েরা উৎসাহ পাবে। আজ আমাদের বার্ষিক অনুষ্ঠান। একটু সময় যদি দেন তাহলে ভালো হয়।

আমি জেনে গেলাম এরা যে সবাই রেডলাইট এরিয়ার বাসিন্দা ছিল তা নয়। রেডলাইট এরিয়ায় যারা একবার নাম লেখায় তারা দালাল, গুণ্ডা এবং মাসির হাত এড়িয়ে শরীর ছিবড়ে হবার আগে বেরিয়ে আসতে সচরাচর পারে না। তবু যারা মরীয়া, ওই ক্লেদাক্ত জীবন সহ্য করতে পারছে না, তাদের কেউ কেউ খোঁজখবর পেয়ে আশ্রয় নিয়েছে ওখানে। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে কাজ খুঁজতে আসা সরল মেয়েদের ধরে দালালরা বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করেছিল এবং পুলিশ তাদের উদ্ধার করে লিলুয়ার আশ্রমে পাঠিয়েছিল, এমন কেউ কেউ এখানে শেষ পর্যন্ত

আশ্রয় পেয়েছে। এছাড়া প্রতিটি মফস্বল শহরের থানার সঙ্গে এদের যোগাযোগ রয়েছে। সেখানে পতিতাবৃত্তির দায়ে পুলিশ যাদের ধরে, তাদের বেশির ভাগেরই শাস্তি হয় না, হলেও নামমাত্র। ছাড়া পেয়ে তারা আরও অন্ধকারে তলিয়ে যায়। এদের কাছে সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ইউনিটের ঠিকানায় পৌঁছে দিতে পুলিশকে অনুরোধ করা হয়েছে। সামান্য সরকারি অনুদান আর ব্যক্তিগত দানের উপর নির্ভর করে কাজ করা হয়। বাসিন্দাদের মধ্যে কেউ কেউ কলেজে-পড়া ভালো ছাত্রী যেমন রয়েছে তেমনি অক্ষরজ্ঞানহীনের সংখ্যাও কম নয়।

গেট পেরিয়ে বাগানওয়ালা একতলা বাড়ির একটি ঘরে আমাকে বসানো হলো। ভদ্রলোক বললেন পেছনের মাঠে স্টেজ বেঁধে অনুষ্ঠান হবে। গান-বাজনার পর নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'। এই সব মেয়েরাই করবে।

এইসময় ঘরে ঢুকলেন যিনি তিনি যে এককালে সুন্দরী ছিলেন তা এক নজরেই বোঝা যায়। লালপাড় সাদা শাড়ি পরা মহিলা দু'হাত জোড় করে আমাকে বললেন, 'আপনি এসেছেন খুব ভালো লাগছে।'

ভদ্রলোক আলাপ করিয়ে দিলেন, 'শিপ্রাদি, শিপ্রা সেন। আমাদের ইউনিটের সেক্রেটারি এ সবকিছুর পেছনে ওঁর অবদান অনেকখানি।'

মাথা নুয়ে গেল শিপ্রাদেবীর। বললেন, 'ছি ছি একি কথা! আপনারা সবাই যদি পাশে না থাকতেন তাহলে! তাছাড়া এখনও কিছুই করা হয়নি।'

জিজ্ঞাসা করলাম,'আপনি কি এখানেই থাকেন?'

'না। আমার স্বামী খুব অসুস্থ। তাছাড়া দুটি ছেলেমেয়েকে দেখাশোনা করতে হয়। আমি সকালে আসি বিকেলে ফিরে যাই।'

শুনলাম আজ শ্যামা হচ্ছে!'

ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, শিপ্রাদি ওদের শিখিয়েছেন।'

'আমি নিজে জানি কি ছাই যে শেখাবো!' শিপ্রা বললেন।

ভদ্রলোককে কেউ ডাকতে তিনি উঠে গেলেন। শিপ্রার দিকে তাকিয়ে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল ওঁকে কোথাও দেখেছি। এখন ওঁর বয়স চল্লিশ ঘেঁষা। শরীরে মেদ নেই। কিন্তু স্মৃতি ঝাপসা।

শিপ্রা বললেন, 'আপনার সাতকাহন আমার খুব প্রিয় উপন্যাস।'

'ধন্যবাদ।'

'নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন?'

'না, তা ঠিক নয়।'

'বাঃ, দীপাবলী ইনকামট্যাক্সে কাজ করত। ওখানকার সব কাহিনী তো আপনার নিজের চোখে দ্যাখা। তাই না?' শিপ্রা প্রশ্ন করতেই একজন বলল, 'দিদি, চা-জলখাবার এখনই আনব?'

শিপ্রা উত্তর দেবার আগেই আমি তীব্র আপত্তি করলাম, 'না না। ওসব কিছু আনতে হবে না। নেহাৎই যদি চান তাহলে এক কাপ চা খাওয়ান। তাতেই চলবে।'

শিপ্রা আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে চলে গেলেন। এখন আমাকে অটোগ্রাফ দিতে হবে। চার-পাঁচটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল খাতা নিয়ে। তাদের বয়স তিরিশের কাছেই।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমরা আমার কোনো বই পড়েছ?'

একজন বলল, 'হ্যাঁ, প্রথম পড়ি তিন নম্বরের সুধারানী।'

আমি চমকে উঠলাম। ওই বইয়ের নায়িকা সুধারানী সোনাগাছিতে থাকত। প্রায় অশিক্ষিতা মেয়েটি শরীরের ব্যবসা করলেও একটু আলাদা হয়ে থাকত। সেই মেয়েকে প্যারিসে যেতে হয়েছিল ভারতবর্ষের বারবনিতাদের প্রতিনিধি হয়ে একটি সম্মেলনে। এই মেয়েটি সেই বই পড়েছে।

'কি করে পড়লে?'

'তখন তো আমি ওখানে থাকতাম। একজন প্রায়ই আসত আমার কাছে। সে এনে দিয়েছিল। আমি কলেজে পার্ট ওয়ান দিয়েছিলাম। শরৎচন্দ্রের সব বই পড়েছি, এটা ও জানত।'

'পড়ে কি মনে হয়েছিল?'

'কান্না পেয়েছিল। তখনই ঠিক করলাম যে করেই হোক লাইন ছেড়ে দেব।'

'কেন কান্না পেয়েছিল?'

'সুধারানী বিদেশে গিয়েও নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। সব ফুরিয়ে যখন আবার সোনাগাছিতে ফিরে এল তখন তার দিন শেষ। কেউ জায়গা দিল না। যে মেয়ে একবার মাথা নোয়ায় তাকে সমাজ কখনও মাথা উঁচু করতে দেয় না। এই শিক্ষাটা পেলাম।'

'কথাটা কি সত্যি? এই যে তোমরা এখন মাথা উঁচু করে আছ, এটা কি মিথ্যে? বল?'

'সেটা তো দিদির জন্যে।'

দিদি মানে যে শিপ্রা তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

একটু বাদেই আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো মঞ্চে। মাঠের মধ্যে স্টেজ বাঁধা হয়েছে। কয়েকজন সাংবাদিক ছাড়া বেশির ভাগই এখানকার বাসিন্দা। শিপ্রা প্রথমে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখলেন। শুনতে শুনতে স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে এল। আমি তখন আয়কর দপ্তরে চাকরি করি। মিডলটন রো ব্রাঞ্চে আছি। এক ভদ্রলোক, নাম এখন মনে নেই, ঠিক সময়ে রিটার্ন জমা দেননি। নোটিশ পাঠানোর পর আমাকে বললেন ম্যানেজ করতে। আমি রাজী না হওয়ায় কয়েকদিন বাদে এসে বললেন, 'আপনি ভুল করে নোটিশ পাঠিয়েছেন। আমি রিটার্ন ঠিক সময়ে জমা দিয়েছি। ফাইল খুলে দেখুন।' আমি ফাইল খুলে দেখলাম সেখানে তাঁর রিটার্ন রয়েছে। অথচ দু'দিন আগেও ওটা ওখানে ছিল না। বুঝলাম ভদ্রলোক ডিপার্টমেন্টের ক্লাস ফোর স্টাফকে টাকা দিয়ে হাত করেছেন। ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার টু পাইস হতো, রাজী হলেন না, আমার আরও কম খরচে কাজ হয়ে গেল।'

রিটার্নটি ঠিক সময়ে জমা পড়েছে। অন্তত আমাদের দপ্তরের স্ট্যাম্পের তারিখ তাই বলছে। কিন্তু ওঁর ওই আয়ের হিসেব যে বানানো তা বুঝতে পারছিলাম। অথচ ভদ্রলোক মিথ্যাকে সত্যি প্রমাণ করতে লড়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎই আমি আবিষ্কার করলাম ওই প্রিন্টেড রিটার্ন ফর্মটি যে তারিখে ছাপা হয়েছে তার এক বছর আগে আমাদের অফিসের স্ট্যাম্প পড়েছে

জমা দেওয়া হয়েছে বলে। প্রতিটি রিটার্নের শেষে প্রিন্টিং ডেট ছাপা থাকে। এটা যে চিটিং কেস তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যে পিওনটি এই কর্মে ওঁকে সাহায্য করেছে সে প্রিন্টিং ডেট দেখেনি। ওঁকে কারণ ব্যাখ্যা করতে চিঠি দেওয়া হলো। এবার ভদ্রলোক এলেন না। আমায় অফিসার ডেকে পাঠাতে ঘরে গিয়ে দেখলাম সেখানে অসামান্যা এক সুন্দরী বসে আছেন। তাঁর খাটো জামা, শঙ্খের মতো সাদা হাত আজও মনে আছে। অফিসার বলেছিলেন, 'এই ব্যাপারটা কমিশনার সাহেব নিজে দেখতে চান। এঁরা মার্সি পিটিশন করেছেন। ফাইলটা আমাকে দিয়ে যান।' সেই ফাইল যখন ফিরে এলো তখন দেখলাম কমিশনার ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। যতই স্মৃতি ঝাপসা হোক, আজ মনে হচ্ছিল সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে শিপ্রার কোথাও মিল আছে। এখন ওঁর ব্লাউজ কনুই পর্যন্ত নামানো, বেশবাসে বিন্দুমাত্র ঔদ্ধত্য নেই। উল্টে অপূর্ব এক স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে আছে তাঁর চারপাশে। কিন্তু আমি যদি তাঁকে ঠিকঠাক মনে করতে পারি তাহলে ওঁর তো আজকের ভূমিকায় আসার কথা নয়। একটা দুনম্বরী ফেরেব্বাজ লোকের হয়ে যিনি এসেছিলেন বেশ কয়েকবছর আগে, তাঁর মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হয়েছিলেন আমার ওপরওয়ালা। অবশ্য তাঁকে দেখেছিলাম দু-তিন মিনিটের বেশি নয়। অতএব এত বছর বাদে স্মৃতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করছে না তা কে বলবে!

অনুষ্ঠান শুরু হলো। যেসব মহিলা গান গাইলেন তাঁদের কারও কারও বয়স পঞ্চাশে পৌঁছেছে। এঁরা এককালে যৌনকর্মী ছিলেন কিন্তু এখন গলা যেমনই হোক পূর্ণ আবেগে গাইলেন 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'। এরপরে ঘোষণা করা হলো গত এক বছরে হাতে কাজ বিক্রি করে এই ইউনিটের যে সব সদস্যা অর্থ উপার্জনে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। সেই পুরস্কার আমার হাতে দিয়ে দেওয়ানো হলো। যে মেয়েটি শাড়ির বুকে নকশা এঁকে বেশি রোজগার করেছে তার বয়স বড়জোর বাইশ। ঝকঝকে মুখ পুরস্কার দেবার পর তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এসব তুমি শিখলে কোথায়?'

মেয়েটি সলজ্জ হাসল, 'দিদি শিখিয়েছেন।'

'আচ্ছা!'

'হ্যাঁ। দিদি না থাকলে আমি কবে মরে যেতাম।'

'কিন্তু এখন তো তুমি মাথা উঁচু করে পুরস্কার নিচ্ছ।'

মেয়েটি একগাল হাসি নিয়ে চলে গেল। পাশে বসা ভদ্রলোক ফিসফিসিয়ে বললেন, 'বেচারা যার প্রেমে পড়ে মফস্বল থেকে এসেছিল, সে হাওড়ার হোটেলে উঠে দালালকে বিক্রি করে চলে যায়। মেয়েটি যখন তা টের পেল তখন আর পালাবার পথ নেই। ওকে যখন দালাল রেডলাইট এলাকায় নিয়ে যাচ্ছে তখন গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে হাওড়া ব্রিজে নেমে দৌড়াতে থাকে। পাবলিক তাকে উদ্ধার করে থানায় জমা দেয়। দোষীদের পুলিশ খুঁজে পায় না। কিন্তু ওর ভাগ্য ভালো বলে ও এখানে আসতে পারে। এখন তো ও আমাদের অ্যাসেট।' আমি তাকালাম। মেয়েটি মিশে গেছে দর্শকদের মধ্যে।

এরপরে শ্যামা নৃত্যনাট্য। না, পেশাদার সংস্থার প্রযোজনার সঙ্গে কোনো তুলনা চলে কিন্তু যেটুকু করছে তা আন্তরিকতার সঙ্গে করছে।

ফিরে আসার সময় শিপ্রা জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন লাগল ?'

'খুব ভালো। যদি আমাকে কোনো কাজে লাগে তাহলে জানাবেন।'

'সত্যি ?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমরা এখানে একটা লাইব্রেরি করতে চাই।'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু সেই লাইব্রেরিতে প্রথম অক্ষর শেখা মেয়েদের জন্যেও বই থাকবে।'

'বুঝতে পেরেছি। আপনি একদিন যোগাযোগ করবেন, আমি প্রকাশকদের সঙ্গে কথা বলে রাখব।'

দিন সাতেকের মধ্যে শিপ্রা সেন টেলিফোন করে সময় চাইলেন। আমি সানন্দে তাঁকে আসতে বললাম। তিনি এলেন। লাইব্রেরি নিয়ে অনেক কথা হলো। যাওয়ার আগে আমি তাঁকে প্রকাশকদের ঠিকানা দিলাম। তাঁদের কাছ থেকে বই ওঁদের সংগ্রহ করতে হবে। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি ইনকামট্যাক্সে কাজ করতাম একথা আপনি জানলেন কি করে ?'

'আপনার লেখার যারা ভক্ত তারা সব খবর রাখে।' শিপ্রা হাসলেন।

'আমার একটা অস্বস্তি হচ্ছে!'

'কি রকম ?'

'সেদিন আপনার কথা শোনার পর থেকেই এটা হচ্ছে। আপনি কি কখনও ইনকামট্যাক্সের মিডলটন রো অফিসে গিয়েছেন ? এই ধরুন, বছর পনের আগে ?'

কয়েক মুহূর্ত স্থির চোখে তাকালেন মহিলা। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন বলুন তো ? হঠাৎ ?'

'আমার স্মৃতিশক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। আর তা করলে আমি খুব খুশি হব। বছর পনের আগে এক ভদ্রলোকের আয়কর সংক্রান্ত মামলায় এক ভদ্রমহিলা আমার ওপরওয়ালার কাছে গিয়েছিলেন। কয়েক মিনিট তাঁকে দেখেছিলাম। মনে রাখার কথা নয়, রাখিওনি। আজ অস্পষ্ট হলেও মনে হচ্ছে তাঁর সঙ্গে আপনার মিল আছে।'

শিপ্রা সেন হাসলেন, 'পনের বছর আগে আমার শরীরের বয়স পনের বছর কম ছিল। এতদিনে তার অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। কয়েক মিনিটের দেখা স্মৃতি কি করে এতদিন পরে মিলে যাবে ?'

হাসলাম, 'সেটাই স্বাভাবিক। আচ্ছা।'

শিপ্রা সেন চলে গেলেন। প্রকাশকরা ওঁদের বই দিয়ে দিয়েছেন। আমি নিজে উদ্যোগী হয়ে একটি পত্রিকায় সেদিনের অনুষ্ঠানের কথা লিখেছি। মনে হয়েছে, এইসব কাজের কথা সাধারণ মানুষের জানা দরকার। লেখায় অবশ্যম্ভাবী হিসেবে শিপ্রা সেনের নামও এসেছিল।

লেখাটা বেরুবার পরে শিপ্রা আমাকে ফোন করলেন, 'লেখার জন্যে অনেক ধন্যবাদ। মেয়েরা খুব উজ্জীবিত। কিন্তু আপনি আমার নাম লিখলেন কেন ?'

'আমি তো অন্যায় কিছু করিনি।'

'আপনার দিক থেকে নয়। কিন্তু আমি আড়ালে থাকতে চাই।'

'কেন ?'

'প্রচার চাই না বলে।'

'আপনি প্রচারিত হলে আপনার সংস্থারই উপকার হবে।'

'জানি না, কিন্তু আমার ভয় করে।'

'কিসের ভয় ?'

'কিছু না। আচ্ছা !'

টেলিফোন রেখে দিলেও আমার মনে হলো শিপ্রা কিছু বলতে চেয়েও পারলেন না। এর মাস দেড়েক পরে একদিন বেহালায় যেতে হয়েছিল। ফেরার পথে ওঁর সঙ্গে দেখা। সেদিন রবিবার। আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হলেন। তারপর ভদ্রতা করে বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেন।

আমি প্রথমে আপত্তি করেছিলাম। কিন্তু মনে কৌতূহল থাকায় শেষ পর্যন্ত রাজী হলাম। বাড়িটি কাছেই। কাজের মেয়ে দরজা খুলে দিতেই শিপ্রা ডাকলেন, 'সোনা, মণি, কুইক, এসে দেখে যাও কে এসেছেন।'

দুজন কিশোর-কিশোরী উজ্জ্বল মুখে এসে প্রণাম করল। ছেলেটির নাম মণি, মেয়েটির সোনা। তারা দুজনেই আমার অর্জুনের গল্প পড়েছে। শিপ্রা চা খাওয়ালেন। তারপর বললেন, 'চলুন, ওদের বাবার সঙ্গে দেখা করবেন। ওঁর পক্ষে বিছানা থেকে নামা সম্ভব নয়।'

গেলাম। শীর্ণ চেহারার এক প্রৌঢ় বিছানায় শুয়েছিলেন। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে ওঠার চেষ্টা করতেই শিপ্রা বললেন, ' না না, উঠতে হবে না।'

আমার পরিচয় জানার পর ভদ্রলোক বললেন, 'আমি তো পড়তে পারি না। চোখে খুব কম দেখি। এভাবে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। শিপ্রা আমাকে জোর করে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমি চলে গেলে ওর খুব উপকার হতো।'

শিপ্রা বললেন, 'বাঃ, খুব ভালো কথা।'

ঘরের দেওয়ালে একজন মহিলার ছবি টাঙানো ছিল। সুন্দর ছবি। ভদ্রলোক বললেন, 'আমার স্ত্রী। যাওয়ার আগে ওই শিপ্রাকে বন্দী করে রেখে গেছে। বুঝলেন।'

শিপ্রা বললেন, 'ওসব কথা থাক।'

আমরা যখন বাইরের ঘরে এলাম তখন শিপ্রা যেন অন্য মানুষ। বসতে বললেন আমাকে। তারপর আচমকা বললেন, 'আমি তো লিখতে পারি না, দেখুন তো, এই ঘটনা আপনার কাছে গল্প হয়ে ওঠে কিনা !'

আমি শিপ্রা সেনের মুখের দিকে তাকালাম। আমার প্রথমে একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। দীর্ঘকাল লেখালেখি করছি, অনেক মানুষের সংস্পর্শে এসেছি। আর কে না জানে প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব গল্প থাকে। নিজের গল্পকে তিনি খুব মূল্যবান মনে করেন। ভাবেন, তাঁর মতো অভিজ্ঞতা আর কারও হয়নি । ফলে সেই গল্প শোনাতে পারলে তিনি খুশি হন। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। প্রথম প্রথম কেউ তাঁর গল্প শোনালে মন দিয়ে শুনতাম। কিন্তু দেখা গেল, দু-এক লাইনের পর ব্যক্তিগত দুঃখ ছাড়া কাহিনীর কোনো চমক বা আকর্ষণ নেই। তিনটে

কাহিনী তিনজনের মুখে শুনলে দুটোর মধ্যে বেশি মিল পাওয়া যাচ্ছে। আর সেসব গল্প লিখলে পাঠকরা আমার লেখা পড়া ছেড়ে দেবেন অথচ সেসব গল্প শোনার সময় খুব গম্ভীর হয়ে থাকতে হয় যাতে বক্তা আহত না হন। ক্রমশ কেউ গল্প শোনাতে চাইলে আমি ভয় পেতাম। বেশ কিছুটা সময় অমন অভিনয় করতে ইচ্ছে করত না। এর বেশির ভাগ কাহিনীই পারিবারিক । স্বামী কি পরিমাণ অত্যাচার করেছেন অথবা শাশুড়ি কতটা যন্ত্রণা দিয়েছেন এবং স্বামী মুখ বুঁজে ছিলেন কিংবা ছেলেমেয়েদের দুর্ব্যবহারের বিবরণ। কেউ কেউ আফশোস করেছেন পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবনের আগে যে তরুণ প্রেম নিবেদন করেছিল তা প্রত্যাখ্যান না করলে আজ জীবন অন্যরকম হতো। এখন কেউ গল্প শোনাতে চাইলে আমি সবিনয়ে এড়িয়ে যেতে চাই। এঁদের কি করে বোঝাই, এই ধরনের গল্প বহু বহুবার লেখা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু শিপ্রা সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো আমি অন্য কিছু শুনতে পারব। তাছাড়া ওঁর অতীত সম্পর্কে আমি বেশ কৌতূহলী হয়েছিলাম। পনের বছরে একজন অসাধারণ সুন্দরী তাঁর সমস্ত সৌন্দর্য খরচ করে পনের বছর পরও যে কিছুটা অবশিষ্ট রাখতে পারেন তা শিপ্রা সেনকে দেখে বোঝা যায়। অত কথায় কাজ কি ! আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম, তা প্রায় বত্রিশ বছর আগের কথা, তখন পাশের প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছিল যে মেয়েটি সে সদ্য একটি ছবিতে অভিনয় করেছিল। আমরা দল বেঁধে যেতাম তাকে দেখতে। তারপর সে খুব নামী মানুষ হলো, নামী এবং গুণী। অথচ এখন তাকে দেখতে চল্লিশ ছুঁই ছুঁই সুন্দরী, শরীরে বিন্দুমাত্র মেদ নেই, চামড়া টান টান, বার্ধক্য বহুৎ দূরে লেজ গুটিয়ে বসে আছে। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। অথচ আমাদের শরীর ভারী হয়েছে, পেটে চর্বি জমেছে। তখনকার দু'-তিন বছরের পার্থক্য এখন প্রায় কুড়ি বছরের করে ফেলেছেন এই অসামান্যা অভিনেত্রী। এই শিপ্রা সেনের চেহারার সঙ্গে তাঁর বেশ মিল রয়েছে।

'আমি থাকতাম কানপুরে। আমরা প্রবাসী বাঙালি। আমার বাবা ছিলেন সাহেব মানুষ। ইংরেজিটা শেখাবার চেষ্টা করতেন, সেইসঙ্গে আদব-কায়দা। আমার মা ছিলেন নিখাদ বাঙালি। তাই দুটো ভাষাই মন দিয়ে শিখতে হয়েছিল। যখন ইংরেজি নিয়ে বি. এ. পাশ করলাম তখন বিয়ের সম্বন্ধ এল। বাবার ইচ্ছে ছিল না তেমন কিন্তু মা সুযোগ ছাড়তে চাইলেন না। পাত্র কলকাতার ব্যবসায়ী। বড় রকমের এক্সপোর্টার। অল্প বয়সে খুব সাফল্য পেয়েছে। আসলে পশ্চিমবাংলার সঙ্গে যোগাযোগ হোক এটাই মা তখন চাইছিলেন। বিয়ে হলো। ফুলশয্যার রাত্রে আমার স্বামী বলেছিলেন, তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি।

একটু যত্ন নিলে দেখবে শরীরে পালিশ আসবে। হিরে যত দামীই হোক ঠিকঠাক না কাটতে পারলে আলো ঠিকরোয় না।

প্রথম রাত্রে ওইসব কথা আমার ভাল লাগেনি। নিজের সৌন্দর্য নিয়ে আমি কখনই মাথা ঘামাইনি। শরীর বড় কথা নয়, ঈশ্বর যাকে যেমন দেন তাই মানতে হয়, এতে মানুষের কোনো নিজস্ব কৃতিত্ব নেই, মনই সব। মন যদি শিক্ষিত না হয় তাহলে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না।

প্রথম প্রথম ভালই ছিলাম। আমার স্বামী আমাকে হেলথ ক্লাবে ভর্তি করে দিলেন।

সেখানে শিখলাম কিভাবে ফিগার ঠিক রাখতে হয়। পার্লারে গিয়ে জেনে নিলাম সৌন্দর্যে চাকচিক্য কি করলে বাড়ে। তিনি থাকেন তাঁর ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের একটা ছেলে হলো। বাঙালি.মেয়েদের সন্তান হলেই শরীর অযত্নে বদলে যায়। তিনি সেটা হতে দিলেন না। মাঝে মাঝে মনে হতো আমি টবের ফুলগাছ। তিনি জল আর সার দেন।

বাচ্চা হওয়ার পর আমার স্বামীর আচরণ অদ্ভুতভাবে বদলে গেল। নার্সিংহোম থেকে ফিরে এসে যে-কদিন শরীর ঠিক হয়নি সে-কদিন আমি বাচ্চা আর আয়াকে নিয়ে আমার ঘরে শুতাম। তিনি পাশের ঘরে। তারপর যখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলাম তখনও ব্যবস্থাটা পাল্টালো না। কারণ জিজ্ঞাসা করলেই বলতেন, ব্যবসার খুব ঝামেলা হচ্ছে, মন-মেজাজ খারাপ, এসময় যেন বিরক্ত না করি। ক্রমশ আমার জগৎ হয়ে গেল আলাদা। বাঙালি মায়েরা এরকম অবস্থায় ছেলেকে আঁকড়ে ধরে। তাকে নিয়েই জীবন কাটাতে চায়। আমার কিন্তু সেরকম অনুভূতি হলো না। ছেলের দিকে তাকালে মনে হতো, এও তো একদিন বড় হবে, বাপের রক্ত শরীরে আছে, বড় হলেই আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু কিভাবে সময় কাটাই ? সেই সময় আলাপ হলো এক মহিলার সঙ্গে। ওঁর একটি নাচের স্কুল আছে। প্রচুর ছাত্রী। প্রায়ই প্রোগ্রাম হয়। আমি নাচ শিখতে শুরু করলাম। বেশি বয়সে গেলাম বলে আগ্রহ বেড়ে গেল।

বেশ চলছিল। তবে মাঝে মাঝেই বুঝতে পারছিলাম আমার স্বামীর ব্যবসা আগের মতো নেই। অনেক খরচ কমাতে হচ্ছে। এমন কি আমার হেলথ ক্লাবের টাকাও বাকি পড়ল। এসবের জন্যে আমি কখনই ওঁর কাছে টাকা চাইতাম না। উনিই দিতেন।

এক সকালে তিনি প্রথম প্রস্তাবটা দিলেন, 'শোন, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমার ব্যবসা ঠিক চলছে না। একজন জার্মান ভদ্রলোক গ্র্যান্ড হোটেলে উঠেছেন। ওর হাতে একটা বড় এক্সপোর্টের অর্ডার আছে। লোকটাকে কিছুতেই রাজী করাতে পারছি না। আজ দুপুরে লাঞ্চ খাওয়াবো ওকে। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। একটু ভালো করে সেজো।'

আমি অবাক, 'তোমার ব্যবসার ব্যাপারে আমি যাব কেন ?'

তিনি শক্ত চোখে তাকালেন, 'আমার টাকায় তোমার শখ, খাওয়া-দাওয়া মেটে, তাই ! বিপদের দিনে স্বামীর পাশে দাঁড়ানো উচিত, তাই না ?'

অতএব যেতে হলো। তিন-চারটে শাড়ির মধ্যে স্বামী আমাকে বেছে দিলেন কোনট পরব। স্লিভলেস জামার রঙটাও তাঁরই পছন্দের। ওই হোটেলেই লাঞ্চ খেলাম আমরা। জার্মান ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের ওপরে। বেশ মোটাসোটা, টাক আছে। আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন এর আগে মহিলা দ্যাখেননি। স্বামীকে দেখতে পেলাম গদগদ হয়ে কথা বলতে। চাকরবাকরেরা মন পেতে ওই কথায় কথা বলে। জার্মান সাহেব ভাঙাভাঙা ইংরেজিতে কেবলই বলছিলেন, 'তোমার ওয়াইফ খুব গম্ভীর,তাই না ?' স্বামী মাথা নাড়ছিলেন, 'না-না। ও একটু লজ্জা পাচ্ছে।' বলেই আমার পায়ে লাথি মারলেন। রেস্টুরেন্টে টেবিলের তলায় আমার পায়ে আঘাত লাগলেও জার্মান সাহেব সেটা টের পেলেন না। আমি দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করলাম।

লাঞ্চের পর আমরা জার্মান সাহেবের ঘরে গেলাম। দু'চারটে কথার পর হঠাৎই আমার

স্বামীর জরুরি একটা দরকারের কথা মনে পড়ল। আমায় বললেন, 'তুমি আধঘণ্টাটাক এখানে অপেক্ষা কর, আমি ঘুরে আসছি।'

আমি আপত্তি করলাম, 'খামোকা অপেক্ষা করব কেন ? আমি বাড়িতে চলে যাচ্ছি।' আমি উঠে দাঁড়ালাম।

স্বামী খুব বিরক্ত হলেন, 'বুঝতে পারছ না কেন, তোমার সঙ্গে দু'দণ্ড গল্প করলে সাহেব খুশি হবে। গল্পই তো, আচ্ছা, আসি।'

যেন সবই আগে থেকে ছকে রাখা ছিল। কিন্তু স্বামী বেরিয়ে যাওয়া মাত্র জার্মান সাহেব খুব হাসতে লাগল। আমি ভয় পাইনি কিন্তু খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। সাহেব বলল, 'লোকটা আমাকে খুব বোকা ভাবে বুঝলে ! এর আগে আমার পার্টনার এসেছিল, তাকেও ওই বলে ঠকিয়েছে।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'উনি আপনাকে ঠকাবেন কেন ?'

সাহেব চোখ পাকাল, 'একটা কলগার্লকে নিজের বউ বলে চালানো ঠকানো নয় ? কত টাকা দিয়েছে ও তোমাকে ?'

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। সাহেব কড়া কড়া কথা বলে যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে হলো কলগার্লে সাহেবের রুচি নেই। তাই দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করতে চোখ বন্ধ করে বললাম, 'এক হাজার টাকা।'

লোকটা বলল, 'মাই গড ! নাউ গেট আউট! চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও। আমাকে বলেছিল রিয়েল ইণ্ডিয়ান হাউস ওয়াইফ এনে দেবে।'

পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলাম। খুব ঘেন্না লাগলেও মনে হচ্ছিল বেঁচে গেছি। পৃথিবীর সমস্ত কলগার্লদের ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করছিল।

সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে স্বামী তাঁর বীরত্ব দেখালেন। আমার সর্বাঙ্গে কালশিটে ফেলে দিয়েও তাঁর যেন শান্তি হচ্ছিল না। আমি কাঁদছি না দেখে তাঁর জেদ আরও বেড়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি হাল ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ঠিক আছে, যা বলে এসেছিলি তাই হবে। তোকে কলগার্ল বানিয়ে বাজারে ছাড়ব। এই অর্ডারটা যখন তোর জন্যে পেলাম না তখন— !'

সেই সময় আমার স্বামী আয়কর দপ্তরের ঝামেলায় পড়েছিলেন। কোনোভাবে কাজ উদ্ধার না করতে পেরে শেষ পর্যন্ত আমাকে পাঠিয়েছিলেন সেখানে। সাতখুন মাপ হয়ে গিয়েছিল।

সেই সময় পর্যন্ত আমি যেতে বাধ্য হয়েছি, সঙ্গ দিয়েছি। ওঁর পরিত্রাতাদের কিন্তু কারও শয্যাসঙ্গিনী হইনি। কিন্তু জলে নামলে কতদিন বেণী না ভিজিয়ে থাকা যায় ? পায়ের তলার পাক ঠিক টেনে নামাবে নিচে। এই যে নিজের সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই এ আর সহ্য করতে পারছিলাম না। বাপের বাড়িতে চলে গিয়েও নিস্তার নেই। তিনি হাজির হতেন। যেভাবে রাখাল হারানো গরুকে খোঁয়াড়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসে সেইভাবে তিনি আমাকে নিয়ে আসতেন।

একদিন বললেন আমাকে দিন তিনেকের জন্যে দার্জিলিং যেতে হবে। এক পাঞ্জাবী প্রৌঢ়কে আনন্দিত করে ফিরতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করলাম মরে গেলেও এই কর্ম করব না। কলকাতায় থেকে এতদিন যেটা এড়াতে পেরেছি, তিনদিন হোটেলের এক ঘরে থাকলে সেটা

সম্ভব নয়। কিন্তু বাঁচব কিভাবে ? পুলিশকে জানিয়ে যে লাভ নেই একথা এতদিনে বুঝে গিয়েছি। পুলিশ হানা দিয়ে কলগার্লদের ধরে নিয়ে আসে কিন্তু যে কারণে মেয়েরা ওই জীবিকা নিতে বাধ্য হয় সেই কারণটাকে পাল্টাতে পারে না। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে একটা কাণ্ড করে ফেললাম। কিছুদিন আগে একজন মহিলা বিচারপতির নাম কাগজে পড়েছিলাম। টেলিফোন গাইড থেকে তাঁর নাম্বার বের করে ডায়াল করলাম। কপাল ভাল ছিল বলে তিনিই ফোন ধরলেন। যে পরিচয়টুকু আছে তা দিয়ে অনুরোধ করলাম দেখা করার সময় দিতে। তিনি তাঁর বাড়িতে যেতে বললেন। গেলাম। আমার চলাফেরার ওপর স্বামীর খুব একটা বিধিনিষেধ ছিল না। হয়তো উনি জানতেন আমার দৌড় বেশি নয়। যেখানেই যাই, না ফিরলে তিনি ঠিক ফিরিয়ে আনতে পারবেন। অতিরিক্ত আস্থাবান হয়ে পড়লে মানুষ এমনই ভাবে।

মহিলা বিচারপতি তাঁর বসার ঘরে বসে আমার সব কথা শুনলেন। শোনার পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কথা আমি বিশ্বাস করব কেন ? এসবের স্বপক্ষে কি প্রমাণ আছে ?'

বললাম, 'আমার শরীরে এখনও দাগ আছে।'

তিনি বললেন, 'কিন্তু সেগুলো যে আপনার স্বামীর দান তার কি কোনো প্রমাণ আছে ?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'না।'

'আপনার ছেলের বয়স কত ?'

'দুই।'

'অর্থাৎ সেও সাক্ষী দিতে পারবে না।'

'কিন্তু উনি আমাকে দার্জিলিং-এ পাঠাচ্ছেন। যে ট্রাভেল এজেন্সি থেকে টিকিট এসেছে তাদের তিনি চেকে পেমেন্ট করেছেন। সম্ভবত হোটেল বুকিংও ওঁর টাকায়। বিশ্বাস করুন আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আপনি যদি আমাকে সাহায্য না করেন তাহলে দুটো রাস্তা খোলা আমার সামনে। হয় সত্যি ওই জীবনে জড়িয়ে যাওয়া নয় আত্মহত্যা করা।' আমি কেঁদে ফেলেছিলাম।

সেইদিনই ট্রাভেল এজেন্সির অফিস থেকে পুলিশ সমস্ত কাগজপত্র উদ্ধার করল। সেই পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীর টিকিটের দামও আমার স্বামী চেকে মিটিয়েছেন। দার্জিলিং-এর হোটেলে ঘর বুক করা হয়েছে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস সিং নামে। তার দামও আমার স্বামী চেকে মিটিয়েছেন।

মহিলা বিচারপতি আমাকে একটি ওল্ড এজ হোমে পাঠিয়ে দিলেন। আমার বিবাহবিচ্ছেদের মামলা শুরু হওয়া মাত্র আদালত আদেশ জারি করল যেন আমার স্বামী কোনোভাবে আমাকে বিরক্ত না করে।

শেষ পর্যন্ত আমি ডিভোর্স পেয়ে গেলাম।

শিপ্রা সেন হেসে বললেন, 'আপনি বলতে পারেন এই গল্পে নতুনত্ব নেই। অনেক মেয়ের জীবনে এমন ঘটনা ঘটেছে। আমার ছেলের বয়স এখন সতের। তার বাবার নিষেধ আছে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যাপারে। এখন ওদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। নিজে থেকে ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ভয় পাই। ওর বাবা রাগলে চণ্ডাল হয়ে যাবে। আমি চলে এসেছি বলে ওঁর যে ক্ষতি হয়েছে তা কোনোদিন ভুলতে পারবেন না।'

এবার আমার প্রশ্নের পালা, 'এই গল্পের সঙ্গে এই সংসারের কি সম্পর্ক ?'

'সে-ও এক গল্প। এইসোস্যাল ওয়েলফেয়ার ইউনিটের কাজ শুরু হওয়ার পর একটি মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। একদিন তাকে দেখতে গিয়ে আমার এক বাল্যবন্ধুর দেখা পাই। বেচারার তখন ক্যানসারের শেষ পর্যায়। আমাকে দেখে সে খুব খুশি হয়। হাত জড়িয়ে ধরে কাঁদে। আমি এখনও কী সুন্দর আছি আর তার শরীর মিশে গেছে বিছানায়। একটা কাজের লোকের সঙ্গে ওর দুটো বাচ্চা যেত মাকে দেখতে। ওদের বাবার কথা জিজ্ঞাসা করায় বান্ধবী বলল ভদ্রলোক শয্যাশায়ী। ও মরে গেলে এদের কি অবস্থা হবে ভেবে সে আরও কষ্ট পাচ্ছে। কি রকম একটা টান হয়ে গেল। আমাদের ইউনিটের মেয়েটি সুস্থ হয়ে ফিরে গেলেও আমি হাসপাতালে যাওয়া ছাড়লাম না। একদিন সে হঠাৎ আমার হাতে বাচ্চা দুটোর হাত দিয়ে বলল, 'তোমাকে কথা দিতে হবে, যখন আমি থাকব না তখন তুমি এদের দায়িত্ব নেবে। ভগবানের নিশ্চয়ই এই ইচ্ছে নইলে এতদিন বাদে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হলো কেন ? কথা দাও।'

বললাম, 'কি করে কথা দেব ! ডিভোর্সের পর আমারই চালচুলোর ঠিক নেই। সারাদিন কাজ নিয়ে থাকি।'

'তা থাকো না। কিন্তু সকালে আর রাত্রে ওদের কাছে গিয়ে থেকো।'

'কি করে সম্ভব ?'

'আমার স্বামীকে তুমি বিয়ে কর। একমাত্র তোমার হাতে সব ছেড়ে দিলে আমার একটুও কষ্ট হবে না।' সে হাসল।

'পাগল ? আবার বিয়ে ?' আমি আঁতকে উঠলাম।

'তুমি বুঝতে পারছ না। ওঁকে বিয়ে করলে ওই বাড়িতে থাকার ব্যাপারটা সহজ হবে। তোমার অধিকার জন্মাবে। আমি বললে উনি আপত্তি করবেন না। প্লিজ !'

'অসম্ভব। আর কোনো পুরুষকে আমি—।'

'বুঝতে পেরেছি। তা তো তোমাকে করতে হবে না। ও বিছানা থেকে নামতে পারে না। কোমরের নিচটা অসাড় হয়ে গিয়েছে। শুধু কথা বলতে পারে। একটা মানুষ যদি তোমার সঙ্গে কথা বলে তাহলে কি তাকে তুমি সহ্য করতে পারবে না ?'

মৃত্যুর আগে বান্ধবীকে তার বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এখন এই যে আমাকে দেখছেন, এ ওর শেষ ইচ্ছের প্রতি সম্মান জানানো। এখন ওই মণি আর সোনার টানে আটকে গিয়েছি আমি।সত্যি কথা বলছি, ওদের বাবাকে আমার বন্ধু বলেই মনে হয়।'

শিপ্রা সেন হাসলেন, 'গল্পটা কেমন লাগল ?'

উত্তর যা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা আপনার ছেলে যদি এখানে এসে মণি আর সোনার সঙ্গে থাকত তাহলে কেমন লাগত ?'

শিপ্রা সেনের চোখ স্থির হলো। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন মহিলা। তারপর নিচু গলায় বললেন, 'ভয় করে।'

'ভয় ?'

'বাবার রক্ত ওর শরীরে। এতকাল তারই কাছে মানুষ। তাই বাবার মতো হওয়া অস্বাভাবিক নয়; তা হলে এদের বিষিয়ে দেবে ও এসে এখানে থাকলে। তাই না?'

শিপ্রা সেন এখনও কলকাতায় আছেন। ওঁর সঙ্গে অনেককাল আমার দেখা হয় না। কিন্তু ভাবলেই মনে হয় একটি মানুষ পৃথিবীর সব বিষ শরীরে ধারণ করে অনেক অনেক মানুষকে অক্ষত রাখতে চাইছেন। আর এটা শিপ্রা সেনরাই পারেন।

॥ ২৭ ॥

আমার বন্ধু নিখিলের কাণ্ড নিয়ে অনেকদিন আগে একটি গল্প লিখেছিলাম। তবে গল্পের মূলসূত্র ছিল নিখিলের কাণ্ড, বাকিটা আমার কল্পনা। নিখিল রাগ করেনি। চিঠি লিখে জানিয়েছিল, 'আনন্দবাজারে তোমার গল্প পড়িলাম। ভাল লাগিয়াছে।' ব্যস, এইটুকু।

নিখিলের সঙ্গে আমার অনেককাল দেখা হয়নি। আমরা দুজনেই চা-বাগানে জন্মেছি, একই পাঠশালায় গিয়েছি, স্কুল আলাদা হলেও গরম এবং শীতে আমাদের দেখা হতো। বন্ধুত্বও গভীর হতো। নিখিল ছটফটে ছিল না, বয়সের তুলনায় বেশি গম্ভীর ছিল। এম. এ. পড়ার সময় আবার আমরা একসঙ্গে হলাম। এবং এইসময় ও হঠাৎ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসে এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে বড় চাকরি পেয়ে যায়। নিখিল সবসময় নিজের মধ্যে ডুবে থাকত। ওর বাড়ির সবাই অনেক চেষ্টা করেও ওকে বিয়ে দিতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দনা নামের একটি মেয়ে আমাদের সঙ্গে আড্ডা মারত। আড্ডা মানে, আমি আর বন্দনাই কথা বলতাম, নিখিল চুপ করেই থাকত। মাঝে মাঝে মনে হতো বন্দনার ব্যাপারে ও একটু দুর্বল। কিন্তু সেটা কখনও প্রকাশ করেনি ও। এম. এ. পরীক্ষার আগেই বন্দনার বিয়ে হয়ে গেল। ওর বাড়ি থেকেই ব্যবস্থা হয়েছিল। বিয়েতে আমি গিয়েছিলাম, নিখিল যায়নি।

অনেক লড়াই করে যখন কলকাতায় টিকে থাকার চেষ্টা করছি তখন নিখিল আসামের এক জঙ্গলে চাকরি করছে। চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল, গেলাম ওর কাছে। কাজের লোক নিয়ে জঙ্গলের পাশে কাঠের বাংলোয় ও দিব্যি আছে। বাংলোয় একটি ছোট্ট প্রাণী দেখলাম। নিখিল তাকে কুকুরের মতো আচরণ করতে শেখাচ্ছেন। নিখিল জানাল ওটি নেকড়ের বাচ্চা। ওর মা জন্ম দিয়েই মরে গেছে। নিখিল জঙ্গল থেকে তুলে এনে বড় করছে। নেকড়ের বাচ্চাকে বাধ্য এবং অনুগত করেছে নিখিল, দেখে ভাল লাগল। নিখিল জানাল বিয়ে-থা করার কোনো বাসনা তার নেই। কারণ আর একটি মানুষেকে সারাজীবন সামলে চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

মাস ছয়েক বাদে নিখিলের চিঠি পেলাম। 'দেশে তোমার গল্প প্রকাশিত হইয়াছে, খুব ভাল

লাগিল। আরও মন দাও। আমার এখানে একটিই খবর, নেকড়ের বাচ্চাটিকে জঙ্গলে ছাড়িয়া দিয়াছি। সে খুব দ্রুত বড় হইয়াছিল এবং আমার আদেশ পালন করিতে দক্ষ ছিল। এক রাত্রে দুটি লোক বাংলোয় ঢুকিয়া আমার ওপর হামলা করে। ইহারা কাঠচোরাইকারী। আমাকে আক্রান্ত দেখিয়া নেকড়ের বাচ্চা তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। তাহার কামড়ে দুজনেই মাটিতে পড়িয়া যায় রক্তাক্ত অবস্থায়। কোনোক্রমে তাহারা পালাইয়া যাইতে সক্ষম হয় কিন্তু তাহদের শরীরের যে রক্ত মাটিতে পড়িয়াছিল তাহা নেকড়ে চাটিয়া খায়। উহাকে ঠাণ্ডা করিতে আমার দুইদিন সময় লাগে। বুঝিলাম একবার রক্তের স্বাদ পাইয়া নেকড়ে জন্মগত চরিত্র ফেরৎ পাইয়াছে। অতএব আত্মরক্ষার তাগিদে তাহাকে বহুদূর জঙ্গলে ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছে।'

নিখিল চিঠি লেখে সাধুভাষায়। কেন লেখে জানি না। যেমন, এখনও পাড়ার ছেলেরা মাইকে যখন ঘোষণা করে তখন অকারণে সাধুভাষায় বর্ষণ শুরু হয়। যাহোক, নিখিলের সঙ্গে এরপরে মাঝে মাঝেই যোগাযোগ হতো। একবার ও কলকাতায় এসে দেখা করল। চেহারা ভারী হয়েছে, চল্লিশেই জুলপি সাদা। খানিকক্ষণ কথা বলার পর বলল, 'আমার হোটেলে একটু যাবে?'

আপত্তি করিনি। পাশাপাশি দুটো ঘর, মাঝখানে দরজা, এমন একটা স্যুট নিয়ে আছে সে। যেতে যেতে বলেছিল, 'বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম। দিল্লি থেকে আগ্রা যাওয়ার পথে পড়ে। বেড়াতে বেড়াতে যমুনার ধারে গিয়ে একজনকে আবিষ্কার করলাম। ওই জায়গায় সংসার ছেড়ে যাওয়া বা ছেড়ে যেতে বাধ্য হওয়া বাঙালি বিধবারা থাকেন। মন্দিরের প্রসাদে বেঁচে আছেন। সেটা যে কী কষ্টের তা না দেখলে বোঝা যাবে না। জলপাইগুড়ির মানুমাসিকে তোমার মনে আছে?'

নিখিলের প্রশ্নে আমি প্রথমে কিছুই মনে করতে পারলাম না। যাওয়া-আসা থাকলেও জলপাইগুড়ি ছেড়েছি প্রায় পচিঁশ বছর। মানুমাসি কে?

নিখিল বলল, 'রঞ্জন বলে একটি ছেলে পড়ত আমাদের সঙ্গে। ভাল হকি খেলত। হাকিমপাড়ায় বাড়ি। ওর মাসিকে আমরাও বলতাম মানুমাসি।'

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল। দারুণ দেখতে ছিলেন মানুমাসি। বন্ধুরা বলত, সুচিত্রা সেনের চেয়েও সুন্দর। মাঝে মাঝে বাড়ির বারান্দায় এসে দাঁড়াতেন। সেই মানুমাসির বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে হয়ে গেল না বলে বলা ভাল বিয়ে করলেন। এটা রঞ্জনের বাড়ির লোক পছন্দ করেনি। বাপ-মা না থাকায় মানুমাসি দিদির বাড়িতে থাকতেন। পড়াশুনাও বেশি ছিল না। ওঁর স্বামী থাকতেন শিলিগুড়িতে। তাঁর বাড়িতেও নাকি ওই বিয়ে মেনে নেয়নি। আমরা তখন খুব ছোট। বিয়ের বছর দুয়েক বাদে মানুমাসির বর অ্যাকসিডেন্টে মারা গেলেন। বিধবা হয়ে শ্বশুরবাড়িতে জায়গা না পেয়ে তিনি ফিরে এলেন দিদির কাছে। কিন্তু বিধবা শালীকে বাড়িতে রাখতে তীব্র আপত্তি ছিল রঞ্জনের বাবার। বিধবা হলেও মানুমাসি তখন আরও সুন্দরী। ওঁর চুল কেটে দেওয়া হলো, ঘরের বাইরে পা দেওয়া নিষিদ্ধ হলো। কারণ ওঁর ওপর নজর দেওয়ার লোকের অভাব ছিল না। এসব কথা আমরা রঞ্জনের কাছে জানতাম। একদিন স্কুলে এসে রঞ্জন অনেকক্ষণ কাঁদল। জানলাম সেদিন ওর মানুমাসিকে নিয়ে ওর বাবা বৃন্দাবনে যাচ্ছেন। সেখানে রাধাকৃষ্ণের পায়ে সমর্পণ করে এলে বাকি জীবন মানুমাসি ভাল থাকবেন। তখনও বাংলা

সাহিত্যের নারী চরিত্ররা সুযোগ পেলেই শাসান কাশীবাসী হয়ে যাবেন বলে। বৃন্দাবনটা তত জনপ্রিয় ছিল না। মনে আছে, কথাটা বাড়ি এসে বলতেই আমার প্রৌঢ়া বাল্যবিধবা পিসিমা খ্যাঁক করে উঠেছিলেন, 'এ কেমন কথা ? বাচ্চা মেয়েটাকে মেরে ফেলছে ওরা ? কেন, আবার বিয়ে দিতে পারত না ?'

এসব কথা হুড়মুড়িয়ে মনে চলে এল। নিখিলকে বললাম, 'এবার মনে পড়েছে। তা হঠাৎ এতকাল বাদে মানুমাসির কথা বললে কেন ?'

নিখিল বলল, 'ওকে নিয়ে এলাম।'

'নিয়ে এলে মানে ?' আমি অবাক।

'বৃন্দাবনে যমুনার ধারে বসে ভিক্ষে করছিলেন। চেহারা দেখে প্রথমে চিনতে পারিনি। মাথাটাও ওঁর ঠিক কাজ করছে না। যখন চিনলাম তখন পরিচয় দিলাম। প্রথমে ধরা দেননি। শেষ পর্যন্ত কাঁদলেন। আমি নিয়ে আসতে চাইলে প্রথমে রাজী হননি। শেষে প্রায় জোর করেই এনেছি।' পরিতৃপ্ত হাসি হাসল নিখিল।

হোটেলে গেলাম। পাশের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। পরিষ্কার বিছানায় নয়, মেঝের ওপর বসে আছেন তিনি। পরনে নতুন কেনা থান। মাথার চুল কদমছাঁটে ছোট। তাতে পাকা চুলের সংখ্যা বেশি। এই মহিলা অতি শীর্ণ, হাড়জিরজিরে। কুঁজো হয়ে বসে আছেন। মানুমাসির যে চেহারা মনে আছে তার সঙ্গে একশ কোটি মাইলের মধ্যে মিল নেই।

মনে পড়ল, সেটা ছাপ্পান্ন সালের কথা। মানুমাসিকে বৃন্দাবনবাসী করা হয়েছিল। অনেক সময় চলে গিয়েছে এর মধ্যে। রঞ্জনের বাবা-মা চলে গিয়েছেন পৃথিবী ছেড়ে। জলপাইগুড়ির বাড়ি বিক্রি করে রঞ্জন কোথায় আছে তা জানি না। কিন্তু সময় যত যায় যাক না, এত পরিবর্তন হবে ? নিখিল ভুল করে অন্য কোনো মহিলাকে নিয়ে আসেনি তো ? ও পরীক্ষা করে নিয়েছে ?

আমি ডাকলাম, 'মানুমাসি ?'

কোনো সাড়া এল না, মুখ ঘোরালেন না মহিলা।

'মানুমাসি আমি রঞ্জনের বন্ধু, একটু তাকান।'

তবু কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। পাশ থেকে নিখিল বলল, 'মাঝে মাঝে সাড়া দিচ্ছেন না। ডাক্তার এনেছিলাম, বললেন, প্রচণ্ড রক্তশূন্যতায় ভুগছেন, ব্রেনও কিছুটা গোলমাল করছে।'

জিজ্ঞাসা করলাম,' কিন্তু তুমি কি করে নিশ্চিন্ত হলে ইনি মানুমাসি ?'

'হয়েছি। মানুমাসির সঙ্গে কার বিয়ে হয়েছিল জানো ?

'না।'

'ভদ্রলোকের নাম ছিল নিখিল।'

'যাঃ।'

'হতেই পারে। এক নাম হাজার লোকের আছে। তুমি পাশে গিয়ে আমার নামটা ওঁর সামনে উচ্চারণ করে দ্যাখো।' নিখিল বলল।

ঘরে ঢুকলাম। ওঁর পাশে মেঝের ওপর বসলাম। ওঁর মনে কোনো ছাপ পড়ল না। নিচু

গলায় বললাম, মানুমাসি, নিখিল এসেছে।'

এবার হঠাৎই মুখ তুললেন আমার দিকে। ঘোলাটে চোখ, বহুকাল অপরিমিত আহারে শীর্ণ মুখ, কিন্তু সেই মুখের আদল, বিশেষ করে চিবুকের গড়ন, অত কুঞ্চিত চামড়ায় ঢেকে থাকা সত্ত্বেও বুঝতে অসুবিধে হলো না, নিখিল ভুল করেনি। এই মহিলাই মানুমাসি। আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, 'আমরা আপনার বোনপো রঞ্জনের বন্ধু। আপনাকে যে বৃন্দাবন থেকে নিয়ে এসেছে তার নাম নিখিল ।'

বৃদ্ধার মুখ আবার আগের মতো হলো।

নিখিলের কাছে ফিরে এসে বললাম, 'মানুমাসিকে নিয়ে এখন কি করবে ?'

নিখিল হাসল, 'তুমি ওঁকে মানুমাসি বলে স্বীকার করছ ?'

বললাম, 'সেইরকম তো মনে হচ্ছে।'

নিখিল বলল, 'আমার মনে হয় ভুল হয়নি। একজন সুন্দরী মহিলা পরিচর্যার অভাবে কী আমূল পরিবর্তিত হয়ে যান, ওঁকে না দেখলে কল্পনা করতে পারতাম না। এই যে নতুন জামাকাপড় পরেছেন তা আমার অনুরোধে নয়। কিনে দেওয়ার পর কয়েকঘণ্টা ছুঁয়েও দ্যাখেননি। নিখিলবাবু আসতে পারেন বলতেই পরে ফেললেন। হ্যাঁ, আমি ওঁকে ফরেস্টে আমার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। তারপর রঞ্জনের খোঁজ করব। সে যদি তার মাসিকে নিয়ে যেতে চায় তো ভাল।'

'যদি না নিতে চায় ? বৃন্দাবনে যাঁকে উৎসর্গ করে এসেছিলো তার বাপ, তাকে যদি ও মেনে না নেয় ?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'আমি একা মানুষ । আর এই ভদ্রমহিলা যখন কথাই বলতে চান না, তখন কোনো সমস্যা হবে না।'

নিখিল চলে গেল মানুমাসিকে নিয়ে তার জঙ্গলের কর্মস্থলে। আমার সঙ্গে আর যোগাযোগ নেই। এই ঘটনা নিয়ে আমি গল্প লিখলাম, 'জননী দেবী'।

নিখিলের চিঠি এল, 'আনন্দবাজারে তোমার গল্প পড়িলাম। ভাল লাগিয়াছে।'

অতএব চিঠি লিখতে হলো। মানুমাসির খবর কি ? রঞ্জনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে কিনা ? সে তার মাসির ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিল ?

নিখিলের চিঠি এল, 'প্রথমেই বলিয়া রাখি, আমাকে দায়ী করিও না। মানুমাসিকে লইয়া এখানে আসার পর ধীরে ধীরে তাঁহার পরিবর্তন হইতে লাগিল। তিনি একটু আধটু কথা বলিতে লাগিলেন,আমার সংসার সম্পর্কে আগ্রহী হইলেন। এখানে ভাল ডাক্তার নাই, কিন্তু তাহার প্রয়োজনও হয় নাই। মানুমাসি কথা বলিতেন কিন্তু তাঁহার অতীত সম্পর্কে কিছু প্রকাশ করিতেন না। এদিকে আমি রঞ্জনের সন্ধানে বহু চেষ্টা করিয়াছি, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও দিয়াছি, কোনো ফল হয় নাই। হঠাৎ একদিন বাংলোয় ফিরিয়া দেখিলাম মানুমাসি নাই। চৌকিদার জানাইল তিনি একটু ঘুরিয়া আসিতেছি বলিয়া বাহির হইয়াছেন। অনেক খোঁজ করিয়াও তাঁহার সন্ধান পাই নাই। মাসখানেক হইল শিলিগুড়ি হইতে জনৈক বাসুদেব সামন্ত আমাকে লিখিয়াছেন, নিতান্ত বাধ্য হয়েই এই চিঠি লিখছি। আপনার ঠিকানা পেয়েছি আমার তথাকথিত জেঠিমার

বাক্স থেকে। আমরা জানতাম জেঠামশাই-এর মৃত্যুর পর তিনি বৃন্দাবনে চলে গিয়েছেন এতবছর বাদে হঠাৎ তিনি এখানে হাজির হয়েছিলেন। তাঁর বিয়েকে এবাড়ির কেউ মে নেয়নি। এখন এসে অনুরোধ করলেন, স্বামীর বাড়িতে শেষ কটা দিন থাকতে চান। আ জানতে পারলাম আপনিই তাঁকে বৃন্দাবন থেকে তুলে এনেছেন এবং এককালে তাঁর বোনপো বন্ধু ছিলেন। আপনাকে প্রশ্ন, আমাদের উপর এই উৎপাত চাপিয়ে আপনার কি লাভ হলো যাহোক, তিনি এখানে আসার দিন চারেকের মধ্যে নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পরলোকগম করেছেন। এই সংবাদ জানানোর জন্যে এই চিঠি।'

এর পর নিখিল লিখেছে, 'বৃন্দাবনের মাটিতে বহুকাল থাকিয়াও যে নারী স্বামীর ভিটা জন্যে টান অনুভব করেন অথবা স্বীকৃতি চান তাঁহাকে আনিয়া আমি ভুল করিয়াছি কিনা জা না তবে এখন সেই নেকড়েশিশুর কথা মনে পড়িতেছে। যতই তাহাকে আরাম দিই না কে রক্ত এবং জঙ্গল তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। নিখিল।'

এরপরে নিখিলের সঙ্গে অনেককাল যোগাযোগ নেই।

লোকে বলে, বিশেষ করে বাড়ির লোকজন, আমার বয়স হচ্ছে। পঞ্চাশে পৌঁছে গেলে নাকি বাঙালির বার্ধক্য আসে। তার পোশাকের রঙ সাদাটে হয়ে যায়, ভাবভঙ্গিতে গাম্ভীর্য আসে মুশকিল হলো, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি না আমি। শরীর এবং মনের কোনো পরিবর্তন টে পাই না। আমার বাবা বা ঠাকুর্দা এই বয়সে যে রকম প্রবীণ-আচরণ করতেন তা করার উৎস পাই না। আবার বাইশ বছরের যুবকের উচ্ছলতাও প্রকাশ করতে পারি না। এখন মানুষের বয় বাড়ছে। আমার মা পঁয়তাল্লিশ বছরে সাদা শাড়ি পরতেন, কুঁচি না দিয়ে। এখন কো মহিলাকে তা ভাবা যায় না। তাহলে ষাটের নিচে আর বয়স বয়স করে কি লাভ ? সমরেশদ সমরেশ বসু, ষাট পেরিয়েও যুবক ছিলেন।

এসব কথা লেখার কারণ নিখিল। ওর বয়স আমারই সমান। দিন কুড়ি আগে ওর চি পেলাম। লিখছে গৌহাটি থেকে। আমি কেমন আছি জানতে চেয়েছে। আসামের জঙ্গলে ও কাজ। লিখেছে, 'জীবনে আর একবার পরীক্ষায় মাতিয়াছি। সময় পাইলে চলিয়া আইস। অ হইবে।'

নেকড়ে, বৃদ্ধা মানুমাসির পর আবার কি পরীক্ষা ? মানুষ পরীক্ষায় মাতে যতদিন তা মনে যৌবন থাকে। সে-অর্থে নিখিল যুবক। তার কয়েকদিন বাদে কাগজে খবর বের হলো 'প্রবীণ ফরেস্ট অফিসার শ্রীনিখিল দত্তকে জঙ্গীরা আটক করেছে। তাঁকে কোথায় রাখা হয়ে কেউ বলতে পারছে না। ভারত সরকার জানাচ্ছেন, শ্রীদত্তকে উদ্ধার করতে সবরকম চেষ্টা কর হবে।' খবরটা পড়ে চমকে উঠলাম। এই সব জঙ্গীদের হাতে পড়ে অনেক প্রাণ চলে গেছে নিখিলের ওই অবস্থা হলে খুব খারাপ লাগবে। কি ভেবে গৌহাটি রওনা হলাম। সাহিত্যি হওয়ার সুবাদে এর আগে কয়েকবার আসামে গিয়েছি। যাঁরা জঙ্গী রাজনীতি করেন তাঁদের কে কেউ সাহিত্য পড়েন, তাঁদের সঙ্গে আলাপও হয়েছিল। যদি কিছু করা যায় এই ভেবেই যাওয়া

•নিখিলের চিঠিতে ঠিকানা ছিল। সেটা ধরে পৌঁছে গিয়ে দেখলাম ওর বাংলোর•সাম পুলিশ পাহারায় রয়েছে। নিজের পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও ওরা আমাকে ভেতরে যেতে দিচ্ছি

না। শেষ পর্যন্ত একজন অফিসার আমাকে চিনতে পারলেন। তিনিই ভেতরে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'আসলে আমরা সাংবাদিকদের ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছি না। ওঁরা এলেই তো প্রশ্ন করবেন, এদিকে মিসেস দত্ত খুব অসুস্থ, ওঁকে বিরক্ত করা ঠিক নয়।'

'মিসেস দত্ত ?' মুখ ফসকে প্রশ্ন ছিটকে গেল।

'নিখিলবাবুর স্ত্রী। আসুন।'

যে ঘরের দরজায় ভদ্রলোক আমাকে পৌঁছে দিলেন সেখানে একজন মহিলা বসে আছেন হুইলচেয়ারে। পেছন থেকে তাঁর চুল দেখতে পাচ্ছি। অফিসার বললেন, 'উনি হাঁটতে পারেন না। আপনারা কথা বলুন।'

ভদ্রলোক চলে গেলে আমি শব্দ করে কাশলাম। সঙ্গে সঙ্গে মুখটি আমার দিকে ফিরল। অনেক অনেক বছর চলে গেছে, তবু আমার চিনতে একটুও অসুবিধা হলো না। বন্দনা।

সেই কলেজ জীবনে যাকে শেষ দেখেছি, নিখিলের সঙ্গে কল্পনা করেছি যার সম্পর্ক আছে, যে বিয়ে করে চলে গিয়েছিল আড়ালে, সে আবার কি করে কোত্থেকে এখানে ফিরে এসে মিসেস দত্ত পরিচয় পেল ? নিখিল যদি এতবছর পরে বিয়ে করে থাকে তাহলে আমাকে জানাবে না ?

কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'চিনতে পারছ ?'

'হ্যাঁ। তুমি তো এখন বিখ্যাত মানুষ।'

'কবে এসেছ এখানে ?'

'বছর খানেক।'

'হঠাৎ ?'

'সেটা তোমার বন্ধু ভাল বলতে পারবে।'

'ও কি তোমাকে বিয়ে করেছে ?'

'বিয়ে ?' হেসে ফেলল বন্দনা, 'না, ওর প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয়নি।'

'তাহলে ? এরা তোমাকে মিসেস দত্ত বলে ডাকছে !'

'আমার স্বামীর পদবী ছিল দত্ত। সেই সুবাদে আমি মিসেস দত্ত।'

আমি মাথা নাড়লাম। তারপর চেয়ার টেনে বসলাম, 'তুমি তো নিখিলের কাছে ছিলে, কি হয়েছিল ?'

'আমি জানি না। সকালে জঙ্গলে গিয়েছিল, আর ফেরেনি।'

'নিখিলের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ ছিল ?'

'না।'

'তাহলে ?'

'দু'বছর আগে এই আসামে এক জিপ-দুর্ঘটনায় আমার স্বামী মারা যান। আমি বেঁচে গিয়েছিলাম কিন্তু স্পাইন্যাল কর্ডে প্রচণ্ড আঘাত লাগায় হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে গেল। নিচের দিকটা অসাড়। হাসপাতালে শুয়ে যখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছি তখন নিখিল এল। জায়গাটা এখান থেকে কাছেই বলে ও খবর পেয়েছিল।'

'তারপর ?'

'আমাদের ছেলেমেয়ে নেই। দুজনেরই মা-বাবা চলে গিয়েছেন। হাসপাতাল থেকে ফিরে কোথায় যাব, স্বামীর কোয়ার্টার্স ছেড়ে দিতে হবে, এই চিন্তা ছিল। নিখিল জোর করল। বলল, বন্ধুর কাছে তো থাকতে পার। ভাল না লাগলে চলে যেও।'

'তুমি জানতে ও তোমাকে ভালবাসে ?'

'না। এখনও জানি না। কিন্তু ও আমার খুব যত্ন করে। যেভাবে শিশুকে তার মা যত্ন করে থাকে। কিন্তু ওকে কেন ধরে নিয়ে গেল ওরা ? আমি এত পাপ করেছি সমরেশ ?'

'তুমি কি এখন ওকে ভালবেসে ফেলেছ ?'

বন্দনা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'জানি না। কলেজে ওকে ভাল লাগত। কখনও প্রকাশ করিনি। ও চুপচাপ থাকত। এখানে আসার পরেও একটুও আবেগ দেখায়নি আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ। বলতে পার শ্রদ্ধা করি।'

'কিন্তু লোকে জানে তোমরা স্বামী-স্ত্রী।'

'তাতে কি এসে গেল ?'

নিখিলকে খোঁজার জন্যে আসাম তোলপাড় করছিলেন সরকার। জঙ্গীরা শর্ত দিয়েছিল সেই শর্ত মানা অসম্ভব ছিল সরকারের। আমিও কিছুদিন ঘোরাঘুরি করলাম। এইসময় বন্দনা আমার সঙ্গে যেটুকু কথা না বললে নয় ততটুকুই বলত।

একদিন বলল, 'আমি চলে যাব। ব্যবস্থা করে দেবে ?'

'কোথায় যাবে ?'

'জমানো যা আছে তাতে কোনো বৃদ্ধাবাসে থাকা যায়। এই ঠিকানায় আমাকে পৌঁছে দাও। আমি ওদের চিঠি লিখেছি।'

ঠিকানাটা ঝাড়গ্রামের এক বৃদ্ধাবাসের। বলেছিলাম, 'নিখিল ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।'

'আমি থাকলে ও ফিরবে না।'

'কেন ?'

'আমি অভিশপ্ত।'

হেসেছিলাম। বুঝিয়েছিলাম। কিন্তু বন্দনা শুনল না। বাধ্য হয়ে ওকে এসকর্ট দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম ঝাড়গ্রামে। এবং তার দিন তিনেক বাদে এক রাত্রে ফিরে এল নিখিল। শরীর অর্ধেক হয়ে গেছে, মুখচোখ ভাঙা, গালে দাড়ি। আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরল। শুনলাম প্রায় একশ কিলোমিটার পথ হেঁটে এসেছে জঙ্গীদের চোখে ধুলো দিয়ে।

পুলিশমহল হৈ হৈ করে ছুটে এল। ও সুস্থ হলে প্রশ্ন করা হবে। ততক্ষণ বাংলোর পাহারা তিনগুণ বাড়ানো হলো।

ভোরবেলা নিখিল আমার ঘরে এল, 'বন্দনা কোথায় ?'

'ও চলে গিয়েছে।'

'সেকি ?'

'ও একটি বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে চাইল।'

'বৃদ্ধাশ্রমে ?' নিখিলের ঠোঁটে হাসি ফুটল, 'তুমি পাঠিয়ে দিলে ?'

'আমার উপায় ছিল না। খুব জোর করছিল ও।'

নিখিল একটা চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর বলল, 'হেরে গেলাম।'

'তার মানে ?'

'নেকড়েটাকে পাঠাতে হয়েছিল জঙ্গলে। বৃদ্ধা মানুমাসি চলে গেলেন স্বামীর ভিটেয়। আর বন্দনা ? সমস্ত অহঙ্কার নিয়ে বৃদ্ধাবাসে। কাউকে ধরে রাখার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি নিশ্চয়ই আজই চলে যাবে ?'

উত্তরটা শোনার জন্যে অপেক্ষা করেনি নিখিল।

॥ ২৮ ॥

একই জায়গায় বাস করলে অথবা দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিক লেখা যদি একই বিষয়নির্ভর হয় তাহলে তা পড়তে পড়তে একঘেয়ে বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অতদূরের কথায় কাজ কী, স্বামী-স্ত্রীর বিবাহিত জীবন বেশ কিছু বছর বাদে ওই একই রোগে আক্রান্ত হতে তো আমরা দেখেই থাকি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, মা এবং সন্তানের সম্পর্ক কয়েক যুগ একত্রিত থাকলেও একঘেয়ে বলে কখনই মনে হয় না।

কেন হয় না তা নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেন। মা-ও একজন মহিলা। তিনি কারও মেয়ে অথবা কারও স্ত্রী। স্বামী যদি তাঁর সঙ্গে থাকতে থাকতে একঘেয়েমি বোধ করেন তাহলে সন্তান কেন তা করে না ? শুধু স্নেহ অথবা বাৎসল্যরসের কারণে ? শুধুই সন্তানকে আগলে রাখা অথবা মঙ্গল কামনা করে যাওয়ার জন্যে ? যাঁরা বলেন, মায়েরা কোনোরকম প্রত্যাশা না রেখে সন্তানকে ভালবেসে যান তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই। যে কোনো ভালবাসাই একতরফা চলতে পারে না। তাঁর জন্যে বেশি কিছু না করুক কিন্তু সন্তান তাঁকে অপমান করছে না জানলে মা খুশী হন। এটাও তো চাওয়া। মানুষের ক্ষেত্রে, আমার মনে হয়, অন্য এক মানসিকতা কাজ করে। আমরা যাকে চলতি কথায় নাড়ির বাঁধন বলে থাকি সেটাই আসল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বেশির ভাগ মায়েরাই সন্তানকে নিজের থেকে আলাদা করতে পারেন না। ওই ন মাস শরীরে বহন করে যে রক্তের আত্মীয়তা তৈরি হয় সেটাকে স্নেহ-বাৎসল্য অথবা ভালবাসার সাইনবোর্ডে চিহ্নিত করা ভুল হবে। নিজের হাত-পা মুখের সঙ্গে সন্তানের হাত-পা-মুখের কোনো পার্থক্য মা অন্তত প্রথম দুটো বছর করতে পারেন না। জন্মাবার পর থেকে নিজের পায়ে হাঁটা পর্যন্ত শিশু যে প্রতিটি

মুহূর্তে মায়ের ওপর নির্ভর করেছিল তা তার অবচেতন মনে চিরকালের মতো গেঁথে ফেলে। এবং পরবর্তী কালে জীবনে যখনই দুর্যোগ এসেছে তখনই মায়ের কাছে পৌঁছে সে একধরনের আরাম পায়। এছাড়া, চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্কগুলোতে সামান্য আঘাত লাগলেই যেসব বাক্যবাণের সামনে তাকে পড়তে হয় তা তাকে কখনই স্বস্তি দেয় না। মায়ের কাছে সেসব কথা খুব কম ক্ষেত্রেই তাকে শুনতে হয়। আর এই কারণে সম্পর্কটি নিটোল থাকে। হয়তো নানান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সে মায়ের প্রাপ্য পূর্ণ করতে অক্ষম হয় কিন্তু তার জন্যে সে কষ্টও কম পায় না।'

এতক্ষণে পাঠকরা কোনো নির্দিষ্ট কাহিনীর সন্ধান না পেয়ে হয়তো উষ্ণ হচ্ছেন। কিন্তু 'মেয়েরা যেমন হয়' যেহেতু কল্পনা নয়, জীবন থেকে নেওয়া তাই মাঝেমাঝেই এইসব ভাবনা আমাকে আচ্ছন্ন করে। এই ভাবনা আমি ভেবেছিলাম গতকাল রাত্রে, পুরী এক্সপ্রেসের বার্থে শুয়ে, মধ্যরাত্রে, যখন ট্রেন হু হু করে ছুটছিল।

প্রথম পুরী গিয়েছিলাম কলেজে পড়ার সময়। সমুদ্র ছাড়া আর সব কিছু দেখে বিরক্ত হয়েছিলাম। নোংরা রাস্তা, কুষ্ঠরোগীর ভিড়, মন্দিরে পাণ্ডাদের অত্যাচার দেখে মনে হয়েছিল লোকে কেন পুরীতে যায় ? রথ দেখা এবং কলা বেচা ভারতীয়দের রক্তে। বাঙালিদের তো বাড়াবাড়ি রকমের বেশি। পুরীতে যদি জগন্নাথের মন্দির না থাকত, ওটা যদি গোপালপুর বা বালেশ্বরে হতো, তাহলে বাঙালি পুরী না গিয়ে সেখানে যেত। গিয়ে প্রায় অন্ধকূপ মন্দিরে ঢুকে পাণ্ডাদের ছড়ির আঘাত খেত, নোংরা জলে পা ডুবিয়ে ভাবত সব পাপ ধুয়ে গেল। অথচ সেই বাঙালি বাড়িতে হিন্দু ধর্মমতের কোনো উপাসনা অথবা আচারানুষ্ঠান করে না। মণ্ডপে গিয়ে কদাচিৎ অঞ্জলি দেয় কিন্তু রাতদুপুরে প্যাণ্ডেলের আলোর কাজ দেখতে ট্যাক্সি ভাড়া করে হলেও বের হয়।

অনেক বছরের ব্যবধানে আবার পুরী গেলাম। আসলে গিয়েছিলাম কটকে। সেখানকার প্রজাতন্ত্র কাগজের বাৎসরিক সাহিত্য সভায়। কাগজের সম্পাদক অনুরোধ করলেন, 'এতদূর যখন এলেন পুরীটা ঘুরে আসুন। সমুদ্রের ধার দিয়ে কোণারক হয়ে রাস্তা হয়েছে, ভাল লাগবে।' রাজী হয়ে গিয়েছিলাম।

ওঁর গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া আমি একাই যাত্রী। রাস্তাটিও ভাল। কোণারক দেখেছিলাম সেই কলেজজীবনে। তখন মূর্তি নিমার্ণের দক্ষতা ও তাদের শিল্পসৌন্দর্য দেখার চেয়ে চোরাচোখে অশ্লীলতা দেখতে বেশি ভাল লেগেছিল। মনে আছে, একটা পরিবার কোণারক গিয়ে এমনভাবে মূর্তিদের দেখে এল যেন কিছুই দেখছে না। ছোটদের সামনে বড়রা যখন উদাসীন ভান করেন তখন ছোটরা খুব সুন্দরভাবে সেটার অনুকরণ করতে পারে।

এবার আর কোণারকে দাঁড়াইনি। দিন ফুরিয়ে আসছিল। তাছাড়া এখন, এই বয়সে, মনে হলো পাথরের মূর্তিগুলো সেই কবে থেকে একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। একটুও নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই বেচারাদের। কীরকম কষ্ট হয়েছিল ওদের জন্যে !

দেখলাম পুরী শহরটি একেবারেই বদলে গিয়েছে। বড় বড় রাস্তা হয়েছে। তার দু'পাশের আলোগুলোও ঝকঝকে। কুষ্ঠরোগীদের চোখে পড়ল না। স্বর্গদ্বার থেকে সমুদ্রের গা ঘেঁষে

চমৎকার রাস্তা করা হয়েছে। এক পাশে সমুদ্র আর অন্যপাশে দারুণ দারুণ হোটেল। আমার মনে হলো, হয়তো মন্দিরের ভেতরের আবহাওয়াও বদলে গিয়েছে। এখন আর কোনো পাণ্ডা মাথায় ডাণ্ডার আঘাত করে না, সেখানে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে আছে।

হোটেলের ব্যবস্থা কটক থেকেই করা ছিল। শীততাপনিয়ন্ত্রিত আরামদায়ক হোটেল। দোতলার জানলা দিয়ে সমুদ্র দেখা যায়। একথা ঠিক, পুরীর সমুদ্রের ঢেউ-এর আসা-যাওয়ার ভঙ্গি খুব সুন্দর। পৃথিবীর অনেক সমুদ্রসৈকত দেখেও এর তুলনা পাইনি। মনে হলো ঘর শীততাপনিয়ন্ত্রিত না হলেই ভালো হতো। তাহলে জানলা খুলে দিতে পারতাম। হু হু করে জলো বাতাস ঘরে ঢুকত সমুদ্রের ঘ্রাণ নিয়ে। আমার আরামের ব্যবস্থা করতে গিয়ে সম্পাদকমশাই একটু বেশি পরিমাণে সতর্ক হয়েছিলেন। কি আর করা যাবে!

সন্ধ্যে একটু ঘন হলে হোটেল থেকে বের হলাম। রাস্তা পার হয়েই বালিয়াড়ি। সমুদ্রের ঢেউ দেখতে পাচ্ছি। এদিকটায় ভিড় নেই। দু'-একজন ইতস্তত বসে আছেন। প্রায় জলের ধারে গিয়ে বসলাম। দূরের রাস্তার আলো এখানেও এসেছে। ঢেউগুলো আসছে-যাচ্ছে সেই আলোয় মাখামাখি হয়ে। এটা ভাল লাগল না। রাতের অন্ধকারে সমুদ্রের ঢেউ-এর একটা আলাদা চেহারা ফোটে। বিশেষ করে যখন ফসফরাস জ্বলে ওঠে ঢেউ-এর মাথায়। তবু সমুদ্র গম্ভীর। দূরান্ত অন্ধকারে ঢাকা। নদীকে সবাই নারীর সঙ্গে তুলনা করেন এবং সমুদ্রকে পুরুষ হিসেবে কল্পনা করা হয়। আজ আমার মনে হলো ব্যাপারটা ঠিক নয়। সমুদ্রের গভীরতা, গাম্ভীর্য এবং এই রাতের অন্ধকারে যে রহস্য তার সঙ্গে একমাত্র নারীরই তুলনা করা যায়। ওই যে ঢেউগুলো তীব্রবেগে গড়িয়ে গড়িয়ে এসে হঠাৎ নিস্তেজ হয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে তা তো নারীরই চরিত্র। মেয়েদের আকাঙ্ক্ষা এইভাবে সোচ্চার হয়ে সামান্য বাধা পেয়েই মাথা নুইয়ে তাদের বুকের ভেতর লুকিয়ে পড়ে।

'বাড়িতে তৈরি করা খাবার খাবেন দাদা? খুব সস্তা।'

পেছন থেকে যে নারীকণ্ঠ ভেসে এল তা আমাকে সজাগ করল। লোকে যেখানে বেড়াতে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে সেখানে হকারদের উপদ্রব লেগেই থাকে। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে হাত নাড়লাম নিঃশব্দে, না।

'খুব যত্ন করে তৈরি করেছি দাদা। একটু খেয়ে দেখুন।' মহিলার গলায় আকুতি।

'আপনি অন্য জায়গায় চেষ্টা করুন।' সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বললাম।

'করেছি দাদা। কিন্তু সবাই এক কথা বলছে, কেউ খেয়ে দেখছে না। আচ্ছা, একটা খেয়ে যদি ভাল না লাগে তাহলে নেবেন না, পয়সাও দিতে হবে না।'

মেয়েটির গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে এবার না তাকিয়ে পারলাম না।

পেছনে রাস্তার আলো, ওর মুখ দেখা যাচ্ছিল না ভাল করে। পরনে সাদা শাড়ি। হাতে একটা প্লাস্টিকের বড় বালতি।

'কি খাবার?'

'পিঠে। পাটিসাপ্টা আর গোকুল পিঠে।'

'আপনি বানিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ওসব খেলে তো জলের দরকার হবে।'

'আমার সঙ্গে জল আছে।' কাঁধে ঝোলানো জলের বোতল দেখালেন। ভদ্রমহিলা অল্পবয়সিনী নন। চল্লিশের ওপাশেই পৌঁছে গেছেন।

একটা পাটিসাপটা নিলাম। বেশ মোলায়েম। খেতে খারাপ নয়। ভদ্রমহিলা একটু দূরে বসলেন। ওঁর ভঙ্গিটি সুন্দর। ছেলেবেলায় খাওয়ার সময় পিসিমা ওই ভঙ্গিতে বসে দেখতেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে অনেকদিন আছেন ?'

'হ্যাঁ। কুড়ি বছর হয়ে গেল।'

'এই আপনার ব্যবসা ?'

'ব্যবসা ! না না। এই বিক্রি হলে কোনোমতে বেঁচে থাকা যায়।'

'কাছাকাছি থাকেন ?'

'না। এখান থেকে মাইল খানেক ভেতরে।'

'তাহলে তো অনেকটা হাঁটতে হয়।'

'পেটের জন্যে মানুষ এর চেয়ে অনেক বেশি করে।'

'আপনাকে এসব করতে হয়, আর কেউ নেই ?'

'না। আর দেব ?'

নিলাম। এখনও দাম জিজ্ঞাসা করিনি। খেতে খেতে জানতে চাইলাম, 'আপনার বাড়ি ছিল কোথায় ?'

'আমার তো কোনো বাড়ি ছিল না,' হাসলো, 'বাবা তো ভাড়ার বাড়িতে থাকতেন। যার সঙ্গে বিয়ে হলো তারও ভাড়ার বাড়ি। তারপরও বাড়ি ভাড়া। এখনও সেই ভাড়া দিয়ে আছি। আমার বাড়ি কোনোদিন ছিল না, এখনও নেই।'

এই যে কথাগুলো উনি বললেন তা কোনো অশিক্ষিত মহিলার পক্ষে ওই ভঙ্গিতে বলা সম্ভব নয়। দাম দিলাম। ন্যায্য দাম। জল পেলাম।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'কদিন আছেন দাদা ?'

'দেখি।'

'কাল যদি থাকেন তাহলে ভাল হয়।'

'কেন ?'

'আমার উপকার করবেন দুটো পিঠে খেয়ে।' মহিলা চলে গেলেন। দেখতে পাচ্ছি সমুদ্রের ধারে বসে থাকা নারীপুরুষদের কাছে গিয়ে বিক্রির চেষ্টা করে যাচ্ছেন তিনি। কিন্তু কাউকে সম্মতি জানাতে দেখলাম না। এই ব্যাপারটা একদমই অস্বাভাবিক নয়। সংসার চালাতে মেয়েদের এখন রোজগারে নামতেই হচ্ছে। কিন্তু ওই যে কথাটা, আমার বাড়ি কোনোদিন ছিল না, এখনও নেই, এটা আমাকে টানতে লাগল। সত্যি কথা বলতে কি আমাদের কারও বাড়ি ছিল না, এখনও নেই, কোনোদিন থাকবে না। যাঁরা পৈতৃক সূত্রে বাড়ি পান অথবা নিজের উপার্জনে বাড়ি তৈরি করেন তাঁরা কতদিন সেখানে বাস করেন ! বড়জোর দশ থেকে আশি

এই পৃথিবীতে তো ওই সময়ের জন্যেই আসা। আশি-নব্বই বছরের জন্যে বেড়িয়ে যাওয়া। আমাদের আসল ঘর কোথাও ছিল কিনা জানি না ; কদিনের জন্যে বেড়াতে এসে যে ঘর তৈরি করি তা তো নিজের বাড়ি নয়।

থেকে গেলাম। মন বলছিল এই যে গড়িয়ে আসা ঢেউ তাই সমুদ্র নয়। সমুদ্র আরও ওপাশে যেখানে গভীর অন্ধকার। হয়তো ভুল হচ্ছে, তবু সেই অন্ধকারকে জানার চেষ্টায় সারাজীবন যখন কাটিয়ে দিলাম তখন আর একটা রাত কাটিয়ে দিতে দোষ কি !

সন্ধ্যের একটু পরেই তিনি এলেন। পেছন থেকে বললেন, 'বাড়িতে তৈরি খাবার খাবেন দাদা ? খুব সস্তা।' এই কথাই গতকাল তিনি বলেছিলেন। মুখ ফেরালাম, 'বসুন।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি উচ্ছ্বসিত, 'আপনি তাহলে যাননি ? আমার কি ভাগ্য !'

'ভাগ্য বলছেন কেন ?'

'বাঃ, আমার দুটো পিঠে আজ বিক্রি হবে।'

'আপনার পিঠের যা কোয়ালিটি তাতে তো সবই বিক্রি হয়ে যাওয়ার কথা।'

'কিন্তু হয় না। আসলে শহরের লোক ভাল দোকান ছাড়া খাবার কিনে খেতে ভয় পায়। একটা গোকুল পিঠে দিই ?' উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে একটা শালপাতায় খাবারটা তুলে এগিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলা। দিয়ে বসলেন।

খেতে খেতে বললাম, 'বাঃ। খুব ভাল। আপনার নামটা জানা হয়নি।'

'নাম জেনে কি হবে ?' সমুদ্রের দিকে মুখ ফেরালেন তিনি।

'কিছু হবে না। যদি কখনও আবার পুরীতে আসি তাহলে দেখা না পেলে খোঁজখবর নিয়ে আপনার বাড়িতে গিয়ে বলব, পিঠে খাওয়ান।'

'মিথ্যে কথা বলবেন না। মিথ্যে কথা আমি ঘেন্না করি।'

'আপনি কি করে বুঝলেন আমি মিথ্যে বলছি !'

'কারণ কেউ কথা রাখে না। ছেলেদের কথা বলছি। আর আমি আপনাকে সত্যি নাম বলব কেন ?' মুখ ফেরালেন তিনি।

'এই যে বললেন মিথ্যে আপনি ঘেন্না করেন।'

'আপনি নিশ্চয়ই বিবাহিত ? ছেলেমেয়ে আছে। কলকাতায় থাকেন। তাই না ?'

'সবই ঠিক।'

'তাহলে সামনের বছর আপনি এখানে আসবেন না, এলেও সামান্য পিঠের জন্যে এত পরিশ্রম করবেন না। বিবাহিত মানুষেরা আবেগে কথা বলে কিন্তু সেটা চলে গেলে সব কিছুকে ঝামেলা বলে দূরে সরিয়ে দেয়।'

'বিবাহিত মানুষদের সম্পর্কে এমন ধারণা কেন হলো ?'

'ছেড়ে দিন। আর একটা দিই ?'

'না। আমার আর খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'কেন ? খারাপ লাগছে ?'

'মোটেই নয়। কিন্তু কেউ আমাকে ভুল বুঝলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি করেন ?'

'লিখি।'

'লেখেন ? কি লেখেন ? গল্প-উপন্যাস ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার নামটা বলবেন ?'

বললাম। শোনার পর তিনি একেবারে চুপ করে গেলেন। কোনো শব্দ নেই, শুধ ঢেউগুলোর আছড়ে পড়ার আওয়াজে একটা চাপা কান্না ছিল।

'দামটা দেবেন ?'

চমকে তাকালাম। তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। দাম দিলাম। সেট নিয়ে বললেন, 'আপনাকে একটা অনুরোধ করব ?'

'বলুন।'

'আমার বাড়িতে একটু যাবেন ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু অনেকটা দূর, আপনার অসুবিধে হতে পারে।'

'বেশ তো, একটা রিকশা নিয়ে নিলেই হয়।'

'ওই তো মুশকিল। আমার পক্ষে রোজ রিকশায় আসা-যাওয়া করা সম্ভব নয়। এখানকার লোকে আমাকে যেমন জানে তেমনই থাকতে চাই।'

অতএব হাঁটা শুরু হলো। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু বাড়ি ফিরে গেলে আপনার বিক্রি মার খাবে না ?'

'মার ?' হাসলেন তিনি, 'সে তো খেয়েই চলেছি।'

কেন তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন জানি না। তবু সন্ধ্যে পার হওয়া এই সময়ে বড় রাস্তা ছেড়ে আলো-আঁধারে গলিপথে চুপচাপ হেঁটে যেতে যেতে আমার মনে হচ্ছিল ওঁর জীবনের গল্প হয়তো শুনতে পাব। কাছাকাছি এসে পড়েছি বুঝলাম যখন কোনো কোনো মানুষ যেচে ওঁর সঙ্গে কথা বলছিল। কেমন আছেন, কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা এইসব প্রশ্ন ভেসে আসছিল। মানুষগুলো বাঙালি নয়, স্থানীয় বাসিন্দা। একটা মাঠ পেরিয়ে যেখানে পৌঁছলাম সেখানে সমুদ্রের আওয়াজ পৌঁছয় না। খুবই দরিদ্র মানুষেরা বাস করে সেখানে। লম্বা একতলা বাড়িটার ঘরে ঘরে ভাড়াটে। তালা খুলে ভেতরে ঢুকে বললেন, 'আপনার বসতে অসুবিধে হবে।'

একটাই কাঠের চেয়ার। তক্তাপোশ। ওপাশে রান্নার ব্যবস্থা। জিনিসপত্র তেমন নেই। আমি চেয়ারে বসা মাত্র মিছিল শুরু হলো। এপাশ-ওপাশ থেকে স্ত্রীলোক ও বয়স্ক পুরুষরা এসে জানতে চাইল, আমি কে ? কোনো সমস্যা হয়েছে নাকি ! তিনি প্রত্যেককে হেসে বললেন, 'ইনি আমার দাদা। নামকরা লেখক। কলকাতায় থাকেন !'

সবাই মাথা নেড়ে চলে যাচ্ছিল শুধু একজন প্রৌঢ়া বললেন, 'এ কেমন দাদা তোমার বোন এখানে পড়ে আছে অথচ খবর রাখে না।'

তিনি হেসে বললেন, 'দোষ ওঁর নয়। আমিই কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখিনি।'

যখন ওঁরা চলে গেলেন তখন বললাম, 'বাঃ। আপনার দেখছি অনেক অভিভাবক।'

'হ্যাঁ। এরাই আমাকে রক্ষা করেছে। নইলে যখন এখানে এসেছিলাম তখন পুরুষের থাবা থেকে নিজেকে বাঁচাবার ক্ষমতা ছিল না।'

এখন ঘরের আলোয় তাঁকে যা দেখছি তাতে মনে হলো, তখন কেন, এখনও ইনি যে কোনো পুরুষের কাম্য হতে পারেন।

বললাম, 'বলুন, আমাকে কেন ডেকে আনলেন ?'

'আচ্ছা, আপনি তো লেখক। আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে আপনার ?'

'কোনো বিবাহিত পুরুষের প্রেমে পড়েছিলেন একসময়। লোকটি আপনাকে প্রতারণা করেছে। সেই ক্ষোভে সব ছেড়ে এখানে চলে এসেছেন।'

তিনি হাসলেন, 'হলো না। না, তাহলে লেখকরা অন্তর্যামী নন।'

'একশবার সত্যি। আমি অত্যন্ত সাধারণ মানুষ।'

'এককালে হিন্দু মেয়েরা বিধবা হলেই কাশী বা বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেওয়া হতো।'

'কেন ?'

'তাদের বোঝা কেউ বইতে চাইত না। তাই বাকি জীবনটা পুজো-আর্চা নিয়ে থাকবে এই অছিলায় দায়মুক্ত হতো।'

'হলো না। বাড়িতে যুবতী বিধবা থাকলে পরিবারের অন্য পুরুষরা চরিত্রহীন হতে পারে এই আশংকায় বৃদ্ধরা এবং বিবাহিতা মহিলারা তাকে ওই অছিলায় বাড়ি থেকে দূর করে দিত।' হাসলেন মহিলা, 'আমার ক্ষেত্রে তেমন কিছু হয়নি। বিধবাদের কেউ পুরীতে পাঠায় না। কারণ এখানকার মন্দিরের গায়ে বড্ড বেশি মিথুন মূর্তি ছড়ানো। চা খাবেন ?'

'না। আপনি কেন এই নির্বাসনে আছেন ?'

'নির্বাসন ? যার কোনো বাস নেই তার আর নির্বাসন কি করে হবে !' বলে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো প্রায় বিবর্ণ হয়ে আসা একটি ছবিকে দেখালেন, উনি আমার স্বামী।'

'আচ্ছা ।'

'না। মারা গিয়েছেন বলে এখনও শুনিনি।'

'কোথায় আছেন ?'

'তাও জানি না।'

'সেকি !' চমকে উঠলাম।

'আমি জানি আমার গল্প শুনতে আপনার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু আমার তো গল্প নেই। দেওঘরে থাকতাম। উনি এলেন বেড়াতে। অনুকূল ঠাকুরের আশ্রমে উঠেছিলাম। প্রথম দেখায় প্রেমে পড়লাম । সাতদিন ছিলেন। সেই সাতটা দিনে যত কাছাকাছি হয়েছি তা সাত বছরেও হয়তো হওয়া যায় না। আমার বাড়ির লোকের সঙ্গে পরিচয় করে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। তারপর ফিরে গেলেন। সেই যে গেলেন আর যোগাযোগ করলেন না। কয়েক ডজন চিঠি দিলাম, উত্তর এল না। বাড়ির লোকজন খবর নিল। ওই ঠিকানায় তিনি থাকেন না। অনুকূল আশ্রমে গিয়ে

জানা গেল তিনি ওঁদের কেউ নন। শিষ্যত্ব নেননি, এসেছিলেন হঠাৎই। ঘর খালি ছিল বলে থাকতে দেওয়া হয়েছিল।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কিছু নেই। বাড়ি থেকে বিয়ের চেষ্টা শুরু করতেই আমি না বলে দিলাম। আর কাউকে আমি বিয়ে করতে পারব না। এই নিয়ে ঝগড়া । সেটা এমন পর্যায়ে উঠল যে আমি পাগল হওয়ার জায়গায় পৌঁছে গেলাম। এই সময় বাবা মারা গেলেন। আর তার কিছুদিন পরেই ঘর ছাড়লাম।'

'কোথায় গেলেন ? '

'কলকাতায়। কেন গিয়েছিলাম সে প্রশ্ন এখন অবান্তর। আমার এক বান্ধবীর বাড়িতে উঠেছিলাম। অনেক খুঁজেছি। তাকে পাইনি। '

'এই ছবিটা ?'

'দেওঘরে তোলা। আমিই তুলেছিলাম।'

'এই ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন করলে কাজ হতো না ?'

'না। পরে মনে হয়েছিল যে ইচ্ছে করে আমাকে ফাঁকি দিয়েছে তাকে কেন জোর করে টেনে আনি।'

'কিন্তু ওঁকে আপনি স্বামী বললেন, সেটা তো— !'

'মন্ত্র পড়ে হয়নি। সইসাবুদ কগজেও নয়। কিন্তু ত্রিকূট পাহাড়ের নির্জনে আমি জীবনে প্রথম এবং শেষবার কোনো পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম। না, ঘনিষ্ঠতা বলতে আজকাল সবাই যা বোঝে তা নয়। কিন্তু আমার ঠোঁট দুটো তো আর কুমারী রইল না। অতএব সেদিন থেকেই তাকে স্বামী বলে ভেবেছি।'

'তারপর ?'

'এই তো দেখছেন। সাতদিন উনি ওঁর শখের কথা বলেছিলেন। পিঠে খেতে তাঁর নাকি খুব ভাল লাগে। তাই পিঠে বিক্রি করে আসছি। বাঙালি নাকি একবার না একবার পুরীতে বেড়াতে আসে। এখানকার ঠুঁটো দেবতাদের মতোই তাদের অবস্থা। তাই সমুদ্রের ধারে পিঠে বিক্রি করি।'

'কিছু মনে করবেন না। বিবাহিত পুরুষদের সম্পর্কে আপনার ঘৃণা কেন ?'

'কারণ এর পরের জীবনে যারা আমার দিকে লোভের বলুন, ভালবাসার বলুন, হাত বাড়িয়েছে তাদের সবাই বিবাহিত। মাঝে মাঝে মনে হয় তিনিও বোধহয় তাই ছিলেন। দেওঘরে আমাকে বলেননি। আবেগ ফুরিয়ে গেলে কলকাতায় ফিরে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন।'

তাহলে এত বছর ধরে তাঁর অপেক্ষায় আছেন কেন ?'

'অভ্যেস। একটা কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে। আবার ভাবি, উনি যদি আমাকে বিয়ে করতেন তাহলে একসঙ্গে থাকতে থাকতে হয়তো ত্রুটি চোখে পড়ত। জীবন একঘেয়ে হয়ে যেত। স্বামী-স্ত্রীর জীবনে যেমন হয়। এই যে হয়নি, একা আছি, যুদ্ধ করছি, তাঁর কথা ভাবছি, সন্ধ্যেবেলায় পিঠে নিয়ে সমুদ্রে যাচ্ছি, এর মধ্যে নিত্য একধরনের উত্তেজনা পাই। তাই নিয়ে

রয়েছি।'

ফিরে এসেছিলাম। মহিলাকে নির্বোধ ভাবার যথেষ্ট কারণ ছিল। এখন এইরকম বোকামি করে কেউ জীবন শেষ করে দেয় না। পরের রাত্রে পুরী এক্সপ্রেসের বার্থে শুয়ে হঠাৎ এই লেখার প্রথম ভাবনাটা মাথায় এল। যে কোনো সম্পর্কের বেলায় একসময় একঘেয়েমি আসে। এই যে ইনি প্রতিদিন সমুদ্রসৈকতে যাচ্ছেন এবং ফিরে আসছেন, এতে একঘেয়েমি আসছে না? জিজ্ঞাসা করিনি। কারও কারও হয়তো আসে না। অপেক্ষা করে থাকতে যাঁরা সুখ পান।

॥ ২৯ ॥

সমরেশবাবু, আমি নিয়মিত গল্প-উপন্যাস পড়ি না। কিন্তু ঘটনাচক্রে প্রায় প্রতি মাসের এই পত্রিকা আমার এক সহকর্মীব কল্যাণে দেখতে পাই। 'মেয়েরা যেমন হয়' শিরোনামে আপনি অনেকদিন ধরে একটা লেখা লিখে চলেছেন। যেহেতু আমি একজন মহিলা তাই কৌতূহলে পড়া শুরু করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে এই চিঠি আপনাকে লিখছি।

শুনেছি, আপনি জনপ্রিয় লেখক, বাংলা ভাষায় লিখে গাড়ি-বাড়ি করেছেন। এদেশে যারা ভণ্ডামি করে তাদের ভাল রোজগার হয়। কোনোভাবে মানুষকে সুড়সুড়ি দিলেই তার মধ্যে গদগদ ভাব এসে যায়। অন্যক্ষেত্রের ভণ্ডরা বেশিদিন সক্রিয় থাকতে পারে না কিন্তু আপনার মতো লেখকদের ক্ষেত্রে সেই ভয় নেই। দিনের পর দিন আপনারা পাঠক-পাঠিকাদের তথাকথিত আবেগের সুযোগ নিয়ে দিব্যি সুখে কাটিয়ে দিতে পারেন।

এই অবধি পড়ে অনুগ্রহ করে চিঠিটাকে ফেলে দেবেন না। সমরেশবাবু, আপনার লেখাটার নাম, 'মেয়েরা যেমন হয়'। সেই প্রথম সংখ্যায় আপনি ভণিতা করেছিলেন, মেয়েরা কেমন হয় তা ঈশ্বর যখন জানেন না তখন আপনার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আপনি এযাবৎকাল মেয়েদের যেমন দেখেছেন তার ভিত্তিতে লিখতে চান, মেয়েরা যেমন হয়। অর্থাৎ আপনি কোনো ঝুঁকি নিলেন না, নিজের দেখা বলে ইনিয়ে-বিনিয়ে গপ্পো শোনাতে আরম্ভ করলেন এবং আমরা তাই গোগ্রাসে গিলব এমন ধারণা করলেন। আপনি বেছে বেছে সেইসব গপ্পো শোনাতে শুরু করলেন যেখানে মেয়েরা অত্যাচারে জর্জরিত, বঞ্চিত। শরৎচন্দ্র যার জনক তা এখনও বাংলা সিনেমা এবং যাত্রার প্রধান হাতিয়ার, সেই মেয়েদের কষ্টের কাহিনী শোনালে ভাল হাততালি পাওয়া যাবে এই ধারণা আপনার কি করে হলো আমি বুঝতে পারছি না। আরে মশাই, এটা যে উনিশশো আটানব্বই সাল। গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গিয়েছে এর মধ্যে। দেশের

প্রধানমন্ত্রী হয়ে একজন মহিলা চোখ রাঙিয়ে গেছেন। শুধু একজন মমতা ব্যানার্জীকে সামলাতে বামফ্রন্ট সরকারের অনেক চুল পেকে গিয়েছে। সোনিয়া আসামাত্র কংগ্রেসের মরা ডালে পাতা গজাচ্ছে। হ্যাঁ, স্বীকার করছি, কোথাও কোথাও এখনও আপনার ভাই-দাদারা বীরদর্পে মেয়েদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু তাদের সংখ্যা হু হু করে কমে আসছে।

আপনার লেখার নামটি নিয়ে আমার আপত্তি নেই। বুঝতেই পারছেন, আপত্তি লেখার বিষয় নিয়ে। মেয়েরা স্বামীর চাপে পরপুরুষের সঙ্গে শুয়ে সংসার চালাতে বাধ্য হচ্ছে এই কাহিনী আর কতদিন চালাবেন ? আচ্ছা, একথা মনে হয় না কেন যে মেয়েটি ওসব করতে বাধ্য হলো কিছুকাল পরে তার বেশ ভাল লাগল। ওইরকম নিকৃষ্ট স্বামীর সঙ্গে শোয়ার চেয়ে এই মুখ বদলানো জীবনে সে বৈচিত্র্য খুঁজে পেল। লিখতে পারবেন এ কথা ? সাহস আছে ? তা পারবেন না। কারণ একটা বিরাট সংখ্যার পাঠক-পাঠিকা যদি হাতছাড়া হয়ে যায় সেই ভয় আপনার আছে। আপনি তাই নিরাপদে থাকতে চান। না, এখন বহুব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গিয়েছে তাই নতুন খোলস পরিয়ে পরিবেশন করে চলেছেন। চালিয়ে যান। এদেশে যার যা ইচ্ছে সে তাই করতে পারে। আপনিই বা করবেন না কেন ?

নিজের কথা এতক্ষণ বলিনি। কিন্তু যেহেতু আমি উড়ো চিঠি লিখতে বসিনি এবং আপনি সেটাই ভেবে বসেন তাই আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছু তথ্য জানানো দরকার। দয়া করে এটা পড়ে নতুন গল্প বানানোর চেষ্টা করবেন না। অবশ্য করলেও তা ভালো বিকোবে না, কারণ আমার জীবনে ওসব আবেগ নেই।

কদিন ধরে কাগজে একটা ছবির বিজ্ঞাপন দেখতে পাচ্ছি। ছবিটির নাম, মেয়েরাও মানুষ। ভাবুন ! যেন এতদিন মেয়েরা সবাই অমানুষ ছিল, এরা ছবি করে নতুন তথ্য দিল !

আমি জন্মেছি দার্জিলিং শহরে। আমার ঠাকুর্দা চা-বাগানের ম্যানেজার ছিলেন। বাবা ওদিকে যাননি। তিনি ডাক্তারি করতেন। ম্যাল থেকে জলাপাহাড়ের দিকে যে রাস্তাটা গিয়েছে, আমাদের বাড়ি ছিল সেখানে। ডাক্তার হিসাবে বাবা খুব জনপ্রিয় ছিলেন। চা-বাগানের ম্যানেজারের ছেলে তিনি, সাহেবী কায়দাগুলোয় অভ্যস্ত ছিলেন কিন্তু গরীব রুগীদের কাছ থেকে দক্ষিণা নিতেন না। ওপর মহলের লোকজন এই ব্যাপারটা পছন্দ না করলেও বাবার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। আমি বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে।

বুঝতেই পারছেন, ছেলেবেলায় আমি অভাবের সঙ্গে মোকাবিলা করিনি। স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করেছি চুটিয়ে। দার্জিলিং-এর সেরা স্কুল থেকে পাশ করে ওখানকার কলেজেই পড়েছি। বাবার ইচ্ছে ছিল আমাকে ডাক্তার হিসেবে দেখার। সেই ইচ্ছে পূর্ণ করতে দিল্লীতে ডাক্তারি পড়েছি। তা এসব করার সময় কেউ আমাকে বলেনি তুমি মেয়ে অতএব মেয়েমানুষ, পুরুষদের মতো মানুষ নও। বরং ব্যাপারটা ঠিক উল্টো হতো। স্কুল থেকেই আমার কোনো মেয়েবন্ধু ছিল না। ওদের অত নরমনরম ভাবভঙ্গি পছন্দ হতো না। ছেলেদের সঙ্গে স্কুলের বাইরে আড্ডা মারতাম। ম্যালে গিয়ে নানারকম দুষ্টুমি করতাম। কলকাতার বাঙালিরা দার্জিলিং-এ পৌঁছে বোধহয় ভাবে বিদেশে বেড়াতে এসেছে। যে মহিলা জীবনে হাফপ্যান্ট পরেননি তিনিও স্বামীর ফুলপ্যান্ট পরে ম্যালে স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করেন। সে দৃশ্য দেখলে মজা না করে পারা

যায় না। কিছু কিছু কলকাতার বাবু অনাবশ্যক ইংরেজি বলেন। বেশির ভাগই ভুল ইংরেজি। ম্যালের পাশে যে আস্তাবলের খচ্চরদের ঘোড়া বলে চালানো হতো তার পিঠে ওইসব বাবুবিবিরা বিশাল চেহারা নিয়ে উঠে বসতেন। আমরা স্থানীয় মানুষ বলে খচ্চরদের মালিকের সঙ্গে পরিচয় ছিল। তেমন পার্টি দেখলে আমি খচ্চর নিয়ে এগিয়ে যেতাম বাবুকে ম্যাল ঘোরাতে। লোকটা যতক্ষণ না বাবাগো মাগো বলে কান্নাকাটি করত ততক্ষণ ছাড়তাম না।

ডাক্তারি পাশ করার পর আমার বাবা সমস্যায় পড়লেন। এদেশে মেয়েদের বিশেষ একটা বয়সের পরে বিয়ে দিয়ে দেওয়া বাবা-মায়ের কর্তব্য বলে মনে করা হয়। সদ্য ডাক্তার হওয়া মেয়েকে ডেকে বাবা বললেন, 'তোমার বয়স হয়েছে। এবার সংসারী হওয়া উচিত। তুমি কি কোনো ছেলেকে জীবনসঙ্গী করবে বলে ভেবেছ? তেমনি হলে নির্দ্বিধায় বলতে পার।'

আমি হেসে ফেলেছিলাম। প্রশ্নটা করার সময় বাবার মুখ একদম অচেনা হয়ে গিয়েছিল। ঐ গলাতেও তিনি কখনও আমার সঙ্গে কথা বলেননি। আমি ছেলেবেলা থেকেই কো-এডুকেশন স্কুলে পড়ে এসেছি। ছেলেরা আমার বন্ধু হয়েছে। কিন্তু কখনই কোনো ছেলে সম্পর্কে আমার বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়নি। বরং সমবয়সী বন্ধুদের কখনই পরিণতবুদ্ধিসম্পন্ন বলে মনে হতো না। ওদের খুব সাধারণ মনে হতো। পরে দিল্লীতে গিয়েও একই অভিজ্ঞতা হয়েছে।

লোকে বলে আমার চেহারা নাকি একটু বেশিমাত্রায় সুন্দর ছিল। প্রায়ই এক-একটা ক্যাবলা ছেলে ইনিয়েবিনিয়ে কথা বলে শেষ পর্যন্ত প্রেমের প্রস্তাব দিত। প্রথম প্রথম খুব মজা লাগত। শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে দিতাম তাকে দেখে আমার মনে কোনো প্রেম আসছে না। না, এ নিয়ে কেউ কোনো ঝামেলা করেনি আমার সঙ্গে। ছেলেদের মুশকিল কি জানেন, ওরা যে মেয়েটিকে দেখে প্রফুল্ল হয় এবং প্রেমে পড়েছে বলে মনে করে, তখন চিন্তাও করে না সেই মেয়েটির ওইসব ইচ্ছে নেই। আমি প্রেম করতে চাইছি তাই তুমি কেন প্রেম করবে না, এইরকম একটা ধারণা তাদের হয়ে থাকে। এটা হয়েছে বা হয় কারণ অবচেতন মনে ছেলেরা নিজেদের উঁচু স্তরের বলে মনে করে। কী নির্বোধ ভাবনাচিন্তা।

আমার মুশকিল হলো, এমন কোনো ছেলের দেখা আমি পাইনি যাকে দেখে ভাবতে পারি ভালবেসে একসঙ্গে থাকা যায়। যাও, ওর সঙ্গে প্রেম কর বললেই কি প্রেম করা যায়? কুকুর-বেড়ালরাও পছন্দমতো সঙ্গী খুঁজে নেয়। এদেশে বিয়ের যে প্রচলিত ব্যবস্থা সেটা চালু হয়েছিল কারণ উদ্যোক্তারা অন্য কোনো ব্যবস্থা খুঁজে পাননি বলে (দুটো সম্পূর্ণ অচেনা নারীপুরুষকে মন্ত্র পড়িয়ে বলা হলো যাও তোমরা এখন ফুলশয্যা কর এবং বাকি জীবন একসঙ্গে সুখে থাক। দুজন দুজনের মন, অভ্যেস, রুচি কিছুই জানে না। তবু পুরুষটি বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে স্বামীর দাবি নিয়ে স্ত্রীকে বিবস্ত্রা করেন। মেয়েটির বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কিছুই করার থাকে না। পুরুষটি অপছন্দের হলেও তার কিছু করার থাকে না। আমি মনে করি, কাউকে প্রেম করো ওর সঙ্গে বললেই সে প্রেম করতে পারে না, তার মনে প্রেম আসা স্বাভাবিক নয় তেমনি উনি তোমাকে বিয়ে করছেন অতএব শোও ওর সঙ্গে বললে মেনে নেওয়া যায় না। এই মানিয়ে নিতে সাহায্য করার জন্য বাঙালির বিয়েতে কতকগুলো আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেই পাকাদেখা, গায়ে হলুদ, উপোস, আশীর্বাদ এবং বিবাহের সংস্কৃত মন্ত্র হলো ওই আয়োজন।)

ভেবেছেন কি, সংস্কৃত বিন্দুমাত্র বোঝে না অধিকাংশ বাঙালি। তবু পুজো বা বিয়েতে সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ হয় এবং পাঠ করা হয় শ্রাদ্ধেও। বাংলাতে অনুবাদ করে স্বচ্ছন্দে তা করা যেত। কিন্তু করা হয় না। কারণ তাহলে ভাষার অবোধ্যতার কারণে যে গম্ভীর আবহাওয়া তৈরি হয় সেট থাকবে না। ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলানো যাবে না।

বাবাকে জানালাম, আমার পছন্দের কোনো মানুষ নেই। বুঝলাম তিনি বিপাকে পড়েছেন। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি বিয়ে করে সংসার যদি সুখে করো তাহলে আমার ভাল লাগবে। কিন্তু আমি কাউকে তোমার ওপর চাপিয়ে দিতে চাই না। এখন বল স্বামী হিসাবে কিরকম পুরুষ তোমার পছন্দ ?'

বললাম, 'বিয়ে যে করতেই হবে তার কি বাধ্যবাধকতা আছে ?'

বাবা বললেন, 'তুমি বড় হয়েছ। সারাজীবন একা থাকা যায় কিন্তু একাকীত্ব সবসময় ভাল লাগবে না। তাছাড়া জৈবিক কারণেও বিয়ে প্রয়োজন।'

এই কথাটা সত্যি। যেহেতু আমি একজন মানুষ তাই দেহের প্রয়োজন অনুভব করি। কিন্তু সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্যে মনের স্বাভাবিকত্বকে জলাঞ্জলি দেওয়ার কথা ভাবতে পারি না

অতএব উত্তর দিতে হলো, 'যাকে আমি বিয়ে করব সে আমার চেয়ে কোনো অংশে কম হবে না। তাকে বন্ধু হতে হবে আগে, পরে স্বামী।'

বাবা ঠিক এই কথাগুলোই বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করলেন। চিঠি আসতে লাগল। কিন্তু বাবার নিজেরই তাদের পছন্দ হলো না। এই করতে করতে বাবা মারা গেলেন । সেসব পাঠ চুকলে দেখলাম বিয়ে করতে হলে নিজের বর নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে। কিছুদিন সেই চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, এমন একজন পুরুষকে খুঁজে পেলাম না যিনি আমাকে আকর্ষণ করতে পারেন। ইচ্ছে করলেই যেমন প্রেম করা যায় না, তেমনি চাইলেই বিয়ে করা গেল না।

এই করতে করতে অনেক বছর পার হয়ে গেল। দার্জিলিং-এ ডাক্তারি করি। সকাল থেকে সন্ধ্যে কাজের মধ্যে কেটে যায়। এখানকার মানুষ ডাক্তারদিদি ডেকে আমাকে প্রায় মাথায় করে রেখেছে। এদের জন্যে কিছু করতে পারলে আমার ভাল লাগে। আমি যেসব কাজ করি তা ফিরিস্তি দিলে ভাববেন নিজের ঢোল পেটাচ্ছি।

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে শরীর এবং মন আনচান করে। কিন্তু সেটা সাময়িক। পছন্দ হয়নি বলে একা আছি। আমি কোনো সমস্যার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি না। এখন চারপাশে বিবাহবিচ্ছেদের প্রায় ঢল নেমেছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যেসব মেয়েদের নেই তারা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। আমার অন্তত সেরকম কিছুর মুখোমুখি হতে হচ্ছে না।

আমি বলছি না কক্ষনো বিয়ে করবো না। তেমন কাউকে পেলে নিশ্চয়ই করব। এদেশে বিয়ের ব্যবস্থা চালু হয়েছিল বহুকাল আগে। তখন পাত্রীর বয়স দশ-বারো। তাদের মনই তৈরি হয়নি সেসময়। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সেই কাদার তালকে শাশুড়ি নিজেদের মতো গড়ে নিতেন ব্যবস্থাটা এখনও একই আছে, পাত্রীর বয়স সাতাশ-আটাশে পৌঁছে গেছে। তার পক্ষে দশ বারো বছরের মেয়ের মতো আচরণ করা সম্ভব নয় এটা কেন কেউ বোঝেন না !

নিজের কথা বলতে গিয়ে একটু বেশি কথা বলে ফেললাম।

সমরেশবাবু, আগেই স্বীকার করেছি, আপনার লেখা আমি আগে পড়িনি। পড়ার সময় পাই না। কিন্তু মেয়েরা যেমন হয় পর্যায়ে লেখার সময় একটু অন্যধরনের মেয়েদের কথাও ভাবুন না। আপনি এত দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন, আপনি নিশ্চয়ই তাদের দেখেছেন।

শুধু চোখের জলে ভেজা মেয়ে নয়, মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো মেয়েদের কথাও লিখুন। দেখবেন তাতে আপনার বই বিক্রির খুব একটা হেরফের হবে না। শুভেচ্ছা রইল। অঙ্গনা মিত্র।

লেখকের নিবেদন

এই চিঠিটা হুবহু ছেপে দিলাম। আমাদের পাঠকবন্ধুদের মতামত জানতে আমি উৎসুক।

গত সংখ্যার লেখায় যে চিঠিটা ছাপিয়েছিলাম সেটা পড়ে অনেকে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কেউ কেউ আমাকে চিঠি লিখে সেই ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। এই সব চিঠির বক্তব্য, পুরুষদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে কোনো মহিলা যদি একা বেঁচে থাকতে চান তাহলে তাঁর মস্তিষ্কে কিঞ্চিৎ অসুস্থতা আসতে বাধ্য। একজন মজা করে লিখেছেন, রোগের বীজাণু থেকে তৈরি ওষুধ প্রয়োগ করলে যেমন মানুষের অসুখ সারে এও অনেকটা তেমনি (পুরুষমানুষ একটি রোগের নাম। সেই রোগ কখনও কখনও মহিলাদের মন এবং শরীরে ওষুধের কাজ করে। উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, অবিবাহিতা মহিলারা একা থাকতে থাকতে নাকি খিটখিটে হয়ে যান। বিবাহিতাদের ক্ষেত্রে এটা খুব কম দেখা যায়।)

এসব ব্যাপারে আমার জ্ঞান খুব সামান্য। তবে প্রকাশিত চিঠিটি আমাকে মোটেই বিরক্ত করেনি বরঞ্চ শিক্ষিত করেছে। আমি পত্রলেখিকার কাছে কৃতজ্ঞ। আমার ত্রুটি দেখতে পেয়ে তিনি তিরস্কার করেছেন, এই অধিকার নিশ্চয়ই ওঁর আছে।

ওঁর ওই চিঠি পড়ে একটি মুখের ছবি চোখের সামনে এল। আজকের গল্প তাঁকে নিয়ে। তিনি এই শহরেই আছেন, তাঁকে নিয়ে লিখছি জানলে তিনি খুব বিরক্ত হবেন। কারণ যে কোনো ব্যাপার মনের মতো না হলে তিনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেন, 'রাবিশ্।'

সঙ্গত কারণেই তাঁর নাম পাল্টাতে বাধ্য হচ্ছি।

পার্ক স্ট্রিট আর এলগিন রোডের মধ্যে কলকাতার যে অঞ্চলটি তার একটা নিজস্ব আভিজাত্য রয়েছে। উত্তর বা দক্ষিণ কলকাতার মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে এই অঞ্চলের

মানুষের মেলে না। জায়গাটায় একসময় সাহেবরা থাকতেন তাই তাঁদের আদব-কায়দা অনুকরণ করেছেন ওখানকার বাঙালি বাসিন্দারা। তাঁরা অভিজাত, শিক্ষিত এবং অর্থবান ছিলেন। স্বাধীনতার পরে এই সব জায়গা মহামূল্যবান হয়ে গেল। অর্থের যোগান কমে যেতে অনেক বঙ্গসন্তান বিশাল বাগানওয়ালা বাড়ি বিক্রি করে ফ্ল্যাট কিনে দক্ষিণে চলে গেলেন। অবাঙালিরা সেগুলো ভেঙে আকাশচুম্বী বাড়ি বানাতে লাগল। এখন হাতে গোনা যায় এমন কিছু বাঙালি তাঁদের পূর্বপুরুষের বাড়ি ধরে রাখতে পেরেছেন।

মনীষা মিত্র এরকম একটি বাড়িতে জন্মেছিলেন। তাঁর বাবার আভিজাত্য এবং পাণ্ডিত্য দুইই প্রবল ছিল। মেয়েকে শিক্ষিতা করতে তিনি কোনো কার্পণ্য করেননি। অভিজাত স্কুল ও তিনজন গৃহশিক্ষিকা মেয়ের ভিত তৈরি করেছিলেন। আট-দশ বছর বয়স থেকেই ইংরেজির সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী এবং জার্মান শেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। কারণ ভদ্রলোক মনে করতেন ওই দুটো ভাষা না জানলে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারের সত্তরভাগই অজানা থেকে যাবে।

মনীষা ছাত্রী হিসাবে প্রথমশ্রেণীর ফল করত। ইংরেজি বলত চমৎকার। কিন্তু ষোল বছরে পা দেওয়ার আগেই প্রেমে পড়ল। যে ছেলেটাকে সে প্রেম দিল সে কবিতা লেখে, আশুতোষ কলেজে পড়ে, পাজামা-পাঞ্জাবি আর কাঁধে ঝোলা নিয়ে কফিহাউসে আড্ডা মারে। ফরাসী জার্মান দূরের কথা ইংরেজিতে পাঁচ মিনিট কথা বলতে পারে না। নিম্নমধ্যবিত্ত বাড়ির এই ছেলেটির সামনে কোনো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নেই। কি করে আলাপ হয়েছিল জানা নেই কিন্তু প্রায়ই স্কুলের পর মনীষাকে দেখা যেত ছেলেটিকে নিয়ে বড় রেস্টুরেন্টে বসে গল্প করছে। অবশ্যই মনীষা বিল মেটাতো। মনীষার বাবা ব্যাপারটা জেনে মেয়েকে প্রশ্ন করলেন। মনীষা ঝটপট স্বীকার করল, 'হ্যাঁ, বাবা, ওকে আমার খুব পছন্দ হয়।'

'কেন ?'

'ওর মধ্যে অদ্ভুত স্পার্ক আছে।'

'সেটা তুমি কিভাবে আবিষ্কার করলে ?'

'ওর চোখ দেখে।'

'কিন্তু এত অল্প বয়সে নিজেকে শক্ত মাটির ওপর দাঁড় না করিয়ে তুমি যা করছ সেটা আমি সমর্থন করছি না। এই ছেলেটি তোমাকে কোনো শেল্টার দিতে পারবে না।'

'আশ্চর্য ! ওর কাছে আমি শেল্টার চাইব কেন ?'

'তোমরা যদি পরস্পরকে ভালবাসো তাহলে নিশ্চয়ই বিয়ে করবে।'

'বিয়ে ? আমি তো এ ব্যাপারে কিছুই ভাবিনি।'

মেয়ের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বাবা বললেন, 'আই সি। তাহলে তোমাকে আমি অনুরোধ করব ছেলেটির সঙ্গে দেখাশোনা বন্ধ কর।'

'কেন ?'

কারণ সে নিম্নমধ্যবিত্ত ছেলে। আবেগসর্বস্ব। জিজ্ঞেস করে দেখো, সে ইতিমধ্যে তোমাকে বিয়ে করে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে আরম্ভ করেছে।'

'ওঃ, না ! কখনই না। তুমি প্রিমিটিভ কথা বলছ !' মেয়ে সরে গেল সামনে থেকে।

সেদিন বিকেলবেলায় বাড়ি ফিরে মনীষা তার বাবাকে বলল, 'আই অ্যাম সরি বাবা। ইউ আর রাইট।' বাবা কিছু বলেননি, মাথা নেড়েছিলেন মাত্র।

সেই সন্ধ্যেবেলায় মনীষার খুব দুঃখ হয়েছিল। কাউকে ভাল লাগলে, বন্ধুর মতো মিশলে, সে কেন চট করে বিয়ের কথা ভাববে ? ভালবাসা মানে আর কিছু নয় ? যেন একটা বাগান, যার নাম ভালবাসা আর তার চারপাশের দেওয়ালটার নাম বিয়ে। কিন্তু বাগান শুধু ফুলের হবে কেন, ঘাসেরও তো হতে পারে ! দিগন্তছোঁয়া ঘাসের মাঠ, কোনো দেওয়াল নেই। এটা কেন ভাবতে পারে না কেউ ? প্রথম প্রেম এভাবেই শেষ হয়েছিল মনীষার।

স্কুলের শেষ পরীক্ষায় মনীষা যে রেকর্ড নম্বর পাবে তা ওর বাবাও কখনও কল্পনা করেননি। এইসময় থেকে মনীষার কথাবার্তায় বিপুল আত্মনির্ভরতা দেখা গেল। প্রেসিডেন্সি লজের ভালো ছাত্রী শুধু নয়, ডিবেটে ওকে হারাতে অন্য কলেজের কেউ সক্ষম ছিল না। মনীষা সুন্দরী ছিল, এবার চেহারায় জ্যোতি এল। ভালকে ভাল এবং খারাপকে খারাপ মুখের ওপর বলতে যে মেয়ের দ্বিধা নেই তাকে সমীহ না করে কেউ পারে না। ছেলেরা ওর সঙ্গে কথা বলতে পারলে বর্তে যেত কিন্তু প্রেম নিবেদন করতে সাহস পেত না। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ধ্যাপকরা ওকে দেখে দুর্বল হয়ে যেতেন। তাঁদের একজন নিজে থেকেই তাকে পড়াতে চয়েছিলেন। মনীষা বলেছিল, 'আমার উচিত আপনার বাড়িতে গিয়ে পড়া। কিন্তু আমি কিছুতেই সময় বের করতে পারছি না। আপনি কি আমার বাড়িতে আসতে পারবেন ?'

অধ্যাপক মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ।'

অধ্যাপক বিগলিত হলেন। কিছুদিন পড়ানোর পর কলেজে রটে গেল মনীষা সেই ধ্যাপকের সঙ্গে প্রেম করছে। কথাটা কানে যেতেই মনীষা ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি শুনছেন ?'

'আপনার প্রতিক্রিয়া ?'

'তোমার আপত্তি না থাকলে আমি খুশী হব।'

'আপত্তি থাকবে কেন ? আপনার সঙ্গে কথা বললে অনেক কিছু জানা যায় যা আমাকে খুঁজে খুঁজে বই থেকে পড়ে জানতে হতো।' মনীষা হাসল।

অধ্যাপক খুব খুশি। কিন্তু পরদিনই মনীষা ক্লাসের শেষে অধ্যাপকদের ঘরে ঢুকে গিয়ে অন্যদের সামনে বলল, 'চলুন, একটু কফি খেয়ে আসি।'

অধ্যাপক থতমত হয়ে গেলেন। অন্যান্য অধ্যাপকরা মুখ টিপে হাসছেন। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক বলতে পারলেন, 'কফি ? মানে, আমি এখন একটু ব্যস্ত !'

মনীষা অভিমান করল, 'এত ব্যস্ত যে আমার অনুরোধ রাখতে পারবেন না !'

অগত্যা মুখ কাঁচুমাচু করে অধ্যাপক ছাত্রীর সঙ্গী হলেন। অন্যান্য অধ্যাপকরা 'কি দিন পড়ল' গোছের মাথা নাড়তে লাগলেন। করিডোর দিয়ে হেঁটে আসার সময় পরিচিত ছাত্র-ছাত্রীর মুখ দেখলেই মনীষা বলতে লাগল, 'আমরা একটু কফি খেতে যাচ্ছি। এসো না।' ছেলেমেয়েরা কৌতূহলী হয়ে পেছনে এল।

কফিহাউসের টেবিলে ওদের ঘিরে আরও আটজন। কেউ কথা বলছে না। মনীষা কাঁধ

ঝাঁকাল, 'কি ব্যাপার ? শ্মশানের মৌনতা কেন ? আপনি কিছু বলুন ?'

অধ্যাপক মাথা নিচু করে বললেন, 'আমি কি বলব !'

'যা ইচ্ছে। আচ্ছা, ওদের এখানে এনে আপনাকে কি অসুবিধেয় ফেলেছি ?'

অধ্যাপক বললেন, 'তা নয়, আসলে আমার খুব জরুরি কাজ ছিল।'

'ও তাই বলুন। তাহলে আপনি যান, আপনাকে আটকাবো না।'

'কফির দামটা দিয়ে যাই ?'

'না। আমি তো আপানাকে ডেকেছি, দাম আমিই দেব।'

উঠে যেতে পেরে অধ্যাপক যেন বেঁচে গেলেন। মনীষা চাপা গলায় মন্তব্য করেছিল, 'যাচ্চলে ! এই ভদ্রলোক আর কোনোদিন আমার সঙ্গে প্রেম করতে চাইবেন না !'

একটি ছেলে ফস্ করে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে কি তোমরা স্টেডি যাচ্ছিলে না ?'

'স্টেডি গেলে ওকে এখানে না এনে বাড়িতে নিয়ে যেতাম।' মনীষা উঠে দাঁড়িয়েছিল

ইকনমিক্সে রেকর্ড নম্বর পেয়ে গ্রাজুয়েট হলো মনীষা। ওর বাবার ইচ্ছে ছিল এবার লন্ডনে পড়তে যাবে মেয়ে। এবং সেটা বাধ্য মেয়ের মতো মেনে নিল মনীষা। সেখানে ভর্তি হতে তার কোনো অসুবিধা হয়নি। তিন মাসের মাথায় বাবা চিঠি পেলেন, 'আমি প্রেমে পড়েছি। এবার খুব সিরিয়াস। ছেলেটি উত্তরপ্রদেশের। এখানেই জন্ম। আমার সঙ্গে মিলেছে ভাল।' বাবা লিখলেন, 'আমার অভিনন্দন নাও। আমি জানি তুমি যেজন্য গিয়েছ সেটা ঠিকভাবে শেষ করবেই যতই প্রেমে পড়ো না কেন !'

চিঠিটা গৌতম শর্মাকে দেখাল মনীষা। ওয়াটারলু ব্রিজের কাছে একটা ফ্ল্যাটে গৌতম থাকত। ফ্ল্যাটটা ওর বাবার। গৌতম বলল, 'তোমার বাবা ইন্ডিয়াতে থেকেও বেশ আধুনিক।'

গৌতমের সঙ্গে মনীষার আলাপ মাস দুয়েকের। প্রথম দর্শনেই প্রেম। শরীরের আনন্দ গৌতম তাকে প্রথম দিয়েছে। সেটা আবিষ্কার করবার পর মনীষা মন খারাপ সারাবার ওষুধ পেয়ে গেছে। যখনই মন খারাপ হয়, একা লাগে, তখনই সে গৌতমের ফ্ল্যাটে চলে আসে। ভালবাসাবাসি শুরু হয় এবং চরম আনন্দে সেটা পূর্ণতা পায়। আর তারপর মনীষা আবিষ্কার করে তার মন ভাল হয়ে গিয়েছে। গৌতম স্বীকার করেছে তার জীবনে গোটা পাঁচেক মেয়ে এসেছে, মনীষাই প্রথম নয়। কিন্তু তারা কেউ মনীষার সমগোত্রীয় নয়। মনীষা যে এতকাল কুমারী ছিল তা গৌতম মেনে নিয়েছে কিন্তু পরবর্তীকালে উৎসাহ দেখে বলেছে এত তাড়াতাড়ি কেউ নিজেকে তৈরি করতে পারে সেটা সে জানত না।

একদিন মনীষা বলল, 'গৌতম আমরা বিয়ে করলে কেমন হয় ?'

গৌতম বলল, 'সানন্দে করা যেতে পারে !'

'তোমার বাড়ির লোকজন ?'

'লোকজন বলতে আমার বাবা। তিনি একটু অসুস্থ। মা নেই। সুতরাং সমস্যাও নেই।'

'তাহলে ব্যবস্থা কর।'

'কিন্তু প্রথম আলাপে তুমি বলেছিলে বাগানের চারপাশে দেওয়াল তুলতে চাও না।'

'বলেছিলাম, কিন্তু সবুজ ঘাসের উপত্যকার শেষে যদি দিগন্তরেখা না দেখা যায় তাহলে

উপত্যকার চেহারাটা ঠিক খোলে না।'

অতএব সই হয়ে গেল। কয়েকজন বন্ধুবান্ধব সাক্ষী থাকল। প্রথম বছরে, ভাল ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও কোনো স্কলারশিপ পায়নি। বাবার এক বন্ধু তাকে অর্থসাহায্য করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মাস থেকেই সে নিজে রোজগার আরম্ভ করেছিল। খুবই অল্প কিন্তু তাতে তার চলে যেত। মনীষা এবার চলে এল গৌতমের ফ্ল্যাটে। বড় সুখ তখন। শরীর এবং মনের। কিন্তু শারীরিক মনের পাশাপাশি বাস্তব যে মন রয়েছে, কয়েকদিনের মধ্যে সে উশখুশ শুরু করল। পড়াশুনা তেমন হচ্ছে না। অনর্গল প্রেমে সময় চলে যাচ্ছে। প্রায়ই গৌতম বেরিয়ে যায়। কোথায় যায় জিজ্ঞাসা করলে উত্তরটায় স্বাভাবিকতা থাকে না। মনীষা ভাবত প্রত্যেকের কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপার আছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যত গাঢ়ই হোক বাথরুমে ঢুকে কে কি করছে তা নিশ্চয়ই অন্যকে জানানোর দায় নেই, জানতে চাওয়াও বোকামি।

কিন্তু গৌতমের কিছু বন্ধু ছিল। বিয়ের আগে তাদের কয়েকবার সে এই ফ্ল্যাটে দেখেছে। মনীষা এলেই তারা বেরিয়ে যেত। বিয়ের পর তারা আসা বন্ধ করেছিল। তাদের একজন হঠাৎ চলে এল। গৌতম তখন ফ্ল্যাটে নেই। ছেলেটি একজন মুল্যাটো। ওর মা বা বাবার কেউ একজন আফ্রিকান ছিলেন, শ্বেতাঙ্গ বা শ্বেতাঙ্গিনীর সংস্রবে জন্মেছে। গায়ের রং তামাটে কিন্তু ফরসার দিকে। মাথার চুল কোঁকড়া। লম্বা নয়, বেঁটেই বলা যেতে পারে। একটু মেয়েলি চাহুনি। এসে সে কান্নাকাটি শুরু করল। মনীষা অনেক চেষ্টায় তাকে শান্ত করতে পারল। তার কান্নার কারণ ছেলেটা বলতে চাইছিল না প্রথমে। শুধু অনুযোগ করছিল কেন মনীষা গৌতমকে বিয়ে করল! মনীষা বুদ্ধিমতী। কথার খেলায় ছেলেটাকে কব্জা করতে অসুবিধে হলো না। মনীষাকে বিয়ে করার আগে গৌতম নাকি ছেলেটাকে ভালবাসত। পুরুষের সঙ্গে পুরুষের শরীরের সম্পর্ক ওদেশে এখন আর সঙ্কোচের নয়। এই ছেলেটি পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে নারী-নারী ভাব প্রবল। সে গৌতমকে নিজের সম্পত্তি বলে ভেবে নিয়েছিল। কিন্তু মনীষা আসার পরে গৌতম তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। সে যে ফ্ল্যাটে থাকে সেখানে আরও সঙ্গী আছে। তাই গৌতমকে সে সেখানে নিয়ে যেতে পারে না। হোটেলে ঘর ভাড়া করার ক্ষমতাও তার নেই। বজ্রাহতের মতো মনীষা এসব কথা চুপচাপ শুনল।

গৌতম বাড়ি ফিরলে সে কৈফিয়ৎ চাইল। গৌতম একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে বলল, 'শোন খুকী। তোমাকে বিয়ে করার আগে আমি অনেক কিছুই করতে পারি। তুমি যখন আমার জীবনে আসোনি তখন আমি কি করেছি তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? তোমাকে বিয়ে করার পরে তো আমি কিছুই করিনি! করেছি?'

'তুমি বিয়ের আগে এসব আমাকে বলোনি কেন?'

'দরকার মনে করিনি। যেমন দরকার মনে করিনি তোমাকে জিজ্ঞাসা করার যে তুমি কিছু করেছ নাকি? তুমি যা বলবে তাই বিশ্বাস করতে হতো। অতএব জিজ্ঞাসা করে কি লাভ?'

'কিন্তু তোমার ওই পুরুষসঙ্গী আমাকে ডিস্টার্ব করেছে।'

'এটা করার কোনো অধিকার ওর নেই। আমি বুঝিয়ে দেব। দ্যাখো মনীষা, তোমাকে আমি ভালবাসি। কিন্তু সেক্সের কথা যদি বল আমি ওকে পছন্দ করি।'

বাঙালি মেয়ে হিসেবে কোনো প্রথাগত ভাবনায় বড় না হলেও খুব অপমানিত বোধ করল মনীষা কথাটা শুনে। সেই দিনই তাদের বিছানা আলাদা হলো। কিন্তু বিয়ে ভাঙল না। মনের ওপর যে চাপ জমল তা সরাতে বেশ কিছু বছর গিয়েছে মনীষার। ইতিমধ্যে পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। ইকনমিক্সে তার মতো ফল এর আগে কোনো ভারতীয় মেয়ে করেনি।

এর পরেই মনীষার বাবা কলকাতায় বসে মেয়ের চিঠি পেলেন, 'বাবা, মনে হচ্ছে আর নয়। গৌতমকেও বলেছি। বিয়েটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমরা আলাদা হচ্ছি।'

বাবা লিখলেন, 'জীবনযাপন করতে যাতে অসুবিধে না হয় তাই তোমার করা উচিত।'

ততদিনে মনীষার আর্থিক অসুবিধে ছিল না। বিবিসিতে ফ্রিল্যান্সার হয়ে ও নিয়মিত কাজ শুরু করে দিয়েছিল। সেইসঙ্গে অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা। বিবিসির সঙ্গে সংযোগ ওকে ওপরতলার মানুষদের কাছে নিয়ে গেল। ডক্টরেট পাওয়ার পর দেশে এবং বিদেশে অনেকগুলো চাকরি তার কাছে সহজলভ্য হয়ে গেল। এই পর্বে তার মনে প্রেম আসেনি। কিন্তু কখনও কখনও কোনো ছেলেকে দেখে সে চঞ্চল হয়েছে। তার শারীরিক আকর্ষণ প্রবল থাকায় ছেলেটিও ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে। দিন সাতেকের ঘনিষ্ঠতার পর মনীষা তাকে শীতল গলায় সরিয়ে দিয়েছে। এবং এ নিয়ে তার কোনো আক্ষেপ ছিল না। কোনো পাপবোধে সে আক্রান্ত হয়নি। এই সব ছেলেদের কেউ ইনটেলেকচুয়াল নয়, পড়াশুনা বা বোধে তার অনেক নিচের স্তরের। চোখের দেখা থেকে যে আকর্ষণের জন্ম তার নিবৃত্তি ঘটলেই এদের বহন করার কোনো দরকার বোধ করেনি সে। ফলে মনীষার দুর্নাম বাড়ছিল। লন্ডন খুব বড় শহর নয়। ভারতীয়দের চিহ্নিত করতে খুব কম সময় লাগে। অতএব মনীষা প্রচারিত হতে লাগল।

পৃথিবীতে একটা অলিখিত নিয়ম চালু আছে। যারা সাধারণ, যাদের নামের পাশে এ বি সি ডি লেখা নেই, তাদের যদি একবার দুর্নাম চালু হয় তাহলে আর তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। অদ্ভুতভাবে পরিচিত-অপরিচিতের ঘৃণার শিকার হয় তারা। কিন্তু যারা নামী বা কিঞ্চিৎ প্রতিভাবান তাদের দুর্নাম গহনার মতো কাজ করে। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে যৌন কেলেঙ্কারির মামলা চালু হওয়া সত্ত্বেও তিনি দেশের মানুষের কাছে জনপ্রিয়তম ব্যক্তি। হিন্দি ছবির নায়িকা রেখার জীবনে নানান ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর অভিনয়-প্রতিভার কারণে লোকজন 'ম্যাডাম' বলে শ্রদ্ধা করে। অতখানি না হলেও মনীষার ক্ষেত্রে সেরকমই হলো। যে মেয়ে সোনিয়া গান্ধীকে বিবিসিতে ইন্টারভিউ করে তার সম্পর্কে যত গল্পই থাকুক লোকে চেয়ার ছেড়ে দেয় হাসিমুখে।

মনীষা ঠিক করল অর্থনীতি তার বিষয় হলেও সে অধ্যাপনার জগতে যাবে না। বর সাংবাদিকতা তাকে আকর্ষণ করল। বিবিসি ততদিনে তাকে পাকা চাকরি দিয়েছে। নিয়মিত তার প্রোগ্রাম হয় সেখানে। সেগুলো বেশ জনপ্রিয়। এবং এই সময় সে দিল্লিবাসী এক বঙ্গসন্তানের প্রেমে পড়ল। ভদ্রলোক বড় ব্যবসায়ী। শিক্ষিত। রুচিসম্পন্ন। এই প্রেমে মন ছিল। মাসখানেকের মধ্যেই তারা বিয়ে করল লন্ডনে। বিশাল পার্টি দেওয়া হয়েছিল। গৌতমের সঙ্গে বিয়েটা ছিল সাদামাটা, লোকজনকে না নেমন্তন্ন করে। সুভদ্র হিলটনে যে পার্টি দিল তাতে

তাবড় তাবড় নামী মানুষেরা হাজির। মনীষা সুন্দরী, সেদিন সেজেছিল উর্বশীকে লজ্জা দিয়ে। কলকাতা থেকে বাবাকে নিয়ে গিয়েছিল উড়িয়ে। মেয়ের সুখে বাবা সুখী হয়েছিলেন। লন্ডনে সুভদ্রর ব্যবসার একটা শাখা ছিল। সেই উপলক্ষে তাকে লন্ডনে আসতে হতো। স্ত্রীর সান্নিধ্য তখনই পেত সে। গুণবতী রূপসী স্ত্রীকে পেয়ে সে ধন্য হয়ে গিয়েছিল। সতী স্ত্রীর মতো ঘর-সংসার করার ইচ্ছে থাকলেও সম্ভব ছিল না মনীষার পক্ষে। কর্মসূত্রে তাকে খুব ছোটাছুটি করতে হতো। সুভদ্র চায়নি সে আর চাকরি করুক। বলত, 'তুমি সব ছেড়ে দিয়ে আমার ব্যবসা দ্যাখ।'

মনীষা হেসে বলত, 'এটা তোমার ব্যবসা। আমি জয়েন করলেও লোকে তোমার ব্যবসাই বলবে। আমাকে কর্মচারী মনে করবে। তাছাড়া ওসবের কিছুই বুঝি না আমি। আমি যে কাজ করছি তাতে আমার ভাল লাগা আছে, সেটাতে আপত্তি করবে তুমি ?'

সুভদ্র আর আপত্তি করেনি। প্রতি মাসে সে লন্ডনে যেত। তখন তাকে সময় দিত মনীষা। সে বড় সুখের সময় ছিল। বছরখানেক বাদে আগে জানিয়ে লন্ডনে গিয়ে সুভদ্র চিরকূট পেল, 'রানীর সঙ্গে আফ্রিকা সফরে যাচ্ছি। সাদা-কালো বর্ণবিদ্বেষের পটভূমিতে এই সফর কভার করা খুব জরুরি। মনীষা।'

সুভদ্র খুব দুঃখ পেল। চলে যাচ্ছে একথা মনীষা তাকে ফোনে জানালে সে লন্ডনে আসত না। দুঃখ থেকে অভিমান, অভিমান থেকে রাগ। সুভদ্র বিবিসিতে খবর নিয়ে জানল রানী জোহানর্সবাগে গিয়েছেন। মনীষাও এখন সেখানে। সুভদ্র পরের প্লেনে চলে এল জোহানর্সবাগে। পাঁচতারার যে হোটেলে মনীষা ছিল সেখানে পৌঁছতে তার অসুবিধে হলো না। রিসেপশন থেকে জানতে পারল ম্যাডাম এখন ঘরে আছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে। তিনি ব্যস্ত আছেন। সুভদ্র হাসল। বিশ্রাম নেবার জন্য মনীষা এই আদেশ দিয়েছে, তাকে দেখলে সে নিশ্চয়ই উৎফুল্ল হবে। সে সোজা মনীষার ঘরে গিয়ে নক্ করল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তৃতীয়বার নক্ করে সে দেখল দুজন হোটেলের গার্ড এসে তাকে নিচে যেতে বলছে। ম্যাডাম খুব অসন্তুষ্ট হয়ে রিসেপশানকে ধমকেছেন। তারা কোনো কথা না শুনে সুভদ্রকে নিচে নামিয়ে আনল। সুভদ্র রিসেপশনিস্টকে জানাল সে ম্যাডামের স্বামী। কিন্তু ভদ্রলোক বললেন আপনি টেলিফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন। সুভদ্র ফোন করল। মনীষার গলা পেয়ে সে বলল, 'তোমার দরজা থেকে ফিরে এসেছি। তুমি কি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও ?'

মনীষা অবাক হয়ে বলল, 'আরে ? তুমি ? এখানে কি করে এলে ?'

'এসেছি। এটাই শেষ কথা। তুমি কি খুশি হওনি ?'

মনীষা বলল 'নিশ্চয়ই খুশি হয়েছি। তুমি মিনিট পনের অপেক্ষা কর। আমি লাউঞ্জে আসছি। মিনিট পনেরর মধ্যে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

'তোমার ঘরে কি কেউ আছে ?'

'হ্যাঁ। সিভিল রাইট ফর ব্ল্যাক পিপল দাবি নিয়ে যারা এখানে আন্দোলন করছে তার সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলছি আমি।'

সুভদ্র টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে সোজা এয়ারপোর্টে চলে এল। সেখান থেকে লন্ডনে। এবং এসেই গৌতমের সঙ্গে যোগাযোগ করল। এই লোকটার সব কথা

সে মনীষার কাছে শুনেছিল। তখন মনে হয়েছিল গৌতম সাপের মতো, কথা বলার কোনো ইচ্ছে হয়নি। এখন মনে হলো মনীষা যা বলেছিল সেটা সত্যি কিনা যাচাই করা দরকার। গৌতম পুলকিত হলো। মনীষার প্রশংসা করল খুব। শুধু বলল, 'যৌন ব্যাপারে ও একটু দুর্বল। কিন্তু সেটা ক্ষণিকের জন্যে।'

'এ ব্যাপারে আপনার কি অভিজ্ঞতা?'

'যাকে ভাল করে জানে না তার সঙ্গে সময় কাটিয়ে ও ছুঁড়ে ফেলে দিতে জানে।'

সেই রাত্রে লন্ডনের ফ্ল্যাটে সুভদ্র আত্মহত্যা করল। একেবারে দিশি প্রথায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ল সে।

লন্ডনে ফিরে ফ্ল্যাটে পৌঁছে স্বামীর মৃতদেহ আবিষ্কার করল মনীষা। প্রথমে খুব ভেঙে পড়েছিল সে। সুভদ্র নোট রেখে গিয়েছিল, তার মৃত্যুর জন্যে সে নিজেই দায়ী। পুলিশ সেটাই মেনে নিয়েছিল। প্রাথমিক শোক কেটে যাওয়ার পর মনীষার মনে হয়েছিল সে একজন নির্বোধ মানুষকে বিয়ে করেছিল। স্ত্রীকে সন্দেহ করে অভিমানে যে আত্মহত্যা করে তাকে নির্বোধ ছাড়া কি বলা যায়! সন্দেহটা সত্যি কিনা তা সে যাচাই করার প্রয়োজন মনে করল না? আর যে স্বামী মনে করে অন্য একটি পুরুষের সঙ্গে বন্ধ দরজার ভেতরে কাজের আলোচনা করার অধিকার স্ত্রীর নেই তার সঙ্গে বসবাস করা মুশকিল হতো। ইংলন্ডের কিছু ছোট কাগজ এ নিয়ে লেখালেখি করেছিল। হু কিলড্ সুভদ্র? জেলাসি? মনীষা গায়ে মাখেনি।

ঠিক এর পরেই বম্বের একটা বড় ইংরেজি ম্যাগাজিন মনীষাকে প্রস্তাব দিল সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে। ফ্ল্যাট, গাড়ি, প্রচুর মাইনে এবং স্বাধীনতা। মূলত মহিলাদের জন্যে পত্রিকাটিকে ঢেলে সাজানোর দায়িত্ব নিয়ে লন্ডনের পাট চুকিয়ে চলে এল মনীষা। বম্বেতে এই কাগজটি দাঁড় করাতে যে উদ্যোগ নিল সে তা দেখে সবাই অবাক। কোনো আপোস সে করবে না এই চুক্তিতে সে কাজটা নিয়েছিল। পুরনো পন্থীদের বিদায় করে নতুন রক্ত নিয়ে এল সে অফিসে। শুধু মেয়েলি সমস্যা নয়, মেয়েদের মাথা তুলে দাঁড়াবার সৎসাহসও কাগজটির মাধ্যমে পৌঁছে দিল সে। সেইসঙ্গে বোম্বের ফিল্মজগতের অন্দরমহলের গোপন খবর যা প্রথম সংখ্যা থেকে আলোড়ন তুলল। যে অভিনেতা ছবি পিছু এক কোটি টাকা নিয়ে আয়করকে দু'লক্ষ দেখান তার বিস্তারিত বিবরণ ছেপে দিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিল সে। প্রযোজকের ছদ্মবেশে রিপোর্টার পাঠিয়ে অভিনেতার সমস্ত কথা টেপে রেকর্ড করে রেখেছিল বলে অভিনেতা মামলা করেও আপসের চেষ্টা করলেন। কাগজটির বিক্রি বাড়ল হু হু করে, সেই সঙ্গে বিজ্ঞাপন আসতে লাগল চমকপ্রদভাবে। আর এই কারণে মনীষা বম্বেতে বিখ্যাত হয়ে গেল রাতারাতি। মনীষা লিখল, ফিল্মের নায়কদের গোপন টাকা আছে, রূপ আছে কিন্তু বিদ্যের চর্চা নেই। না আছে কোনো বুদ্ধির দীপ্তি। ফিল্মের বাইরে যেসব শিল্পপতি এখন যুবক এবং গ্ল্যামার আছে, আছে গোপন জীবন তাদের আপনাদের সামনে উপস্থিত করব। কারণ এরা বুদ্ধিমান। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পপতি মহলে হৈচৈ পড়ে গেল। সবাই চাইল আক্রান্ত না হতে।

এইসময় মনীষা তৃতীয়বার বিয়ে করল। এই মানুষটি তার থেকে বয়সে অনেক বড় ভদ্রলোকের নাম হরিশংকর ত্রিবেদী। অধ্যাপনা করেন। স্ত্রী মারা গিয়েছেন বছর দশেক আগে।

কটি মেয়ে রয়েছে বছর বারোর। সারাক্ষণ পড়াশুনো নিয়ে থাকেন। আর লেখেন। ওঁর লেখা পড়ে
ীষা চিঠি লিখেছিল। সেই সূত্রেই আলাপ। কথা বলার পর মনে হয়েছিল যেন হিমালয়ের নিচে
়স দাঁড়িয়েছে। একটা মানুষের অনেক জ্ঞান থাকতে পারে কিন্তু সেই সঙ্গে বিনয়ের মিশ্রণ তাকে
রও বড় করে তোলে। মনীষা আবিষ্কার করল হরিশংকর কথা বললেই সে কিছু না কিছু জানতে
রছে। বারো বছরের মেয়েটির সঙ্গে ভাব জমতে দেরি হলো না। সুন্দরী বিখ্যাত মহিলার প্রতি
কর্ষণ বালিকাটি এড়াতে পারল না। মনীষা বিয়ের প্রস্তাব দিলে হরিশংকর দ্বিধায় পড়লেন। প্রথম
র স্মৃতি তাঁর মনে প্রবল ছিল। কিন্তু চাপ এল মেয়ের কাছ থেকে। সে যখন দু'বছরের তখন তার
মারা গিয়েছিল। মাকে যা জেনেছে তা অন্যের মুখ থেকে অথবা ছবি দেখে। মায়ের চলে
ওয়াটাকে সে মানতে পারেনি, বঞ্চিত ভেবেছে নিজেকে। তাই মনীষাকে সেই জায়গায় দেখতে
ইল সে। মনীষা তার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করে, সেটাও কারণ হিসেবে কাজ করছিল।

মনীষা তার বাবাকে চিঠি লিখল, 'শেষ পর্যন্ত স্থিরতায় পৌছলাম। এ জীবন আমাকে
নেক দিয়েছে। কতটা দিয়েছে সে হিসাব করার বাসনা আমার নেই। কিন্তু এখন হরিশংকরের
ঙ্গে জীবন কাটাবার অঙ্গীকার আমাকে স্থিতি দেবে বলে বিশ্বাস করি। আশীর্বাদ করো।'

হরিশংকর অবসর নেওয়ার পর বোম্বে থেকে কলকাতায় চলে এসেছেন। এসেছেন
নীষার অনুরোধে। পত্রিকার কাজ ছেড়ে দিয়ে মনীষা এখানকার একটা নামী স্কুলে প্রিন্সিপ্যাল
সেবে যোগ দিয়েছে। আমূল পাল্টে ফেলা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, ওর পক্ষেও
নি। তাই মাঝে মাঝেই পার্টিতে ওকে যেতে হয়। সঙ্গে কখনও হরিশংকর থাকেন, কখনও
কেন না। মেয়েটার বিয়ে খুব ধুমধামের সঙ্গে দিয়েছে মনীষা।

ওর জীবন এত অল্প জায়গায় লেখা সম্ভব নয়। তবু মনীষার মুখ মনে পড়ে যাওয়াতে লিখে
ফললাম। তারপর মনে হলো ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার। বছর তিনেক আগে একটা পার্টিতে
র সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি ও তখন প্রেসিডেন্সির ছাত্রী। সে
ময় ওর নাম শুনে দেখতে গিয়েছিলাম। কথাটা বলতে খুব হেসেছিল।

শেষ পর্যন্ত টেলিফোন করলাম। ও-ই ধরল। নাম শুনে বলল, 'আরে কি খবর?'

'একটু কথা বলতে চাই।'

'টেলিফোনে, না আসবেন? আসতে চাইলে সামনের সপ্তাহে। কাল আমি আর হরি
র্জিলিং যাচ্ছি। পাঁচদিন থাকব।'

'টেলিফোনেই বলি। ছোট্ট একটা প্রশ্ন, কেমন আছেন এখন?'

'চমৎকার।' হাসল মনীষা। ঝরনার তলায় নুড়ি নুড়িতে ঠুকে গেল যেন।

'পেছনের দিকে তাকালে কি মনে হয়?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'পেছনে? সেখানে শুধু ছায়া। ছায়া তো আমি নই। যদিও ছায়াটা আমারই। কিন্তু আমি
মাকে নিয়ে ভাবতে চাই। ছায়াকে নিয়ে নয়।'

'এই বিবাহিত জীবন কেমন লাগছে?'

'অনেকদিন তো হয়ে গেল। হরি খুব ভাল মানুষ। ভাল না হলে আমার মতো খেয়ালীকে
মনে নেয়?' বলেই গলা পাল্টাল মনীষার, 'আসলে কি জানেন, সারাদিন অনেক ঘোরাঘুরি

করে সন্ধ্যের মুখে বাড়ি ফেরার যে আরাম তার কোনো তুলনা হয় না।'

'তাহলে কি আপনার এখন সন্ধ্যে ?'

নকল চমকে উঠল মনীষা, 'তার মানে ?'

'আমার বিশ্বাস হয় না আপনার সন্ধ্যে নেমেছে।'

'না না। মানুষের জীবনে ওটা একসময় নামা উচিত। আরে মশাই, একটা পাখি কি দিনরাত উড়ে বেড়াতে পারে ? বিশ্রামের জন্যে তারও তো একটা গাছের ডাল দরকার। ফি এলে ফোন করব। আজ রাখি ?)

কোনো পুরুষমানুষ এমন গলায় কখনও আমার সঙ্গে কথা বলেনি। এমন নিরাসক্ত অথ বন্ধুর মতো।

॥ ৩১ ॥

ভেবেছিলাম, আর নয়, অনেক হয়েছে, এবার থামা যাক সেই যে বুদ্ধিমানেরা বলে থাকে, ঠিক সময়ে থামতে জানতে হয়। এই জানাটাই অনেকের হয়ে ওঠে না। কিন্ত বুদ্ধিমান কাদের বলা হয় ? ছেলেবেলায় শুনতাম, নির্বোধ নেমন্তন্ন করেন আর বুদ্ধিমানরা খেয়ে আসেন। সে-সম কথাটাকে ঠিকঠাক মনে হত। পরে ভেবেছি, খাইয়ে আনন্দ ওই নির্বোধ হয়ে থাকতে গিয়ে তো সেটা পাও যায় না। তাই মাঝে মাঝে নির্বোধ হওয়া ভাল। 'মেয়ে যেমন হয়' শুরু করেছিলাম অন্য একটি পত্রিকায়। তারপর একটা সময় এল, মন বলল, অনে হয়েছে, প্রচুর জ্ঞান দিয়েছ, এবার থামো। যতটা যা মেয়েদের দেখেছ তার চেয়ে বহুগুণ বে বলে গেছ। উপদেশ শুনে লেখাটা যেই বন্ধ করলাম, তখনই টেলিফোনটা এল।

হ্যালো বলতেই হাসি বাজল ওপাশে, 'চিনতে পারছেন ?'

এই হেঁয়ালি যে কেন মানুষ করে আমি বুঝতে পারছি না। নিত্য যার সঙ্গে টেলিফো কথা বলি তার গলা শুনলেই যদি বলে দিতে পারি, তাহলে আমার গণৎকার হিসাবে খ্যা বাড়া উচিত। অথচ কেউ কেউ ওই প্রশ্ন করে যাচাই করতে চান তাঁর সম্পর্কে সজাগ কি আগে আত্মসর্মপণ করতাম, আজকাল অভিনয় করি, 'আরে ! কি খবর ?'

'সত্যি আমাকে চিনতে পারছেন ?' মহিলা উৎসুক।

'কি আশ্চর্য ! চিনবো না কেন ? তারপর ? খবরটবর কি ?' আমি কথা খুঁজি কথা বলানো জন্যে। ওঁকে কথা বলাতে পারলে নিশ্চয়ই কোনো ক্লু পেয়ে যাবো, যা থেকে ওঁর পরিচয় বু নিতে পারব।

'নাঃ, আপনি চিনতে পারেননি ! আপনার মেয়েরা যেমন হয় পড়ছি।'

তার মানে ইনি একজন পা'ঠিকা, কোথাও হয়তো সামান্য পরিচয় হয়েছিল।

বললাম, 'ওই আর কি ! যেমন দেখেছি তেমন লিখেছি। কিন্তু আর নয়, লেখাটা বন্ধ করে দিলাম।'

'সে কি !' প্রায় আঁতকে উঠলেন মহিলা, 'এখনও তো সব লেখা লেখেননি !'

'সব লেখা মানে ?'

'আপনি যেসব মেয়ের সংস্পর্শে এসেছেন, তাদের সবার সম্পর্কে লিখেছেন ?'

'সবার সম্পর্কে কেন লিখব ? যাদের মধ্যে লেখার বিষয় আছে তাদের কথাই লিখেছি। সবার সম্পর্কে লিখতে গেলে একই কথা বারংবার লিখতে হবে।'

'তাই ? এমন কেউ কি বাকি নেই, যার কথা লেখা যেত ?'

'এই মুহূর্তে মনে পড়েছে না।'

একটা বড় নিঃশ্বাসের আওয়াজ পেলাম, 'ইস, আমার কপালটাই এইরকম ! প্রত্যেক মাসে ভাবি এবার আমার কথা পড়তে পারব, অথচ আপনি যে সব ভুলে বসে আছেন তা কি করে জানব !'

এবার প্রশ্নটা না করে পারলাম না, 'আপনি কে বলুন তো ?'

'তাহলে স্বীকার করছেন চিনতে পারেননি ! তাই তো ?'

'স্বীকার করছি।'

'দেখুন,আপনি লিখেছেন ঠিক দুপুরে মাথার ছায়া পায়ের তলায় থাকে, খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কিন্তু বেলা গড়াতে ছায়া তো লম্বা হয়, তখন পেছনে তাকালেই তো তাকে দেখা যায়। একটু দেখতে চেষ্টা করুন আর সেটা করলেন কিনা তা আমি বুঝতে পারব না লেখাটা বন্ধ করে দিলে !' আবার হাসি।

'কি রকম ?'

'এই বিষয় নিয়ে কিছুদিন লিখলে যদি আমার কথা পড়তে চাই তাহলে বুঝব আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন।'

মহিলা ফোন রেখে দিলেন। আমি পড়লাম ফ্যাসাদে। কিছুতেই ওঁকে চিনতে পারছি না। কণ্ঠস্বরে বয়স তিরিশের আশেপাশে মনে হচ্ছে। কিন্তু এই মনে হওয়াটাই ভুল। আমার বন্ধু বিখ্যাত আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষের মা এই ভুলটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। প্রদীপ বা রুচিকে করলে মাসীমা যদি ফোন ধরেন তাহলে আমি একটি কিশোরীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। প্রথম প্রথম একই ভুল করে গেছি। মাসীমা এই বয়সে ও কণ্ঠে তারুণ্য ধরে রেখেছেন ! হয়তো এই কারণেই প্রদীপ স্বর্ণকণ্ঠের অধিকারী। বাপমায়ের কিছু তো ছেলেমেয়ে পায়ই।

অতএব হে পাঠকপাঠিকা, লেখাটা আপাতত বন্ধ করে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় নেই। তবে পত্রান্তরে চলে এলাম।

কিন্তু এই মহিলা কে হতে পারেন ? বেলা গড়ালে ছায়া তো লম্বা হয়—এই কথা যদি বলতে পারেন তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই সাম্প্রতিককালে আমার দেখা হয়নি। শৈশব থেকে দেখে আসা।

মেয়েদের কথা তো অনেক লিখেছি, কিন্তু তার মধ্যে তিনি কি ছিলেন না?

এই এক অস্বস্তি আমাকে সবসময় ঘিরে থাকছে।

গতকাল কয়েকজন এলেন। জামসেদপুরের একটি সাহিত্য-সভায় যাওয়ার জন্যে তাঁর অনুরোধ করলেন। আজকাল এরকম প্রস্তাবে আমি উৎসাহী হই না। বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও ওঁরা আবার যোগাযোগ করবেন বলে চলে গেলেন। একলা হতেই মনে হল জামসেদপুরে অনেককাল যাইনি। প্রথম গিয়েছিলাম পাঁচ বছর বয়সে, বাবামায়ের সঙ্গে। আমার পিসেমশাই সেসময় টিসকোতে কাজ করতেন। একটা সজনেগাছের কথা মনে আছে। খুব ফুল ফুটেছিল।

দ্বিতীয়বার যাই সতের বছরে বয়সে। তখন কলকাতার কলেজে পড়ি, হোস্টেলে থাকি।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল অ্যালবামটার কথা। ওই একটি সঞ্চয় আমার আছে। এই বয়েসে পৌঁছনোর বিভিন্ন পর্বের কিছু ছবি। অ্যালবামের প্রায় গোড়ার দিকেই নিজেকে দেখতে পেলাম। শার্টপ্যান্ট পরে খুব পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি একটা পামজাতীয় গাছের পাশে। ওটা জামসেদপুরের জুবিলি গার্ডেনে তোলা। তুলেছিল—।

চট করে সেই মুখ মনে চলে এল। ইন্দ্রাণী তুলেছিল। ইন্দ্রাণীর কথা ভাবতেই ঝকঝকে একটি মিষ্টি হাসির মেয়েকে দেখতে পেলাম। ইন্দ্রাণীর গজদাঁত ছিল। হাসলে মুখটাকে আরও পবিত্র দেখাতো। ইন্দ্রাণী এখন কোথায়? জানি না এখনও আছে কিনা। অথবা ওই যে মেয়ে টেলিফোনে হেঁয়ালি জানাচ্ছে, সে কি ইন্দ্রাণী? নিজের ছবির দিকে তাকালাম। ছিপছিপে, একমাথা চুল কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় জীবন সম্পর্কে একদম অনভিজ্ঞ। ঈষৎ মুখ তুলে আছি আকাশের দিকে। ইন্দ্রাণী ছবি তোলার সময় বলেছিল, 'মুখ তোল, আর একটু, ব্যাস!

আমার পিসেমশাই খুব সহজ মানুষ ছিলেন। কখনই রাগতে দেখিনি। বেহালা বাজানো ছিল তাঁর শখ। পিসিমা রাশভারি, তাঁর কড়া শাসনে বাড়ির সবাই তটস্থ থাকত। দ্বিতীয়বার জামসেদপুরে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, পিসিমা আমাকে একটু বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছেন। সাকচির বাড়িতে আমার জন্যে বিশেষ আয়োজন যা পিসতুতো ভাইদেরও অবাক করত। হয়তো বাবামাকে ছেড়ে কলকাতার হোস্টেলে থাকি বলে পিসিমা একটু বেশি দরদী হয়েছিলেন। দিনদশেক ছিলাম। কোনো কাজ নেই, শুধু আড্ডা আর বেড়ানো। পিসিমাদের সঙ্গে ইন্দ্রাণীদের পরিচয়ের বন্ধুত্ব খুব গাঢ় ছিল। দু-বেলা যাতায়াত ছিল ওদের। ইন্দ্রাণীরা থাকত খানিকটা দূরে। মেয়েলি স্বভাব বলতে যা বোঝায় ইন্দ্রাণীর ঠিক তার উল্টো ছিল। একটু ডাকাবুকো, ঝকঝকে কথা বলত। আর সেই কথায় হিন্দীর মিশেল থাকত খুব। বিহারের বাংলায় এমনটা পরেও দেখেছি। প্রথম আলাপেই সে আমাকে বলল, 'তুমি আমার চেয়ে যাদা বড় না, তাই দাদা বলব না। ঠিক আছে?' সেই বয়সে প্রায় কাছাকাছি বয়সের কোনো অনাত্মীয় মেয়ের সঙ্গে এইভাবে কথা বলার সুযোগ আমার হয়নি। উত্তম-সুচিত্রার ছবি দেখার কল্যাণে মেয়েদের সম্পর্কে রোমান্টিক ভাবনা ভাবতে শুরু করে দিয়েছি। চোরা-চোখে তাকানো, বোকা বোকা কথা বলা যেখানে স্বাভাবিক সেখানে ওই মেয়ে পিসিমার সামনেই আমাকে বলল, 'চল, তোমাকে জুবিলি পার্কে নিয়ে যাই। বহুৎ ভাল লাগবে তোমার।'

পিসিমা বলল, 'যা ঘুরে আয়। সন্ধ্যের সময় লাইট দেয় খুব।'

পিসতুতো ভাইয়ের সময় হলো না । ইন্দ্রাণী বলল, 'তুমি সাইকেল চালাতে পার ? না পারলে কেরিয়ারে বসো, আমি চালাচ্ছি।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কত দূর ?'

ইন্দ্রাণী বলল, 'যাদা দূর তো না, এক মাইল হবে।'

জলপাইগুড়ির ছেলে বলে সাইকেল আয়ত্তে ছিল। ইন্দ্রাণী ক্যারিয়ারে বসল। ও যেদিকে যেতে বলছে সেদিকে যাচ্ছি। জলপাইগুড়ি হলে সবাই আমাদের দেখত কিন্তু এখানে কেউ চোখ ফেরাচ্ছে না।

ক্যারিয়ারে বসে হঠাৎ ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার গার্লফ্রেন্ড আছে ?'

আমার গলা শুকিয়ে গেল, 'না।' কোনোমতে বলতে পারলাম।

'ঝুট বলছ না তো ?'

'খামোকা মিথ্যে বলব কেন ?'

'গুড। আমারও কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই।'

আমি কিছু বললাম না দেখে সে আমায় জিজ্ঞাসা করল, 'শুনতে পেয়েছ ?'

'হ্যাঁ।'

জুবিলি পার্কে চলে এলাম আমরা। তখন পার্কটা সবে হয়েছে এবং খুব সুন্দর ছিল। সাইকেল নিয়ে পার্কের ভেতর যাওয়া যেত না। স্ট্যান্ডে রেখে যেতে হত। গেট পেরিয়ে ভেতরে কতেই ইন্দ্রাণী বলল,'দাড়াও, তোমার সঙ্গে কথা আছে। দ্যাখো, তোমারও গার্লফ্রেন্ড নেই আমারও বয়ফ্রেন্ড নেই। ঠিক তো ? তোমাকে দেখে আমার ভাল লেগেছে। আমাকে তোমার কেমন লাগছে ?'

মাটির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ভাল।'

'তাহলে ঠিক হ্যায়, আমরা আজ থেকে দোস্ত হয়ে গেলাম। মেলাও হাত।'

এতটা স্মার্ট সেসময় ছিলাম না। কোনো সিনেমার নায়িকাকেও এমন সংলাপ বলতে শুনিনি। কোনোরকমে বললাম, 'তুমি তো আমাকে ভাল করে চেন না !'

'কে বলল, চিনি না ? তুমি ফাল্গুন মাসে জন্মেছ। যুদ্ধের পর তোমার জন্ম বলে নাম রাখা হয়েছে সমরেশ। ছোটবেলায় দুষ্টমি করতে, পড়া করতে না বলে তোমার বাবা অ্যাইসা মেরেছিল যে চোখের ওপর ফেটে গিয়েছিল। এই তো কাট মার্ক। ঠিক আছে ? তুমি জলপাইগুড়িতে দাদু আর এক পিসির কাছে থাকতে। আউর তোমার কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই। কি, ঠিক বলেছি ?' সে হাসল। তার গজদাঁত পৃথিবীটাকেই পবিত্র করে দিল।

বুঝলাম আমি আসার আগেই পিসিমার কাছে সে গল্প শুনেছে। আমার নামকরণ ওই ভদ্রমহিলাই করেছিলেন।

খুব গম্ভীর ভঙ্গীতে ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করল, 'আভি বল, দোস্তি করবে কি করবে না ! তোমার চয়েস !'

আমি হাত বাড়ালাম। সে খুব খুশী হয়ে হাত ধরে ঝাঁকাল।

তখন সেই বয়স যখন মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব মানেই প্রেম। আর প্রেম মানে ফুলভরা গাছের নিচে বসে সুচিত্রা সেনের মতো ভঙ্গীতে প্রেমিকা গান গাইবে—তুমি যে আমার ! জুবিলি পার্কের সাজানো গাছগুলোর মধ্যে হাঁটাতে হাঁটতে আমার শরীরের শিরায় শিরায় রক্ত নয় যেন আবেগের বন্যা উছলে পড়ল। নিঃশ্বাস গরম হলো, কান লাল। ইন্দ্রাণী বোধহয় টের পেয়েছিল। এই টের পাওয়ার বোধটা বোধহয় মেয়েদের জন্মগত।

: ঈশ্বর মেয়েদের শরীর আলাদা করে গড়েছেন। প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতে যা যা দরকার ভেতর বাইরে তার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেননি। মেয়েদের তিনি আর একটি জিনিস দিয়েছেন, সেটা অনুভূতি। তীব্র, তীক্ষ্ণ। স্বামী যদি মিথ্যে কথা বলে, তাহলে স্ত্রীর মনে সেই কারণে অস্বস্তি হয়। ছেলের মনের কথা মেয়েরা পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয় বলে বোঝে না, কিন্তু বেচাল হলেই তাদের অস্বস্তি হয়। বেলা একটায় দু'পেগ ভদকা খেয়ে কাজকর্ম করে বিকেলে চা-পান খেয়ে রাত্রে নিরীহ মুখ করে স্বামী বাড়ি ফিরতেই স্ত্রী চোখ কুঁচকে তাকান 'আবার খেয়ে এসেছ ?' অথচ বাড়ি ফেরার আগে স্বামীর পান না করা বন্ধুরা জোর দিয়ে বলেছে—একটুও গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না। ভদকার গন্ধ কম, থাকার কথাও নয়—তবু স্ত্রীর নাককে ফাঁকি দেওয়া গেল না। গন্ধ শুঁকে যেসব পুলিশি কুকুর অপরাধী খুঁজে বের করে তাদের সঙ্গে স্ত্রীদের কোন পার্থক্য খুঁজে পান না এই স্বামীরা। এক স্বামী আমাকে খুব আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন, 'এত ক্ষমতা ওদের তবু সব সময় অভিযোগ করে কেন বলুন তো ? একজন দেখান যিনি বলবেন স্বামী সম্পর্কে কোন অভিযোগ নেই ?'

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আবার কি হলো ?'

'আর বলবেন না। পরশু বলল রাজস্থানে বেড়াবার ব্যবস্থা করতে। অফিসের কাজের চাপ বেশি বলতে বলল, তা তো হবেই। আমি যা বলব তা কাটাতে তোমার জুড়ি নেই। বিয়ের পর থেকে আমাকে তুমি শুধু ভোগ করে এসেছ, আমাকে কি দিয়েছ ?' স্বামী বললেন, 'বুঝলেন প্রত্যেক বছর বেড়াতে নিয়ে গিয়েছি—যা দরকার তাই দিয়েছি, তবু শুনতে হলো আমি ভোগ করেছি ! আচ্ছা মশাই, ভোগ কি শুধু পুরুষরাই করে ? মেয়েরা ভোগ করে না ?'

মনে পড়ল,আমার এক বন্ধু যৌবনে প্রেম করেছিল। প্রেমিকা ও সে যা যা করার স করেছিল। তারপর হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, ঝগড়া এবং শেষে ছাড়াছাড়ি। মেয়েটি আমার কাছে এসে বলেছিল, 'আপনার বন্ধুকে আমি ছাড়ব না ! আমাকে ভোগ করে কেটে পড়ার শাস্তি ওকে পেতে হবে।' যদি বলতাম. সে-সময় আপনারও সম্মতি ছিল, আপনি নিশ্চয়ই উদ্যোগী ছিলেন তাহলে অভিযোগটা একতরফা হচ্ছে না ?

ব্যাপারটা এদেশেই সম্ভব। মেয়েরা যত শিক্ষিত হোক, অবচেতন মনে নিজেদের আস বা খাদ্যসামগ্রী বলে মনে করে। এই মেয়েরা মানে অবশ্যই তামাম নারীকুল নন, ব্যতিক্রম আছেই, তাঁদের কথা বলছি না। সহবাসের সময় তারাও তো কম উপভোগ করেন না। কিন্তু পরবর্তীকালে অযত্ন পেলেই নিজেকে পুরুষের ব্যবহৃত সামগ্রী হিসেবে ভেবে বসেন। কোনো পুরুষ যদি অভিযোগ করত তার প্রেমিকা তাকে ভোগ করে চলে গেছে, তাহলে কী রকম দাঁড়াতো ? এরকম পুরুষকে আমি জানি। তখন কলেজে পড়ি। আমার এক বন্ধু প্রেম করত

জনেছি। হোস্টেলে থাকত। প্রায়ই প্রেমিকার বাড়িতে যেত। প্রেমিকার মা নেই, বাবা ব্যবসায়ী। একদিন রাত্রে দেখলাম সে কাঁদছে। সহানুভূতি পেয়েই সে বলে ফেলল, 'আমি ওকে ভালবেসেছি। জোর করে ও আমার সঙ্গে ওসব করত। আমি বলতাম, তোমার আগে আমি কারও সঙ্গে এসব করিনি। তুমি কথা দাও, আমাকে বিয়ে করবে ? ও হাসতো। আজ মুখের উপর বলে দিল, আমাকে ও বিয়ে করতে পারবে না। আমি যেন আর সম্পর্ক না রাখি। ও আমাকে ভোগ করে ছুঁড়ে ফেলে দিল !'

ইন্দ্রাণীর প্রসঙ্গ থেকে এত কথায় চলে আসার কারণ ছিল।

পরদিন ইন্দ্রাণী এল না। আমার পিসতুতো ভাই-এর বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ওদের একজন গম্ভীর হয়ে বলল, 'কলকাতার ছেলেদের এলেম আছে !'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি রকম ?'

বলল, 'কদিন এসেছ এর মধ্যেই ইন্দ্রাণীর মন পেয়ে গেলে ! আমরা শালা এতদিন লাইন মারছি, কিন্তু পাত্তাই দেয় না !'

পিসতুতো ভাই গম্ভীর হয়ে বলল, 'মায়ের কানে কথাটা গেলে খুব খারাপ হবে। তুমি ওর সঙ্গে একটু কম মিশো।'

মেশার সুযোগই পাইনি। ইন্দ্রাণী আসছে না। শেষ পর্যন্ত আর না পেরে ওর বাড়িতে গেলাম। ওর বাড়ির সবাই খুব ভাল। আলাপ করে যখন ফিরে আসছি তখন ইন্দ্রাণী আমাকে এগিয়ে দিতে এল।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার দেখা পাচ্ছি না কেন ?'

ইন্দ্রাণী হাসল, 'দেখা করতে ইচ্ছে করছিল ?'

'হ্যাঁ, তুমি আমার বন্ধু হয়েছ--।'

'ঠিকই। এই যে ইচ্ছে হচ্ছে অথচ দেখা পাচ্ছ না, এটা একটা আলাদা ফিলিং। বহুৎ দামী, তাই না ?'

'কিন্তু আমি যে কালই চলে যাব !' করুণ গলায় বললাম।

'কিন্তু আমরা বন্ধু থাকব।'

'তুমি এখানকার ছেলেদের আমাদের কথা বলেছ ?'

'হ্যাঁ। ওরা আমাকে বহুৎ ডিসটার্ব করে। সবাই প্রেম করতে চায়। তোমার কথা বলতে সবাই গুটিয়ে গেল। নাউ আই হ্যাভ এ স্টেডি বয়ফ্রেন্ড, কেউ আর ডিস্টার্ব করবে না। তাই বললাম।'

'কিন্তু তুমি আমার ঠিকানা নাওনি। চিঠি দেবে কি করে ?'

'ঠিকানা তো পিসির কাছে পেয়ে যাব।'

ইন্দ্রাণীর চিঠি আমি কোনোদিন পাইনি। ক্রমশ মনে হতে লাগল আমি যদি জামসেদপুরে থাকতাম, তাহলে সে কখনই আমাকে তার বয়ফ্রেন্ড বানাতো না। আমি কলকাতায় চলে যাব, নিত্য দেখা হবে না—এটা জেনেই সে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে। আমাকে ব্যবহার করে সে অন্য ছেলেদের কাছ থেকে রেহাই পেতে চেয়েছে, হয়তো পেয়েছে। আমাকে তার ভাললাগার

কোনো কারণ ছিল না, ভালবাসার তো নয়ই। নিজেকে কি রকম ব্যবহৃত বলে মনে হয়েছি
তখন। এটাকে যদি বন্ধুর ভাষায় ভোগ করে ছুঁড়ে ফেলা বলি, তাহলে একটু বাড়িয়ে বলা হ
কি ? হয়তো, কিন্তু তখনকার অনুভূতি এইরকম ছিল।

এরপরেও ইন্দ্রাণীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। জামসেদপুরে নয়, কলকাতায়। তখ
বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা কদিন বাদেই। থাকি হরি ঘোষ স্ট্রিটের একটা হোস্টেলে
দুপুরবেলায় খাটে উপুড় হয়ে পড়ছি এমন সময় দরজায় শব্দ হলো। চমক দেখলাম ইন্দ্রাণী আ
আমাদের হোস্টেলের দারোয়ান দাঁড়িয়ে। পরনে শাড়ি, দেখতে আরও সুন্দর হয়েছে
চোখাচোখি হতেই উঠে বসলাম। ইন্দ্রাণী বলল, 'দারোয়ান বাধা দিচ্ছিল। ছেলেদের হোস্টে
মেয়েদের নাকি ঢোকা নিষেধ। বললাম, আমি ওর আত্মীয়, বাইরের মেয়ে নই। জোর ক
চলে এলাম। রাগ করেছেন ?'

'হঠাৎ কলকাতায় ?'

'কেন ? এই শহরে কি আমরা আসতে পারি না ?'

দারোয়ান চলে গেল। মা-বোনেরা যদিও ঘরে আসেন তবু সুপারকে কৈফিয়ৎ দিতে হ
পারে। কিন্তু আমার মাথায় তখন ওসব কথা নেই। চেয়ার এগিয়ে দিলাম। ইন্দ্রাণী বসল

'কোথায় ওঠা হয়েছে ?'

'মানিকতলায়। পিসি ভুল নাম্বার দিয়েছিল। অনেক কষ্টে পৌঁছলাম। বলুন, কে
আছেন ?' ইন্দ্রাণী হাসল।

'আছি।' আমি কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

'আমার ওপর রাগ নেই তো ?'

'রাগ কেন করব ?'

'গার্লফ্রেন্ড নিশ্চয়ই হয়েছে ?'

'আজ্ঞে না।'

'এখনও আমাকে বন্ধু ভাবেন ?'

'ভাবতে ভাল লাগে।'

'আমরা চিরজীবন বন্ধু থাকব। আচ্ছা চলি। আপনি পড়ুন।'

সে চলে গেল। কেন এসেছিল তা বলে গেল না।

এর কিছুদিন বাদেই পিসতুতো ভাই-এর সঙ্গে দেখা। ও এসেছিল কলকাতায়। কথ
কথায় বলল, 'জানো, ইন্দ্রাণী বিয়ে করেছে!'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম।

'কলকাতার মানিকতলা থেকে বিয়ে হয়েছে বলে আমরা আসতে পারিনি। ছেলে আ
এ. এস. অফিসার।'

'কবে বিয়ে হল ?'

পিসতুতো ভাই যে সময়টার কথা বলল, সেইসময়েই ইন্দ্রাণী আমার সঙ্গে দেখা ক
গিয়েছিল

ইন্দ্রাণী এখন কোথায় আমি জানি না। এখন বেঁচে থাকলে ওর বয়স পঞ্চাশে পা দিয়ে ফেলেছে। একজন রাশভারী মহিলার মুখ আমি কল্পনা করতে পারছি না। ওর কথা মনে এলেই গজদাঁত চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ষোড়শীর গজদাঁতের সৌন্দর্য পঞ্চাশে কি ম্লান হয়ে যায়?

এই টেলিফোনটি কি ইন্দ্রাণী করেছিল? হোস্টেলে এসে ইন্দ্রাণী তুমি নয় আপনি বলেছিল। তাহলে কি—

কিন্তু এঁর কণ্ঠস্বর এখনও উজ্জ্বল। একটাও হিন্দী শব্দ ব্যবহার করেননি। মেয়েরা পাল্টায়, এতটা পাল্টে যেতে পারে?

কি জানি!

॥ ৩২ ॥

পত্রিকান্তরে লিখেছি, এই পত্রিকার পাঠক-পাঠিকার কাছেও কবুল করা দরকার।

যিনি বলেছিলেন, মেয়েরা কেমন হয় তা ঈশ্বরও জানেন না, মানুষ তো কোন ছার, তিনি বাড়িয়ে বলেছিলেন কিনা আমার জানা নেই। আমি নিজে ছেলেদেরই বুঝতে পারি না, মেয়েদের কথা ওঠেই না। যখন হোস্টেলে থাকতাম তখন আমার রুমমেট ছিল মেদিনীপুরের একটি শান্তশিষ্ট তরুণ। আমার চেয়ে নিচু ক্লাসে পড়ত সে। কলকাতা চিনত না। আমার ওপর নির্ভর করত। আমি তাকে সাহায্য করতাম। হঠাৎ তার লেখা একটা ডায়েরির পাতা নজরে এল। তাতে সে আমায় বাপবাপান্ত করেছে, কারণ আমি নাকি তার ওপর দাদাগিরি ফলাই। এই লেখাটা না পড়লে ওকে জানতে ভুল থেকে যেত।

সুতরাং মেয়েরা কেমন হয় আমি জানি না। সেই বাল্যকাল থেকে মা-পিসিমা থেকে শুরু করে যেসব মহিলার সংস্পর্শে এসেছি তাঁদের কথাই লিখতে চেষ্টা করছি মাত্র। তাঁদের যেমন দেখেছি তাই নিয়েই মেয়েরা যেমন হয় এই লেখা আমার নিজস্ব, কারও সঙ্গে না মিললে কিছু করার নেই।

জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের শেষধাপের ছাত্র যখন তখন আমি শরৎচন্দ্র থেকে অচিন্ত্যকুমার পড়ে ফেলেছি। কাক দিয়ে যার শুরু কলি দিয়ে তার শেষ, অচিন্ত্যকুমারের প্রথম কদম ফুলের নায়িকা কাকলিকে নিয়ে ঘুমের মধ্যে বেড়াতে যাই। শেষের কবিতার লাবণ্যকে একটু দূরের মানুষ বলে মনে হত। বরং, নের কিরণময়ীর দেখা পাওয়ার জন্যে ছোঁক ছোঁক করতাম। এই যে, ঠোঁটে একটু ঠোঁট ছুঁইয়ে যে মহিলা খিলখিল করে হেসে উঠলেন, তিনি কোথায়? যাযাবরের দৃষ্টিপাত মুখস্থ করে ফেলেছি। আহা, প্রেমের সপক্ষে কী সব দারুণ দারুণ লাইন। রবীন্দ্রনাথের

প্রবন্ধ কবিতা পড়বার মন তৈরি হয়নি তখনও। গানও নয়। বরং চিতাবহ্নিমানের নায়িকা যখ
তার লম্বা বেণীকে চাবুকের মতো ব্যবহার করেছিল তখন শিউরে উঠেছিলাম। আহা, সেসম
শশধর দত্তের রমাকে সত্যি ভীরু পায়রার মতো মনে হত। সে বড় সুখের সময় ছিল।

তখন আমার পনের বছর বয়স। বাড়িতে মাত্র ছ'জন মানুষ—প্রচণ্ড আদর্শবাদী ঠাকু
আর স্নেহময়ী বিধবা পিসিমা। এঁদের ফাঁকি দিয়ে গল্পের বই পড়তে অসুবিধে হত না। তা এতস
নায়িকার বই থেকে উঠে যখন আমার সঙ্গে বাস করছেন তখন আর একজন যোগ দিলেন, তি
সুচিত্রা সেন। তাঁর হাসি, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানো, আবেগের সময় অস্ফুট উচ্চারণ আমার নিজ
সম্পত্তি হয়ে গেল। এতসব হচ্ছিল যখন তখন আমার জীবনে বাস্তব ছিল নারীশূন্য। মরুভূমি
মানুষ বোধহয় বেশি মেঘের স্বপ্ন দেখেন।

আমার স্কুলের বন্ধুদের কয়েকজন ইতিমধ্যে প্রেমে পড়ে গিয়েছে। সে সময়ে প্রেম ছি
একটু দূর থেকে দেখা, আলতো হাসি এবং সাহসী হলে চিঠি লেখা।

আমার বন্ধু গোবিন্দ এইরকম চারটি মেয়ের সঙ্গে পাশাপাশি প্রেম চালিয়ে মনস্থির করত
পারছিল না কাকে শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি দেবে। ছুটির পর স্কুলের মাঠের মাঝখানে বসে আম
গোবিন্দর সমস্যা নিয়ে কথা বলতাম যাতে কেউ শুনতে না পায়। খেলা থাকলে তিস্তার বাঁ
তো ছিলই। মন্টু যে মেয়েটিকে ভালবেসে ফেলেছে সে নাকি বড় উদাসীন। তিনবার তার দি
তাকিয়ে হাসলে সে একবার হাসে। তবে রেটিং-এ গোবিন্দ ছিল এক নম্বর। প্রেমিকারা যে
তার জন্যে সর্বত্র অপেক্ষা করছে। খুব মন খারাপ হয়ে যেত আমার।

একদিন গোবিন্দ এল একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে। আমাকে নিচু গলায় বলল, 'কি করি ভে
পাচ্ছি না। ও চিঠি দিয়ে জবাব চায়।'

'কে ? কোন্ জন ?'

যার নাম বলল সে থাকে করলা নদীর ধারে। বনেদী বাড়ির মেয়ে। করলা গার্লস স্কু
পড়ে। এসব তথ্য গোবিন্দই শুনিয়েছিল। বললাম, 'উত্তর লেখ।'

'দূর ! আমার বাংলা হাতের লেখা খুব খারাপ। তারপর ভাষাটাসা আসে না। প্রার্থ
কবিতার ভাবসম্প্রসারণ লিখে তিন পেয়েছি দশে।' তারপর আমার দিকে তাকাল কাতর চো
'সমরেশ, তুই লিখে দে। তুই তো আট পেয়েছিলি।'

সেই শুরু। গোবিন্দ একের পর এক প্রেমপত্র এনে দিত। শেলী, যূথিকা, পত্রলেখা, কুন্তী
সে-সব চিঠিতে আবেগ যেন পিচকারি দিয়ে ছিটকে বেরুচ্ছে। আমি আমার সেই সময়ের প
নায়িকাদের ছবি ভেবে জবাব লিখে যাচ্ছি। যদিও নিচে সই করছি, তোমার জন্ম-জন্মান্তরে
গোবিন্দ কিন্তু মনে হতো ওটা আমারই নাম। দুবার লেখার পর মনে হলো ঠিক হচ্ছে না
গোবিন্দকে বলল।

গোবিন্দ চিন্তিত হলো, 'না দেখলে লিখতে পারবি না ?'

'না, গুলিয়ে যায়। যে শ্যামলা তাকে ধানক্ষেতে পড়া প্রথম সূর্যের আলোয় কথা বল
হবে, যে ফরসা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে তার সামনে নতজানু করে দেব ! না দেখলে এরটা ওকে বল
সব গুলিয়ে যাবে।'

গোবিন্দ বলল, 'ঠিক হ্যায়, এখনই চল।'

তখন আমরা সাইকেলে পাক দিতাম। করলা নদীর ধারে সেই অভিজাত বাড়ির সামনে দিয়ে দুবার পাক দিয়েও কাউকে বারান্দায় দেখতে পেলাম না। গোবিন্দ দু-দুবার তার সংকেত বেল বাজাল। তবু বারান্দা নায়িকা-শূন্য। এই মেয়েটি তার শেষ চিঠিতে লিখেছে, 'রিক্ত আমি শূন্য আমি কিছুই আমার নাই, চেয়েছিলে ভালবাসা, দিলাম ঢেলে তাই।' সে-সময়ে ওই লাইন বুকের সব বাতাস কেড়ে নিত। হতাশ হয়ে যখন ফিরে আসছি তখন একটা রিক্সা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। গিন্নীধরনের মহিলার পাশে ছিপছিপে শ্যামলা খুব স্মার্ট সুন্দরীটি। গোবিন্দর দিকে চোরা হাসি ছুঁড়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। দ্রুত সাইকেল চালিয়ে ফাঁকা জায়গায় এসে গোবিন্দ এক গাল হাসল, 'দেখলি ?'

'এর নাম ?'

'পত্রলেখা।'

আমার চোখের সামনে পত্রলেখার টানটান মুখের ছবি। সেই রাত্রে চিঠি লিখে ফেললাম— মেঘলা দিনে মন যখন উদাস তখনই মেঘভাঙা রোদ গড়ালো পৃথিবীতে। না, ভুল হল, পৃথিবীতে নয়, তোমার মুখে। সেই রোদ তোমার হাসি চুরি করে নিয়েছে। তুমি রিক্ত নও, নিঃস্ব নও, তোমার এক ফোঁটা ভালবাসার জন্য আমি অমরত্ব ছেড়ে দিতে পারি। তোমার আত্মার আত্মীয় হতে চাওয়া—গোবিন্দ।'

এই যে চিঠি লিখে যাওয়া, এক একজনকে আলাদা ভাষায় প্রেম জানানো, আমার দিনরাত যেন এক হয়ে গেল। গোবিন্দর নামে চিঠি লিখছি বটে কিন্তু অজান্তে আমার নামই যেন গোবিন্দ হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে বন্ধুমহলে আমার খ্যাতি ছড়িয়েছে। সদ্য প্রেমে যারা পড়ছে এবং লেখার ব্যাপারে সংকোচ তারা এসে আমাকে অনুনয় করছে চিঠি লিখে দেওয়ার জন্যে। আমি ব্যাকগ্রাউণ্ড জানতে চাইতাম। মেয়েটি কেমন ? বাবা-মায়ের ভূমিকা কি ?

উত্তরগুলো প্রায় একই ধরনের। মেয়েটি হয় সুপ্রিয়া নয় অরুন্ধতী অথবা সাবিত্রীর মতো দেখতে। ভ্যাগিস এরা কেউ সুচিত্রার মতো দেখতে বলেনি। কিন্তু বাবা কমল মিত্রের সেকেণ্ড এডিশন মা রাজলক্ষ্মী দেবী। চড়া মেজাজ। এরা যেন নিজের মেয়েকে বন্দিনী করে রেখেছেন। এই দৈত্যের প্রাসাদ থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে হবে। তবে এখনই নয়, একটা চাকরি পেলেই সেই অভিযান শুরু হবে।

স্কুলের শেষ ক্লাসের ছাত্র হিসেবে জানা ছিল না চাকরিটা কত দূরে রয়েছে। জানতেও চাইত না কেউ। একসময় তো পাওয়া যাবে এই প্রত্যয়ে মন শক্ত থাকত। তখন নিজেদের ওপর খুব আস্থা ছিল। শিশুদের যেমন থাকে। তখন জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন প্রান্তে কয়েকজন সুন্দরীর বাস ছিল। এদের বয়স পনেরর এপাশ ওপাশে ছিল। সেইসব বাড়িগুলোর সামনে দিয়ে একবার পাক না খেয়ে এলে রাত্রে আমাদের ঘুম হতো না। এই দূর থেকে দেখায় কি আনন্দ ছিল। যেদিন নায়িকাকে দেখতে পেতাম না সেদিন বাড়িটাকে দেখেই তৃপ্ত থাকতাম। এই সব সুন্দরীর চারজন গোবিন্দর প্রেমিকা। এদের কারও সঙ্গে গোবিন্দ সামনাসামনি কথা বলার সুযোগ পায়নি। চিঠি আসা-যাওয়া করত মেয়েরা যখন স্কুলে যেত তখন। সম্ভবত রিক্সাওয়ালারা

এ-ব্যাপারে গোবিন্দকে সাহায্য করত। প্রায় একই সময়ে চারটে রিক্সাওয়ালার সঙ্গে গোবিন্দ কি করে যোগাযোগ রাখত তাই ছিল আমাদের আলোচ্য বিষয়। অজিত বলেছিল, পরবর্তী জীবনে গোবিন্দ খুব বড় কোম্পানীর ম্যানেজার হবে।

এক বিকেলে গোবিন্দ এল মুখ কালো করে। তার হাতে চার নায়িকার চারটে চিঠি । নীল খামে। বলল, 'পড়ে দ্যাখ।'

প্রথম চিঠি শেলীর। লিখেছে, 'আমি একটা নতুন জুতো কিনেছি। হিলতোলা। ভাবছি তলায় লোহার নাল বসিয়ে নেব। তারপর তোর দুই গালে নালের ছাপ চিরদিনের জন্যে বসিয়ে দেব।'

হতভম্ব হয়ে গেলাম। দ্বিতীয় খাম খুললাম। একি কাণ্ড ! একই চিঠি একই শব্দ, তবে হাতের লেখা অন্য। তৃতীয় এবং চতুর্থ দুটিও এগুলোর নকল, শুধু তফাৎ হলো হাতের লেখায় এই চারটে হাতের লেখা আমার পরিচিত। এদের লেখা প্রেমপত্রের সঙ্গে আমি পরিচিত।

গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ কি করে হলো ?'

গোবিন্দ যেন ঝড়ে পোড়া গাছ। মাথা নাড়ল, সে কিছুই জানে না।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এরা চারজনই কি এক স্কুলে পড়ে ?'

গোবিন্দ বলল, 'না না, পত্রলেখা আর শেলী পড়ে করলা গার্লসে এবং যূথিকা আর কুন্তী গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুলে।'

বললাম, 'দুটো স্কুল আলাদা হলেও ওদের মধ্যে যোগাযোগ হয়েছে। যেই ওরা জেনেছে তুই চারজনের সঙ্গে প্রেম করছিস অমনি ওরা এক হয়ে গিয়েছে। আর কিছু করার নেই গোবিন্দ।'

গোবিন্দ বলল, 'এই শুনি মেয়েরা মেয়েদের সহ্য করতে পারে না ! তাহলে ওরা এক হলো কি করে ?'

'কি করে হলো ভেবে লাভ নেই , তুই মন খারাপ না করে অন্য জায়গায় চেষ্টা কর।' আমি তাকে উপদেশ দিলাম।

কিন্তু আমার পৃথিবীটা ফাঁকা হয়ে গেল। এই যে নিত্য চিঠি লেখা এর মধ্যে উন্মাদনা ছিল বাংলা টিচার শশিবাবু বলেছেন, আমার নাকি বাংলা লেখার খুব উন্নতি হয়েছে। সেটা শুনে দা বলেছিলেন, 'বাংলায় উন্নতি করে কি হবে ? ইংরেজিটায় উন্নতি করো।'

মুশকিল হলো আমার কোনো বন্ধুকেই তাদের প্রেমিকারা ইংরেজিতে চিঠি লিখত না লিখলে তার উত্তর দিতে দিতে নিশ্চয়ই আমার ইংরেজি খুব ভাল হয়ে যেত।

সেসময় খুব ফাঁকা লাগত। নতুন বইয়ে ভাল লাইন পেলেই লিখে রাখতাম চিঠিতে ঢোকাবো বলে। কিন্তু লিখবো কাকে ?

এই সময় গোবিন্দ এল, 'এই, রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় পড়েছিস ?'

'না।'

'পড়ে ফ্যাল, আজই !'

'কেন ?'

'আমাকে একজন বলেছে আমি চারুলতা, তুমি অমল হবে ? আমি কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, অমল ? সে বলল, বারে, তুমি রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় পড়োনি ? তাই বলছি পড়ে ফ্যাল।' গোবিন্দ বলল।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম বাবুপাড়া পাঠাগারে। সুনীলদাকে ধরে রবীন্দ্র-রচনাবলী থেকে নষ্টনীড় গল্পটি আবিষ্কার করলাম। সেখানে বসেই পড়ে ফেললাম গল্পটা। শেষ করেই মনে হলো, গোবিন্দ এবার পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করছে। এটা কি ঠিক হচ্ছে ?

মনে রাখতে হবে, তখন সত্যজিৎ রায় চারুলতা ছবি তৈরি করেননি। তার বহু আগে মফঃস্বলের জনৈকা বিবাহিতা মহিলা একজন তরুণকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি অমল হবে ?

পরের দিন গোবিন্দ এসে চিঠি দিল, 'বেশিদিন আমার ব্যাড প্যাচ থাকে না রে। নে, উত্তরটা লেখ।'

চিঠি পড়লাম—'আমার অমল, আকাশ আছে মেঘ নেই, একি ভাল লাগে ? নদী আছে কিন্তু জল নেই, ভাবতে পারো ? আমার অবস্থা ঠিক তাই। তিনি তো তাঁর ব্যবসার কাজে প্রায়ই কলকাতা গৌহাটি করছেন, আমার দিকে তাকাবার সময় কোথায় ? আমি আছি অন্ধ শাশুড়ির সেবা করতে। তাই তুমি এসো। মেঘ হয়ে এসো, জল হয়ে এসো। এসো আমার ঘরে। ঠিক দুপুরবেলায়। শাশুড়িকে বারোটার মধ্যে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেব। তুমি খিড়কিদরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকবে। ওটা খোলা রাখব। আর সঙ্গে নিয়ে আসবে একটা মন-ভেজানো চিঠি। চারুলতা।'

চিঠি পড়ে আমার কান লাল হয়ে গেল। মন বলল, এ অন্যায়। বললাম, 'নারে এ চিঠির উত্তর আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়।'

'কেন ? অন্যায় কেন ?'

'তুই বিবাহিতা মেয়ের বাড়িতে যাবি ? এর শাশুড়ি অন্ধ, স্বামী বাইরে। তাদের দুজনকে তোরা ঠকাবি ?'

'এতে ঠকাবার কি আছে ? কিরণময়ী যখন দিবাকরকে চুমু খেয়েছিল তখন কাকে ঠকিয়েছিল ?'

'আমি ওসব জানি না। অবৈধ প্রেমে আমি নেই।'

'হুঁঃ ! নেই ? আসলে তুই জেলাস। হিংসে করিস আমাকে। রবীন্দ্রনাথ এমন গল্প লিখতে পারেন, শরৎচন্দ্র চুমু খাওয়াতে পারেন আর তুই আমার হয়ে চিঠি লিখতে পারিস না !'

গোবিন্দ চলে গেল। আমার মন খারাপ হয়ে গেল।

এসব অনেক অনেক কালের কথা। কিছুদিন আগে জলপাইগুড়িতে গিয়ে মনে পড়ল এসব কাহিনী। গোবিন্দকে অনেককাল দেখিনি। পুরোনো বাড়িতে ওরা থাকে না। সে চাকরি করে সরকারি দপ্তরে। সেখানে গিয়ে তাকে ধরলাম। মোটা হয়েছে, টাক পড়েছে, পান খায় খুব, দেখেই বোঝা যায়। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোর সব লেখা আমি পড়ি।'

• 'কেমন আছিস ?'

'চলে যাচ্ছে। মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। ছেলে এল আই সি-তে চাকরি করে। রিটায়ার করতে

আর বছর চারেক বাকি।'

গোবিন্দ জোর করে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। নিজেই বাড়ি করেছে। যে ভদ্রমহিলা ও স্ত্রী তিনি এককালে সুন্দরী ছিলেন। চোখমুখ দেখে বোঝা যায়। তবু মনে হচ্ছিল ইনি বয়ে গোবিন্দর চেয়ে বড়।

গোবিন্দ হেসে বলল, 'তুই ওকে দেখিস নি, তবে ওর কথা শুনেছিস।'

'মানে ?'

'চারুলতা। তুই অবৈধ চিঠি লিখবি না বলেছিলি !'

'সেকি ! উনি—।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমার স্বামী প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়ার পর ও জোর কর আমি প্রথমে ওর কথা ভেবে রাজী হইনি। পরে যখন বলল আমার শাশুড়িকে ও মেনে নে তখন রাজী হয়ে গেলাম।'

'তিনি নিশ্চয়ই—।'

'হ্যাঁ, অনেককাল আগে মারা গেছেন।'

'এখন আপনি নিশ্চয়ই ওকে অমল বলে ডাকেন না ?'

'কেন ?' ভদ্রমহিলা চোখ ছোট করলেন।

'না, মানে—।' আমি থেমে গেলাম।

'আসলে ও তো প্রথমে অমলই ছিল। তারপর ছেলেমেয়ে হলো। ওর বয়স বাড় চাকরিতে উন্নতি করল। আর পাঁচজন বয়স্ক মানুষের মতো আচরণ করতে করতে শেষপর্য ভূপতি হয়ে গেল।'

স্বীকার করছি, চারুলতা সিনেমায় ভূপতি চারুর হাতে হাত রাখতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ যা পারেননি তা মফঃস্বল শহরের এক মহিলা কেমন করে পেরে গেলো জানি না।

তবে একথা অত্যন্ত বাস্তব যে আমরা কেউ কেউ শুরু করি অমল হয়ে—আর সবাই ে করি ভূপতির ভূমিকায়।

আবেগ যখন ফুরিয়ে যায় তখন চারপাশে শুধু পাঁচিল তুলি।

॥ ৩৩ ॥

পাঠক-পাঠিকাদের চিঠি সাধারণ প্রকাশক অথবা সম্পাদকের দপ্তর ঘুরে আমার হাতে আসে। বেশিরভাগ চিঠিই চটজলদি আবেগে লেখা। ভাল লাগা অথবা মন্দ লাগা জানিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য। তাদের বাঁধুনিও খুব আলগা। আবার কেউ কেউ যুক্তি তথ্য সাজিয়ে নিজের পড়াশুনা জাহির করতে চান। তা এইসব চিঠি যখন আমার হাতে আসে তখন লেখাটি শেষ হয়ে গেছে অথবা বই বের হচ্ছে। যেহেতু চিঠির জবাবে চিঠি লেখার অভ্যেস আমার নেই তাই ওইসব চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না। পাঠক-পাঠিকারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার মা-ও জলপাইগুড়ি থেকে একই অনুযোগ করে আসছেন এতকাল। এখন ও বাড়িতে টেলিফোন আসায় সপ্তাহে দুদিন কথা হয় বলে সেটা থিতিয়েছে।

যেহেতু এই লেখা কাগজে বের হচ্ছে তাই অঙ্গনা মিত্র যে চিঠি আমায় লিখেছিলেন তা আমার লেখায় ছেপেছিলাম। তার প্রতিক্রিয়ায় প্রচুর চিঠি লিখেছেন ক্ষিপ্ত হয়ে অনেকেই। কিন্তু চব্বিশ পরগনার নব ব্যারাকপুরের শ্রীযুক্ত শ্রুতি ঘোষ যে চিঠিটা লিখেছেন সেটা আমাকে আকর্ষণ করেছে। ওঁর অনুমতি ছাড়াই চিঠিটা প্রকাশ করছি বলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

শ্রুতি লিখেছেন, 'প্রথমেই জানাই যে আমি কোন নারীমুক্তি আন্দোলনের নেত্রী নই বা স্বনির্ভর অতি-ডিগ্রিধারী, প্রতিবাদী কোন মহিলা নই, আমি বাইশ বছরের সামান্য একজন গৃহবধূ। তবু এই সামান্য জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে যেটুকু উপলব্ধি হয়েছে তা সহজভাবে লেখার চেষ্টা করছি। আমি তো কোন সাহিত্যিক নই, তাই মনের সামান্য চিন্তাভাবনাটুকু সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে পারবো কিনা জানি না তবু ক্ষীণ আশা রাখছি আপনি নিজগুণে ক্ষমা করে নেবেন।

আপনার অভিজ্ঞতা, সম্মান ইত্যাদির কাছে আমি নগণ্য, আপনাকে প্রশ্ন করার ধৃষ্টতা আমার নেই, তবুও একটা বিষয় খুব জানতে ইচ্ছে হয়। শ্রীমতি অঙ্গনা মিত্র আপনাকে স্বনির্ভর প্রতিবাদী মেয়েদের কাহিনী লিখতে অনুরোধ করেছেন আর আপনি লেখেন বঞ্চিতা, নির্যাতিতা মেয়েদের মর্মস্পর্শী কাহিনী। আচ্ছা, মেয়েরা কি কেবলই এই দু' ধরনের হয় ? এমনও অনেক মেয়ে আছেন যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্য মানুষের (এমন কি মেয়েদেরও) ক্ষতি করেন, আবার এমন মেয়েও আছেন যাঁরা নারী স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা চালান। তাঁরা কি খুব সুখী বা স্বাধীন নারী হিসেবে আত্মগর্ব অনুভব করেন ? আবার এমনও মেয়ে আছেন যাঁরা অনেক কষ্ট সহ্য করেও সংসারের শান্তি বজায় রাখতে সক্ষম হন। এঁরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বঞ্চিত হলে অন্য এক সুখে সুখী নন কি ? তাহলে এঁদের কথা কে লিখবে ? আমাদের এই পুরুষশাসিত

সমাজে মেয়েদের দুর্দশার জন্যে কি শুধু পুরুষরাই দায়ী ?

সব মেয়ে ইচ্ছে থাকলে জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, স্বনির্ভর হতে পারে না। সেক্ষেত্রে হয়তো গুরুজনদের পছন্দ করা পাত্রকে তাদের বিয়ে করতে হয়। দুটি অচেনা অজানা নরনারী নতুন জীবন যাপন করার ছাড়পত্র পায় বিয়ের মাধ্যমে, কিন্তু সবক্ষেত্রেই কি তারা অসুখী হয় ? বলা হয়েছে, যাকে কখনই চেনা ছিল না তাকে ভালবাসা কি সম্ভব ? বিয়ের আগে মেলামেশা করে কি একটা মানুষের চরিত্র সম্পূর্ণ বোঝা যায় ? আর কাউকে দেখে কি ভবিষ্যৎ-বাণী করা সম্ভব যে 'এ আমার উপযুক্ত হবে' বা 'এর সঙ্গেই সুখী হব !' আসলে বিয়ের আগে দশ বছরেও যে পুরুষকে চেনা যায় না, বিয়ের মাত্র এক বছরেই তাকে ভাল ভাবে চেনা যায়। তাই গুরুজনদের কথায় অচেনা হলেও যোগ্য পুরুষকে বিয়ে করে তার সঙ্গে বসবাস করার মধ্যে নারীত্বের কোনো অবমাননা আছে কি ? বিয়ে মানে শুধু শারীরিক সম্পর্ক তো নয়, দুটি ভিন্ন হৃদয়ের মেলবন্ধন ঘটার নাম বিয়ে। এই বিয়ের পরিণতি শুধু কপালের ওপর নির্ভর করে না, করে দুটি বিবাহিত মানুষের মানসিকতার ওপর। দায় শুধু নারীর না, পুরুষেরও। তবে দুটো মানুষের চিন্তাভাবনা, ভাল লাগা মন্দ লাগা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা কখনও এক হতে পারে না। তবু একে অপরের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে মেনে নিয়ে, অশান্তি বর্জন করে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করার অর্থ নারী-স্বাধীনতা বিসর্জন করা নয়। ছেলেবেলা থেকে পুরুষবন্ধুর সঙ্গলাভ আমাদের দেশের আশিভাগ মেয়েরই জোটে না, তা বলে তারা কি স্বাধীনতা পায়নি ? তারা কি সবাই স্ব-নির্বাচিত পুরুষ বিবাহ করতে না পারায় অসুখী ? আবার যারা পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী, তারা কি কখনও পুরুষ চিনতে ভুল করেন না বা সঠিকভাবে চিনতে না পারায় একাকীত্বকে সঙ্গী করে হা-হুতাশ করেন না ?

সংস্কৃত মন্ত্র অথবা বাংলা মন্ত্র পড়েই হোক বা রেজিস্ট্রি বা অন্য যে কোনো উপায়েই হোক, বিয়ে নামক পবিত্র বন্ধনকে অস্বীকার করা যায় না। আবার স্বনির্বাচিত, পরিচিত পুরুষকে বিয়ে করাই নারীস্বাধীনতার মাপকাঠি নয়। আজ যদি লিভ টুগেদারের যুগ হয়, তবে কারও কারও স্বার্থসিদ্ধি হলেও সমাজ অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে যাবে। তাই স্বামী পরিচিত অথবা অপরিচিত যাই হোক না কেন, লম্পট, মাতাল, দুশ্চরিত্র বা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত না হলে তাকে ভালবেসে শ্রদ্ধা করে সারাজীবন কাটাতে বাধা কোথায় ? স্বামীর কাছ থেকে যোগ্য মর্যাদা পেলে তাঁকে নির্ভর করে জীবনযাপন করার মধ্যে কি কোনো আত্মতৃপ্তি নেই ? শুধু নারীত্বকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্যে তাকে অবমাননা করা কি যোগ্য নারীসুলভ মনোভাব ?

তবে হ্যাঁ, আমাদের সেই সব মানুষের পাশেই দাঁড়াতে হবে, বাঁচার রসদ যোগাতে হবে যারা সত্যিই নির্যাতন এবং বঞ্চনার শিকার, সে নারী-পুরুষ যেই হোক না কেন ! কিন্তু শুধু নারীমুক্তি বলে চিৎকার করে বিবাহ-বন্ধন অস্বীকার করে পুরুষের নামে কুৎসা রটিয়ে বাঁচা যায় না, কারণ সমাজে নারী-পুরুষ উভয়ই অপরিহার্য এবং আমরা সামাজিক জীব। আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানবমুক্তি অর্থাৎ অত্যাচারী লোভী স্বার্থান্বেষী মানুষের কবল থেকে অন্য মানুষকে রক্ষা করা, তবেই এক সুন্দর সমাজ গড়ে উঠবে, মানুষ খুশী হবে।'

কী ভাল চিঠি ! আশাবাদী, সুস্থ সমাজের আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট। 'বাইশ বছরের সামান্য একজন

গৃহবধূ' এমন চিঠি লিখেছেন জানলে খুব ভাল লাগে। 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।'
শবেলায় অনেক বাড়িতে ছুঁচসুতো দিয়ে বাক্যটি কাপড়ে লিখে দেওয়ালের ফ্রেমে বাঁধিয়ে
ঝুলতে দেখেছি। শ্রীযুক্তা শ্রুতি ঘোষকে সেইরকম একজন রমণী হিসেবে কল্পনা করতে
অসুবিধে হচ্ছে না। তিনি অত্যাচারীর হাত থেকে অত্যাচারিতকে রক্ষা করতে চান এবং ওই
পথেই একদিন মানুষের মুক্তি হবে বলে বিশ্বাস করেন।

মুশকিলে পড়লাম ওই বাইশ বছর বয়সটাকে নিয়ে। উনি যদি বাষট্টি অথবা বাহাত্তর হতেন
তাহলে সমস্যাটা হত না। ওঁর চার পাঁচ বছর বয়সে নকশাল আন্দোলন হয়ে গেছে, একান্নবর্তী
পরিবার ভেঙে গেছে। বারো-তেরোতে টিভি ঢুকে গেছে ঘরে। তিন-চার বছরে নার্সারি স্কুলে
যেতে হয়েছে ইউনিফর্ম পরে এবং টিফিনের বাক্স নিয়ে এবং তাঁর মা পইপই করে বুঝিয়েছেন
টিফিনটা খেতে হবে তাকেই, অন্য কাউকে দান করলে খুব রেগে যাবেন তিনি। বাড়িতে ঠাকুমা
বা পিসি থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে মা যখন বাবাকে ঠেস দিয়ে কথা বলেছেন শোওয়ার ঘরে চাপা
গলায় তখনও তিনি ছিলেন শ্রোতা। ছোটদের সামনে বড়রা ওই ধরনের কথা বলা শুরু করেছিল
খন থেকেই।

আবার আমার ভুলও হতে পারে। কলকাতার অনেক দূরে একটি বড় একান্নবর্তী পরিবারে
ন্মে পিসি কাকিমা দাদু দিদিমাদের কাছে মানুষ হয়েছেন ভদ্রমহিলা। তাঁরাই তাঁকে শিখিয়েছেন
: রকম ব্যবহার করা উচিত। বাড়ির লোক মেয়েদের স্কুলে-কলেজে নিয়ে যাওয়া আসা করত।
জের পায়ে দাঁড়ানো নয়, পুরনো ব্যবস্থা মেনে উনিশ-কুড়িতেই বিয়ে দেওয়া হয়েছিল ভাল
হলে খুঁজে। তার আগে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল স্বামীর সঙ্গে, স্বামীর পরিবারের লোকজনের
ঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হবে। এবং সেইমতো আচরণ করে সমর্পিত হয়ে জীবনের কিছু
খ পেয়ে গেছেন তিনি।

এই চিঠি পড়ে দুজন মানুষের কথা মনে এল। একজন মণিমাসী। মণিমাসী আমার আত্মীয়া
ন। জলপাইগুড়িতে আমি থাকতাম হাকিমপাড়ায়, মণিমাসীরা সেনপাড়ায়। ওঁর ভাসুরের
ছেলে নিখিল আমার সঙ্গে পড়ত। সেই সূত্রে ওঁদের বাড়িতে যেতাম আমি। তখন পনের বছর
াস. সাহেব বিবি গোলামের সুমিত্রা দেবীকে দেখে ফেলেছি। মণিমাসীকে ঠিক সুমিত্রা দেবীর
তো দেখাতো। টকটকে গায়ের রঙ, নাক মুখ চোখ যেন শিল্পীর হাতে তৈরি। মণিমাসীর বয়স,
খন অনুমান করতে পারি, সেসময় তিরিশের আশেপাশে ছিল। আমি যেতাম বিকেলবেলায়,
াদ মরার আগে। দেখতাম নিখিলদের বাগানের বাঁধানো চাতালে বসে মণিমাসী 'দেশ'
ড়ছেন। ঘোমটা খোঁপা ছাড়িয়ে সামান্য উঠেই থেমে গিয়েছে। দৃশ্যটি আমার খুব ভাল লাগত।
িখিলকে বলেছিলাম, 'তোর মণিকাকী খুব পড়েন, না?'

'পড়ার সময়ই পায় না। এই দুপুর তিনটে থেকে চারটে, ব্যাস! একটু পরেই বাবা-কাকারা
সে যাবে। তাদের জলখাবার করতে হবে না?'

ওর মণিকাকী আমার কেন মণিমাসী সেটা বলা দরকার। প্রথম দিন সেই চাতালে যেতেই
ণিমাসী বললেন, 'এসো। কি নাম ভাই?'

'সমরেশ।'

'ওমা ! আমার দিদির ছেলের নামও যে তাই। তুমি আমাকে মাসী বলে ডেকো, কেমন ?'

মণিমাসীর বর জলপাইগুড়ির কোর্টে চাকরি করতেন। একান্নবর্তী পরিবার ওঁদের। সে-সময় কার কেমন আর্থিক অবস্থা তা বোঝবার ক্ষমতা বা ইচ্ছে ছিল না বলেই আমি জানি না মণিমাসীর বর কি রোজগার করতেন ? ভদ্রলোককে দেখেছি। সাইকেলে করে অফিসে যেতেন। রোগা, খাটো।

ও-বাড়িতে কাজের লোক ছিল একজন। সে বাসন মাজতো আর বাগানের কাজ করত। নিখিলের কাছে শুনেছি, মণিমাসী শীত গ্রীষ্ম বসন্তে ভোর চারটের সময় বিছানা ছাড়তেন। রান্নাঘর পরিষ্কার করে বাথরুমে যেতেন। জামাকাপড় কেচে উনুন ধরিতেন। ওঁর শাশুড়ি ঠিক পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠেই বউমার হাতের চা খেতেন। ওইসময় রান্না শুরু হয়ে যেত। নিখিলের মা মারা গিয়েছেন কয়েকবছর আগে। নিখিলের পিসি সাড়ে ছটায় উঠে চা খেয়ে পড়তে বসে যেত। সংসারের কাজে হাত দিত না। নিখিলের ঠাকুমা বলতেন, 'সারাজীবন তো ওকে হেঁসেল ঠেলতে হবে, এখন একটু আরাম করুক।'

রান্না শেষ হত আটটা নাগাদ। আমিষ এবং নিরামিষ আলাদা করে রাঁধতে হত। তারপর অফিসযাত্রীদের খাবার, স্কুলের ভাত পরিবেশন করে শাশুড়ি এবং বাড়িতে যারা থাকবে তাদের জন্যে জলখাবার করে দিতেন মণিমাসী। বাড়ি কিছুটা ফাঁকা হয়ে গেলে ঘর ঝাঁট দিয়ে ন্যাতা বোলাতে হত মেঝেয়। এই করতেই দুপুর আসত। তারপর স্নান এবং শাশুড়িকে খাইয়ে নিজের খাওয়া। শাশুড়ি শুতে গেলে বই নিয়ে বসতেন বাগানের চাতালে। তারপর আবার সংসারের কাজ যেটা সেটা শেষ হত রাত এগারটায়।

সব শুনে নিখিলকে বলেছিলাম, 'তোর কাকিকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয় !'

'ধ্যেৎ ! কাকিকে জিজ্ঞাসা কর, বলবে, ওমা নিজের সংসারে করব না ? আমি কখনও কাকিকে হাসিমুখ ছাড়া দেখিনি। আর আমাদের বাড়িতে কাকি রান্না না করলে কেউ খেতে পারবে না বলে উনি কোথাও যেতে পারেন না।'

সে-সময় শরৎচন্দ্রের লেখা গোগ্রাসে গিলছি। মণিমাসীর ওপর সহানুভূতি বেড়ে যাচ্ছিল সেকারণেই। একদিন নিখিলের ঠাকুমাকে বলেই ফেললাম, 'আচ্ছা, আপনারা তো একজন রান্নার লোক রাখতে পারেন, তাই না ?'

বৃদ্ধা মুখ গম্ভীর করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একথা কে বলতে পাঠাল ?'

'কেউ না।'

তার পরের দিন যখন বিকেলে ও-বাড়িতে গিয়েছি তখন দেখলাম মণিমাসী নীহাররঞ্জন গুপ্তের বই পড়ছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি বই ?'

'কালো ভ্রমর !' পড়েছ ? উঃ, কী উত্তেজনা !' মুখচোখে সেটা স্পষ্ট হলো।

'বউমা !' ভেতর থেকে ডাক ভেসে এল।

তড়িঘড়ি বই নিয়ে ছুটলেন মণিমাসী। বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলাম বৃদ্ধার গলা, 'কে এসেছে ?'

'সমরেশ।'

'অ। এত ঘনঘন আসছে কেন ? আগে তো আসতো না ?'

'তখন ছোট ছিল, এখন বড় হয়েছে—।'

'সেটাই তো সমস্যা। কার কি মনে আছে বোঝা যায় না। ছোট খোকা জানলে অন্য কিছু ভেবে না বসে, দ্যাখো !'

'কী বলছেন ? ও আমার চেয়ে কত ছোট !'

'আমিও তোমার শ্বশুরের চেয়ে কুড়ি বছরের ছোট ছিলাম বউমা। তাই বলে কি আমার ছেলেপুলে হয়নি ?'

আমার কান-মাথা দিয়ে আগুন বেরুতে লাগল। সেই যে বেরিয়ে এসেছিলাম, আর নিখিলদের বাড়িতে কখনও যাইনি। নিখিলকে বলিওনি কারণটা।

বছর কুড়ি বাদে যখন আমি কলকাতায় শেকড় গেড়ে ফেলেছি তখন বাৎসরিক ভ্রমণে জলপাইগুড়িতে গেলাম। আমার ছেলেবেলার এক বন্ধু সুবোধ বিশ্বাস সেনপাড়ায় থাকে। ওর বাড়িতে গিয়ে আড্ডা মারতে মারতে পুরনো বন্ধুদের খবর নিতে গিয়ে শুনলাম নিখিল এখন কুয়ালালামপুরে। নিখিলের কথা শুনে মনে এল মণিমাসীর কথা। ওঁর শাশুড়ি কি এখনও বেঁচে আছেন ? বাড়ি ফেরার সময় ওদের বাড়ির সামনে রিক্সা দাঁড় করালাম।

টিনের দরজায় শব্দ করতেই একটি ছেলে বেরিয়ে এল, 'কি চাই ?'

বললাম, 'মণিমাসী আছেন ?'

তখন সকাল এগারটা। ছেলেটি ভেতরে নিয়ে গেল। বারান্দায় গোটাতিনেক বাচ্চা বসে আছে মুখ তুলে। ফর্সা মোটাসোটা যে প্রৌঢ়া ওদের মুখে ভাতের লাড্ডু তুলে দিচ্ছেন তিনিই যে মণিমাসী তা বুঝতে অসুবিধে হলো না। মাত্র কুড়ি বছর সময়, কিন্তু কী আমূল পরিবর্তন ! চোখটানা রূপসী থেকে জরাগ্রস্তা রমণীতে পরিণত হয়ে গিয়েছেন। বাচ্চাগুলো আমাকে দেখে অবাক হয়ে খাওয়া ভুলে তাকিয়ে রইল। মণিমাসীর বাঁ হাত চলে গেল পেছনের দিকে। ঘোমটা তোলার চেষ্টা করলেন, চোখে বিস্ময়।

'সমরেশ না ?'

'হ্যাঁ, কেমন আছেন ?'

'ভাল। এই যে, এরা আমার নাতি-নাতনি। নিখিলের দাদার ছেলে আর ওর বোনের মেয়ে। এদের নিয়ে ভালই আছি। তুই ?'

'আছি।'

'তোর লেখা বই পড়েছি। উত্তরাধিকারে তো এখানকার কথা আছে। সবার কথা, শুধু আমার কথা লিখিসনি।'

আমি হাসলাম। 'উত্তরাধিকার' আমার জীবনী নয়, উপন্যাস। সেখানে প্রয়োজনমতো চরিত্র এসেছে। আর লিখতে চাইলে কি লিখতাম ?

এইসময় ভেতর থেকে গলা ভেসে এল, 'কাকিমা, তাড়াতাড়ি ওদের খাওয়ানো শেষ করুন। এরপর তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ বউমা। এ্যাই আয়, খা বাবা, সেই রাজকন্যার গল্পটা বলব। সেই রাজকন্যা যে

তিনমাথা রাক্ষসকেও ভয় পায়নি। আয়—।'

বললাম, 'আপনি ওদের খাওয়ান। আমি চলি।'

'আবার আসিস। আমি না খাইয়ে দিলে এদের খাওয়া হয় না, খেতেই চায় না।' মণিমাসী তাঁর সম্পর্কের নাতি-নাতনিকে গল্প শুনিয়ে খাওয়ানো শুরু করলেন। আমি বেরিয়ে পড়লাম।

রিক্সায় বসে ভাবছিলাম মণিমাসীকে নিয়ে যদি কেউ লিখতে চায় তো সে লিখবে কি করে ভদ্রমহিলা তাঁর নিজস্ব ইচ্ছেগুলোকে মেরে ফেলে সংসারের জন্যে নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে ব্যাপারটা তো উল্টো হতে পারে: নিজের সন্তান হয়নি। স্বামী চলে গিয়েছেন। সংসারটাকে নিজের বিশ্বাস করে মণিমাসী যা যা করণীয় তাই করে গিয়েছেন। সেই করাটাকে আমাদের চোখে বেদনাদায়ক হলেও তিনি আনন্দ পেয়েছেন। প্রত্যেকের জন্যে কিছু করে যিনি সুখী হয়েছেন তাঁকে দুঃখী বলা যায় কি করে? স্বামী যদি বেশ কয়েক লক্ষ টাকা রেখে যেতেন ওঁর নামে, তাহলে কি তিনি ওই সংসার থেকে বেরিয়ে আসতেন? আলাদা ফ্ল্যাট নিয়ে ঝি-চাকর রেখে পায়ের ওপর পা তুলে বই পড়ে কি জীবন কাটিয়ে দিতেন? সেরকম হলে আমরা খুশী হতাম, কিন্তু আমি জানি মণিমাসী তাতে সুখ পেতেন না।

শ্রীযুক্তা শ্রুতি ঘোষের চিঠিটা আমি আর একজনকে পড়তে দিয়েছিলাম। মেয়েটির নাম কেয়া মিত্র। অঙ্গনা মিত্রের চিঠি পড়ে কেয়া বলেছিলেন, 'একটু বেশি লিখেছেন। আসলে চলতে জানতে যেমন হয় থামতেও শিখতে হয়। সাপ যখন ছোবল মারে তখন বিষ বেরিয়ে যায়। তারপর মাথা নিচু করে পালায়। মেয়েরাও যদি একই কাণ্ড করে তবে মুশকিল।'

কেয়ার কথা আমার ভাল লেগেছিল। শ্রীযুক্ত শ্রুতির চিঠি পড়ে বললেন, 'সোনার পাথরবাটি।'

'তার মানে?'

'প্রথম কথা ইনি গুরুজনদের ওপর ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁরা পাত্র যোগাড় করে এনে দিলে ইনি তার সঙ্গে বাস করবেন। অনেক কষ্ট সহ্য করেও ইনি সংসারের শান্তি বজায় রাখতে চাইবেন। যেহেতু তাঁর নিজের কিছু করার ক্ষমতা নেই তাই বেঁচে থাকার জন্যে উনি অ্যাডজাস্টমেন্ট করার উপদেশ দিয়েছেন। শুধু স্বামী লম্পট, মাতাল, দুশ্চরিত্র বা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত না হলেই হলো। তাহলেই তাঁকে শ্রদ্ধা ভালবাসা জানিয়ে সারাজীবন কাটাতে চান। আচ্ছা ধরা যাক, বিয়ের পর জানা গেল ওই তিনটি মহাগুণের একটি স্বামীর মধ্যে রয়েছে। তাহলে ওই ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা ভালবাসা জানাতে পারবেন না? না পেরে যাবেন কোথায়? বাপের বাড়িতে? ওঁর তো নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতাও নেই। বাকি জীবন বাবা-মা থাকবেন না। ভাই-এর ঘাড়ে পড়ে থাকতে ভাল লাগবে? আর একটা কথা, ধরা যাক ওঁর স্বামীর ওই তিন মহাগুণ নেই। তিনি মদ খান না, লম্পট বা দুশ্চরিত্র নন আর অসুখবিসুখও নেই। কিন্তু ভদ্রলোকের সন্দেহ করার বাতিক আছে। কথায় কথায় যন্ত্রণা দিতে পারলে আনন্দ পান। জীবনে একটা ভাল বই পড়েননি, গানও শোনেন না। সব ব্যাপারে নাক গলান। কথা বলার সময় অশ্লীল শব্দ না বলতে পারলে পেটের ভাত হজম হয় না। যীশুখৃষ্ট অথবা চৈতন্যদেবের ক্ষমতা নেই এই মানুষটির মধ্যে পরিবর্তন আনার। শ্রুতি দেবী এঁকে ভালবাসতে

শ্রদ্ধা করতে পারবেন ? ইনি ওসব আত্মীয়স্বজন বা গুরুজনদের সামনে করনে না। তাঁরা জানেন না এই স্বভাবের কথা। তাঁদের কাছে উনি বেশ ভদ্রলোক। কি করবেন শ্রুতি দেবী ?'

কেয়া হাসলেন, 'সমরেশদা, এদেশের স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে আমি বাথরুমে যাচ্ছি, তুমি ভাতটা গ্যাস থেকে নামিয়ে রেখো, তাহলে হজম করা মুশকিল হয়ে যায়। যাক গে, আপনি নিশ্চয় জানেন, এখন ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়ার আগে তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় পছন্দের মানুষ কেউ আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে বাপরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। নিজেরা পছন্দ করে ছেলে বা মেয়ে আনলে যে ঝুঁকি থাকছে তা আর বেশির ভাগ মানুষ নিতে চাইছে না।'

কেয়ার কথায় যুক্তি রয়েছে। শ্রুতি দেবীও তাঁর বিশ্বাসের কথা লিখেছেন। মুশকিল হলো কোন মেয়ে যদি স্বাধীনভাবে নিজের মতো বাঁচতে চান, তাহলে লোকে তাঁকে উগ্রবাদী আখ্যা দিয়ে সুখ পায়। বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন বিয়ে করেননি। কিন্তু কোনো মেয়ের কি অধিকার নেই একথা বলার যে আমি বিয়ে করব না ? নিজের মতো করে বাঁচতে চাই ?

॥ ৩৪ ॥

পঞ্চাশ বছর আগে ভালবাসা শব্দটি খুব সঙ্কুচিত অবস্থায় ছিল। কোন মহিলার অধিকার ছিল না বাবা মা অথবা সন্তানদের ছাড়া অন্য কাউকে ভালবাসি বলার। এমন কি স্বামীকেও যে তিনি ভালবাসেন তা পাঁচজনের সামনে বললে চরিত্রহানির সম্ভাবনা ছিল। বিবাহিতা মহিলার অন্য পুরুষের প্রতি ভালবাসা ঘোষণা করার কথা যেমন চিন্তা করা যেত না, অবিবাহিতাদের পক্ষে সেকথা বলা প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। ছেলে বা মেয়ে প্রেমে পড়েছে জানলেই অভিভাবকরা বিচলিত এবং নিষ্ঠুর হয়ে যেতেন। এবং তাই নিয়ে প্রায় ষাট দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে অনেক উপন্যাস লেখা হয়েছে।

এইটুকু ভূমিকা থেকে মনে করা ভুল হবে সেসময় কোনো মহিলা ভালবাসতেন না। সাবিত্রী কিরণময়ীরা যেমন ছিলো তেমনি লাবণ্যদেরও অভাব ছিল না। বঙ্কিমের নায়িকারা নেহাৎই বালিকা বয়সে চুটিয়ে প্রেম করেছেন যদিও বঙ্কিম বলেছেন বাল্যপ্রেমে অভিশাপ আছে। সেটা থাক বা না থাক বাল্যপ্রেম যে ছিল তা কথাটায় বোঝা যাচ্ছে।

ভালবাসা তো ছিল, আছেও, কিন্তু একজীবনে কটা ভালবাসা মানুষ বাসতে পারে এবং তা সমাজ স্বীকার করে নেবে ? আমরা জানি দেবদাস পার্বতীর প্রেমে প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল এবং দ্বিতীয় কোনো নারীর প্রেমে পড়েনি। এটাকেই আদর্শ করে নিয়েছিল সেকালের যাবৎ প্রেমিক-প্রেমিকারা। কিন্তু ধরা যাক, একজন আর একজনের প্রেমে পড়ল, প্রচণ্ড ভালবাসা

জন্মাল। তারপর একজন মারা গেল। অন্যজন সেই স্মৃতি নিয়ে বিরহী হয়ে বাকি জীবন অপেক্ষা করবে কার জন্যে ? মৃত্যুর ? ধরা যাক তাই করছিল সে। এইসময় তার জীবনে আর একজন এল। সে শোক মুছিয়ে দিল। জীবনের অর্থ পাল্টে দিল। তাকে ভাল না বেসে প্রথমজন পারল না। এতে কি তার প্রথম ভালবাসাকে অপমান জানানো হবে ? এবার এই নতুন ভালবাসাকে স্বীকৃতি দিয়ে এরা বিয়ে করল। বিয়ের কিছুদিন পর আবিষ্কৃত হলো কিছুতেই সমঝোতা হচ্ছে না। বেশির ভাগ ব্যাপারেই মতপার্থক্য। আগের বায়বীয় জীবনে যেটা ধরা পড়েনি তা বিয়েরর পর বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে নগ্ন হলো। তখন ধীরে ধীরে ভালবাসা বদলে যাচ্ছে। একসঙ্গে থাকতে হয় বলে থাকা। দুজনে দুটো বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো রয়েছে। শেষ পর্যন্ত সম্পর্কের সুতো বোঝা হয়ে দাঁড়াল। ওরা বিচ্ছিন্ন হলো। এইবার প্রথমজনের মনে হলো অনেক হয়েছে, আর নয়। কিন্তু কে বলতে পারে বছর কয়েকের মধ্যেই তার জীবনে তৃতীয় মানুষের আগমন হবে না যাকে ভালবেসে সংসার করলে বাকি জীবন সুন্দরভাবে কেটে যাবে ? কেউ বলেন ভালবাসা মানে হিমালয়ের বোঝা নয় যে একবার ঘাড়ের ওপর তুললে জীবনে নামানো যাবে না। কেউ বলেন ভালবাসা অত্যন্ত পবিত্র অনুভূতি, যা দ্বিতীয়বার আসতে পারে না।

প্রথম দলের বক্তব্য হল, দুটো মানুষ কখনই এক হতে পারে না। তাদের মধ্যে বড়জোর তিরিশ ভাগ মিল থাকতে পারে। বাকি সত্তর ভাগের অমিল তারা উপেক্ষা করে ভালবাসার জন্যে। আমি গোলাপ ভালবাসি মানে রজনীগন্ধা ভালবাসতে পারব না এটা ভাবা মূর্খামি। ভালবাসার মূল শর্ত যদি সততা তাহলে যতদিন সম্পর্ক থাকবে ততদিন অসৎ না হলেই হলো। সম্পর্ক শেষ হয়ে যাওয়ার পর সৎ থাকার কি কোনো মানে আছে ? সেক্ষেত্রে জীবনে যদি আর কেউ আসে তার প্রতি সৎ হওয়াই বেশি মূল্যবান্।

যারা বিপক্ষে তারা বলেন ভাল না বেসে যে বিয়ে তাতে ভালবাসা আসে বিয়ের পর। একটু একটু করে। এই বন্ধন সমাজকে করে আরও বেশি শক্তিশালী। জীবনের অন্যান্য মূল্যবোধকে করে আলোকিত। তাই যারা পরস্পরকে ভালবাসে তারা পারিপার্শ্বিকের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করল। তাদের কোন অধিকার নেই ভালবাসাকে বিনষ্ট করার।

ভূমিকাটি কি বেশি বড় হয়ে গেল ? আমার কয়েকদিন বন্যাদির কথা মনে পড়ছে। এই সেদিন আকাদেমিতে নাটক দেখতে গিয়ে পেছন থেকে এক মহিলাকে দেখে প্রায় ডেকেই ফেলেছিলাম বন্যাদি ভেবে। তারপর থেকেই মনে আসছেন তিনি।

বন্যাদি পড়তো আমাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভদ্রমহিলা বয়সে আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড় ছিলেন। বিয়ে হয়েছিল আগেই, বিধবা হন ছমাসের মধ্যে। তারপর আবার পড়া আরম্ভ করে স্পেশ্যাল অনার্স নিয়ে এম. এ. পড়তে এসেছিলেন। ওঁর চেহারাটি মন্দ ছিল না। কিন্তু অদ্ভুত একটা বিষণ্নভাব জড়ানো থাকত। উনি ক্লাস করতেন, নোট নিতেন কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন না। সোজা লাইব্রেরিতে চলে যেতেন। এম. এ. ক্লাসে একজন মাস্টারমশাই-এর খুব ফ্যান ছিলাম আমরা। দেশবিদেশের সাহিত্যের খবর তাঁর কাছে পাওয়া যেত। কোনো কারণে অন্যমনস্ক হলে তিনি পড়ানো থামিয়ে বলতেন, 'মনে হচ্ছে, সমরেশবাবু এই মুহূর্তে ক্লাসের কোনো সুন্দরীর কথা ভাবছেন ! উনি কি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা বলবেন ?'

নিজের নাম শুনে হকচকিয়ে গেছি ততক্ষণে। প্রায় জনা চল্লিশেক ছেলেমেয়ে আমার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে। ভাবখানা এমন, বোঝ, স্যার কিরকম টাইট দিয়েছেন। উঠতে হলো। মাস্টারমশাই প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করলেন। কি উত্তর দেব ভেবে না পেয়ে মেয়েদের বেঞ্চিগুলোর দিকে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে সবাই মুখ ফিরিয়ে নিল। বললাম, 'আমি বন্যাদির কথা ভাবছিলাম। কতখানি সিরিয়াস হলে পিছিয়ে গিয়েও আবার পড়াশুনায় এগিয়ে এসেছেন।' বন্যাদি মুখ নামালেন। মাস্টারমশাই বললেন, 'ওই সিরিয়াসনেস যদি তোমার মধ্যে দেখতে পাই তাহলে আমি খুশী হব।'

আমি ফাঁকিবাজ ছিলাম। বন্যাদি টিচার্স রুমে গিয়ে মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে আলোচনা করতেন, লেখা দেখাতেন। মাস্টারমশাই যেসব অনুষ্ঠানে যেতেন সেখানেও বন্যাদি অন্ধ ছাত্রীর মতো যেতেন। বক্তৃতা শুনতেন, চলে আসতেন। ওঁর বাড়িতেও শুনেছি যাওয়া আসা ছিল বন্যাদির।

আমরা এম. এ. করে বেরিয়ে আসার পরে শুনলাম বন্যাদিকে নিয়ে মাস্টারমশাই-এর বাড়িতে খুব ঝামেলা শুরু হয়েছে। ওঁর স্ত্রী বন্যাদিকে সহ্য করতে পারছেন না, বাড়িতে আসতে নিষেধ করেছেন। মাস্টারমশাইকে সন্দেহ করছেন তিনি। মাস্টারমশাই আমাদের চোখে ছিলেন আদর্শ। তাঁর সম্পর্কে এসব শুনতে ভাল লাগেনি। বন্যাদি কোন এক কলকাতার কাছাকাছি কলেজে চাকরি পেয়েছেন। তখন সিঁথিতে সিঁদুর দেখা যাচ্ছে তাঁর। যে-ই জিজ্ঞাসা করছে বলছেন মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে। সামাজিক চাপে একসঙ্গে থাকতে পারছেন না। কেউ বিশ্বাস করিনি, কেউ করেছি কথাটা। এইসময় আচমকা মাস্টারমশাই মারা গেলেন। খবর পেয়ে আমরা ছুটলাম হসপিটালে। মাস্টারমশাই-এর মৃতদেহ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে শ্মশানে যেতে হবে। বন্যাদিকে দেখলাম মাস্টারমশাই-এর পায়ের কাছে পাথরের মতো বসে আছেন। বাজে পোড়া গাছের মতো চেহারা। শোকটা যে সত্যিকারের তাতে সন্দেহ নেই। মাস্টারমশাই-এর স্ত্রী এলেন। চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'ওই ডাইনিটাকে এখান থেকে সরিয়ে দিন। ওর জন্যে এই সর্বনাশ হলো।' বয়স্করা বন্যাদিকে অনেক বুঝিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেলে আমরা মৃতদেহ লরিতে তুলে শেষযাত্রা করেছিলাম। এই ঘটনার পর কেউ কেউ মাস্টারমশাইকে দোষী করতেন কেউ বন্যাদিকে। সত্য বা অসত্য আমি জানি না। তবে মনে হয়েছিল যে কোনো মহিলা যদি সামান্য সংবেদনশীলা হন তাহলে মাস্টারমশাইকে না ভালবেসে পারবেন না। বন্যাদি কি অন্যায় করেছিলেন ?

এর পরের ঘটনা আর একজন বেপরোয়া লেখককে জড়িয়ে যিনি প্রথাসিদ্ধ লেখা না লিখে বিখ্যাত হচ্ছিলেন। বড় কাগজে কাজ করেও তাদের সঙ্গে আপোষ করেননি। হঠাৎ তাঁর সঙ্গে বন্যাদির নাম জড়িয়ে গেল। ওঁদের প্রায়ই এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে। আমাদের মনে তখন মাস্টারমশাই-এর স্মৃতি ফিকে হয়ে এসেছে। কিন্তু বন্যাদির কথা উঠলেই তাঁর কথা মনে আসত। সেই বন্যাদি কি করে আবার প্রেমে পড়লেন ? সেই লেখকের বাড়িতেও অসন্তোষ শুরু হলো এবং হঠাৎই ভদ্রলোক মারা গেলেন। হৃদরোগ তাঁর সর্বনাশ করল।

স্বামীকে ধরলে তিনজন পুরুষের মৃত্যু বন্যাদিকে চিহ্নিত করল অন্যরকম ভাবে। তাঁর

সান্নিধ্যে যে পুরুষ আসবে, এসে ভালবাসা পাবে তাকে চলে যেতে হবে পৃথিবী থেকে। কুলোকের
এরকম রটনা শুরু করল। আমার সঙ্গে বন্যাদির কোন সংযোগ নেই। দেখা হয় না। শুনতে খুব
খারাপ লাগে। কেবলই মনে হয় বন্যাদির সঙ্গে দেখা হলে জানতে চাইব কেন একরম হয়?

তারপর বেশ কিছুদিন বন্যাদির কোনো খবর পাইনি। কাগজের অফিসে যাই। আড্ডা হয়।
একজন পরম শ্রদ্ধেয় বিখ্যাত লেখক-সাংবাদিকের ঘনিষ্ঠ হয়েছি আমি। ভদ্রলোক যখন কথা
বলেন তখন অজস্র মণিমুক্তোর সন্ধান পাই। যে কোনো বিষয়ে তাঁর জ্ঞান অবাক হয়ে জানার
মতো। একসময় উজ্জ্বল গল্প লিখেছেন, উপন্যাসও। হঠাৎ লেখার ভঙ্গী পাল্টালেন। জটিল
হয়ে গেল ওঁর গদ্য। সেইসঙ্গে সাংবাদিকতার চাপ ওঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল সাহিত্য থেকে।
তারপর যখন আবার ফিরে আসতে চাইলেন তখন ট্রেনের চাকার চাইতে লাইন কিঞ্চিৎ ছোট
হয়ে গিয়েছে। সেইসময় তাঁর মরীয়া প্রয়াস লক্ষ্য করেছি। মদ্যপান করতে ভালবাসতেন
হতাশা তাঁকে উদ্ধত করেছিল। তবু রাত বারোটার সময় লিখতে লিখতে যখন লাগসই শব্দ খুঁজে
পেতাম না অথবা ডুয়ার্সের ময়নাগুড়ি থেকে বাঁ দিকে ঘুরে কিছুটা গেলে যে হাট বসে তার নামটা
মনে না আসতো তখন ওঁকে ফোন করতাম। প্রশ্ন শুনে জবাব দিয়েই টেলিফোন নামিয়ে
রাখতেন। সামান্য ব্যাপারে ওঁর অভিমান হত। তখন কথা বন্ধ। আবার পুজো সংখ্যায় আমার
একটা উপন্যাস পড়ে ভোর পাঁচটায় চলে এলেন বাড়িতে। বললেন, 'দারুণ লিখেছ! এসো
দাবা খেলি।' সেই খেলা শেষ করতে হয়েছিল দুপুর দুটোয়। তারপর রাতদিন হোটেলে গিয়ে
মদ্যপান করে বলেছিলেন, 'চল গান শুনি।' একজন বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর বাড়িতে গিয়ে
অনেক গান শোনা হলো। গীতবিতান ওঁর মুখস্থ ছিল, স্বরবিতানের কোন পাতায় কোন স্বরলিপি
তাও না দেখে বলে দিতে পারতেন। আমি দেখতাম একটি বল্গাহীন ঘোড়ার মতো তিনি ছুটে
বেড়াচ্ছেন, কোথাও শান্তি পাচ্ছেন না।

একদিন বিকেলে ওঁর চেম্বারে একা শান্ত অবস্থায় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি
মানসিক সমস্যায় আছেন?'

কি ভাবলেন। তখন তাঁর বাযট্টি বছর বয়স। ড্রয়ার খুলে একতাড়া চিঠি বের করে বললেন
'এগুলোর ওজন আর সহ্য করতে পারছি না। দিন দিন ওজন বেড়ে যাচ্ছে।'

'কি এগুলো?'

'চিঠি তা বুঝতে পারছ। ভালবাসার চিঠি। ভালবাসা যখন সর্বগ্রাসী হয় তখন তার ওজন
মারাত্মক হয়ে যায়। সেই ভালবাসা সহ্য করা যায় না, একথা ভদ্রমহিলা বোঝেন না। ইনি এমন
কি বিশ্বাসও করেন যে যিনি আমার ছেলেমেয়ের মা তিনি আমার বৈধ স্ত্রী নন। আমাকে সেই
ভদ্রমহিলা জোর করে আটকে রেখেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। কি করে বোঝাই
এ যে কি যন্ত্রণা—!'

'কি করে আলাপ হয়েছিল?'

'এক সাহিত্যসভায়। দেখলাম ভাল পড়াশুনা আছে। ভাব হয়ে গেল চটপট! উনি
ভালবেসে ফেললেন। আমার প্রতিটা লাইন পড়ে ফেলেছেন। প্রতি সপ্তাহে তিনটে চিঠি
লেখেন। আমাকে ওঁর সঙ্গে বাকি জীবন থাকতে হবে। আমাকে ঘিরে থাকবেন তিনি। আমি

:নক বুঝিয়েছি কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। এখন ভয়ে আমি রবীন্দ্রসদন শিশির মঞ্চে একা যেতে রি না। মেয়েকে নিয়ে যাই, তুমিও গিয়েছ।'

'কেন ?'

'একা দেখলেই কাছে চলে আসবেন। ফিসফিস করে বলবেন, "কি সিদ্ধান্ত নিলে ? আমি পারছি না ?" ওই কণ্ঠস্বর শুনলে রক্ত হিম হয়ে যায় আমার। অফিসের রিসেপশনে বলে খেছি ওঁকে ঢুকতে না দিতে; অপারেটারকে বলেছি লাইন না দিতে। কিন্তু অন্য নামে ফোন রলে বা পোস্টে চিঠি পাঠালে কি করে আটকাবো ?'

'আপনি ওঁকে ভালবাসেননি ?'

'ভাল লেগেছিল। ওঁর কিছু গুণ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু যেই বুঝলাম ওঁর ভালবাসা গ্রাসী, সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়েছিলাম। কিন্তু কে শোনে কার কথা!'

'বউদি জানেন ?'

'হ্যাঁ। মেয়েরাও জানে।'

'বউদি কিছু বলেননি ?'

'না। আমার যন্ত্রণা দেখে হয়তো মজা পেয়েছেন। এর আগে কেউ আমাকে এমন যন্ত্রণা য়নি।'

'ভদ্রমহিলাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। কিছু করেন ?'

'হ্যাঁ। কলেজে পড়ান।'

'কি নাম ?'

'বন্যা।'

সোজা হয়ে বসেছিলাম। আমার মুখ দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হলো ?'

'ইনি— !'

'আমি সব জানি।'

'জানেন ?'

'আলাপ হওয়ার আগে জানতাম না। পরে জেনেছি। ওই দুজনের মৃত্যুর জন্যে ও দায়ী ব কেন ? এটা নেহাৎই কাকতালীয় ব্যাপার। তোমাদের মাস্টারমশাইকে ও সত্যি ভালবেসেছিল। রলোক স্বীকৃতি দিতে পারেননি। ও আদায় করে নিতে চেয়েছিল, সিঁদুর পরেছিল। কিন্তু উনি ল গেলেন। এই লেখক সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে। তবে এ দুঃসাহসী ছিল। ন্তু হৃদরোগ বাদ সাধল। আমার মনে হয়েছিল একটি মেয়ে ভালবাসার নয়, ভালবাসতে জেন্দ্রাণীর মতো দুহাত উজাড় করে দিতে চাইছে অথচ দেবার পাত্র পাচ্ছে না। আমরা সবাই লবাসার কাঙাল হই, কেউ ভালবাসা দেবার জন্যে পাগল হই না। পরে বুঝলাম কেউ দিতে লেই নেওয়া যায় না। যে দিচ্ছে সে রেখে ঢেকে দিতে জানে না। জল জীবন দেয়। তাই ন কেউ যদি এক চৌবাচ্চা জল খেতে বাধ্য করে তাহলে পেট ফুলে মরে যেতে হবে।'

রাগ হয়ে গেল খুব। বন্যাদির উপর। এ কিরকম কথা! একের পর এক মানুষকে লবাসতে যাচ্ছেন ? কত ভালবাসা আছে তাঁর ?

হঠাৎ খবর এল লেখক-সাংবাদিকের গলায় ক্যানসার বাসা বেঁধেছে। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে শেষপর্যন্ত হার মানলেন তিনি।

বন্যাদির কথা আজকাল বড় একটা শুনি না।

সেদিন কলেজ স্ট্রিটে এক প্রকাশকের অফিসে আড্ডা মারছিলাম। পুরনো দিনের কথা হচ্ছিল। ওঁদের ওই অফিসে এককালে সাহিত্যের দিকপালরা আড্ডা মারতে আসতেন। বিখ্যাত জ্যোতিষী আসতেন সেই সময়। একদিন মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে বন্যাদিও নাকি গিয়েছিলেন। জ্যোতিষী তাঁর জন্মের ছক দেখতে চেয়েছিলেন। দেখে মন্তব্য করেছিলেন, 'এই মহিলা যাকে ভালবাসবেন তিনি অসুখী হবেন।' মাস্টারমশাই জ্যোতিষীকে বিশ্বাস করতেন না।

আমিও করি না। মাঝে মাঝে মনে হয় সুযোগ হলে ওঁর সঙ্গে বসতাম। রবীন্দ্রনাথের ওই গানটা কি ওঁর খুব প্রিয় ? সখী ভাবনা কাহারে বলে ? ভালবাসা কারে কয়—তা কি তিনি আজও জানতে পারেননি ?

॥ ৩৫ ॥

ওদের বাড়িটা বেশ বড়। হাইওয়ে থেকে ডানদিকের গলি দিয়ে নেমে খানিকটা সোজা গেলে বাঁদিকে হাইওয়ের নিচের রাস্তাটা পাওয়া যায়। সেটা ধরে এপাশে এলে শান্ত রাস্তার পাশে গেটওয়ালা বাড়ি। গেটে নাম্বার ঝোলানো. কোন নাম নেই। বাঁ দিকে গ্যারাজের সামনে বাঁধানো চত্বরে একটা গাড়ি, গ্যারাজের ভেতরে আর একটা। এপাশে যত্ন করে তৈরী ঘাসের লন, সবুজ গাছগাছালির গায়ে ওদের সাদা একতলা লম্বাটে কাঠের বাংলো বাড়িটি যে কোনো বাঙালির চোখে স্বপ্নের মতো লাগবে। বাড়ির পেছনেও ঘাসের লন, চওড়া রঙিন ছাতির নিচে বসার ব্যবস্থা।

এই বাড়িতে এখন দুজন মানুষ থাকেন। দুজনেরই বয়স পঞ্চাশের নিচে। আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে এঁদের বিয়ে হয়েছিল কলকাতায়। সেসময় শ্যামল তরুণ ইঞ্জিনিয়ার। চাকরি পেয়েছেন আমেরিকায়। শুভ্রা ছাত্রী হিসেবে সাধারণ, নিউ আলিপুর কলেজে পড়ে, কোনো লক্ষ্য ছাড়াই কলেজে যায়। সম্বন্ধ এল। শুভ্রার একটাই সম্বল ছিল, সে দেখতে ভারি মিষ্টি, লক্ষ্মী প্রতিমার সঙ্গে মিল ছিল। আর যেটা জরুরী, কোনো বয়ফ্রেণ্ড ছিল না। শ্যামলের বাবা শুভ্রার বাবাকে বলেছিলেন, 'হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম মশাই। যে মেয়েকে দেখতে যাই, পছন্দ করি, খবর পাই তার একজন বয়ফ্রেণ্ড রয়েছে। কেউ ফ্রি নয়। একজনকে পছন্দ হলো. উড়ো ফোন এল, তার এখন নেই বটে কিন্তু একসময় ছিল। আমার ছেলের তাতে আপত্তি। আপনার মেয়েকে

গলে রেখেছেন বলে ধন্যবাদ।'

আমেরিকা প্রবাসী ইঞ্জিনিয়ার পাত্রকে জামাই হিসেবে পাওয়ার স্বপ্ন শুভ্রার মা-বাবা থতেন না। শুধু মেয়ে দেখতে ভাল এবং কারও সঙ্গে প্রেম করেনি বলে মন্ত্র পড়ে বিয়ে হয়ে ল। বিয়ের ছ মাস পরে স্বামীর ঘর করতে এসেছিল শুভ্রা। তখন ওরা থাকত নিউইয়র্কের াসটেরিয়া অঞ্চলে, দেড়ঘরের ফ্ল্যাটে। লং আইল্যান্ডের এই বাড়ি হয়েছে বছর আটেক আগে।

শ্যামল-শুভ্রার এক ছেলে এক মেয়ে। ওরা জন্মেছে এখানে। বাংলা বলে ভাঙা ভাঙা, রেজি উচ্চারণ কলকাতার বাঙালি বুঝতে পারবে না। দুজনেই স্কুল পেরিয়ে কলেজে গিয়েছে। দশের কলেজে ছেলেমেয়েকে পড়ানোর খরচ বিশাল! আট বছর আগে যখন বাড়িটা নেছিল তখন ধার করতে হয়েছিল. আমেরিকায় যে ধার করে না সে মর্যাদা পায় না। তুমি পাচ্ছ তার মানে এই যে তোমার ওপর আস্থা রাখা যায়। এ দেশের নব্বই ভাগ মানুষ ধারের ার চলে। কিন্তু শ্যামল চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করার কিছুদিন বাদেই ধার শোধ করে দিতে রেছিল। সমস্যা হলো ছেলেমেয়েরা পরপর বছর যখন কলেজে ভর্তি হলো। ওদের টাকা াগান দিতে গিয়ে হাঁসফাঁস অবস্থা। একেই এই বাড়ির জন্যে বছরে এগার হাজার ডলার ট্যাক্স ত হয়। সে-সময় শুভ্রা চাকরিতে বের হলো। তার যা বিদ্যে তাতে বড়সড় চাকরি পাওয়ার া নয়। মিনিট কুড়ি গাড়ি-দূরত্বে একটি বিশাল ডিপার্টমেন্টাল দোকানে সেলসের চাকরি পেল । মাসমাইনে নয়। দিনে ছ ঘণ্টা দিয়ে শুরু হয়েছিল। এখন সেটা আটে দাঁড়িয়েছে। ঘণ্টা ছু আট ডলার পাওয়া যায়। সপ্তাহে একদিন ছুটি। অর্থাৎ মাসে এক হাজার তিনশো ছত্রিশ ার ঘরে আনে শুভ্রা। এই টাকায় ওদেশে ছোটখাটো পরিবারের বাড়িভাড়া দিয়েও চলে যায় ানোমতে। এদের বাড়িভাড়া দেওয়ার প্রশ্ন ছিল না। ফলে অর্থনৈতিক সমস্যা আর রইল না।

এ বাড়ির রাত শেষ হয় সকাল সাড়ে সাতটায়। তখন বাইরে রোদ্দুর। ঝটপট চায়ের জল ম করার ব্যবস্থা করে বাথরুমে চলে যায়। ফিরে এসে চা বানায়। শুভ্রার জন্যে ফ্লাস্কে ঢেলে জ লনের দিকে তাকিয়ে চা পান করে। তারপর দাড়ি কামানো স্নানের পালা শেষ করে দ্যাখে া চা নিয়ে বসেছে। ঝটপট দুধ আর সিরিয়াল বের করে মিশিয়ে খেয়ে নিয়ে শ্যামল বলে, চ্ছি'। শুভ্রা এসে দাঁড়ায় বাইরের বারান্দায়। দ্যাখে শ্যামল গাড়ি নিয়ে চলে গেল। তখন াওয়া আটটা। চল্লিশ মিনিট গাড়ি চালিয়ে কুইন্সে গিয়ে দোকান খুলবে শ্যামল। কাঁটায় কাঁটায় ায় দোকান খুলতে হয় তাকে।

বিশাল বাড়িতে তখন শুভ্রা একা। চা খেয়ে স্নান করে সে। তারপর ঠাকুরঘরে গিয়ে পুজোয় দ। এটা সে রপ্ত করেছে ঠাকুমাকে দেখে। তাঁর কাছ থেকেই মন্ত্র মুখস্থ করেছে। অবশ্য কাতা থেকে কেনা পূজা-পদ্ধতির বইগুলো সামনে থাকে। এইসময় ফোন বাজলেও সে ধরে । আধঘণ্টা ঠাকুরের সামনে বসে থেকে সে দ্রুত পোশাক বদলায়। ফুল প্যান্টের ওপর ঢোলা র্ট। লম্বা স্ট্র্যাপওয়ালা ব্যাগে একটা আপেল আর কয়েকটা বিস্কুট পুরে নিয়ে যখন দরজায় তালা য়ে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা গাড়িতে উঠে বসে তখন দশটা বাজতে মিনিট কুড়ি বাকি।

কলকাতায় গাড়ি চালানোর প্রশ্নই ছিল না। এখানে যখন ফ্ল্যাট ছিল তখন সাহস হয়নি, যাগও ছিল না। চাকরির প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে শিখতে হয়েছে তাকে। এখনও এই মধ্যচল্লিশে

এসেও বেশিদূরে গাড়ি চালিয়ে যেতে সাহস হয় না তার। বাড়ি থেকে অফিসে পৌঁছতে হাইওয়েতে উঠতে হয় না, প্যারালাল রাস্তা দিয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় বলে বাঁচোয়া।

পার্কিং-এ গাড়ি রেখে দ্রুত যখন ডিপার্টমেন্টাল শপের বারান্দায় ওঠে তখন কাঁচের দরজাটা আপনা থেকেই সরে গিয়ে পথ করে দেয়। রোজ এই মুহূর্তে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়ায় শুভ্রা। ছেলেবেলায় পড়া গল্পের যাদুবিদ্যায় খুলে যাওয়া দরজার কথা মনে পড়ে। দরজা পার হতেই বেশ কয়েকবার তাকে গুড মর্নিং বলতে হয়। তারপর কাজ শুরু। এখানে খদ্দেররা ঘুরে ঘুরে নিজেরাই জিনিসপত্র হাতে তুলে ট্রলিতে চাপিয়ে কাউন্টারে যায়। সেইসব অগোছালো জিনিসগুলোকে সঙ্গে সঙ্গে সঠিকভাবে রাখার দায়িত্ব যাদের তাদের একজন শুভ্রা। বসে থাকার কোনো উপায় নেই। বুকে ব্যাচ এঁটে কাজটা করে যেতে হয়। ওর পাশের রো-তে যে মেয়েটি কাজ করে সে হিসপ্যানিস। ফর্সা, লম্বা সুন্দর চেহারা। প্রথম প্রথম সাদা আমেরিকান বলে ভুল করত। পরে জেনেছে ও হিসপ্যানিস। অর্থাৎ মা বা বাবার কেউ কখনও স্পেনের বাসিন্দা ছিল। ভারতের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মত আর কি ! মেয়েটি ইতিমধ্যে চারবার বিয়ে করেছে। চার-চারটে তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও মেয়েটি হাল ছাড়েনি। সম্প্রতি আবার প্রেমে পড়েছে। শুভ্রা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ছেলেদের সম্পর্কে তোমার এখনও মোহ আছে ?'

'কেন থাকবে না ? আমার বাবাও তো ছেলে। মাকে কী ভালই না বাসত ! সেরকম কাউকে তো পেয়েও যেতে পারি, তাই না ?'

'ভাগ্যিস তোমার ছেলেমেয়ে হয়নি !'

মেয়েটা হেসেছিল। আজ পাশের রো থেকে মেয়েটি বলল, গুড মর্নিং, তোমাকে খুব দুঃখী-দুঃখী দেখাচ্ছে কেন ?'

'তোমার মতো প্রেমে পড়িনি তাই।'

'দূর ! আমার প্রেম এখন নেই।'

'সেকি ! সে কোথায় গেল ?'

'বড্ড বেশি মদ খায়। আমি জানতাম না। জানার পর বললাম, পথ দ্যাখো। মদের বোতলকে সতীন বলে ভাবতে পারব না।' মেয়েটি তার কাজে চলে গেল।

এরা বেশ আছে। কিন্তু এদেশে আসার আগে তো তার অন্য ধারণা ছিল। এখানকার মেয়েরা কোনো সামাজিক নিয়ম মানে না। স্বাধীনতার অপব্যবহার করে, সেক্স-এর ব্যাপারে বাছবিচার নেই। ইত্যাদি।

কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো সাদা আমেরিকান মেয়েকে উচ্ছৃঙ্খল হতে দ্যাখেনি সে। ক্যাথলিন নামে একটি মেয়ে এখানে কাজ করত। তিনশো বছর আগে ওর পূর্বপুরুষ এসেছিল স্কটল্যান্ড থেকে। পরবর্তীকালে যারা এসেছে এবং শঙ্কর প্রজাতি সৃষ্টি করেছে ও তাদের দলে নয়। ক্যাথি খুব চুপচাপ থাকত, অল্প হাসত। ওর ইংরেজি বুঝতে পারত সে। একদিন লাঞ্চের সময় শুভ্রা যখন আপেল আর বিস্কুট খাচ্ছে তখন ক্যাথি এসে তার পাশে বসল। বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'বল।' শুভ্রা অবাক হলো।

'তুমি তো ভারতীয় ? গুজরাতের লোকেরাও তো ভারতীয়, তাই না ?'
'নিশ্চয়ই।'
'তোমাদের কি এক ভাষা, এক কালচার ?'
'না। ভারতবর্ষের মানুষ হলেও আমাদের সব কিছু আলাদা।'
'তাহলে তোমার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই।'
'তোমার কি সমস্যা বল, আমি সাহায্য করতে পারি।'
'তুমি জানো কিনা জানি না, আমরা যারা অরিজিন্যাল আমেরিকান তারা সাধারণত াদের সঙ্গে প্রেম করি না। প্রেম না করলে বিয়ে তো হতেই পারে না। আমার দিদি হসপিটালে ছ। যে ডাক্তার ওকে অপারেশন করেছে সে ভারতীয়, গুজরাতি। হ্যান্ডসাম চেহারা। লোকের আমাকে ভাল লেগেছে। এরকম তো কত লোকের লাগে ! আমি পাত্তা দিইনি। কে দেখে চলে আসতাম। কিন্তু ভদ্রলোক সরাসরি আমাকে প্রস্তাব দিয়েছেন। উনি ওঁর য়র সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে চান। আমি ওঁর ভাষা, সংস্কৃতি জানি না। তাছাড়া ং আমি কেন আমাদের গণ্ডীর বাইরে বিয়ে করতে যাব ?'
'উনি কি আমেরিকান নাগরিক নন ?'
'হ্যাঁ। কিন্তু উনি ইণ্ডিয়ান-আমেরিকান।'
'তা তুমি যখন মেনে নিতে পারছ না তখন সমস্যা কোথায় ?'
'আমার দিদি বলছে ভদ্রলোক খুব ভাল। গত পরশু আমার সঙ্গে খানিকটা হেঁটেছেন। ছা, আমি কি ওঁকে বাড়িতে আসতে বলতে পারি ? গুজরাতিরা কিরকম মানুষ হয় ?'
'সাধারণত ওরা শান্ত, শিক্ষিত, তবে কেউ কেউ তো আলাদা হয়। তুমি ওকে বাড়িতে ত বলবে কেন ?'
'বাঃ, আমি কাকে বিয়ে করছি তা আমার মা-বাবা জানবে না ? ওরা কথা বলে বুঝবে ার পছন্দ ঠিক কিনা।'
'কথা বলে কি বোঝা যায় ?'
'জানি না, তবে ওদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য।'
'সে কি ? তোমরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নাও না ?'
'সিদ্ধান্তটা আমার কিন্তু ওদের না জানিয়ে নয়। আচ্ছা— !'
অবাক হয়ে গিয়েছিল শুভ্রা। একজন সাদা-আমেরিকানের সঙ্গে আজকের কলকাতার টি শিক্ষিত মেয়ের কোনো পার্থক্য খুঁজে পায়নি সে। অথচ সিনেমা এবং টিভির মাধ্যমে কে কি রকম ভুল ধারণা করে ! ক্যাথি শেষপর্যন্ত গুজরাটি ছেলেটিকে বিয়ে করেনি। াছিল, 'আমাদের দুজনের বড় হওয়ার ধরনে এত পার্থক্য যে ভবিষ্যতে গোলমাল হবেই। দরকার জীবনটাকে জটিল করে !'
চাকরির এই সময়টায় মন বেশ ভাল থাকে। সময়টা কেটে যায় দ্রুত। তারপর আবার ড় চালিয়ে শূন্য বাড়িতে ফিরে আসা। শ্যামল ফিরবে ছটায়। গাড়ি থেকে নেমে বাড়ি লন গাছালির দিকে তাকিয়ে থাকে শুভ্রা। কলকাতায় এমন বাড়ির কথা সে ভাবতে পারত

কখনও ? এরকম বাড়ি ওখানে যাদের আছে তারা তো কোটিপতি !

এই আটবছরে শ্যামলের নিকট আত্মীয়দের অনেকে এখানে এসে থেকে গেছে দেশ থেকে শুভ্রার এক মামাতো দাদা-বউদি এসে কয়েকদিন ছিলেন। তাঁদের কাছে বাড়ির বর্ণনা শুনেছে মা-বাবা। শুভ্রা তাঁদের লিখেছিল বেড়াতে আসার জন্যে। কিন্তু এক লক্ষ টাকা খরচ করার মত অবস্থা তাঁদের নয়, আবার মেয়ে-জামাই-এর টাকায় বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছে তাঁদের নেই।

দরজার বাইরে দাঁড়ালে হাইওয়ে দিয়ে ছুটে যাওয়া গাড়ির শব্দে কান ঝালাপালা। এই শ কমাতে হাইওয়ের দুপাশে আড়াল তোলা হচ্ছে। এ দেশের মানুষকে কোনো অসুবিধে বে দিন ভোগ করতে হয় না।

দরজা খুলে ভেতরে যাওয়া মাত্র নিস্তব্ধতা। কোথাও কোনো আওয়াজ নেই। শীতকা উষ্ণতার গরমে ঠাণ্ডার ব্যবস্থা করা আছে পুরো বাড়ি জুড়ে। ওয়াল টু ওয়াল অফহোয়া কার্পেট, পা ফেললে ডুবে যায়। বিশাল হলঘরটাকে আধখানা পার্টিশন দিয়ে রহস্যময় ক হয়েছে। শুভ্রা চুপচাপ ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল। এতবড় টিভি সে দেশে কারও বাড়ি দ্যাখেনি। ও পাশের তাক জুড়ে পঙ্কজ মল্লিক থেকে সুমন চ্যাটার্জীর ক্যাসেট সাজানো। এ কোনো বাঙালি গায়ক নেই যার গান শ্যামল সংগ্রহ করেনি।

পোশাক ছাড়ল শুভ্রা। এখন সালোয়ার কামিজ। শাড়ি পরার সুযোগ কোনো অনুষ্ঠা গেলে পাওয়া যায়। চায়ের জল গ্যাসে বসিয়ে ফ্রিজ খুলে দেখে নিল রবিবারের রান্না কি পড়ে আছে। সেই দেখে খানিকটা নতুন রান্না সেরে নিল চা খেতে খেতে। তারপর বেরিয়ে পড় যন্ত্র নিয়ে ঘাস কাটতে। একটা লোক প্রত্যেক মাসে দুবার এসে ঘাস কেটে দিয়ে যায়। চারব এলে বেশি টাকা দিতে হবে বলে এই অবস্থা। নিজের গাড়ি চালিয়ে ঘাস কাটতে আসে লোকট

অনেকটা ঘাস কেটে ঘর্মাক্ত শুভ্রা বাড়িতে ঢোকে। এবার কার্পেট পরিষ্কার করা। রো এক একটা দিকে মেশিন চালায় সে।

এই সময় শ্যামল ফেরে। মেইল বক্স থেকে চিঠির তাড়া নিয়ে সোফায় বসে। বেশির ভাগ বিভিন্ন কোম্পানির বিজ্ঞাপন। সেসব দেখে বলে, 'বাচ্চু ফোন করেছিল, ভাল আছে। রনি ফোন করেছ ?'

'করেছিলাম, পাইনি।'

'মেয়েটা যে কি করে !' শ্যামল বাথরুমে চলে গেল।

এদেশের কলেজের পড়ুয়ারা হোস্টেলে থাকে। বড় ছেলে পরীক্ষার আগে ক্যাম্প ইন্টারভিউ দিচ্ছে। গত পরশু ফোনে বলেছে যে সে চাকরি পেয়ে গেছে। এখন মাসে আট হাজ ডলার পাবে। একুশ বছর বয়সে অত টাকার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি শ্যামল। গাড়ি চালি এখান থেকে ওর কর্মস্থলে পৌঁছতে ঘণ্টা-দেড়েক সময় লাগলেও ও বাড়িতে থাকবে না। অফিসে কাছাকাছি ফ্ল্যাট ভাড়া করবে। আপাতত ফ্ল্যাটে যা লাগবে তা বাবা-মায়ের কাছ থেকে নেবে একাই থাকবে। পরিষ্কার বলে দিয়েছে, 'তোমরা যদি আমার ওখানে যেতে চাও ফোন করে যেও না বলে যাওয়া আমি পছন্দ করি না।' পরশু রাত্রে ঘুমোতে পারেনি শুভ্রা। তুলনায় মেয়ে র কিছুটা নরম। তবে বাঙালি ছেলেকে বিয়ে করতে একদম নারাজ। বলে, 'ওঃ হরিবল ! কিরব

ক্যাবলা-ক্যাবলা হয় ! বাবা হিসেবে মেনে নেওয়া যায়, বর হিসেবে ভাবতেই পারা যায় না।'

স্নান সেরে চায়ের কাপ নিয়ে ক্যাসেট চালায় শ্যামল। সেদিনের সোনাঝরা সন্ধ্যা আর এমনি মাধবী রাত মিলে— । সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটার চরিত্র বদলে যায়। অনেক অনেক বছর আগের দিনগুলো ফিরে আসতে চায়।

আটটার মধ্যে ডিনার। এঁটো ডিস গ্লাস ধুয়ে রান্নাঘর পরিষ্কার করা হয়ে যায়। এসব শুভ্রাকে একা করতে হয় না, শ্যামলও হাত লাগায়। খেতে বসে দু'চারটে কথা। বেশিরভাগই বৈষয়িক। অথবা সামনের শুক্রবারে কোথায় নেমন্তন্নে যেতে হবে তার খবর।

কাজ এবং খাওয়া শেষ হলে টিভি দেখতে বসে শ্যামল আর টেলিফোন তুলে নেয় শুভ্রা। নিউইয়র্ক তো বটেই আমেরিকার বিভিন্ন শহরে পরিচিত বাঙালি মহিলা প্রচুর। নিউজার্সির বন্দনার আজকে দেশ থেকে আসার কথা। 'হ্যালো বন্দনা, কখন ফিরলে ? ডিস্টার্ব করছি না তো ? থ্যাঙ্ক ইউ। দেশের খবর কি ? খুব গরম ? ও। হ্যাঁ— । তুমি গিয়েছিলে ? মায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে ? আচার দিয়েছে আমার জন্যে ? কষ্ট করে নিয়ে এলে, কি বলে ধন্যবাদ দেব ! হ্যাঁ। নিয়ে আসব। মাকে কেমন দেখলে ? হ্যাঁ, বয়স তো হচ্ছেই। দেখি কবে যাই— । আচ্ছা—বাই।'

রাত সাড়ে নটায় এ বাড়িতে ঘুম নামার কথা। বিছানার এক পাশে শ্যামল, কাৎ হয়ে শোওয়ার দুমিনিটের মধ্যেই ঘুমে কাদা। সারাদিনরাতে শ্যামলের সঙ্গে কটা কথা হয় ? বড়জোর পাঁচ কি ছয়। দুটো মানুষ একসঙ্গে থাকতে থাকতে একসময় কথা ফুরিয়ে যায়, রোজ এক জীবনযাপন করতে করতে ক্লান্তি এসে যায়। শ্যামলকে দোষ দেওয়ার কোনো মানে হয় না।

আরও কিছুক্ষণ বাদে শোওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে শুভ্রা। অন্ধকারে হেঁটে বাইরের দরজা খুলে বারান্দায় চেয়ারে এসে বসে। আজ কি প্রথম চাঁদের রাত ? ঘোলাটে আলো বাগানে নেমেছে। ওপাশের হাইওয়েতে সেই পাগলের মতো ছুটে যাওয়া গাড়িগুলো এখনও সমুদ্রের গর্জন তুলছে। এই বিশাল বাড়ির পরতে পরতে সুখ। কত সুখ। নিঃশব্দে কেঁদে যায় শুভ্রা।

॥ ৩৬ ॥

আড়াই বছর আগে এই লেখা শুরু করেছিলাম। শুরু হলে তো তার শেষ তো অনিবার্যভাবেই হয়। কিন্তু এ এমন বিষয় যা একজন্মের অভিজ্ঞতায় শেষ করা যায় না। তবু যাঁদের দেখেছি তাঁদের অনেককেই এই লেখায় হাজির করেছি। পঁচিশ বা তিরিশ বছর আগে যিনি আমার জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন, এই লেখায় নিজেকে দেখে যোগাযোগ করেছেন। এইটে কম লাভ নয়। আমার এই পর্যন্ত যে জীবনযাপন তাতে

থেকে মহিলাদেব ভূমিকা কম নয়। অল্প বয়সে কৌতূহল থাকত, যেহেতু আমাদের বাড়িতে কোনো অল্পবয়েসি মেয়ে ছিল না। ঠাকুর্দা এবং বিধবা পিসিমার শাসনে বড় হচ্ছিলাম। সুতরং মহিলাদের সম্পর্কে আমাপ আগ্রহ থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যৌবনে পা দিয়ে আর এক ধরনের সম্পর্কের গন্ধ পেতাম। এসব কথা লেখার চেষ্টা করেছি। পঞ্চাশে পা দিয়ে আবিষ্কার করলাম খুব অল্প আলাপেই মেয়েদের আস্থা পেয়ে যাচ্ছি। হয়তো আমার মাধবীলতা, জয়িতা অথবা দীপাবলী এই ব্যাপারে মেয়েদের সাহসী করেছে। তাঁরা খুব অকপটে আমাকে নিজের মানুষ ভাবতে পারছেন। এই নিজের মানুষ বাবা অথবা দাদা সম্পর্কেই ভাবা যায়। এই ভূমিকায় নিজেকে সুস্থির রাখলে খুব চাপ আসে। আবার ভালও লাগে।

এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট ঘটনা বলি। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটে আমার এক স্নেহাস্পদ বাঙালি যুবকের বাংলা বই এবং ক্যাসেটের দোকান আছে। ছেলেটি নিঃস্ব অবস্থায় ওদেশে গিয়ে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে গত কয়েক বছরে দোকনটি করেছে। তার ব্যবহারে তামাম বঙ্গকুল মুগ্ধ। ব্যবহার এবং পণ্যের কারণে সেইসব মানুষ ওর দোকানে ভিড় করেন। দুপুর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত। এর আগেরবার ওর সঙ্গে পরিচিত হয়েই আত্মীয় হয়ে গিয়েছিলাম, ওর বাড়িতে গিয়ে ওর স্ত্রী এবং সন্তানদের দেখেই। তারা খুব ছোট। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ছেলেটি বিয়ে করেছে। বউ চমৎকার সুন্দরী। দোকান থেকে বাড়ির দূরত্বে হাঁটলে মিনিট দশেক। সেবার ওর বউ আমাকে বলেছিল, 'দাদা, আপনাকে দেখলে দাদা ছাড়া কিছু ভাবা যায় না।' আমি হেসেছিলাম।

এবার সেখানে গিয়ে দেখলাম ছেলেটার ব্যবসা আরও বেড়েছে। হিমশিম খাচ্ছে সে। কাজের লোক থাকলেও খদ্দেররা তার সঙ্গে কথা বলতে চায় বলে সমস্যা। বললাম, 'বউকে দোকানে আনছো না কেন ? সে থাকলে সাহায্য করতে পারত।' ছেলেটি বলল, 'তাই তো আগেই করতাম দাদা। বাচ্চারা হওয়ার পর সে আর বেরুতে পারে না। ওরা খুব দুরন্ত। আর ঘরে আটকে থেকে আপনার বোনের শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

পাঠকের মনে রাখা উচিত, নিউইয়র্কের মধ্যবিত্তের ঘর মানে দুই কামরার ফ্ল্যাট। আশেপাশে কোনো বাঙালি নেই যে গল্প-গাছা করা যাবে। দিনরাত মুখ বুজে বাচ্চাদের সামলানো ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। দোকান থেকে ফোন করলাম। মেয়েটি আমার গলা শুনেই চিৎকার করল, 'দাদা না ? কবে এসেছেন ? এখনও আসেননি কেন ?'

বললাম, 'যাব। কিন্তু তুমি নাকি সুস্থ নও ?'

হঠাৎ মেয়েটি কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি মরে যাবো দাদা, আমি মরে যাবো।'

সেদিন জোর করে তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে ওর ফ্ল্যাটে গেলাম। দরজা খুলে আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল। পাঠক, বুঝতেই পারছেন, এর সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার দেখা, পাশে এর স্বামী দাঁড়িয়ে আছে, অতএব অস্বস্তি হওয়া খুব স্বাভাবিক।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে ? তুই এরকম করছিস কেন ?'

'আমি আর পারছি না দাদা। আমি মরে যাব।'

'ঠিক আছে। আগে শান্ত হ। শুনি তোর কথা।'

এর আগেরবার ওকে তুমি বলেছিলাম। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মুখ থেকে তুই বেরিয়ে ল। নিজের কানে সেটাকে খুব স্বাভাবিক শোনাল।

আমি জানলাম, ছেলেটি সেই সকালে বেরিয়ে যায়। বিভিন্ন জায়গায় অর্ডার দিতে এবং নতে হয়। তারপর দোকান। সেটা বন্ধ হয় রাত এগারটায়। এই এতক্ষণ সময় একা থাকতে কতে ওর নার্ভ আর সহ্য করতে পারছে না। সেই সঙ্গে আছে বাচ্চাদের দৌরাত্ম্য। তারা ওকে গল করে মাবে। এই দৌরাত্ম্যের নমুনা আমি নিজের চোখেই দেখলাম। আমাদের দেশে থাকথিত মায়েদের আত্মত্যাগের কথা জানি। তা নিশ্চয়ই খুব শ্রদ্ধার ব্যাপারে কিন্তু াত্মহত্যাকে কি শ্রদ্ধা করতে পারি ?

ছেলেটিকে বললাম একটা সুরাহা করতে যাতে মেয়েটি বাইরে বেরুতে পারে। শেষ পর্যন্ত নেক আলোচনার পর ঠিক হলো। অর্ডার নিয়ে ছেলেটি বাড়িতে ফিরে আসবে আর মেয়েটি য়ে দোকান খুলবে। ঘন্টাতিনেক বাচ্চাদের সামলে ছেলেটি বাড়িতে খেয়ে নেবে। তারপর য়েটি মিনিটকুড়ির জন্যে কর্মচারীর ওপর দোকানের ভার দিয়ে ফিরে এলে ছেলেটি সেখানে াবে।

মেয়েটি বলল, 'জানেন দাদা, একথা ওকে বলেছিলাম। তখন বলেছে তুমি পারবে না। খন আপনি বলতে রাজী হলো।' সে চোখ মুছল। তার ঠোঁটের কোণে হাসি।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি পারবে তো ?'

'নিশ্চয়ই পারব। আমি তো বাচ্চা হওয়ার আগে দোকানে যেতাম।'

সে রাতে বেরিয়ে আসার আগে মেয়েটি বলল, 'দাদা— !'

'বল।'

'আপনি আবার কবে আসবেন ?'

'দেখি।'

'না দাদা, সামনের বছর আসতে হবে। আপনাকে দেখলে মনে খুব ভরসা আসে। জানি েশে আসতে অনেক টাকার টিকিট লাগে, কিন্তু কেউ না কেউ তো আপনাকে নেমন্তন্ন বেই।'

যা বলছিলাম, এই এক নতুন ভূমিকায় নেমেছি এখন। এই গল্পমালা কোথায় শেষ হবে ন না। জানতেও চাই না। তবু এই লেখাটা না হয় শেষ হোক এমন একজনকে নিয়ে।

মেয়েটির নাম শামা।

শ্যামা নয়। বাংলা দেশের ঢাকা শহরের এই সুন্দরীর নাম শামা। মেয়েটিকে ঈশ্বর তিনটি পদ দিয়েছিলেন। প্রথমটি চোখ। গহীন গাঙের জলের নিচে যে স্বপ্নের আলো চলকে ওঠে তার কলতা ওর চোখে। কণ্ঠস্বরে অপূর্ব যাদু। আর যাকে বিশ্বাস করতে পারলো তার জন্য লক্ষ ল হেঁটে যেতে পারে। এমন মেয়ের সংখ্যা এপার এবং ওপার বাংলায় অনেক। শামা তাদের নই একজন সাধারণ মেয়ে কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলে তাকে অসাধারণ বলে মনে হবেই।

ওরা থাকতো ঢাকায়। একাত্তরের স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশে অনেক রাজনৈতিক দল

আত্মপ্রকাশ করে। তখন 'আওয়ামি লীগের রাজত্ব শেষ। বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছেন। বাংলাদেশে প্রেসিডেন্টের শাসন চলছে। শামার বাবা একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এবং সরকারবিরোধী দলের সমর্থক। নির্বাচন আসছিল। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা তুঙ্গে। সাধারণ মানুষের হাতে অস্ত্র চলে আসায় খুনখারাপি অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। কিশোরের পকেটেও পিস্তল দেখা যাচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কাজে লাগাচ্ছে।

শামার বাবা ফরিদপুরের মানুষ। বেশ জনপ্রিয় তিনি সেখানে। নিজে নির্বাচনে না দাঁড়ালেও পছন্দসহ প্রার্থীকে জিতিয়ে নিয়ে আসার ক্ষমতা তাঁর আছে। একদিন শাসকদলের একজন সদস্য তাঁর কাছে এলেন। এই বয়স্ক মানুষটিকে শামার বাবা দীর্ঘকাল চেনেন। দুটো আলাদা দল হলেও সম্পর্ক ভাল। ভদ্রলোক প্রস্তাব দিলেন ফরিদপুরের ওই কেন্দ্রে শাসকদলের প্রার্থীকে সমর্থন করতে হবে শামার বাবাকে। করলে নানা উপঢৌকন দেওয়া হবে। এমন কি পৃথিবীর কোনো এক দেশে রাষ্ট্রদূত করেই পাঠানো যেতে পারে।

শামার বাবা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এরপর নানভাবে তাঁর উপর চাপ এল। অনুরোধ থেকে শাসানি সব চলল। ভদ্রলোক অবিচল।

শামা তখন কলেজে পড়ে। বাড়ি থেকে আর পাঁচটা মেয়ের মতো রিক্সায় যাওয়া আসা করে। কলেজে সে খুব জনপ্রিয়। জীবনানন্দের কবিতা তার গলায় ছবি হয়ে যায়। কলেজের বাইরের পথঘাটে বা অন্যত্র মেয়েদের স্বাধীনতা খুব কম হলেও কলেজ কম্পাউণ্ডের ভেতর সংস্কৃতিচর্চার কোনো বাধা নেই। শামার সঙ্গে পরিচিত হতে তাই সব ছাত্র আগ্রহী।

একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটা গাড়ি এসে শামার রিক্সার পথরোধ করল। গাড়ি থেকে নেমে এল তিনজন স্বাস্থ্যবান মানুষ। একজন মুখ চেপে ধরল। বাকি দুজন চ্যাঙদোলা করে গাড়িতে তুলে নিল। প্রকাশ্য রাস্তায় ঘটনাটা ঘটলেও কেউ বাধা দিতে পারল না। এসব ঘটনা যারা ঘটায় তাদের সঙ্গে অস্ত্র থাকে। দয়ামায়া থাকে না।

সেই গাড়ি শামাকে নিয়ে গেল সংসদ ভবনে। একটি বিশেষ ঘরে বসিয়ে অভয় দেওয়া হলো। সেই বৃদ্ধ রাজনৈতিক কর্মী, যাকে শামা বাবার কাছে আসতে দেখেছে, অভয় দিলেন, 'তোর কোনো ভয় নেই, মা। তোর বাপের মনে শুভবুদ্ধির উদয় হলেই তোকে বাড়িতে পৌঁছে দেব।'

শামার বাবা টেলিফোন পেলেন। তাঁর মেয়েকে ছেড়ে দেওয়া হবে যদি তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন শাসকদলের প্রার্থীকে সমর্থন করছেন। ভদ্রলোক প্রচণ্ড রেগে গেলেন। থানায় পৌঁছে ডায়েরী করতে চাইলেন। কিন্তু যে মেয়েকে সংসদ ভবনে আটকে রাখা হয়েছে তাকে উদ্ধার করার সাহস পুলিসের ছিল না। এমন কি তারা ডায়েরী নিতেও রাজী হলো না।

তিনদিন শামা সংসদ ভবনে বন্দী হয়ে ছিল। প্রচুর কান্না কেঁদেছে সে। অনেক অনুনয় করেছে। বরফ হলে গলে যেত, পাথর বলে গলেনি। যখন চক্রান্তকারীরা বুঝতে পারল চাপে ভেঙে পড়ছেন না শামার বাবা তখন তারা অন্য পথ ধরল। বৃদ্ধ এসে বললেন, 'মারে, কাঁদিস না। আজ তোর বিয়ে।' শামা অবাক। বৃদ্ধ বললেন, 'একজন তোকে অনেকদিন থেকে ভালোবাসে। তোকে বিয়ে করতে চায়।'

শামা রাজী হলো না। যাকে চেনে না তাকে বিয়ে করবে কেন? কিন্তু বর এল না

দলে মৌলবী এল আংটি নিয়ে। সেই আংটি পরিয়ে দেওয়া হলো শামার আঙুলে। বলা হলো, ায়ে হয়ে গেছে। তারপর জোর করে দুটো ফর্ম সই করানো হলো। একটা তার পাশপোর্টের াবেদনপত্র অন্যটি ভিসার। বৃদ্ধ বললেন, 'তোকে এখন স্বামীর ঘর করতে যেতে হবে রে। তার স্বামী থাকে আমেরিকায়। সেখানে গিয়ে তুই কলেজে ভর্তি হবি। কত লেখাপড়া শিখবি।'

সংসদ ভবনে আসার পর জোর করে দুধ বা জল না খাওয়ালে কিছুই খায়নি শামা। সারাক্ষণ ান্নাকাটি করায় তার শরীর দুর্বল হয়েছিল। ওরা যখন তাকে ইনজেকশন দিল সে প্রতিবাদ রতে পারলো না। বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে তাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে আসা হলো। ইনজেকশনের ান্যে তার কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। তাকে প্লেনে তুলে দেয়া হলো। সঙ্গে এলো সেই বৃদ্ধ।

নিউইয়র্কে নেমে ইমিগ্রেশন সমস্যা দক্ষ হাতে সামলে নিলেন বৃদ্ধ। তারপর ট্যাক্সি করে লেলেন ব্রংক্সের একটা আটতলা ফ্ল্যাটে। ব্রংক্স নিগ্রো এবং হিসপ্যানিয়ানদের পাড়া। সখানে কোনো বাঙালি থাকে না। থাকতে ভয় পায়।

বৃদ্ধ খুব সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু একটাও কথা বলতো না শামা। তার চোখে কাঁদতে কাঁদতে ্যথা জমেছিল, জল শুকিয়েছিল। বৃদ্ধ খাবার আনতেন। সামান্যই দাঁতে কাটতো সে। দশদিনে শ কেজি ওজন কমে গিয়েছিল শামার, মাথা ঘুরত সবসময়।

একদিন বৃদ্ধ বললেন, 'আজ তোর বর আসবে মা। একটু সেজেগুজে থাক। তোদের আজ ্রথম মিলনের রাত।'

শামা ভয়ে কাঁটা হয়ে রইল। বৃদ্ধ যখন টয়লেটে তখন সে দরজা খুলে পালাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু করিডোরে প্রতিবেশী বিশাল চেহারার নিগ্রোদের দেখে আর সাহস পায়নি। ্খন আবার ঘরের কোণে বসে দুহাতে মুখ লুকোনো ছাড়া কোনো উপায় নেই। এই বাড়িতে টলিফোন আছে। কিন্তু কত নম্বর ডায়াল করলে বাংলাদেশে লাইন যাবে, ঢাকায় ওদের বাড়িতে টলিফোন বেজে উঠবে সেটা তার জানা নেই। শামা কাঁদতে লাগল।

লোকটা এল দুপুরে। বৃদ্ধ তাকে সমাদরে বসালেন। তারপর শামার ঘরে এসে বললেন, তোর বর এসে গিয়েছে। এবার আমার ছুটি।'

যে মানুষটি তাকে ঢাকা থেকে নানান বাহানা দেখিয়ে নিউইয়র্কে নিয়ে এসেছে সেই ানুষটির পায়ে পড়েছিল শামা। কিন্তু বৃদ্ধ হেসেছিলেন। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরই লাকটা ঢুকেছিল। বলেছিল, কান্নাকাটি তার একদম ভাল লাগে না। নেতার নির্দেশে তাকে বিয়ে করতে হয়েছে যখন তখন বউকে ভোগ করার অধিকার তার আছে। দুর্বল শরীরে শামা াধা দিতে পারেনি। লোকটা যখন পরিতৃপ্ত হলো তখন শামা সংজ্ঞাহীন। জলের ঝাপটা দিয়েও খন তার জ্ঞান ফিরে এল না তখন তাকে নিয়ে যাওয়া হলো হাসপাতালে। ডাক্তার বললেন, ানসিক ধাক্কা এবং শারীরিক দুর্বলতার কারণে অমন হয়েছে। পেশেন্টকে অন্তত একমাস ারীরিক সম্পর্ক থেকে রেহাই দেওয়া উচিত। বৃদ্ধ শামাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন ফ্ল্যাটে। তার ্বামী আবার উধাও।

শরীরে কোনো পরিবর্তন আসছে কিনা সে-ব্যাপারে শামা সম্পূর্ণ অসচেতন ছিল। যেটুকু া খেলে মানুষ বাঁচতে পারে না সেটুকুই সে খেত। বৃদ্ধ ভোরবেলায় বেরিয়ে যেতেন, ফিরতেন

রাতে। যাওয়ার সময় দরজায় তালা দিয়ে যেতেন। সারাদিন কেউ না কেউ বেল বাজাতো আর শামা শিউরে শিউরে উঠত। তিনমাস পরে আবার স্বামী এলেন। তাঁকে দেখেই অজ্ঞান হয়ে গেল শামা। তার হাত-পা কাঁপতে লাগল। ফলে আবার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে আবিষ্কৃত হলো শামা গর্ভবতী। একমাস ধরে তাকে সুস্থ করার চেষ্টা হলো। শেষপর্যন্ত ডাক্তাররা ঘোষণা করলেন, ওর পেটে যে ভ্রূণ রয়েছে সেটি মৃতপ্রায়। অবিলম্বে সেটাকে শরীর থেকে বের করে না দিলে শামার জীবন বিপন্ন হবে। বৃদ্ধ রাজী হলেন। এই সময় ডাক্তাররা অন্য সিদ্ধান্ত নিল। মৃতপ্রায় ভ্রূণকে ওই অবস্থায় বের করে এনে কৃত্রিম উপায়ে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করতে চাইলেন তাঁরা। কিন্তু গর্ভের ভেতর ভ্রূণ মারা গেলে ডাক্তাররা দায়ী হবেন না, গর্ভের বাইরে যদি মারা যায় তাহলে দায়িত্ব আসবে। তাঁরা চাইলেন সেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে শামা বন্ড লিখে দিক। শামা রাজী হলো। এইসময় একজন ভারতীয় নার্সের সঙ্গে আলাপ হলো হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে। শামা তাকে তার ঢাকার নাম্বার দিয়ে অনুরোধ করল বাবা-মাকে খবর দিতে।

ডাক্তাররা কৃত্রিম উপায়ে গর্ভজাত ভ্রূণকে বাইরে বের করে নিয়ে এসে বেলুনজাতীয় জিনিসের মধ্যে রেখে বিজ্ঞানের সাহায্যে জীবিত রাখার প্রয়াস চালালেন। শামা বিপদমুক্ত। এই সময় নার্সের টেলিফোন পেয়ে শামার বাবা-মা হাজির হলেন নিউইয়র্কে। দীর্ঘদিন পরে মেয়েকে আবিষ্কার করলেন ভিন্ন পরিস্থিতিতে। তাঁরা এসে পড়ায় বৃদ্ধ উধাও হয়ে গেলেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ শামা মা-বাবাকে নিয়ে ফিরে এল তাঁর ফ্ল্যাটে। মা-বাবা চাইলেন শামা তাঁদের সঙ্গে ঢাকায় চলুক। কিন্তু শামা অপেক্ষা করতে চাইল। কৃত্রিম উপায়ে যাকে বাঁচানো হচ্ছে সে মারা গেলেই ফিরে যাবে।

মাসখানেক অপেক্ষা করার পর শামার বাবা ফিরে গেলেন ঢাকায়, মা রইলেন। শামা প্রতিদিন হাসপাতালে যায়, বাচ্চাটাকে দূর থেকে বেলুনের মধ্যে দ্যাখে। এগারো মাসের মাথায় হাসপাতালের ডাক্তাররা একটি দু'পাউন্ড দশ আউন্সের শিশুকে শামার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'এ এখন কথা বলতে বা হাঁটতে পারবে না আগামী দু বছর। এখন থেকে একে নিয়ে সপ্তাহে দুবার আপনাকে এখানে এসে নানান পরীক্ষা করতে হবে। সেগুলোতে যদি শিশু রেসপন্ড করে তাহলে দুবছর বাদে সে স্বাভাবিক হবে।'

যেহেতু এই ধরনের ঘটনা ওই হাসপাতালে প্রথম হয়েছিল তাই শিশুটির যাবতীয় খরচ হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষ বহন করলেন। সাধারণত নবজাতকের ওজন সাত পাউন্ড হয়। এক্ষেত্রে মাত্র দু পাউন্ড দশ আউন্স ওজনের মানুষের মতো দেখতে একটি শিশুকে নিয়ে হিমশিম খেয়ে গেল শামা এবং তার মা। এই হাসপাতালে যাওয়া আসার পথে একটু একটু করে মানুষের সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। বাবা-মা আসার পর শামার তথাকথিত স্বামী বা সেই বৃদ্ধের দেখা না পাওয়া গেলেও ফ্ল্যাটের ভাড়া তাঁরা দিয়ে যাচ্ছিলেন। দৈনন্দিন খরচ মেটাচ্ছিলেন শামার বাবার টাকায়। ডাক্তারদের বদান্যতায় শামা হাসপাতালে একটা চাকরি পেল। রিসেপশনে ঘণ্টাচারেক বসতে হত রোজ। তার জন্যে দশ ডলার ঘণ্টা-পিছু দিতেন হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষ। রবিবার ছুটি।

শামা দেশে ফিরতে রাজী না হওয়ায় তার মা শেষ পর্যন্ত ঢাকায় ফিরে গেলেন। স্বামী-সংসার ফেলে তিনি অনেকদিন বিদেশে পড়েছিলেন। শামা তার ঢাকায় না যাওয়ার পক্ষে

কয়েকটা কারণ বলেছে। তার নিউইয়র্কে আসার কাহিনী দেশে প্রচারিত হয়েছে। সবাই জেনেছে একটি সাজানো বিয়ের শিকার হয়েছে সে। তারপর সে সন্তানের মা হয়েছে। যে বিয়ে সে নিজে মানে না সেই বিয়ের ফসল কি করে বহন করল এই কৈফিয়ৎ দেশে গেলেই তাকে দিতে হবে। লোকে তার সম্পর্কে কৌতূহলী হবে এবং হাসাহাসি করবে। এতে তার বাবার মাথা আরও হেঁট হবে। দ্বিতীয়ত দেশে গিয়ে সে কি করবে ? পড়াশুনা আর হবে না। তার পক্ষে সেখানে কোনো চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়। বাবার কাছে পড়ে থাকতে হবে সারাজীবন। তিন নম্বর সমস্যা হবে বাচ্চাটাকে নিয়ে। নিউইয়র্কের হাসপাতাল ওকে দু'বছর পর্যন্ত যে চিকিৎসা করে সুস্থতা এনে দেবে ঢাকায় তা সম্ভব নয়। আর শেষ যুক্তি হল, সে ওই লোকটার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চায়।

বাচ্চাটার যখন এক বছর বয়স, ওজন বেড়েছে, হাঁটতে বা কথা বলতে পারবে কিনা তখনও বোঝা যাচ্ছে না, তখন এক সকালে টেলিফোন এল, 'আমি তোমার স্বামী বলছি। একটু বাদেই আসছি।'

সেদিন শামা আতঙ্কিত হলো না। অপেক্ষা করল। তার থেকে বয়সে অনেক বড় মানুষটা আসামাত্র জিজ্ঞাসা করল, 'কি চান ?'

'এই ফ্ল্যাটের ভাড়া একবছরের জন্যে আগাম দেওয়া ছিল। সেটা আরও একবছরের জন্যে দিতে এসেছি। তাছাড়া তোমার সংসারের জন্যে কি লাগবে সেটাই বল।' ভদ্রলোক হাসলেন।

'এগুলো কেন করবেন ? শামা জানতে চাইল।

'তুমি আমার স্ত্রী বলে।'

'আমি আপনার স্ত্রী ? আমাকে জোর করে এদেশে এনেছেন আপনারা। আমার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে রেপ করেছেন। আপনি আমার স্বামী ? প্রমাণ দিতে পারেন যে আপনি আমাকে বিয়ে করেছিলেন ?'

'কেন ? মৌলবী তোমাকে আমার আংটি পরিয়ে দেয়নি ?'

'না, কেউ আমাকে কিছু পরায়নি। আর আংটি পাঠিয়ে বিয়ে করা হয়তো রাজা-বাদশাদের আমলে হত, কিন্তু আমেরিকার আইন সেটাকে মানবে না। আপনি আমার কেউ নন। একথা আমি হাসপাতালেও বলেছি। সেখানে আমার সন্তানের পদবী লেখা হয়েছে আমার পদবী অনুসারে। আপনি আমাকে রেপ করেছিলেন। হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষ বলেছিল আপনার কথা পুলিশকে বলতে। বলিনি। কিন্তু আবার যদি আপনি এই দরজায় এসে দাঁড়ান তাহলে আপনাকে আমি জেলে পাঠাব।'

লোকটি মাথা নিচু করে শুনল, 'কিন্তু তোমার চলবে কি করে ?'

'সেটা আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি দূর হন।'

লোকটি চলে গেল।

বাড়িভাড়াই সাড়ে সাতশো ডলার। দুজনের সংসার চালাতে গেলে অন্তত পনেরশ ডলার দরকার। হাসপাতালে চাকরি করে মাসে হাজারের বেশি পাবে না শামা। এসব শামার মা জেনে গিয়েছিলেন। তাই প্রতিমাসে দেশ থেকে পাঁচশো ডলার আসতে লাগল। বাবার অবস্থা ভাল। তিনি ওই টাকা দিতে পারেন।

কিন্তু শামার মনে দ্বিধা জন্মালো। উপায় নেই বলে তাকে টাকাটা নিতে হচ্ছে। কিন্তু বাবাকে সে অশান্তি ছাড়া কিছুই দিতে পারেনি। আরও একটা বছর তাকে অপেক্ষা করতে হলো। বাচ্চাটা কথা বলছে, হাঁটতে পারছে টলমলে পায়ে। ওকে একা রেখে কোথাও যাওয়া যাচ্ছে না।

কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সমস্যার সমাধান হলো। আশেপাশের ফ্ল্যাটের বিশাল চেহারার নিগ্রো হিসপ্যানিশদের মেয়েদের মায়েদের সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। ওরা শামার ইতিবৃত্ত জেনে গিয়েছিল। কোনো মেয়ে একা লড়াই করছে দেখলে পুরুষরা তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, মেয়েরা সাহায্যের হাত বাড়ায়। একজন হিসপ্যানিশ বৃদ্ধা বিনা পয়সায় বেবিসিটারের দায়িত্ব নিলেন। তাঁর কাছে বাচ্চাকে রেখে শামা কাজে বের হয়। হাসপাতাল ছাড়া আর একটি ডিপার্টমেন্ট স্টোরে কাজ নিল সে। তারপর বাবাকে লিখল, 'আমি স্বাবলম্বী হয়েছি। তোমাকে আর টাকা পাঠাতে হবে না।'

নিউইয়র্কের বাঙালিমহলের সঙ্গে একটু একটু করে পরিচয় হয়ে গেল শামার। সে ভাল কবিতা বলে, অভিনয় করতে পারে। অতএব পরিচিতি ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না। আবৃত্তি বা অভিনয়ের রিহার্সাল বসে তার ফ্ল্যাটে, কাজের পরে, ছুটির দিনে। যেসব অবিবাহিত বাঙালি যুবকের সঙ্গে তার আলাপ হয় তাদের অনেকের চোখে মুগ্ধতা দ্যাখে শামা। কিন্তু নিজের চারপাশে একটা লক্ষ্মণগণ্ডী তৈরি করে রেখেছে সে। প্রণয়প্রার্থীদের জানিয়ে দেয় সে বিবাহিত।

আমার সঙ্গে শামার পরিচয় দু'বছর আগে। গর্ভধারিণীর জয়িতা চরিত্র ওকে আলোড়িত করতে ছুটে এসেছিল, অটোগ্রাফ চেয়েছিল। আমি ওর খাতায় লিখেছিলাম, শামা ভালো থেকো তারপর কি মনে হতে 'শ' অক্ষরটি কেটে দিয়েছিলাম। সেই থেকে আমি ওর আর এক ছেলে হয়ে গেছি। এ বছর দেখলাম ও এবং আরও কয়েকজন মঞ্চ ভাড়া করে বাংলা কবিতার ওপর দারুণ অনুষ্ঠান করল। এবার বলল, 'সাতকাহনের দীপাবলীকে পড়ে আমি মুগ্ধ।'

মেয়েটা এখন শিশুকে বালকে নিয়ে যেতে পেরেছে। সুস্থ সংস্কৃতি করছে জমানো টাকা খরচ করে।

পাঠক, একেও তো দেখলাম। এই শামাকে কেউ যদি অন্য চোখে দেখে থাকেন তিনি নিশ্চয়ই সেটা পারেন। আমি যেমন দেখেছি তাই লিখেছি। গণেশ বা কার্তিকের পৃথিবী দর্শন নয়, এ আমার একান্ত নিজের উপলব্ধি। মেয়েরা কেমন হয়, ঈশ্বর জানেন না বলে প্রচারিত। ছেলেরা কেমন হয় এই প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? মনে রাখতে হবে, আমাদের অনেক দেবী, তাদের পূজো আমরা করি কিন্তু ভগবান বললেই আমরা একজন পুরুষমানুষকে কল্পনা করি, কোনো দেবী নয়।

আর সেই ভগবানরূপী পুরুষমানুষ তো মেয়েদের জানতেই চাইবেন না। তাতে অনেক সুবিধে।